রুনু
গুহ নিয়োগী
সাদা আমি
কালো আমি

মৃত্যুর ফাঁদ কেটে বারবার বেরিয়ে এল যে পুলিশ অফিসার, তাকে বিতর্কের ফাঁদও ছিঁড়তে হল একাধিকবার। পালিয়ে গিয়ে নয়, কর্ম দিয়ে। কর্মের সাধনায় মত্ত সে পুরোপুরি স্বতন্ত্র। তাই তারই ডাক আসে সন্ত্রাসবাদ দমনের, আরবান গেরিলাদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ার। বোমার অবিশ্রান্ত ধারার মাঝখান থেকে পুরনো কলকাতার হৃদয়কে ফিরিয়ে আনার। বর্ষার থিকথিকে অন্ধকার ভেদ করে কসবার জলা থেকে খুনীকে গ্রেফতার করার। আবার তারই কাঁধে চেপে বসে ফেরারি প্রতারককে খুঁজে বার করার দায়িত্ব, ব্যাঙ্ক কিংবা হাইওয়ে ডাকাত ধরে শাস্তি দেওয়ার চ্যালেঞ্জ। পারবে কি—?

(চতুর্থ খণ্ড)

৪

Sada Ami Kalo Ami
(Fourth Part)
by Runu Guha Neogi

Rupees Eighty Only

M. L. Dey & Co.
(Estd : 1868)
13/1, Bankim Chatterjee Street
Calcutta 700 073

রঞ্জন গুহ নিয়োগী

সাদা আমি কালো আমি

(চতুর্থ খণ্ড)

এম. এল. দে এণ্ড কোং

১৩/১, বঙ্কিম চাটার্জী স্ট্রিট,

কলকাতা-৭০০০৭৩

আমার পরম পূজনীয়
পিতৃদেব ৺সত্যেন্দ্রনাথ গুহনিয়োগীর স্মৃতির
উদ্দেশে—

আরও ক'টি কথা

নতুন সহস্রাব্দে পৃথিবীর সঙ্গে আমরাও পা দিয়েছি। নতুন শতাব্দী ও সহস্রাব্দকে বরণ করার চারদিকে কত আয়োজন, কত উদ্দীপনা, কত শপথ। প্রত্যেকের মূল কথা এবং উদ্দেশ্যে নতুন শতাব্দী ও সহস্রাব্দে আমরা পৃথিবীকে নতুন করে সাজাব। সেখানে শুধু শান্তি ও সুন্দরের পুজো হবে।

এ সব শুনতে খুবই ভাল লাগে। কিন্তু প্রশ্ন, করবেটা কে? সমাজের কাণ্ডারীরা? নাকি সাধারণ অগণিত মানুষ? কাণ্ডারীদের যে সেই সদিচ্ছা আছে এমন কোনও দৃষ্টান্ত আমাদের কাছে নেই। তারা মানুষের সঙ্গে মানুষের বিভাজন সৃষ্টি করেই টিঁকে থাকতে চায়, তাতেই তাদের উৎসাহ এবং তারা সেই জটিল অংক নিয়েই ব্যস্ত।

সুতরাং শান্তি ও সুন্দরকে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে সাধারণ মানুষকেই এগিয়ে আসতে হবে দ্বিধাহীনভাবে। ধর্ম, বর্ণ, রঙ সব ভুলে যেতে হবে। অন্তত যে সব অপরাধের মূল ভিত্তি ধর্ম, বর্ণ, রঙ তাকে নির্মূল করতে হবে। ধর্ম, বর্ণ, রঙের ওপর নির্ভর করে যারা উন্মাদনা, উত্তেজনা ও গুজব ছড়িয়ে সমাজে অশান্তি সৃষ্টিতে নিয়োজিত তাদের চিহ্নিত করে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে। এটা একটা বিরাট, বিশাল কাজ। কিন্তু অত্যন্ত জরুরী এবং প্রয়োজনীয় কাজ।

এই চতুর্থ খণ্ডে তারই একটা চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। এই কাজটা এত জরুরী যে, যে প্রসঙ্গের মাধ্যমে সেই চিত্রটা তুলে ধরেছি সেই প্রসঙ্গের শেষ আইনি নিষ্পত্তি এখনও বাকি। কিন্তু এটা এত আশু প্রয়োজন যে সময়ের অপচয় না করে আমি পাঠক সমাজের মাধ্যমে তা জানিয়ে দেওয়ার তাগিদ অনুভব করেই সেই প্রসঙ্গের অবতারণা করেছি। এখানে একটা কথা পরিষ্কার বলে রাখা ভাল, আইন আইনের পথেই চলবে। আমার লিখিত বিবরণ দিয়ে তাকে প্রভাবিত করার কোনও ইচ্ছাই আমার নেই। আদালত তার কাছে গচ্ছিত প্রমাণপত্র দিয়ে তার বিচার করবেন। সেখানে আমার লেখা যেন দলিল হিসাবে প্রয়োগ না করা হয়। প্রমাণের ক্ষেত্রে যে সব ঘাটতি আছে তার ব্যর্থতার দায় অবশ্যই আমাদের, সেখানে নতুন করে কোনও আলোকপাত করার চেষ্টা এখানে আমি করিনি। দয়া করে তেমন উদ্যোগ যেন কোনও পক্ষ না নেন।

কেউ তেমন উদ্যোগ নিলে তার দায় তার, আমার নয়। এ ব্যাপারে আশাকরি সবাই সমমত পোষণ করবেন।

যে রাজনৈতিক ঘটনাগুলোর উপর প্রতি খণ্ডে আলোকপাত করেছি, এই খণ্ডেও তা বহু অংশ জুড়ে আছে। চেষ্টা করেছি ওই রাজনৈতিক ঘটনাগুলো সম্পর্কে আমার দেখা ও জানা যতটুকু ছিল তা বিশ্লেষণ করার। সামান্য বাকি যতটুকু আছে সময় ও সুযোগ পেলে তা অন্যত্র বলব। এই বক্তব্য যে সবাইকে সন্তুষ্ট করবে না আমি জানি। কিন্তু সেই অল্প সংখ্যক অসন্তুষ্ট মানুষকে সন্তুষ্ট করার সাধনায় আমি লিখতে বসিনি। অগণিত মানুষকে সত্য জানানোর জন্যই আমার এই প্রয়াস।

প্রতি খণ্ডের মতো এই খণ্ডে কিছু নাম গোপন করেছি। কিছু বলেছি উল্টো। প্রয়োজনে। কারণ সামাজিক অবস্থানে আঘাত করার ইচ্ছা নেই বলেই আমার এই ধারা অব্যাহত রাখতে বাধ্য হয়েছি।

প্রথম তিনটে খণ্ড পাঠক সমাজ যেভাবে গ্রহণ করেছেন, আশা করি এই খণ্ডও সেইভাবে গ্রহণ করবেন। তাহলেই আমার পরিশ্রম সার্থক হবে। আগামি খণ্ডই এই পর্যায়ের শেষ খণ্ড। আশা করি পাঠক সমাজ ধৈর্য ধরে আমার সঙ্গে সহযোগিতা করবেন।

প্রজাতন্ত্র দিবস
২৬ শে জানুয়ারি,
২০০১

রুণু গুহ নিয়োগী

কে না জানে মানুষ মানুষের জন্যই তৈরি করেছে আইন। জন্তু-জানোয়ারদের জগতে কোনও আইন নেই। মানুষ তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার জন্যই সামাজিক বন্ধন ও রূপরেখার চিত্ররূপ এঁকেছে। কিন্তু এক এক সময় সেই মানুষের ভেতরের কদর্যতা, লোভ, হিংস্রতা, পরশ্রীকাতরতা, রিরংসা, স্বার্থপরতা দেখলে মনে প্রশ্ন জাগে সত্যিই মানুষ শ্রেষ্ঠ জীব কি না। আবার মানুষের উদারতা, আত্মত্যাগ, ভালবাসা, প্রেম, ভদ্রতা দেখলে মানুষ জন্মটার সার্থকতা বুঝতে পারি।

কিন্তু হায়রে, পুলিশের চাকরির বাধ্যবাধকতাতেই বাধা আছে মানুষের কদর্য রূপটা প্রায় সারাক্ষণ নিরীক্ষণ করে যাওয়া। তার ফাঁকে ফাঁকে যে সত্যিকারের মানুষের দেখা মেলেনি তা নয়, কিন্তু তা আর কতজন?

সমাজই তো দূষিত হয়ে গেছে। সেই সমাজের আইনের রক্ষক পুলিশকে দূষিত করে সমাজই। অদ্ভুত একটা অলিখিত ধারা বয়ে চলেছে। পুলিশের হাতে গ্রেফতার হলে বা গ্রেফতারের আশঙ্কা বা মামলা হলেই দোষী ব্যক্তির তরফ থেকে প্রথমেই নিষ্পত্তির জন্য সংশ্লিষ্ট পুলিশকর্মীকে উৎকোচের থলি এগিয়ে দেওয়া হয়। লোভী ও প্রতিযোগিতামূলক সমাজে সেই সব পুলিশকর্মী কতক্ষণ আর কতদিন সেই লোভ সংবরণ করে কর্মে একনিষ্ঠ থাকতে পারে?

ঘটনা হলো, এক সময় না এক সময় মেরুদণ্ড ভেঙ্গে পড়ে বা বলা যায় ভেঙে ফেলা হয়। উৎকোচের রকমফেরও বহুবিধ—নারী, সুরা, অর্থ থেকে শুরু করে বিভিন্ন জিনিসপত্র। যে দেবতা যে ফুলে তুষ্ট হয় সেই দেবতাকে সেই ফুলেই নৈবেদ্য সাজিয়ে দেওয়াই রীতি। কার্যোদ্ধারের প্রয়োজনে যা কিছু করা দরকার অপরাধীদের তরফ থেকে তাই করার চেষ্টা করা হয়।

নেব কি নেব না, যাব কি যাব না, খাব কি খাব না, এই টানাপোড়েনের জাঁতাকলে সারা পুলিশ কর্মজীবনে জ্বলে পুড়ে খাক হতে হয়। যারা আত্মসমর্পণ করে না জ্বালাটা তাদেরই বেশি। আর সমর্পণ করলে তো আর মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করার জ্বালা সইতে হয় না।

মুশকিল হচ্ছে, যে সব গরীব, নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে অল্প বয়সীরা পুলিশে চাকরি করতে আসে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেই সব পরিবার থেকেও অলক্ষ্যে একটা চাপ থাকে অন্য পথে অতিরিক্ত আয় করার।

কর্মক্ষেত্রের ক্ষমতার উৎস থেকেই আসতে পারে এই অতিরিক্ত আয়। এবং শুরু হয় অপপ্রয়োগ ও অপব্যবহার। সময়ে যা মাত্রাছাড়াও হয়ে যায়।

লোভের তো কোনও শেষ নেই। ধাপের পর ধাপ। চুরাশি সালে এক ডাকাত দলের তিন সদস্যকে গ্রেফতার করেছি। কিন্তু ওই দলের আরও সাতজনকে কিছুতেই গ্রেফতার করতে পারছি না। অথচ ওই তিনজন আমাদের ওষুধ খেয়ে বাকি সাতজনের খবরই আমাদের জানিয়েছে। আমরাও যথারীতি ওদের খবরের ভিত্তিতে ওই সাতজনকে গ্রেফতারের উদ্দেশে কখনও কাকিনাড়া, কখনও বেলঘরিয়া বা বনগাঁ, ইছাপুর এবং আরও এদিক ওদিক হানা দিচ্ছি। কিন্তু না, আমরা বিষণ্ণ মনে খালি হাতে ফিরতে বাধ্য হচ্ছি। অথচ একটা আশ্চর্য ব্যাপার লক্ষ্য করছি যে, আমরা একবারও ভুল জায়গায় হানা দিইনি। ওদের গোপন আস্তানায় সঠিকভাবেই হানা দিয়েছি কারণ প্রায় প্রতিটা জায়গায় গিয়ে জানতে পেরেছি, আমরা হানা দেওয়ার ঘণ্টা দুয়েক বা তিনেক আগে আসামি আস্তানা ছেড়ে পালিয়ে গেছে। কি করে পালাল? কেন পালাল? আমরা যে আসব সেটা টের পেল কি করে?

প্রতিটি হানার ক্ষেত্রে একই ঘটনা ঘটতে থাকায় আমার মনে সন্দেহ জাগল ওরা নিশ্চয়ই আমরা আসার আগে কোনও সূত্র থেকে আগাম খবর পেয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কি করে?

এমন ঘটনার সম্মুখীন আমি আগে কখনও হইনি। তাছাড়া ডাকাতি দমন শাখার ভার নেওয়ার পর প্রায় আমার প্রতিটা সহকর্মীকে আমি নিজের পছন্দ মতো অন্য দপ্তর থেকে বদলি করিয়ে নিয়ে এসেছি। যাতে এক সূত্রে গাঁথা একটা তীরের ফলার মতো কাজ করতে পারি।

হানা থেকে নিষ্ফল হয়ে লালবাজারে ফেরার পর খুব স্বাভাবিকভাবেই ব্যর্থতার সমস্ত জ্বালা ওই তিনজন ডাকাতের ওপর আছড়ে পড়ত এবং ওরাও আমাদের আছড়ে পড়া ঘূর্ণিঝড়ের সামাল দিত নতুন কোনও সূত্র দিয়ে। কিন্তু সেখানেও ফল হতে লাগল শূন্য।

এভাবে প্রায় দিন পনেরো চলে গেল। কিন্তু এভাবে তো আর চলতে দেওয়া যায় না। বাকি সাত ডাকাত জেনে গেছে, আমরা ওদের গ্রেফতার করার জন্য হন্যে হয়ে খুঁজে যাচ্ছি। ওঁদের আমরা নির্দিষ্ট করেছি, এটা জানার পর ওরাও নিশ্চিত হয়ে এক জায়গায় বসে থাকবে না। ঘুরে বেড়াবে। কিন্তু কি উপায়ে বার করব ওদের গতিবিধির গলিপথ? বরং ওরাই তো আমাদের ওপর আমাদের অলক্ষ্যে নজর রেখে আমাদের গতিবিধি আগাম জেনে যাচ্ছে।

সুতরাং প্রথম কাজ ওদের নজরদারি বন্ধ করা। কোন চোখ দিয়ে ওরা নজরদারি রাখছে, সেটা খুঁজে বার করতে হবে। সেটা যে আমাদের দফতরেরই কারও চোখ সে বিষয়ে আমার মনে কোনও সন্দেহই নেই। কিন্তু কে সেই চোখের মালিক? তাকে ধরব কি করে? প্রত্যেকেই বিশ্বাসী। এখানেই সমস্যা। আর আন্দাজে ঢিলও মারা যাবে না।

অন্যদিকে ওই তিন আসামিকে তো আর অনির্দিষ্টকালের জন্য লালবাজারে রেখে দিতে পারব না। তাদের জেলে পাঠিয়ে দিতেই হবে। আর জেলে চলে গেলে আমার হাতের সূত্র হাতছাড়া হয়ে যাবে। সমস্যা আরও আছে, দীর্ঘদিন ধরে যদি এই লুকোচুরি খেলা চলতে থাকে তবে আমাদের হাতের ধৃত আসামিরাও আর সূত্র জানাতে পারবে না। কারণ বাইরের আসামিরা ইতিমধ্যে তাদের পুরনো সব যোগসূত্র ছিন্ন করে আনকোরা স্থানে নিজেদের লুকিয়ে ফেলবে। তেমন হলে ওই তিনজনকে ওষুধ খাইয়েও আর কোনও ফল লাভ হবে না। আমাদের সমস্ত পরিশ্রমটাই মাটি হয়ে যাবে।

ডাকাতদের চোখকে ধরার জন্য ছক কষতে লাগলাম। ঠিক করলাম, রাতে ওই তিনজন আসামিকে আমি আমাদের লালবাজারের সেন্ট্রাল লকআপে পাঠাব না। দফতরেই রেখে দেব। দফতরে কোনও অফিসার থাকবে না। বাইরে বসে পাহারা দেবে অন্য দফতরের কনস্টেবলেরা। অর্থাৎ যাদের সঙ্গে ওই ডাকাতদের পূর্ব যোগাযোগ নেই। আমাদের দফতরের যে কনস্টেবল নজর রাখার জন্য ঠিক করলাম সে আমার বিশ্বস্ত কনস্টেবল সন্তোষ। সে দেখবে ওই ডাকাতদের সঙ্গে রাতে কে গোপনে কথা বলছে এবং সেটাই সে আমাকে জানাবে। সব ব্যবস্থা করে আমি আমার লালবাজারের কোয়ার্টারে চলে গেলাম। সন্তোষ ছাড়া এই ব্যবস্থার কথা অন্য কেউ জানে না। বিশ্বাস যে, আমাদের দফতরের 'আসামি' ফাঁদে পা দেবে। একমাত্র ওই আসামিটা যদি সন্তোষই হয় তবে আমার ছক ব্যর্থ হবে। কার্যক্ষেত্রে কিছু কিছু বিশ্বাস তো রাখতেই হবে।

কোয়ার্টারে বসে আছি সন্তোষের আগমনের অপেক্ষায়। ভাবছি, কী বিচিত্র এই চাকরি! চোর ডাকাত ধরার জন্য আমরা ফাঁদ পাতি আর এখন নিজেরই দফতরে ডাকাতের বন্ধু ধরার জন্য ফাঁদ পেতে কোয়ার্টারে ঘুমকে বিদায় জানিয়ে বসে আছি। বাড়ির অন্য সদস্যরা বিছানায় কাতর। শরীর আমাকেও বিছানায় গা এলিয়ে দেওয়ার জন্য ডাকছে, কিন্তু কর্তব্যের টানে বিছানার টান উপেক্ষা করে বসে থাকতে বাধ্য হচ্ছি। কারণ, সন্তোষ ডাকার সঙ্গে সঙ্গে যেন আমি 'আসামি'কে ধরতে পারি। ফস্কে গেলে চলবে না।

ঘড়ি নিয়ম করে তার কাঁটা দুটোকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। তার দোষ

কী, আবিষ্কারের লগ্ন থেকে সে আমাদের অপেক্ষায় না থেকে আমাদেরই অষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে তার বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য করিয়েছে। কী অদ্ভুত, মানুষ তার নিজেরই সৃষ্টির কাছে নিজে দাস হয়ে যায় অনায়াসে। আসলে মানুষ যতই স্বাধীনতার কথা বলে থাকুক না কেন, অন্তরে কোথায় যেন লুকিয়ে থাকে দাস হয়ে থাকার একটা ইচ্ছা। সেটা প্রকৃতির কাছেই হোক কিংবা যন্ত্রের। প্রতিটা মানুষই দাস। এই দাস হয়েই তাকে জীবন কাটাতে হয়, কোনও দিন এর থেকে তার মুক্তি নেই। প্রকৃতপক্ষে মানুষ নিজের কাছেই নিজে দাস। তার ইচ্ছা, ভালবাসা, প্রেম, মায়া, বন্ধন, কর্ম, রিপুর কাছে সে চিরজীবন দাস। তার সেই দাসত্বের জন্য সে পাগলের মতো ছুটে চলেছে। মৃত্যু ছাড়া তার মুক্তি নেই।

কোয়ার্টারে বসার ঘরের সোফায় শার্ট ট্রাউজার পরেই কখন গা আলগা করে দিয়েছি, টের পাইনি। টের পেলাম, ঝনঝন করে কলিংবেল বেজে ওঠার আওয়াজে। চোখে শ্রান্তি নেমে এসেছিল। সামনের টেবিলে চশমাটা উল্টে রাখা। বৈদ্যুতিক যন্ত্রের ঝনঝন ডাকে হুড়মুড়িয়ে উঠে তাড়াতাড়ি চশমাটা চোখে গুঁজে দরজা খুলে দিলাম।

হ্যাঁ সন্তোষ। বললাম, "কি রে?"

সন্তোষ বলল, "বিশ্বনাথ স্যার।"

দরজাটা টেনে বন্ধ করে দফতরের দিকে যেতে যেতে জিজ্ঞেস করলাম, "ঠিক বলেছিস তো? ওই কাজটা বিশ্বনাথ মাহাতো করত?"

"হ্যাঁ স্যার, আমি সিওর হয়েই আপনাকে ডাকতে এসেছি।" সন্তোষ বেশ আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে জানাল।

কনস্টেবল বিশ্বনাথ মাহাতোর নাম শুনে আমি একটু আশ্চর্যই হলাম। অবশ্য যার নামই শুনতাম, তাতেই আমি আশ্চর্য হতাম। সত্যি কথা বলতে কি, এই ঘটনা ঘটার আগে আমি এইরকম একটা পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। তাই ঘটনা ঘটার পর আমি বেশ ভাল রকমই অবাক হয়েছিলাম এবং অবশেষে বিশ্বনাথের নাম শুনেও অবাক হলাম।

আসলে বিশ্বনাথ মোটামুটি কাজের ছিল। দোষ বলতে এখানে ওখানে ডাকাতি দমন শাখার কনস্টেবলের কাজের সুযোগে হম্বিতম্বি করত, বড় বড় কথা বলত। কিন্তু এমন তো অনেকেই করে। এটা বন্ধ করাও যাবে না। কর্মস্থল থেকে ছুটির পর নিজের পরিচিত জগতে ফিরে অনেকেই যে হাতে গলা কাটে তেমন অভিজ্ঞতা তো আর নতুন নয়। বিশ্বনাথও ওই শ্রেণীর, ব্যস, এর বেশি ওর বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ আমার কাছে

ছিল না। অর্থাৎ লোভ ওকে কতদূর নিচে নামিয়েছে সেই খবর আমার কাছে বিশেষ ছিল না। তাই ওর নামে আমি অবাক হলাম।

সন্তোষকে প্রশ্ন করলাম, "কি দেখলি?"

সন্তোষ আমার সঙ্গে সঙ্গে দফতরের দিকে ফিরে যেতে যেতে বলল, "স্যার, ও একা একা ওদের দিকে গেল, তারপর যখন দেখল কেউ দেখছে না, তখন ফিসফিস করে মিনিট দশেক কথা বলল, আমি যে দরজার ফাঁক দিয়ে নজর রাখছি ও দেখেইনি।"

জিজ্ঞেস করলাম, "তারপর?"

"তারপর ও পকেট থেকে একটা কাগজ বার করল, একটা পেন দিল, ওরা সেই কাগজে কি লিখে দিতেই সেটা নিয়ে তাড়াতাড়ি প্যান্টের পকেটে ঢুকিয়ে দিয়ে পেনটা তুলে বাইরে চলে এল। আমি ততক্ষণে যা বোঝার বুঝে গিয়ে দরজার কাছ থেকে সরে এসেছি। তারপর আপনার কাছে।" সন্তোষের জবাব শুনে বললাম, "ঠিক আছে, তুই আমার সঙ্গে দফতরে যাবি না, একটু পরে যাবি, এখন বিশ্বনাথ কোথায় আছে?"

সন্তোষ আমার নির্দেশ শুনে দাঁড়িয়ে গেছে। শুধু বলল, "বারান্দার বেঞ্চিতে।" সিঁড়ির তলার প্রায়ান্ধকারে সন্তোষকে ছেড়ে আমি দ্রুত গতিতে সিঁড়ি ভাঙ্গতে লাগলাম। রাগে আমার শরীরের ভেতর জ্বলছে। ভাবতেই পারছি না, নিজের পেশাদারীত্ব বিকিয়ে কেউ ডাকাতদের খবরের চালানদার হয়ে যাবে।

আমাদের দফতরের সামনে দ্রুত উঠে এলাম। বেঞ্চে আরও ক'জন কনস্টেবলের সঙ্গে বিশ্বনাথ বসে আছে। আমাকে দেখে সবাই নিয়মমাফিক বিস্মিত হয়েছিল ঠিকই। কিন্তু যারা আমার কাজের ধরন জানে ও বহুদিন ধরে আমাকে দেখছে তারা খুব একটা অবাক হয়নি। কারণ ওইরকম ভাবে যখন তখন হুটহাট আমি চলে আসি এবং সেটা কাজের জন্যই। কখন যে কি পরিকল্পনা নিয়ে চলি ওরা তার নাগাল পায় না।

কিন্তু আজ যে একটা বিশেষ কাজে এসেছি সেটা ওরাও আন্দাজ করতে পারছে না। আমি আমার ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বিশ্বনাথকে ডেকে নিলাম।

বিশ্বনাথ কি কোনও কিছু অনুমান করল? ভয়ে ভয়ে এগিয়ে এল, মিনমিনে গলায় শুধু বলল, "স্যার।"

আর স্যার! আমি সোজা বাঁ হাত দিয়ে ওর চুলের মুঠি ধরে ডান হাত দিয়ে ওর গালে মারলাম সজোরে এক থাপ্পড়। টাল সামলে বিশ্বনাথ আবার শুধু "স্যার, স্যার" আওয়াজ বার করতে লাগল।

কিন্তু একটা থাপ্পড়ে কি আর আমার রাগের পারদ নিচে নামে? এতবড় অন্যায় আমার দ্বারা মেনে নেওয়া সম্ভব? যে ডাকাত দলকে আমরা কয়েক মাস ধরে হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়িয়ে ওই দলের তিন সদস্যকে মাত্র গ্রেফতার করতে পেরেছি এবং বাকিদের গ্রেফতারের জন্য প্রতিদিন মাথা কুটে এদিক ওদিক দৌড়ে বেড়াচ্ছি তা কিনা বিশ্বনাথের লোভের জন্য ধূলিসাৎ হয়ে যাচ্ছে। সামান্য টাকার বিনিময়ে ও আমাদের পরিশ্রম, ইজ্জত, দফতরের দায় সব বিক্রি করে দিচ্ছে।

সুতরাং আমার এলোপাথাড়ি ঘুষি, চড় বিশ্বনাথের শরীরের ওপর পড়তে লাগল। বিশ্বনাথ 'স্যার স্যার' করে চিৎকার করতে লাগল। বারান্দায় যে সব কনস্টেবল বসেছিল তারা ঘরের দরজার সামনে উঁকি দিয়ে দেখছে, বুঝতে চাইছে কি এমন হয়েছে যে আমি আমার অধীনে আমারই দফতরের কনস্টেবলকে মারছি। ওই ভিড়ের মধ্যে সন্তোষও এসে দাঁড়িয়েছে।

বিশ্বনাথ আমার পা জড়িয়ে কাঁদতে লাগল। আমি সন্তোষ সমেত আমাদের ডাকাতি দমন শাখার আরও দু'জন কনস্টেবলকে ভেতরে ডেকে ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিতে বললাম।

এবার আমি বিশ্বনাথের চুলের মুঠিটা আবার ধরে ওকে টেনে তুলতে তুলতে অন্য কনস্টেবলদের দিকে তাকিয়ে বললাম, "জানিস শালা কি করেছে? ডাকাতদলের ইনফরমার হয়েছে, ভেবেছে এভাবেই চলবে, আমরা জানতে পারব না। আমি রিপোর্ট করলে যে ওর চাকরিটা চলে যাবে সেটাও জানে না।"

বিশ্বনাথ কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগল, "আমায় ক্ষমা করে দিন স্যার, আর করব না।"

ধমকে উঠে বললাম, "আর করবি না, শালা, আমরা হন্যে হয়ে খুঁজছি আর তুই দিব্যি ওদের থেকে পয়সা নিয়ে আমাদের খবর চালান করছিস, একটু লজ্জাও করল না। নিজের ইজ্জত তো দিয়েছিস, সঙ্গে পুরো ডিপার্টমেন্টের মুখে চুনকালি মাখিয়ে দিলি।"

আমার উঁচু গমগমে গলার মেজাজের সামনে প্রত্যেকে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। শুনছে। একমাত্র সন্তোষ ছাড়া অন্যেরা অবাক। সন্তোষই সব জানে।

আমি দাঁত কড়মড় করে বিশ্বনাথকে বললাম, "চিঠিটা দে।"

বিশ্বনাথ মিনমিনিয়ে করুণ গলায় বলল, "স্যার, চিঠি!" ওর গলার আওয়াজে বোঝাতে চাইছে, কোনও চিঠি ওর কাছে নেই।

আমি একইভাবে দৃঢ় স্বরে বললাম, "চিঠিটা দে।" আমার গলার ঝাঁজে

এমন কিছু ছিল যাতে বিশ্বনাথ বুঝে গেছে আমি নিশ্চিতভাবে জানি ওর কাছে ডাকাতদের লেখা চিঠি আছে।

আবার কেঁদে ফেলে আমার পা জড়িয়ে ধরল। আমি পা ছাড়িয়ে বলে উঠলাম, "ন্যাকামি করতে হবে না। যখন এই সব কারবার করছিলি তখন কান্না কোথায় ছিল ?"

বিশ্বনাথ একইভাবে "স্যার, স্যার" বলে কেঁদে যাচ্ছে। আমার বিরক্তি চরমে চলে যাচ্ছে। সন্তোষ আর কনস্টেবল অসিতকে বললাম, "একে ন্যাকামি করতে বারণ কর, চিঠিটা দিয়ে ও যা জানে আমাকে বলতে বল।"

সন্তোষরাই বিশ্বনাথকে টেনে তুলল, বলল, "চিঠি থাকলে স্যারকে দিয়ে দে।" বিশ্বনাথ আস্তে আস্তে ওর প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা চিরকুট বার করল। আমি ওটা হাতে নিয়ে তাড়াতাড়ি পড়তে শুরু করলাম। বাংলায় অজস্র ভুল বানানে আঁকাবাঁকা হাতে ওদের দলের এক সদস্যের উদ্দেশে লেখা। লিখেছে, কখন কাকে কোথায় টাকা দিতে হবে, কোথায় কোথায় আমরা হানা দিতে পারি। চিরকুটের প্রতিটা কথাই আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। চিরকুটটা নিজের পকেটে রাখলাম।

এতক্ষণ বিশ্বনাথের ওপর ঘৃণায়, রাগে, নিজের চেয়ারেও বসিনি। এবার বসলাম। আমাদের 'আসামি'কে ধরে খানিকটা নিশ্চিন্তও হয়েছি। বিশ্বনাথ মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে। অন্য কনস্টেবলরাও দাঁড়িয়ে, আমার পরবর্তী নির্দেশের অপেক্ষায়।

বিশ্বনাথের মনে ধস নামিয়ে দিতে হবে। কারণ ওর থেকেই জানতে হবে এতদিন কি প্রক্রিয়ায় ও যোগাযোগের কাজটা করত। কারণ সেই সূত্র দিয়েই ডাকাতদলটার বাকি সদস্যদের ধরতে হবে। গলায় যতখানি সম্ভব ঝাঁজ বজায় রেখে সন্তোষদের উদ্দেশে বললাম, "এর কী চাকরিটা আর রাখা উচিত ? তোরা বল কি করব ?" সন্তোষরা শুধু অস্ফুট গলায় বলে উঠল, "স্যার।" সহকর্মীর চাকরিটা বরবাদ করে দিতে তো আর সরাসরি বলতে পারে না! তাছাড়া ওরা জানে আমি মনে মনে ঠিকই একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি, যা ওরা টলাতে পারবে না।

যে উদ্দেশে আমার এই তীর ছোঁড়া তা অব্যর্থ লক্ষ্যে গেঁথে গেছে। বিশ্বনাথ আবার ভেঁউ ভেঁউ করে কাঁদতে কাঁদতে সটান আমার পায়ের তলায় একেবারে ঝাঁপ দিয়ে "আমাকে মারবেন না স্যার, আমি মরে যাব, বাড়িতে সবাই না খেতে পেয়ে মরবে। আর কোনও দিন করব না।" ইত্যাদি আকৃতি জানাতে লাগল।

মিনিট দুয়েক এই দৃশ্য চলতে দিলাম। গুরুত্বটা হৃদয়ঙ্গম করুক। পেশাদারীত্ব ব্যাপারটা যে এত পলকা নয় তার গভীরতাটা বুঝুক।

রাতের প্রহর শেষ হতে হতে নিয়মমাফিক ভোরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। একটা বড় সমস্যার সমাধান করতে পেরে শরীরের ক্লান্তিটা দূরে চলে গেছে। আমি ঝট করে পা সরিয়ে নিয়ে বলে উঠলাম, "সর, বল, কিভাবে এইসব চিঠি কোথায় পৌঁছে দিতিস?"

বিশ্বনাথ কাঁদতে কাঁদতে বলে উঠল, "ডানলপে স্যার, ডানলপে।"

"ডানলপের কোথায়?"

"একটা পান বিড়ির দোকানে।"

"তারপর।"

"ওদের লোক এসে ওই দোকান থেকে নিয়ে যায়।"

"হুঁ। তার মানে তুই কাল সকালে ওটা দিয়ে আসবি, ওরা পরে এসে ওটা নিয়ে যাবে?" প্রশ্ন করে আমি বিশ্বনাথের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

বিশ্বনাথ ইতিবাচক ভঙ্গীতে মাথা নাড়ল।

"তুই তো বিনা পয়সায় ওদের কাজ করিসনি। এখন বল ওরা তোকে কিভাবে টাকা দিত।" জানতে চাইলাম।

বিশ্বনাথ মাথা নিচু করে চুপ করে রইল। আমি ধমকে উঠলাম, "কি বলতে লজ্জা করছে?" তবু ও চুপ। চিৎকার করে বললাম, "বল, আমার সময় নেই তোর ঢঙ দেখার।"

বিশ্বনাথ ধমকের চোটে কোনমতে জানাল, "ওই দোকানদারই একটা খামে—।"

"তোকে দিত। তাই তো?" বললাম।

বিশ্বনাথ চুপ। "এখন যা। আমি যতক্ষণ না বলব তুই লালবাজারেই থাকবি। তোকে আমার দরকার লাগতে পারে।" নির্দেশ দিয়ে আমি বেরিয়ে গেলাম। আমি জানি, বিশ্বনাথের আর সাহস হবে না ওই ধৃত তিন ডাকাতের কাছে যাওয়ার।

কোয়ার্টারে ফিরে বিছানায় আশ্রয় নিলাম। আশ্রয় নিলেও ঘুম এল না। কীভাবে ওই ডাকাতদলের বাকি ডাকাতগুলোকে ধরতে পারব, কোন ছকে বিশ্বনাথের তথ্য অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ নেব তা চিন্তা করতে লাগলাম। ডানলপের ওই পান বিড়ির দোকানদারকে গ্রেফতার করে সূত্র বার করব কি? নাকি যারা ওর কাছে চিঠি নিতে আসে তাদের ওপর নজরদারি করে এগিয়ে যাব। কিন্তু তাদের কীভাবে চিনব। এইসব চিন্তা করতে করতে

কখন ঘুমের দেশে চলে গেছি তা জানব কী করে। জানলাম, সকাল প্রায় ন'টার সময়, যখন দফতর থেকে ডাক এল।

দিন প্রারম্ভের কাজকর্ম সেরে যখন সাড়ে দশটায় অফিসে পৌঁছালাম তখনও বিশ্বনাথ বেঞ্চিতে বসে আছে।

ছক একটা কষে নিয়েছি। বিশ্বনাথকে দিয়েই কাঁটা তুলব। ওকেই কাজে লাগাব। প্রথমত ও ওই পানবিড়ির দোকানটা চেনে এবং দোকানদার ওকে বিশ্বাস করবে। দ্বিতীয়ত, বিশ্বনাথের ওপর ডাকাতদলের বিশ্বাসটাও প্রয়োজনে কাজে লাগতে পারে। পরিস্থিতি অনুযায়ী এগিয়ে যেতে হবে। ঠিক করেছি, ওই দোকানদারকে আমাদের দিকে নিয়ে আসতে হবে। ওই চেনে ডাকাতদলের লোকেদের। কারণ চিঠিগুলো ওর কাছ থেকেই ওই দলের লোকেরা নিয়ে যায়। একটা ব্যাপারে অতিরিক্ত সতর্কতা নিতে হবে। ওই পান বিড়ির দোকানদারকে যখন আটক করব তা যেন কোনও ভাবেই প্রচার না পায়, আর প্রচারের তরঙ্গ যেন ডাকাতদের কানে পৌঁছে যেতে না পারে। এখানে বিশ্বনাথকে দরকার।

বিশ্বনাথকে ডাকলাম, জানতে চাইলাম, "ওই দোকানদার কোথায় থাকে জানিস?"

বিশ্বনাথ বলল, "হ্যাঁ স্যার, পাশেই।"

"ওর বাড়িতে কে কে আছে?"

"কেউ নেই স্যার, দেশে থাকে। বিহারে।" বিশ্বনাথ জানাল।

বুঝলাম ওই দোকানদার হিন্দুস্থানি, বিহারের কোনও এক জেলার অধিবাসী। ভালই হল। ওকে নিয়ে এলে কেউ জানতে পারবে না।

"দুপুরবেলা লোকটা দোকান বন্ধ করে?" জিজ্ঞেস করলাম।

"করে।" বিশ্বনাথের জবাবে জানতে চাইলাম, "কখন?"

"দেড়টা নাগাদ। নিজে রান্না করে খায়। তিনটে নাগাদ ফিরে আসে দোকানে।"

নিজের হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম, কাঁটাটা ঠিক এগারোটায় এসে পৌঁছেছে। বিশ্বনাথকে বললাম, "ঠিক আছে তুই বাইরে থাক, আমি ডেকে নেব।"

বিশ্বনাথ চলে যেতে আমি ছকটা সম্পূর্ণ করলাম। দেড়টার সময় যখন দোকান বন্ধ করবে তখনই ওকে তুলে আনব কৌশলে।

আমি দু'জন অফিসারকে ডেকে সব বুঝিয়ে ওদের সঙ্গে একটা গাড়িতে বিশ্বনাথকে পাঠিয়ে দিলাম। অন্য কাজে মগ্ন হলেও ওদের আগমনের অপেক্ষায় মনটা পড়ে রইল।

কাজটা বিশেষ কঠিন নয়। শুধু একটা ব্যাপারেই খেয়াল রাখতে হবে, প্রচার যেন না হয়।

তিনটের সময় আমাদের অফিসাররা ও বিশ্বনাথ ফিরে এল। সঙ্গে একটা বছর চল্লিশের লোক। দেখেই বুঝলাম, এই হচ্ছে সেই পানবিড়ির দোকানের দোকানদার। অন্য প্রদেশের লোক, এখানে বসে ডাকাতদলের যোগাযোগকারী হিসাবে কিছু উপরি রোজগার করে যাচ্ছে। মনে মনে ঠিক করে নিলাম, এমন ধমক লাগাব, উপরি রোজগারের ধান্ধা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হবে।

আমার সামনে অফিসাররা ওকে হাজির করাল। লোকটা ভয়ে ঠক-ঠক করে কাঁপছে। আমি থমথমে মুখ করে প্রথমে একটা রুল টেবিলের ওপর রেখে তারপর ওর মুখের দিকে তাকিয়ে হুমকি মেরে জানতে চাইলাম, "কবে থেকে এ কাজ করছিস?"

আমার কথার সরাসরি উত্তর না দিয়ে কেঁদে ফেলল, বলল, "আর কভি হবে না হুজুর, মাফি মাঙতা হ্যায়।"

"শালা, ডাকাতদের হয়ে কাজ করে এখন মাফি মাঙতা হ্যায়, সারা জীবন জেলে পচিয়ে মারব তোকে।" আমার চিৎকারে ও চমকে চমকে উঠে কাঁদতে কাঁদতে মেঝেতে বসে পড়ল। আর একই কথা আওড়ে যেতে লাগল, "আর হবে না হুজুর, আর হবে না হুজুর, ও লোখ ডাকু হ্যায় হামি জানতাম না।"

"জানতিস না? শালা। পয়সা নেওয়ার সময় তোর কি মনে হয়েছিল ওরা সব সাধু? তোকে প্রেম করে পয়সা দিচ্ছে। ন্যাকামি বন্ধ কর। বাঁচতে চাইলে আমি যা জিজ্ঞেস করছি সব তাড়াতাড়ি বল।" আমার গর্জন শুনে ওই লোকটা হামাগুড়ি দিয়ে আমার পায়ের কাছে এসে পা চেপে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলল, "সব বলব হুজুর, আপ পুছিয়ে।" ভয়ের চোটে লোকটা অর্ধেক বাংলায় অর্ধেক হিন্দিতে উত্তর দিয়ে যাচ্ছে। ওকে যতটুকু ভয় দেখানোর দরকার ততটুকু দেখানো হয়ে গেছে। আমি প্রশ্ন করলাম, "কখন ওদের লোক তোর কাছে আবার আসবে? সত্যি কথা বলবি। নয়ত পিঠের সব চামড়া তুলে দেব।"

"কাল শুভা আট সাড়ে আট মে।"

"হুঁ। চিঠি নেবে। পয়সা দেবে, চলে যাবে?"

"হুজুর।"

"হুজুর, হুজুর করতে হবে না। এবার বল, কতদিন ধরে এদের চিনিস।" যথারীতি হুঙ্কার ছেড়ে বললাম।

"ছে মাহিনা করিভ।"

"আর কার কার হয়ে কাজ করিস?"

"নেহি নেহি হুজুর, আর কিসিকো নহি জানতা।

"শালা, মিথ্যা বললে তোর জিভ ছিঁড়ে নেব।"

"জো হুজুর, হাম সাচ বাতাতা হ্যায়।"

"শোন, আমি যা বলছি তাই করবি। নইলে।"

লোকটা ঘাড় কাৎ করে সম্মতি জানাল। বললাম, "কাল সকালে যখন ওই লোকটা তোর কাছে চিঠি নিতে আসবে ইশারায় ওকে আমাদের চিনিয়ে দিবি। তোর দোকান ছেড়ে গেলে আমরা—।"

"জরুর। আপ যো বলিয়ে গা।"

"এখন যা।" ওকে পাশের ঘরে পাঠিয়ে দিলাম। ওকে পরদিন সকাল পর্যন্ত আমাদের হেফাজতেই থাকতে হবে। ছেড়ে দিলে যাতে ভয়ে পালিয়ে না যায়। দোকান খোলার আগে আমাদের লোকই ওকে নিয়ে যাবে। দোকান খোলাবে। তারপর ফাঁদ পেতে বসে থাকবে।

আমি আমার অফিসারদের সঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা করে নিলাম। ওরা দায়িত্ব বুঝে নিয়েছে। আগামিকাল সকালে ঠিক কাজ করবে। ওঁদের হাতে আমি ধৃত ডাকাতদের লেখা চিঠিটা দিয়ে দিলাম। ওই চিঠিটা ওরা আগামিকাল সকালে ওই দোকানদারের হাতে দিয়ে দেবে। ওটা সে ওই ডাকাতদল থেকে আসা লোকটার হাতে দেবে। যাতে ডাকাতরা দোকানদারকে সন্দেহ না করে।

পরদিন সকাল সাড়ে দশটায় আমাদের অফিসার আর কনস্টেবলরা ডাকাতদলের সঙ্গীকে গ্রেফতার করে নিয়ে এল।

প্রত্যেকেই যার যার দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করেছে। ওই সঙ্গীর বয়স বেশি নয়। চব্বিশ পঁচিশ বছরের একটা কালো, মাঝারি উচ্চতার, রোগা মত ছেলে। চেহারায় কোনও ধারই নেই। গর্তে বসা চোখে এখন ভয়ের ভাষা। সকালে এই ছেলেটাই আমাদের ফাঁদে ধরা পড়েছে। এবার একে দলাইমালাই করে আসল ডাকাতগুলিকে ধরতে হবে।

প্রথমে মৃদুভাবে মেসিন চালু করলাম। মৃদুতে কাজ হয়ে গেলে আর ভোল্টেজ বাড়িয়ে লাভ কী। পাঁচ মিনিট মেসিন চালিয়েই কাজ হয়ে গেল। পটাপট সব বলতে লাগল। এবার আমাদের পরবর্তী কাজের পালা।

ওর কথা অনুযায়ী সেদিন রাতেই আমরা হানা দিলাম আগড়পাড়ার এক ঘিঞ্জি অঞ্চলে। সেখানে দুই ডাকাতকে মাতাল অবস্থায় পেয়ে গেলাম। ওদের লালবাজারে মেসিনের স্বাদ দিতেই দলের বাকি সদস্যদেরও আস্তানার খোঁজ পেয়ে গেলাম।

চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে দলের সব ডাকাতকে লালবাজারে নিয়ে এলাম। কাউকে বনগাঁ থেকে, কাউকে বা বেলঘরিয়া থেকে। সাধারণ ডাকাত, অনেক আগেই আমরা ওদের পেয়ে যেতাম, যদি না বিশ্বনাথ তার লোভের জিভটা ওদের সাহায্যের জন্য বাড়িয়ে দিত।

দুষ্কর্মের জন্য বিশ্বনাথের চাকরিটা আমি অনায়াসে বরবাদ করে দিতে পারতাম। দিলাম না। ওকে শুধু আমার দফতর থেকে অন্য দফতরে বদলি করে দিলাম। বিশ্বনাথ তার লোভটা সংযত করেছিল কি না ওই জানে। তবে পেশাদারীত্ব বিকিয়ে লোভের পরিণামটা ও আমাদের হাড়ে হাড়ে টের পাইয়ে দিয়েছিল। মনে মনে তাই আমি ওকে ক্ষমা করতে পারিনি।

জসিমুদ্দিন। আরেক কনস্টেবল। আমারই অধীন ডাকাতি দমন শাখায় ছিল। চটপট কাজ করত ভালই। কিন্তু ওই, লোভের রোগ ধরে গিয়েছিল। নেশার মতো এই রোগ ধরাটাই কাল। তখন মস্তিষ্কের কোষ থেকে কোথায় থামতে হবে সেই বিচারের চাবিটাকেই বেমালুম হরিয়ে ফেলে।

ডাকাতি দমন শাখার তখন কলকাতা জুড়ে খুব সুনাম এবং বদনাম। সুনাম ডাকাত ধরার জন্য আর বদনাম দলাইমালাইয়ের জন্য। এই দুই নাম মিলে মিশে অপরাধীদের মধ্যে একটা আতঙ্কের বাতাবরণ সৃষ্টি করেছিল। তাতে ডাকাত ও অন্যান্য অপরাধীদের জগতে একটা ত্রাসের আবহাওয়া তৈরি করেছিল ঠিকই, অন্যদিকে সেই সুযোগে আমাদের দফতরের কোনও কোনও কর্মচারী অপরাধ জগত থেকে ভয় দেখিয়ে বিশেষ বিশেষ সুবিধাও আদায় করছিল।

জসিমুদ্দিন তাদের মধ্যে একজন। খবর পেলাম এবং লালবাজার থেকে ওকে অন্যস্থানে একটা ছোট্ট দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়ে দিলাম। আমার দফতর থেকে অন্যত্র বদলির সুপারিশ করলাম না।

ডাকাতি দমন শাখার দায়িত্ব নেওয়ার কিছুদিন পরই একটা সমস্যার সম্মুখীন হলাম। দেখলাম, যে সব ডাকাত জেলে সাজা খাটছে তারা কখন জেল থেকে ছাড়া পেয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, তার কোনও খবরই আমাদের কাছে নেই। ওইসব ডাকাত জেল থেকে বেরিয়ে আরও বলীয়ান হয়ে আরও সুকৌশলে ডাকাতি করছে। বুঝতে পারলাম, যদি ওই ডাকাতের মুক্তির খবর আমাদের কাছে থাকত, তবে আমরাও ওর ওপর নজর রাখতে পারতাম এবং এত সহজে সে আবার নতুন করে ডাকাতদল সাজিয়ে ডাকাতি করতে পারত না।

খবরের এই ফাঁকটা ভরাট করার জন্য আমি আলিপুর সেন্ট্রাল জেল, প্রেসিডেন্সি জেল ও দমদম সেন্ট্রাল জেলের গেটে আমাদের তিনজন কনস্টেবলকে

নজরদারিতে বহাল করলাম। এদের কাজ, কবে কখন কোন ডাকাত জেল থেকে ছাড়া পাচ্ছে তার হিসাব রাখা, বিশেষ ক্ষেত্রে দফতরে আমাদের আগের থেকে ওয়াকিবহাল করা এবং নির্দেশ মতো মুক্তি পেলেই জেল গেটেই আবার কোনও ডাকাতকে গ্রেফতার করে সোজা লালবাজারে হাজির করা।

জসিমুদ্দিনকে আমি আলিপুর সেন্ট্রাল জেলের গেটে নজরদারিতে পাঠালাম। ওখানে দফতরের নাম ভাঙ্গিয়ে অতিরিক্ত কিছু আদায় করার সুযোগ কম। এক মাস, দু'মাস, তিন মাস জসিমুদ্দিন যথারীতি কাজ করে যাচ্ছে।

হঠাৎ মাস চারেক পর একদিন সন্ধেবেলা হেস্টিংস থানার তখনকার অফিসার-ইন-চার্জ প্রদীপ শংকর চক্রবর্তীর ফোন এল আমার কাছে।

বলল, "আজ সন্ধেবেলা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের চত্বর থেকে দু'জনকে গ্রেফতার করেছি, ওরা রোজ সন্ধ্যায় ওখানে প্রেমিক যুগলদের ভয় দেখিয়ে তোলা আদায় করত। রিপোর্ট আমি বেশ ক'দিন থেকেই পাচ্ছিলাম। আজ ধরেছি। তাদের একজন বলছে আপনার কনস্টেবল।"

বললাম, "সে কি, কি নাম?"

"জসিমুদ্দিন।"

নাম শুনেই আমি ভেতরে ভেতরে রাগে থরথর করে কাঁপতে লাগলাম। আমার দফতরের কনস্টেবল কিনা শেষ পর্যন্ত ছিনতাই করছে? জেল গেটের নজরদারিতে উপরি রোজগার বন্ধ হয়ে যাওয়াতে লোভের চোটে ছিনতাইবাজ হয়ে গেছে? পরিণাম আমি ধারণাই করতে পারছি না। চক্রবর্তীকে বললাম, "আমি এক্ষুণি আসছি, তুমি থানাতেই থেকো। তা ওর সঙ্গীটি কে?"

চক্রবর্তী খানিকটা নীরব। উত্তর দিল, "এলেই জানতে পারবেন।"

গাড়ি নিয়ে একাই ছুটলাম হেস্টিংস থানার দিকে। শাস্তি দেওয়ার তাড়নায় আমার ছোটাও হলো প্রায় বাধভাঙ্গা।

মিনিট পনেরোর মধ্যেই আমি হেস্টিংস থানায়। ছুটে পৌঁছে গেলাম অফিসার-ইন-চার্জের ঘরে।

চক্রবর্তী আমাকে দেখেই চেয়ার দেখিয়ে বলল, "বসুন।"

আমি বসলাম না। প্রশ্ন করলাম, "কোথায়?"

"ডাকাচ্ছি।" চক্রবর্তী আর্দালি দিয়ে জসিমুদ্দিনকে ডেকে পাঠাল। এল। মুখ নিচু। ভয়ে না লজ্জায়?

ওকে দেখেই আমি মারতে শুরু করলাম, জসিমুদ্দিন শুধু "স্যার স্যার" করে মাপ চাইতে লাগল। আমি থামছি না। চক্রবর্তীর টেবিলে ওকে উপুড় করে শুইয়ে একটা রুল দিয়ে ওর পিঠে কয়েক ঘা মারলাম। বাধ্য হয়ে

চক্রবর্তীই অবশেষে আমাকে থামাল। জসিমুদ্দিনকে টেবিল থেকে নেমে আমার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে বলল, ও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

আমি হাঁপাচ্ছি। বললাম, "তোকে দিয়ে যে কী করি, আমার সামনে থেকে দূর হয়ে যা।" জসিমুদ্দিনও বিকারগ্রস্তের মতো আমার পা জড়িয়ে ধরে বলতে লাগল, "স্যার আপনি আমার মা বাপ, আর কখনও আর ভুল করব না।"

পা ছাড়িয়ে বললাম, "শালা, তোদের কাজ করার সময় মনে পড়ে না যে ধরা পড়লে চাকরিটা যাবে। ভেবেছিস, ডুবে ডুবে জল খাবি, কোনও দিন কেউ জানতে পারবে না?"

জসিমুদ্দিন তখনও তোতাপাখির মতো একই কথা বলে চলেছে, "আর হবে না স্যার, এবার মাপ করে দিন। আর হবে না স্যার।"

গর্জন করে বললাম, "জিভটা কেটে ফেল না। এত লম্বা করেছিস কেন? তাহলেই ঝামেলা চুকে যায়।"

আমার কথার কী অর্থ বুঝল জসিমুদ্দিনই জানে, বলল, "হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ।"

বললাম, "এখন যা আমার সামনে থেকে, তোকে আমি সহ্য করতে পারছি না।"

জসিমুদ্দিন অন্য ঘরে চলে গেল। আমি চক্রবর্তীর কাছে জানতে চাইলাম, "এর দোসরটি কে?"

চক্রবর্তী মাথাটা টেবিলের দিকে নিচু করে বলল, "সে অমুক অমুক থানার কনস্টেবল, দুজনে জুটি বেঁধে এই কাজটা চালিয়ে যাচ্ছিল।"

চক্রবর্তী তখনও মাথা হেঁট করে আমাকে বলে যাচ্ছে। এরা তো জানে না, ওদের এই ধরনের দুষ্কর্মের জন্য আমাদের মাথা হেঁট হয়ে যায়। অপমানবোধ যদি সামান্যতম থাকত তবে এই সব কাজ ওরা করতে পারত না। চাকরির সুযোগ নিয়ে অপকর্ম করতে লজ্জা পেত।

আমার মতো একই অবস্থা চক্রবর্তীর। বুঝতে পারছি। তফাৎ একটাই আমি রাগটা দমন করতে না পেরে হাতে গরমে জসিমুদ্দিনকে শাস্তি দিয়ে দিয়েছি। চক্রবর্তী পারেনি। ও আইন মেনে চলছে। আমি আইন মানিনি। মানলে আমি কোনও কনস্টেবলের গায়ে হাত দিতে পারি না।

চক্রবর্তীই জিজ্ঞেস করল, "এখন এদের নিয়ে কী করি।"

আমি প্রায় ভাবলেশহীন ভাবে বললাম, "কি আর করবে? এক দোষের জন্য তো আর দু'বার শাস্তি দেওয়া যায় না। আমি যা শাস্তি দেওয়ার

দিয়ে দিয়েছি। এখন ওদের চালান করলে, ওদের চাকরিটা যাবে। না খেয়ে মরবে। তখন পুরো ছিনতাইবাজ হয়ে যাবে। আর আমি তো জসিমুদ্দিনকে মেরে ওর প্রাপ্য শাস্তি দিয়েই দিয়েছি। তুমি ওভাবে পারবে না। আবার কোর্টে চালান দিয়ে চাকরিটাও খেয়ে নিতে পারবে না। তার চেয়ে ওকে থানার থেকে বদলি করে রিজার্ভ ফোর্স টোর্সে পাঠিয়ে দাও, ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।"

"তাই করব, ওকে থানায় রাখা যাবে না। রাখলে অন্যরাও প্রশ্রয় পেয়ে যাবে।" চক্রবর্তী বলল।

আমি উঠে দাঁড়ালাম। বললাম, "আমি যাই, জসিমুদ্দিনকে নিয়ে যাচ্ছি।" চক্রবর্তী আমাকে এগিয়ে দিল। আমি জসিমুদ্দিনকে গাড়িতে তুলে লালবাজারে নিয়ে এলাম।

না, আমি ওকে অন্য দফতরে বদলি করলাম না। যথারীতি জেল গেটের নজরদারির কাজেই বহাল রাখলাম।

তারপর থেকে জসিমুদ্দিন শান্তভাবে ওর কাজ করে গেল। জানি না, ওর গহ্বরে ঢোকা জিভটা আবার লোভের ঠেলায় বেরিয়ে এসেছিল কি না? না বের হলেই ভাল, নয়ত মরবে।

পুলিশের চাকরিটাই সমস্যাসঙ্কুল। অবশ্য তা যদি সঠিক পেশাদারী পদ্ধতিতে করতে হয়। দায়িত্বহীনভাবে, গায়ে হাওয়া লাগিয়ে কোনওমতে চেয়ারটা রাখার জন্য যদি চাকরিটা করতে হয় তবে অবশ্য সমস্যা নয়। দায়িত্ব। এর গুরুত্ব যদি মনের গভীর থেকে বোধের তন্ত্রিতে সর্বক্ষণ না ঠেলা মারে তবে কোনও কাজই সফলভাবে পালন করা যায় না। ঘণ্টা বাজলে কাজ শুরু, ঘণ্টা থামলে বন্ধ, এভাবে আর যে কাজই চালানো যাক না কেন, পুলিশের কাজ চালানো যায় না। পুলিশের কাজে চব্বিশ ঘণ্টাই নিজেকে নিয়োজিত করতে হয়। রক্তের গভীরে কাজকে মিশিয়ে দিতে হয়। তবেই একজন পুলিশ কর্মচারী তার দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হবে নয়ত কোনওভাবেই নয়।

ডাকাত ধরতে গিয়ে আরও একবার সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলাম। সেটা উনিশশো তিরাশি সালের কথা।

সেই সমস্যাও এসেছিল এক অভাবিত কোণ থেকে। সমস্যার কথা বলার আগে ক'টা সাধারণ কথা বলে নিতে চাই।

সাধারণভাবে আমরা অপরাধী ধরি প্রথমে ঘটনার প্রাথমিক অনুসন্ধান ও তার ফলের সূত্র থেকে পাওয়া তথ্য থেকে। তারপর সেই সূত্র ধরে আমাদের নজরদার ও সোর্স থেকে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে। এরপর কোনও অপরাধী গ্রেফতার করতে পারলে তাকে বিভিন্ন কায়দায় জিজ্ঞাসাবাদ করে তার থেকে পাওয়া নতুন সূত্র ধরে অন্য অপরাধীকে আটক করি। এটাই সাধারণ পদ্ধতি।

অপরাধীদের কোনও সংগঠিত দলকে গ্রেফতার করতে গেলে এর চেয়ে আর কার্যকরী পদ্ধতি নেই। শুধু গোপনীয়তা ও সঠিকভাবে দ্রুত অ্যাকশন নিতে হবে।

সেবার পরপর দুটো ডাকাত দলের ক'জন সদস্যকে গ্রেফতার করেছি। কিন্তু আর এগিয়ে যেতে পারছি না। কারণ আমাদের ব্যর্থতা নয়। নতুন যোগসূত্রের অভাব। যে ধৃত ডাকাতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে নতুন যোগসূত্র পাব তা বিচ্ছিন্ন হতে লাগল।

তারা আমাদের হাত থেকে ফস্কে যাচ্ছে। যাচ্ছে আর কোথায়ও নয়, লালবাজারের সেন্ট্রাল লকআপ থেকে বিভিন্ন জেল হাজতে। কিন্তু তাতে তো আমাদের কাজ হবে না।

আমাদের সরাসরি কব্জা থেকে ডাকাতদের জেল হাজতে চলে যেতে সাহায্য করছেন আর কেউ না, আমাদের সেন্ট্রাল লকআপের ডাক্তার চক্রবর্তী। তিনি ডাকাতদের শরীরে জিজ্ঞাসাবাদের পরবর্তী সময়ে পরীক্ষা করে কোনও সামান্যতম যন্ত্রণা খুঁজে পেলেই সংশ্লিষ্ট আদালতের সমনে লিখে দিচ্ছেন যে ধৃত আসামিকে শারীরিক কারণে আর পুলিশের লকআপে রাখা উচিত নয়।

ব্যস, ওই একটা কারণ দেখিয়েই ডাকাতরা পটাপট আমাদের এক্তিয়ার এড়িয়ে জেল হাজতের আশ্রয়ে চলে যাচ্ছে।

এতে লাভ হচ্ছে কার? ওই ডাকাত ও তাদের দলের পলাতক সদস্যদের। আর ক্ষতি হচ্ছে আমাদের ও সার্বিকভাবে সমগ্র সমাজের। কারণ পলাতক ডাকাতরা তো আর কোনও সেবাশ্রমের সাধু নয় যে তারা জনগণকে সেবা করে বেড়াচ্ছে।

লালবাজার সেন্ট্রাল লকআপে একজন সর্বক্ষণের ডাক্তার থাকেন। তাঁর কাজ লকআপের বন্দিদের চিকিৎসা করা, বিশেষ প্রয়োজনে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা। তিনি লকআপ সংলগ্ন কোয়ার্টারেই থাকেন। যাতে যে কোনও সময় চিকিৎসা করতে পারেন। অন্য কোনও বিষয়ে তিনি সাধারণত মাথা ঘামান না। অলিখিত নিয়ম অনুযায়ী তিনি আমাদের তদন্তের কাজে

পরোক্ষে সাহায্যও করে থাকেন। আর আমরাও জানি চিকিৎসার বাইরে অন্য ব্যাপারে তিনি আমাদের সাহায্যকারীই।

কিন্তু ডাক্তার চক্রবর্তী আমাদের কাজে সাহায্য তো দূরের কথা, ব্যাঘাত ঘটাতে লাগলেন। পরপর বহু ঘাম ঝরিয়ে ডাকাত ধরছি, আর তিনি মাঝপথে আমাদের স্রোতকে উল্টো পথে ঘুরিয়ে দিচ্ছেন। বলা যায়, তিনি সক্রিয়ভাবে না হলেও নিজের চেয়ারের জোরে ডাকাতদেরই সাহায্য করে যাচ্ছেন। এবং সেটা ইচ্ছাকৃত ভাবে। অবশ্য গুরুত্ব না বুঝেই।

এভাবে প্রায় তিন মাস চলল। আমি ভেবে পাচ্ছি না কী করে এই সমস্যার সমাধান করব। ডাক্তারবাবু যা করে যাচ্ছেন তা আইনমাফিকই। আমি কীভাবে তাঁর কাজে হস্তক্ষেপ করে তাঁকে থামাব? আর তিনি তো আমার অধীনে নয় যে অন্য কোনও উপায়ে তাঁকে ক্ষান্ত করব। অথচ তাঁর অদ্ভুত ধরনের কাজে দিন দিন আমাদের হতাশা বাড়ছে। কিন্তু এভাবে তো চলতে পারে না। উপায় একটা বার করতেই হবে। নয়ত আমরা আর ডাকাত ধরতে পারব না। তাতে শুধু নিজেদের উপরওয়ালার চাপ ও সরকারী চাপই সহ্য করতে হবে না, সাধারণভাবে জনসাধারণ ও পত্রপত্রিকার চাপও সামলাতে হবে। তারা তো আর জানেন না কোন একটা সামান্য সমস্যার জন্য আমরা দ্রুত ডাকাতদের গ্রেফতার করতে পারছি না। তাদের অভিযোগ তো সম্পূর্ণভাবে যুক্তিযুক্ত। আমাদের ব্যর্থতা তারা মেনে নেবেন কেন? তারা প্রশ্ন তুলতেই পারেন, 'কি জন্য আমরা আছি? কি কারণে আমরা সরকার থেকে প্রতিমাসে পারিশ্রমিক নিই?'

ডাক্তারবাবুর ভীষণ রাগ আমাদের দফতরের ওপর। রাগের কারণ কিন্তু অতি ক্ষুদ্র। তিনি তাঁর ব্যক্তিগত প্রয়োজনে আমাদের দফতর থেকে গাড়ি চেয়ে পাননি। দ্বিতীয় রাগ তাঁকে আমরা কোনওদিন সান্ধ্য আসরে মদ্যপানের জন্য আমন্ত্রণ জানাইনি। এই দুটো রাগের বশবর্তী হয়ে তিনি আমাদের কাজ ভণ্ডুল করে চলেছেন।

হতাশা থেকে আমার রাগ বাড়তে লাগল। কারণটা কী স্বাভাবিক নয়? কত পরিশ্রম ও কৌশল করে যে একটা ডাকাতদলকে ধরতে হয় তা একমাত্র যারা ওই কাজে নিয়োজিত তারা ছাড়া কেউ বুঝতে পারবে না। আর অসম্ভব ঝুঁকি ও পরিশ্রমের পর যদি বিনা কারণে তা মাঝপথে থমকে যায় তবে রাগ কী হতে পারে না?

মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলাম এর একটা বিহিত করবই করব। একটা তুচ্ছ কারণে আমাদের ঘামের দাম অকারণে একজনের পাগলামির কাছে বিকিয়ে দেব না।

সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর ডাক্তারবাবুকে জব্দ করার জন্য একটা ছকও কষে ফেললাম। এবং সেটা কার্যকরী করার জন্য আমার সহকারী হিসাবে বেছে নিলাম আমাদের অফিসার শচী মজুমদারকে। যে ছক কষেছি সেটা ঠিকভাবে সফল করতে গেলে ওর চেয়ে আর ভাল সহকারী আমাদের দফতরে নেই। কারণ ছকটা একাধারে খানিকটা নিষ্ঠুর, খানিকটা বা দুষ্টুমিতে ভরা। দুষ্টুমি ব্যাপারটা শচীর খুব ভাল আসে। তাছাড়া ব্যাপারটা গোপনীয়ও, কোথায়ও কোনখানে সামান্যতমও এর প্রচার হলে চলবে না। যতই হোক, যাকে আমরা জব্দ করতে যাচ্ছি তিনি একজন ডাক্তার এবং আমাদেরই সেন্ট্রাল লকআপে কর্মরত। শচী ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝে গোপন রাখবে এই বিশ্বাস আমার ছিল।

পরিকল্পনা অনুযায়ী আমি একদিন রবিবার সকালে স্পেনসার বারে গেলাম। রাজভবনের উত্তরদিকের সদর, দরজার সামনে ওয়েলেসলি প্লেসে স্পেনসার বার ও রেস্টুরেন্টটা ছিল। ওখানকার প্রত্যেক কর্মচারীই আমার বিশেষ পরিচিত ছিল। বারে যারা টেবিলে টেবিলে মদের গ্লাশ পরিবেশন করে তাদের থেকে বিশেষভাবে আমার অনুগত ছিল এমন দুজনকে আমি আমার গোপন কাজটা জানিয়ে রাখলাম। তারপর বললাম, "আমি আর শচী দুপুরবেলা ওই ভদ্রলোককে নিয়ে আসব।"

লালবাজারে ফিরে গিয়েই আমি শচীকে দিয়ে ডাক্তার চক্রবর্তীর কাছে খবর পাঠালাম যে দুপুরবেলা তিনি আমাদের সঙ্গে লাঞ্চ করতে যাবেন। তিনি খুশি মনে আমার আমন্ত্রণ গ্রহণ করে শচীকে বললেন, "নিশ্চয়ই যাব। আমি তৈরি থাকব।"

দুপুর দুটোর সময় আমাদের গাড়িতে ডাঃ চক্রবর্তীকে তুলে নিলাম। তিনি প্রায় গদগদ চিত্তে আমাদের সঙ্গে চললেন লাঞ্চ সারতে। তিনি তো জানেন না, লাঞ্চ খাওয়ানোর আড়ালে তাকে জব্দ করতে চলেছি, আমাদের গাড়ি ছুটল স্পেনসার বার ও রেস্টুরেন্টের দিকে।

বারে ঢুকে আমরা যথানির্দিষ্ট টেবিলে বসলাম। শচী উঠে বার কাউন্টারের দিকে চলে গিয়ে গল্পগুজব করতে লাগল। ওর কাছে পাঁচটা অ্যানালজেসিক ট্যাবলেট রাখা আছে। সেগুলি সে আমার অনুগত ওয়েটারদের দিয়ে দেবে। তারা ডাক্তারের প্রতি পেগ রামের সঙ্গে একটা করে অ্যানালজেসিক ট্যাবলেট গুঁড়ো করে মিশিয়ে দেবে। আর আমাদের দু'জনকে ওরা একই রঙের ঠাণ্ডা পানীয় পরিবেশন করবে। যাতে ডাক্তার বুঝতে না পারেন যে আমরা মদ্যপানের বদলে ওঁর সঙ্গ দিতে ঠাণ্ডা পানীয় খাচ্ছি, তাই ওরা একেবারে

গ্লাস ভর্তি করে জল ও সোডা ডাক্তারের গ্লাসে দিয়ে পরিবেশন করবে, আমার সেটাই নির্দেশ।

শচী তার কাজ সেরে টেবিলে এসে বসল। ওয়েটার আমার পরিকল্পনা অনুযায়ী ডাক্তারকে সোডা মিশ্রিত রাম ও আমাদের দু'জনকে একই রঙের ঠাণ্ডা পানীয় দিয়ে গেল।

ডাক্তার চক্রবর্তী রামের গ্লাসে চুমুক দিতে শুরু করলেন। আমরাও 'চিয়ার্স' করে আমাদের গ্লাসে চুমুক দিতে শুরু করলাম। ডাক্তার গল্প জুড়ে দিলেন। আমরাও যোগ দিলাম। ঠাণ্ডা পানীয়ের গ্লাস এক চুমুকেই শেষ করা যায়, কিন্তু উপায় কী, আমরাও ডাক্তারের সঙ্গে ছোট ছোট চুমুক দিতে লাগলাম। এক পেগ শেষ করতে বেশ খানিকটা সময় নিলেন ডাক্তার। আমি ভাবলাম, এভাবে এত আস্তে চলবে না, আরও দ্রুত শেষ করতে হবে, তাহলেই ডাক্তারের নেশা তুঙ্গে তোলা যাবে। ট্যাবলেট ও রামের গুণে ডাক্তারকে কাৎ করতে হবে।

ভাবনা অনুযায়ী, দ্বিতীয় পেগ একইভাবে শুরু হলে আমি আমার গ্লাস তাড়াতাড়ি শেষ করলাম। ইঙ্গিতটা শচী বোঝার সঙ্গে সঙ্গে সেও তার ঠাণ্ডা পানীয়ের গ্লাস শেষ করলে, আমি ডাক্তারকে তাড়াতাড়ি তার গ্লাস শেষ করতে বললাম, "তাড়াতাড়ি চালান ডাক্তার, এত ধীরে চললে কখন শেষ হবে?"

আমার তাড়ায় ডাক্তার তাঁর দ্বিতীয় পেগ তাড়াতাড়ি শেষ করতেই তৃতীয় পেগ সাজিয়ে ওয়েটার নিয়ে এল।

আমরা এবার খাবার অর্ডার দিলাম। অর্ডার অনুযায়ী খাবার আসার আগেই দ্রুত লয়ে তৃতীয় পেগও শেষ করতে আমরা ডাক্তারকে বাধ্য করালাম। খালি পেটে তিন পেগ রাম ও অ্যানালজেসিক ট্যাবলেটের গুঁড়ো ডাক্তারের পাকস্থলীতে পড়তে সেগুলো যথারীতি কাজ শুরু করেছে। কাজ তো তারা করবেই, কাজের জন্যই তাদের পাঠানো হয়েছে। ডাক্তার চক্রবর্তী বকর বকর শুরু করেছেন। আমরাও আসর জমানোর জন্য তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে বকবক করছি। চতুর্থ পেগ এল।

আমি এবার একটানে আমার গ্লাশ শেষ করলাম। তিনি আমার মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন চোখ গোল করে। আমি মুচকি হেসে প্রশ্ন করলাম, "কী হলো ডাক্তার, অবাক হচ্ছেন। আমি এমনি ভাবেই খাই। প্রথমে একটু ধীরে, তারপর দ্রুত।"

"না, না, এমনভাবে খাবেন না, এটা খারাপ, হার্টে ধাক্কা মারে।" ডাক্তার চক্রবর্তীকে উদ্বিগ্ন দেখাল।

"দুর, ওসব ভাবলে আর মদ খাওয়া যায় না। একটু নেশা না হলে আর মদ খাওয়ার দরকার কী?" বললাম।

তিনি তো আর জানেন না, আমি আসলে ঠাণ্ডা পানীয় গলধঃকরণ করছি। ওঁকে ঠকাচ্ছি। শচীর গ্লাসও শেষ।

চার গ্লাস ঠাণ্ডা পানীয় পেটে চালান দেওয়ার ফলস্বরূপ বাথরুমের দিকে যেতেই হলো। আমি ফিরে এলে শচীও ঘুরে এল। চতুর্থ পেগও শেষ। ডাক্তার খেতে শুরু করেছেন। আমরাও।

আমি পঞ্চম পেগের অর্ডার দিলাম। ডাক্তার একবার 'না-না' করে বললেন, "আর খাব না।"

"আরে ডাক্তার সে কী হয়, রোজ রোজ তো আর বসা যাবে না। আর বসলে জমিয়ে আড্ডা না মারলে কী ভাল লাগে?" আমি ডাক্তারকে উপেক্ষা করেই পঞ্চম পেগ আনালাম।

তারপর ষষ্ঠ, সপ্তম। ডাক্তারের নেশাও সপ্তমে চড়ে গেছে। কথা বলছেন না তো, যেন চিৎকার দিচ্ছেন। কোনমতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে কিছু খেলেন কিছু ফেললেন। আমি বুঝে গেলাম আমার উদ্দেশ্য যা ছিল তা হয়ে গেছে। এবার একে মাঠে নামিয়ে দেওয়া যেতে পারে।

আমরা বেরিয়ে এলাম। ডাক্তারকে গাড়ির পেছনের সিটের মাঝখানে বসিয়ে আমি আর শচী দু'জনে ওর দু'পাশে বসলাম। ডাক্তার নিজের নেশাতেই এত মত্ত যে, আমরা যে নেশাগ্রস্ত নই তা তিনি বুঝতেই পারছেন না।

ইচ্ছে করেই আমি গাড়ি ছোটালাম গঙ্গার দিকে, ডাক্তারকে একটু হাওয়া খাওয়াব। স্পেনসার থেকে গঙ্গার পুব পাড়ে আসতে আর ক'মিনিট। আমরা গাড়ি নিয়ে উত্তর দক্ষিণে তিন পাক ঘুরলাম। ডাক্তারের নেশা একেবারে হাওয়াই বাজির মতো আকাশে ঊর্ধ্বমুখী উঠছেই উঠছে।

আমি আর শচী গঙ্গার ধারে গাড়ি থেকে নেমে ড্রাইভারকে নির্দেশ দিলাম ওকে লালবাজারে পৌঁছে দিতে, আমরা ওঁর সঙ্গে ফিরলাম না। একসঙ্গে ফিরলে সবাই জেনে যাবে যে, ওঁর এই অবস্থার জন্য আমরাই দায়ী। ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে ছুটল। আমরা ডাক্তারকে বিদায় জানালাম।

তখন ঘড়িতে সাড়ে চারটে বাজে। আড়াই ঘণ্টাতেই আমাদের কাজ শেষ। এবার ফলের অপেক্ষায়।

আমি আর শচী ঘণ্টাখানিক ফালতু এদিক ওদিক ঘুরলাম। রবিবার। ছুটির দিন। আমরা ইডেন গার্ডেনের পশ্চিম দিকের বাগানে যুগলবন্দীদের হরেক রকম কর্ম ও অপকর্ম দেখতে দেখতে সময় কাটাতে লাগলাম। এসব তো আর দেখা হয় না। আর বয়সের মাপকাঠিতে আমরা সেই প্রান্তরেখা

বহুদিন আগে পার করে দিয়ে এসেছি। আমি পার করেছি কোচবিহার শহরে আর শচী হাওড়া ও কলকাতার রাস্তায়। শচীর বয়স আমার চেয়ে কম। তাই ওর চোখের তারার দৃষ্টিতে এখনও রঙীন জীবন ফ্যাকাশে হয়ে যায়নি। জীবনটাকে মিষ্টিই লাগে। আমার তরী সমুদ্রের কোল ফেলে অনেকদূর এগিয়ে গেছে, জীবনের মিষ্টির স্বাদ কতটা মিষ্টি তা টের পেয়ে গেছি। মিষ্টি ফিরে পেতে চাইলেও যে আর ফিরে পাব না তাও জেনে গেছি। পুলিশের চাকরি যে কতটা নির্মম তা খানিক আগে ডাক্তার চক্রবর্তীকে নাজেহাল করার মধ্যেই টের পেয়েছি। নিজেকে অপরাধী মনে হলেও বৃহত্তর সামাজিক স্বার্থেই যে এমন নির্মম হতে হয়েছে তাও জানি। এই কঠোর জীবনে আর রস কই যে, পৃথিবীর মিষ্টি স্বাদ উপভোগ করব? ইডেনের বাগান থেকে আমরা বেরিয়ে এলাম।

এবার লালবাজারে যেতে হবে। ডাক্তারের খবর নিতে হবে। খবর নিয়ে বুঝব ফলাফল ইতিবাচক হবে না নেতিবাচক।

ছ'টা নাগাদ আমি আর শচী ট্যাক্সিতে চেপে লালবাজারে ফিরে সোজা আমাদের ডাকাতি দমন শাখার দফতরে চলে এলাম।

দফতরে স্বাভাবিক কারণেই লোক কম। আমি, আমাদের দুই কনস্টেবল শচীন ও অসিতকে ডেকে ডাক্তার চক্রবর্তী লালবাজারে ফিরে কী কী ঘটিয়েছে সেই খবর আনার জন্য পাঠালাম।

আমি আর শচী খবরের আশায় অধীর ভাবে বসে রইলাম।

ওরা মিনিট পনেরোর মধ্যে লালবাজার চত্বর ঘুরে ফিরে এল। ওদের মুখে মিঠি মিঠি হাসি ঝুলছে দেখেই আমার মালুম হলো ডাক্তার নিশ্চয়ই কিছু ঘটিয়েছে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কী রে কী শুনলি, ডাক্তার এখন কোথায়?"

অসিত হেসে বলল, "সেন্ট্রাল লকআপের ডিসপেনসারির টেবিলে শুয়ে বকে যাচ্ছেন।"

আমি বললাম, "সেকি রে, কোয়ার্টারে যেতে পারেননি?"

শচীন জানাল, "না স্যার, সে অনেক কথা।"

"তাহলে প্রথম থেকেই বল, কি শুনেছিস?"

শচীন বলতে শুরু করল, "সাড়ে চারটে নাগাদ আমাদের গাড়িতে ফিরেছে। গাড়িটা স্যার ঢোকার মুখে একবার দাঁড়িয়ে গিয়েছিল, ডাক্তারবাবু চিৎকার করে যাচ্ছিলেন, কিন্তু ওকে দেখা যাচ্ছিল না।"

প্রশ্ন করলাম, "দেখা যাচ্ছিল না মানে?"

"হ্যাঁ স্যার। বাইরে থেকে চিৎকার শোনা যাচ্ছিল, অথচ নিরুত্তাপ ড্রাইভার

বাদে কোনও লোককে গাড়িতে দেখা যাচ্ছিল না বলে গেট ডিউটির সিপাই এগিয়ে গিয়ে দেখে কী ডাক্তারবাবু পেছনের সিটের সামনে পড়ে আছে আর ওর পা দুটো সামনের সিটের পেছনে উঁচু করে তোলা। ডাক্তারবাবুকে ওই অবস্থায় দেখেই গেট ডিউটি বুঝে যায় কী হয়েছে। ও কিছু বলেনি, ড্রাইভার সেন্ট্রাল লকআপের সামনে গিয়ে গাড়ি দাঁড় করায়।"

"তারপর?"

শচীন আবার বলতে শুরু করল। "ড্রাইভার লকআপের সামনে দাঁড়ানো দু'জন কনস্টেবলকে ধরে ডাক্তারবাবুকে টেনে গাড়ি থেকে নামাতেই তিনি চিৎকার করে বলতে থাকেন, ছাড় আমাকে ছাড়, জানিস আমি আজ কার সঙ্গে খেয়েছি, আমি রাজার সঙ্গে খেয়েছি, রাজার সঙ্গে।"

মনে মনে পুরো দৃশ্যটা ভেবে আমার হাসি পাচ্ছে। জিজ্ঞেস করলাম, "তারপর কী হয়েছে?"

"ওনার চিৎকারে চারপাশের অনেক লোক জমে গেছে। উনি একই কথা বলে চলেছেন, আমি আজ রাজার সঙ্গে খেয়েছি, রাজার সঙ্গে। কে একজন জিজ্ঞেস করেছিল, কোন রাজা স্যার? উনি নাকি বলেছেন, রাজাকে চিনিস না, লালবাজারের রাজা, ছ্যা! তোরা যা।"

"লকআপের সামনেই এসব হচ্ছে?"

শচীন বলল, "হ্যাঁ স্যার, ওনার চিৎকারে ওপরের কোয়ার্টারের বারান্দা থেকে ওনার স্ত্রী আর ছেলে উঁকি দিয়ে দেখেন। স্ত্রী ওনার ওই অবস্থা দেখে ছ্যা ছ্যা করে ভেতরে ঢুকে যান। ছেলে বাবাকে কোয়ার্টারে নিয়ে যাওয়ার জন্য নিচে এসেছিল, ছেলেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। ওনার তো কোনও ব্যালেন্সই নেই। তারপর ডিসপেনসারির লোকেরা কোনও মতে টেনে টেনে চ্যাংদোলা করে ডিসপেনসারিতে নিয়ে যায়। ওখানেই টেবিলের ওপর শুইয়ে দেয়, ওখানেই আছেন।"

জিজ্ঞেস করলাম, "অবস্থা কী রকম, তোরা দেখে এসেছিস?"

দু'জনে প্রায় একসঙ্গে বলল, "হ্যাঁ স্যার, চিৎকারটা থেমেছে, তবে এখনও কী বিড়বিড় করে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে, আজ ওভাবেই কাটবে।"

"ঠিক আছে। তোরা যা। মাঝে মধ্যে ডাক্তারের খবর নিস।" বললাম।

শচীন ও অসিত চলে গেল।

আমি আর শচী একচোট হাসলাম। ওষুধ কাজে লেগেছে। এবার ওকে যে জন্য ওষুধ দিয়েছিলাম তার প্রতিক্রিয়ার জন্য অপেক্ষা করব। আমাদের ধৃত ডাকাতদের ওর ক্ষমতা প্রয়োগ করে অযথা আর জেল হাজতে পাঠায় কী পাঠায় না সেটা দেখব।

আমি আর শচী যে যার বাড়ি চলে গেলাম।

রাত দশটা নাগাদ খবর নিলাম, তখনও ডাক্তার ডিসপেনসারির টেবিলে শুয়ে আছেন। তবে অঘোরে ঘুমাচ্ছেন। ঘুমান। এখন ওর গভীর ঘুম দরকার। সাত পেগ রাম আর পাঁচটা অ্যানালজেসিক ট্যাবলেটের গুঁড়োর জোর কোথায় যাবে। রক্তে মিশে তার প্রতিক্রিয়া তো হবেই হবে। ডাক্তার ঘুমাবেন।

পরদিন সকাল দশটার সময় ডাক্তারের ঘুম ভাঙল। সারারাত ডিসপেনসারির ওই টেবিলেই শুয়ে ছিলেন। কোথায় শুয়েছিলেন তিনি তো আর জানেন না। ঘুম ভাঙার পর জেনেছেন। তারপর সোজা কোয়ার্টারে। সেদিন আর নিচে নামেননি। নিশ্চয়ই দুপুরেও নেশার অবশিষ্ট রেশ কাটাতে নিজের বিছানায় ঘুমিয়েছেন। তবে ওঁর স্ত্রী যে অবিশ্রান্ত ধারায় ওর বাপান্ত করে গেছেন সেই খবর পেয়েছি। খবর আমাকে রাখতেই হচ্ছে কারণ আমার আসল উদ্দেশ্য সফল হলো কী না সেটাই জানা দরকার। সেটা জানতে আরও একদিন অপেক্ষা করতে হলো। ক'জন ডাকাত সেন্ট্রাল লকআপে রয়েছে। তাদের তিনি কী করেন সেটা দেখলেই বোঝা যাবে, আর অহেতুক তিনি আমাদের কাজে হস্তক্ষেপ করবেন কী না।

একদিন পর তিনি নামলেন। ডাকাতদের চিকিৎসাও করলেন। আমি ডাক্তারের আচরণ পরীক্ষা করার জন্য ডাকাতদের ওপর ওষুধও প্রয়োগ করে রেখেছিলাম। না, ডাক্তার আর আদালতে সুপারিশ করেননি ওই ডাকাতদের জেল হাজতে পাঠিয়ে দেওয়ার। তিনি সম্ভবত বুঝে গিয়েছিলেন যে আমাদের সঙ্গে তিক্ত সম্পর্ক তৈরি করে আখেরে তার কোনও লাভ হবে না। তাই তিনি চুপ করে গেছেন।

অবশ্য এই ঘটনার পর তিনি আমার সঙ্গে আর কোনওদিন কথা বলেননি, যখনই দেখা হয়েছে তখনই মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছেন, আর শচীকে তো গালাগালি দিতেন। সরাসরি নয়। পরোক্ষে।

ঘটনা হলো, প্রশাসনিক কারণে আমি ক'টা কনস্টেবলকে মেরেছি এমন কী আমাদের গোয়েন্দা দফতরের একসময়কার ডি সি প্রসূন মুখোপাধ্যায়ের নির্দেশে তারই চেম্বারে পুলিশের পুরো সাজসজ্জা পরিহিত অবস্থায় এক সার্জেন্টকেও কটা চড় মেরেছি। মেরেছি কিন্তু কারও চাকরির থেকে বরখাস্ত হওয়া রুখেছি। ওই সার্জেন্টও এমন অপরাধে জড়িয়ে গিয়েছিল যে চড়ের বদলে সে বরখাস্ত হতো। বিশ্বনাথ, জসিমুদ্দিনরাও বরখাস্ত হতো। আমি কোনও নালিশ করিনি।

তাই এখনও, অবসর নেওয়ার পরও ওরা আমার সঙ্গে সৌজন্যমূলক

সাক্ষাৎ করে যায়। জসিমুদ্দিন প্রতি বছর ঈদের পর আমার বাড়ি আসে মুবারক জানাতে। ওরা জানত, আমি ওদের ভালবাসি, তাই অন্যায় করে আমার দেওয়া শাস্তি মাথা পেতে নিয়েছে।

সঠিকভাবে প্রশাসন চালাতে গেলে এক চোখ কড়া আর এক চোখ নরম রাখতেই হয়। ভাল কাজ করলে যেমন পুরস্কৃত করতে হয়, মন্দ কাজ করলে তেমনই তিরস্কার করতে হয়। তবে ভাল হওয়ার অবশ্যই সুযোগ দিতে হবে এবং সেটা তাড়িয়ে দিলে পাওয়া যাবে না। এই সত্যটা কে না জানে?

একাত্তরের শেষ ভাগে এসে কলকাতায় নকশাল আন্দোলন অনেকটাই স্তিমিত হয়ে আসে। একদিকে আমাদের একনাগাড়ে প্রতি আক্রমণ। অন্যদিকে তাদের অসার রাজনীতির জন্য ব্যাপক জনগণের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তারা দিগ্‌ভ্রান্তের মতো প্রায় শূন্যে ভাসতে লাগল। তাদের অধিকাংশ জঙ্গি সদস্যরা হয় জেলে নয়ত মৃত। নিজেদের মধ্যে মতাদর্শ নিয়ে তীব্র দ্বন্দ্ব। শুধু তীব্র দ্বন্দ্বই নয় তাদের পরস্পরের মধ্যে প্রায় শত্রুতার সম্পর্ক।

শীর্ষ নেতাদের মধ্যে কানু সান্যাল, জঙ্গল সাঁওতাল, সৌরেন বসু, অসীম চট্টোপাধ্যায় জেলে। সরোজ দত্ত নিখোঁজ। তিনি জীবিত না মৃত তাই নিয়ে জোর বিতর্ক। অন্তত লালবাজারে আমাদের নকশাল আন্দোলন দমন সেলে তার সম্পর্কে নির্দিষ্ট কোনও খবর নেই। তা নিয়ে গুজব, পাল্টা গুজব ও খবরের মধ্যে একটা রহস্য।

আমাদের এ ব্যাপারে খুব একটা মাথাব্যথা নেই, কারণ আমরা জানি, ডানা ছাঁটা হলে পাখি আর উড়তে পারে না। আমাদের প্রতিদিনের কর্ম সেদিকেই নির্দিষ্ট। হ্যাঁ, যদি পাখিকেও খাঁচায় পোরা যায় তবে ডানার জীবনীশক্তিকেও নিষ্ক্রিয় করা যায় বৈকি। সুতরাং নেতাদের কব্জা করাটাও একটা লক্ষ্য অবশ্যই ছিল। কিন্তু মূল লক্ষ্য নয়, মূল লক্ষ্য হচ্ছে সন্ত্রাসবাদ দমন। খুন, জখম বন্ধ করা।

তখনও চারুবাবু বাইরে এবং গোপন আস্তানা থেকে একের পর এক বোমা ছুঁড়ে চলেছেন। বোমাগুলি সব তাদের মুখপত্র, 'দেশব্রতীর' পাতায় ছাপার অক্ষরে। এবং সবই তাঁর পার্টির বিশৃঙ্খল কর্মীদের প্রতি। কর্তব্য

সম্পর্কে হুঁশিয়ারি এবং ভবিষ্যৎবাণী। সেই নির্দেশ মতো তাঁর অনুগামীরা সন্ত্রাস সৃষ্টিতে ব্যস্ত।

অন্ধ ভাবালুতার যে কি পরিণাম তখন পশ্চিমবঙ্গের মানুষ জেনেছেন। আন্দোলনের পরিণতি দেখেও চারুবাবুর প্রতি অন্ধ বিশ্বাসে তারা তখনও অন্ধের মতো বিশ্বাস করত সত্তর দশকেরই মধ্যে ভারতবর্ষের 'মুক্তি' সম্ভব। তাদের কাছে একটাই যুক্তি, তা হলো, কথাটা 'শ্রদ্ধেয় নেতা' বলেছেন। সুতরাং 'না' হয়ে যাবে না।

এই বিশ্বাসের ফলেই, গুটি কয় নকশাল তখনও চালিয়ে যেতে লাগল সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ। কারণ একাত্তরের ডিসেম্বরে চারুবাবু একটা লেখায় তাদের বললেন, "সাময়িকভাবে হয়তো আমরা কয়েক জায়গায় পিছু হঠতে বাধ্য হব, কিন্তু পার্টি যদি থাকে তাহলে সংগ্রাম অনিবার্যভাবে উন্নত পর্যায়ে উঠবে। আমাদের পার্টি কমরেডরা যে বিপ্লবী সংগ্রাম পরিচালনা করছেন তাকে আরও তীব্র করা এবং এই রাজনৈতিক প্রচার ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেওয়া হলো আমাদের কাজ। সামগ্রিকভাবে বিপ্লবী জোয়ার আসতে বাধ্য—এই বিশ্বাস নিয়ে আজ আমাদের কমরেডদের আরও দৃঢ়ভাবে এগিয়ে যেতে হবে।"

আন্দোলনের পরিণতি চারুবাবু দেখেছিলেন। তাই তিনি বলতে বাধ্য হলেন, "সাময়িকভাবে আমরা কয়েক জায়গায় পিছু হঠতে বাধ্য হব" কিন্তু তিনি কৌশল করে, "কেন পিছু হঠতে বাধ্য হব।" সেই প্রশ্নের কোনও উত্তর দিলেন না। সেটার সঠিক ব্যাখ্যা দিতে গেলে তারই সৃষ্টি কিছু অলীক স্বপ্নের আসল চেহারাটা সামনে এসে পড়ত। কিন্তু তিনি সেটা চাননি। চাননি তাঁর স্বপ্নের সৌধকে নিজের হাতেই গুঁড়িয়ে দিতে। তাই তিনি তাঁর দিশায় নেশাগ্রস্ত তরুণ-তরুণীদের উৎসাহ দেওয়ার জন্য বললেন, "বিপ্লবী জোয়ার আসতে বাধ্য।"

কোথা থেকে আসবে, কেন আসবে তার কোনও ব্যাখ্যা নেই। যে জোয়ার ব্যাপক জনগণের মন থেকে উঠে আসে সেই জনগণই যে চারুবাবুর ভ্রান্ত পথকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে তা তিনি নিজে উপলব্ধি করলেও তাঁর ক্যাডারদের মধ্যে সংক্রমিত হতে দিলেন না। যদিও ততদিনে তাঁর পার্টির মধ্যে তাঁর কর্তৃত্ব শুধু চ্যালেঞ্জেরই সম্মুখীন হয়নি, সেটা ছত্রাকার, টুকরো টুকরো।

সৌরেন বসু চিন সফর শেষে ফিরে এসে চিনের কমিউনিস্ট পার্টির বক্তব্য চারুবাবুকে তাঁর গোপন আস্তানায় বিস্তারিতভাবে বলেছিলেন। চিনের

পার্টি যে চারুবাবুর লাইনকে সমর্থন করছেন না, সেটা শুনে চারুবাবু কিছুক্ষণের জন্য চেতনা হারিয়ে ফেলেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন, যাঁদের নাম করে তিনি 'সশস্ত্র বিপ্লবের' কৌশলকে সাজিয়েছিলেন তারা যখন তা নস্যাৎ করে দিয়েছেন তখন তাঁর সব আশা শেষ। তাই সাময়িকভাবে তাঁর চেতনা লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তিনি দমে যাননি। তিনি তাঁর পুরনো লাইনকে আঁকড়ে থেকে তাঁর সদস্যদের সেই পথে নির্দেশ দিতে থাকলেন। কিন্তু সৌরেনবাবুর বক্তব্য তাদের পার্টির মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচার হয়ে যেতে পার্টির মধ্যে গুরুতর ভাবে ভাঙ্গন দেখা দিল। তাদের অভ্যন্তরে অন্তর্বিরোধ ও মতপার্থক্য চূড়ান্ত রূপ নিয়ে তারা ছোট ছোট দল উপদলে বিভক্ত হতে লাগল।

কিন্তু তখন চারুবাবুর পথের একনিষ্ঠ অনুগামীরা সন্ত্রাসবাদ সংগঠিত করতে লাগল। বাহাত্তর সালের প্রথম দিকে ছত্রাকার অবস্থায় ওরা কলকাতায় কোনও খুন করতে না পারলেও বিভিন্ন স্কুল ও কলেজে হামলা চালিয়ে যেতে লাগল।

জানুয়ারির উনত্রিশ তারিখে হামলা করল জোড়াসাঁকোর সিমলা স্ট্রিটে ক্যালকাটা ট্রেনিং একাডেমিতে।

পয়লা মার্চ চিৎপুর থানার শ্রীশ চৌধুরী লেনের বস্তির ভেতর বিকেল সাড়ে তিনটের সময় ওই থানার এক তদন্তকারী দলকে বোমা দিয়ে আক্রমণ করে। তদন্তকারী দলের গুলির পাল্টা আক্রমণে ওদের দলের এক তরুণ সদস্য মারা গেল। ওর থেকে উদ্ধার হলো একটা পাইপগান।

বাইশে এপ্রিল লেনিনের জন্মদিনে এবং ওদের পার্টির প্রতিষ্ঠা দিবসে পার্টির দক্ষিণ কলকাতার শাখার ছ'জন সদস্য দুপুর আড়াইটার সময় সাদার্ন অ্যাভিনিয়ুর বিড়লা একাডেমি অফ আর্টস অ্যান্ড কালচারে লাল পতাকা উড়িয়ে দিয়ে চলে গেল।

বিকেল সাড়ে চারটের সময় একই কায়দায় টালিগঞ্জ থানার অধীন লেক রোডের কমলা গার্লস স্কুলে পতাকা উড়িয়ে পালাল, এখানেও ওই ছ'জন যুবক। এবার গড়িয়াহাট রোডের সিটি কলেজে তারা কর্মসূচী পালন করল। তখন সাড়ে পাঁচটা। ছ'জন যুবক এল। নকশালদের বাঁধাধরা স্লোগান দিল, পতাকা উড়িয়ে চলে গেল। জানি না, লেনিন তাঁর লিখিত চুয়ান্ন খণ্ডের কোনও পংক্তিতে এভাবে বিপ্লব এগিয়ে নিয়ে যাবার কোন নির্দেশ দিয়েছিলেন কিনা। কিন্তু চারুবাবুর অনুগামীরা যে তাঁর নামে এই কাণ্ডগুলি করল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তাতে কার সম্মান বৃদ্ধি পেল একমাত্র তারাই জানে।

ওই বছর মে দিবসও ওই একইভাবে পালন করল ওরা স্কটিশ চার্চ

কলেজিয়েট স্কুল ও নোনাপুকুর ট্রাম ডিপোয়। রক্ত ঝরিয়ে মে দিবস পালন করার ওদের যে কায়দা তা আর করতে পারল না। কারণ ততদিনে ওদের শক্তি অনেকটাই কমে গেছে।

যদিও মার্চ মাসে চারুবাবু তাঁর অনুগামীদের অনুপ্রাণিত করার জন্য তাঁর গোপন আস্তানা থেকে আরও একটা লেখা পাঠালেন। তাতে তিনি লিখলেন, "নকশালবাড়ির কৃষক সংগ্রাম থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত যারা পার্টি থেকে বিতাড়িত হয়েছে তারা সকলেই পার্টির 'শ্রেণীশত্রু খতম' ও 'সশস্ত্র সংগ্রামের লাইনের' ওপর আক্রমণ হানছে। এসব সংশোধনবাদীরাই আবার গণ আন্দোলন গড়ে তোলার ব্যাপারে একমত। কেউ কেউ তো এমনও বলতে শুরু করেছে যে, ভারতে সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করার পরিস্থিতিই আসেনি। আমার কিন্তু দৃঢ় বিশ্বাস যে আমাদের পার্টি সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে অর্থাৎ বন্দুকের দ্বারা গণসংগ্রামের রাস্তা উন্মুক্ত করবে ও চালিয়ে যাবে। এভাবেই জনযুদ্ধের দাবানল জ্বলে উঠবে।"

এখানে দুটো জিনিস পরিষ্কার, প্রথমত যারা চারুবাবুর পথকে পরিত্যাগ করেছে, চারুবাবু বললেন, তিনি তাদের পার্টি থেকে বিতাড়িত করেছেন। এই 'বিতারিতদের' মধ্যে কানু সান্যাল, জঙ্গল সাঁওতালরাও ছিলেন, যাঁরা নকশালবাড়ির কৃষক আন্দোলনের মূল কাণ্ডারী। তাতে বোঝা যায়, চারুবাবু নিজেকে অতি-সাংবিধানিক শক্তি হিসাবে ভাবতেন। দ্বিতীয়ত, খতম ও সশস্ত্র সংগ্রামের প্রশ্নকে একসঙ্গে রেখে গুলিয়ে দিয়েছেন, যাতে মনে হয় 'সশস্ত্র বিপ্লব' আর 'খতম' একই লাইন। পরিচালনা যে 'বন্দুক' অর্থাৎ সেই 'খতমই' করবে তাও বলে দিলেন।

কিন্তু সমস্যা হচ্ছে অন্য জায়গায়। তা হলো, একটা মানুষ স্বপ্নে যা ইচ্ছে তাই দেখতে পারে, সেটা তার হাতে। কিন্তু বাস্তব তো তার হাতে নয়। বাস্তব তো তখন অন্য কথা বলছে। বাস্তব বলছে, চারুবাবুর লাইনে স্বপ্ন দেখা বন্ধ হয়ে গেছে। যে ক'জন দেখে, তাদের শক্তি নগণ্য। এবং আর একটা জিনিস ততদিনে পরিষ্কার, 'চারুবাবুর লাইনে নতুন করে আর কেউ স্বপ্ন দেখবে না।' তাই লেনিনের জন্মদিনে ও মে দিবসে 'রক্তের হোলি খেলে যথার্থভাবে' পালন করা পাগল তরুণদের আর পাওয়া যাবে না।

একাত্তরের শেষদিকে ওদের পার্টির বিহার শাখা, অন্ধ্রপ্রদেশের শাখা এবং পঞ্জাব শাখার ভাঙন সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। চারুবাবুর কর্তৃত্ব আর

তারা মানবে না বলে ঘোষণা করে দিয়েছিল কারণ চারুবাবুর পথকে তারা ভুল হিসাবে পরিত্যাগ করেছিল।

এরপর ওদের সি পি আই (এম এল)-র সবচেয়ে শক্তিশালী অংশ পশ্চিমবঙ্গেও ভাঙ্গন সম্পূর্ণ হলো যখন বাহাত্তরের জুন মাসে জেল থেকে কানু সান্যাল, চৌধুরী তেজেশ্বর রাও, সৌরেন বসু, নাগভূষণ পট্টনায়ক, কোলা ভেঙ্কাকাইয়া, ভুবনমোহন পট্টনায়ক—এই ছ'জন নেতা এক খোলা চিঠিতে সরাসরি চারুবাবুকে আক্রমণ করে তাঁর নীতি ও কৌশলকে নস্যাৎ করলেন। সেই চিঠিতে ওই ছ'জন নেতা পরিষ্কার করে চারুবাবুর পথ সম্পর্কে চিনা কমিউনিস্ট পার্টির মূল্যায়ন জানালেন, "একজন বিপ্লবীর হাত যদি শ্রেণীশত্রুর রক্তে রঞ্জিত না হয়, তাহলে সে কমিউনিস্ট নয়—এই সূত্র সম্পর্কে আমাদের মত হলো, এই যদি কোনও কমিউনিস্ট পার্টিতে কমিউনিস্ট হবার মাপকাঠি হয়ে থাকে, তাহলে সেই পার্টি আর কমিউনিস্ট পার্টি থাকতে পারে না।"

"গণ-সংগ্রাম, গণ-সংগঠন ছাড়া কৃষকের সশস্ত্র সংগ্রাম টিকে থাকতে পারে না। নকশালবাড়ির সংগ্রামকে নিছক রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের সংগ্রাম ভেবে কিন্তু চিনের কমিউনিস্ট পার্টি সমর্থন করেনি।"

"গঠন ও বিকাশের ক্ষেত্রে একজন নেতার কর্তৃত্ব ও সম্মান গড়ে তোলা যেতে পারে না।"

"সি পি আই (এম এল)-র সাধারণ গঠন কর্ম সঠিক কিন্তু এর নীতি ভুল।"

ওই চিঠিতে এরপর ওই ছ'জন নেতা লিখলেন, "ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টির (চিনা কমিউনিস্ট পার্টি) তরফ থেকে দেওয়া এইসব মূল্যবান সুপারিশ এবং সমালোচনাকে আমরা দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করছি। আমরা গভীরভাবে মনে করেছিলাম, কমরেড চারু মজুমদারের নেতৃত্বে পরিচালিত আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি উল্লেখিত সুপারিশ এবং সমালোচনাকে গ্রহণ করবে এবং আমাদের দেশের কৃষি বিপ্লবের স্বার্থে সুপারিশ মতো আত্মসমালোচনা করে ভুলগুলিকে সংশোধন করবে।

কিন্তু বড়ই অসন্তুষ্টির বিষয়, আমরা দুঃখ ও বিরক্তির সঙ্গে লক্ষ্য করলাম—কমরেড চারু মজুমদার এবং তাঁর নেতৃত্বে পরিচালিত কেন্দ্রীয় কমিটি এই মূল্যবান সুপারিশগুলি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করত অস্বীকার করেছে। আমাদের মতে, এই সুপারিশগুলি সম্পর্কে তাঁর যদি কোনও ভিন্নমত থেকে থাকে, তাহলে তিনি ওই সুপারিশগুলিকে আলোচনার জন্য সঙ্গে সঙ্গে

পার্টি ইউনিটগুলির কাছে পাঠাতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করতে ব্যর্থ হয়েছেন এবং যার ফলে পার্টির মধ্যে আলোচনা ও বিরূপ আলোচনার সৃষ্টি হয়েছে। এ হলো ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনে অনুসৃত সেই অচল, পুরনো পদ্ধতি ও প্রয়োগের অনুসরণ।

আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, কেন্দ্রীয় কমিটি ও কেন্দ্রীয় পার্টি লাইন গৌরবময় নকশালবাড়ির কৃষক অভ্যুত্থানের পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে।

আমরা গভীরভাবে অনুভব করি আমাদের পার্টির নীতি বামপন্থী অ্যাডভেনচারিস্ট বিচ্যুতিতে ভুগছে। যার ফলে পার্টি গোষ্ঠী ও উপদলে বিভক্ত হচ্ছে এবং কমরেড সুশীতল রায়চৌধুরী এই পদ্ধতির শিকার হয়েছেন। পরিণতিতে আমাদের দেশের কৃষি বিপ্লবের বিষয়টি পিছু হটছে এবং বিপন্ন হচ্ছে।

আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, বামপন্থী অ্যাডভেনচারিস্ট বিচ্যুতির জন্য পার্টির সাধারণ সম্পাদকরূপে কমরেড চারু মজুমদার প্রধানত দায়ী। একইভাবে আমরা আরও বিশ্বাস করি যে, পার্টির প্রথম কংগ্রেস দ্বারা নির্বাচিত আগেকার কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যরা এবং বর্তমান কেন্দ্রীয় কমিটির মনোনীত সদস্যরাও নিজেদের দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারেন না, যেহেতু তাঁরা সকলেই পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে কিছু না কিছু পরিমাণে বামপন্থী অ্যাডভেনচারিস্ট বিচ্যুতির জন্য দায়ী।

আমরা আমাদের অন্যায়কে স্বীকার করছি এবং জোরের সঙ্গে ঘোষণা করছি যে, এ বিষয়ে আমরা আমাদের কমরেডদের আত্মসমালোচনা সম্পূর্ণ সততার সঙ্গে শুরু করেছি। সশস্ত্র কৃষি বিপ্লবের স্বার্থে আমরা আমাদের আগেকার ও বর্তমান কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদের কাছে আহ্বান জানাচ্ছি নিজেদের অন্যায়কে স্বীকার করুন, শুরু করুন আত্মসমালোচনা।

আমরা আন্তরিকভাবে আমাদের পার্টির সদস্য ও সমর্থকদের অনুরোধ করছি, আপনারা আরও সাহসী হোন এবং কমরেড চারু মজুমদারের দ্বারা পরিচালিত বামপন্থী অ্যাডভেনচারিস্ট লাইনকে বিনা দ্বিধায় বাতিল করুন। কমরেড চারু মজুমদারকে বলুন, সৎভাবে তিনি তাঁর আত্মসমালোচনা করে সশস্ত্র কৃষি বিপ্লব সম্পর্কে তাঁর অন্যায়গুলি মেনে নিক। কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদের সমালোচনা করার জন্য আমরা আমাদের সদস্য ও সমর্থকদের আবেদন করছি এবং আপনারা তাঁদের বলুনঃ তাঁদের অন্যায়গুলি স্বীকার করে নিজেদের সৎভাবে আত্মসমালোচনা করুক।"

এই চিঠিতে ওই ছ'জন নেতা নিজেদের দায়িত্ব স্বীকার করে মূলদোষের ভাগীদার হিসাবে চারুবাবুর দিকে তীর নিক্ষেপ করেছেন। কিন্তু কেন চারুবাবু

চিনা কমিউনিস্ট পার্টির সমালোচনা হজম করতে পারেননি? তার কোনও ব্যাখ্যা তিনি করেননি, অবশ্য ওদের তা বলা এবং করা সম্ভবও ছিল না। হজম না করার একমাত্র কারণ হলো, তাহলে তার নিজের অস্তিত্বকেই নিজের হাতে গলা টিপে মারা। নিজের কবর নিজের হাতে খোঁড়া। যেটা কোনও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব নিজের হাতে করতে পারেন না।

কিন্তু একটা জিনিস তখন পরিষ্কার, কানু সান্যালদের এই খোলা চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে পুরনো সি পি আই (এম এল) পার্টির অস্তিত্বই আর বাস্তবিকভাবে রইল না। বিতর্কের ঝড়ে তা ছোট ছোট গোষ্ঠীতে আলাদা আলাদা ভাবে বিচ্ছিন্ন হতে লাগল। যদিও চারুবাবুকে ঘিরে একটা বড় গোষ্ঠী তখনও পার্টির নামে তাদের কাজ চালিয়ে যেতে লাগল। অন্ধ ভাবালুতা এমনই। সেখানে যুক্তির কোনও স্থান নেই। তর্কের কোনও জায়গা নেই। একগুঁয়ে গোঁড়ামিই সেখানে একমাত্র যুক্তির মাপকাঠি।

এই পরিস্থিতিতে, চারদিক থেকে প্রচণ্ড চাপের মুখে চারুবাবু নয়ই জুন তাঁর জীবনের সম্ভবত শেষ রাজনৈতিক লেখায় লিখলেন, "আমাদের দেশে সশস্ত্র সংগ্রাম একটা স্তরে পৌঁছাবার পর তার আবার পশ্চাৎগতি শুরু হয়েছে। এই সময় আমাদের কর্তব্য হলো, পার্টিকে সজীব রাখা। শ্রমিক, কৃষক, বৃহত্তর জনগণের মধ্যে আমাদের পার্টিকে গড়ে তুলতে হবে। যদি আমরা রাজনৈতিক ঐক্যের ভিত্তিতে পার্টিকে গড়ে তুলতে পারি, তাহলে আমরা আমাদের পিছু হঠার পালাকে অতিক্রম করতে পারব। পারব সংগ্রামকে আগের চেয়েও উন্নত স্তরে নিয়ে যেতে, আমি আশা করি আমরা অল্প সময়ের মধ্যেই তা করতে সক্ষম হব।"

এখানে প্রশ্ন, সশস্ত্র সংগ্রামের কোন স্তরে তাঁরা পৌঁছেছিলেন?

কানুবাবুরাই যেটা সরাসরি আক্রমণ করেছেন সন্ত্রাসবাদ আখ্যা দিয়ে, সেই স্তরেই নয় কি? কতগুলি নিরপরাধ মানুষকে খুন করা যদি সশস্ত্র সংগ্রামের কোনও উন্নত স্তর হয় তবে তা আলাদা কথা।

চারুবাবু লিখেছেন, "পার্টিকে সজীব রাখা।" কোন পার্টিকে? যে পার্টিতে তখন কিছু লুম্পেন এবং শিকড়হীন অনাথ তরুণ ছাড়া কেউ নেই। সেই পার্টিকে?

"শ্রমিক, কৃষক ও বৃহত্তর জনগণের মধ্যে আমাদের পার্টিকে গড়ে তুলতে হবে।" শ্রমিক, কৃষক ও সাধারণ মানুষ চারুবাবুদের নীতিকে প্রত্যাখ্যান করেছে, এরপর কোন ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে কোন নীতি ও আদর্শ সামনে রেখে কিভাবে পার্টিকে গড়ে তুলবে?

"রাজনৈতিক ঐক্যের ভিত্তিতে গড়ে তুলতে পারি!" কোন রাজনৈতিক

ঐক্য? তিনি তো বিশ্বাস করতেন তাঁর পথ কেউ না মানলেই তিনি তাঁর কাছে 'শ্রেণীশত্রু'। তা হলে কিসের ভিত্তিতে গড়ে উঠবে তথাকথিত ঐক্য। যে ঐক্যের ওপর দাঁড়িয়ে 'সংগ্রামকে আরও উন্নত স্তরে' নিয়ে যেতে পারবেন।

এই লেখাতে তিনি স্বীকারই করে নিয়েছেন তাঁর 'হার'। কিন্তু কেন তাঁর 'হার' হলো তা ইচ্ছা করেই পরিষ্কার করলেন না। এবং নিজের পুরনো লাইনেই আটকে রইলেন, ভাঙলেন কিন্তু মচকালেন না। কানুবাবুরা এই 'হারের' জন্য যে কারণগুলি উল্লেখ করেছেন, সে সম্পর্কে একটা কথাও উচ্চারণ করলেন না। আত্মসমালোচনা তো দূরের কথা, ভাসা ভাসা ক'টা স্লোগানভিত্তিক পংক্তি লিখে তিনি তাঁর 'মহান কর্তব্য' সম্পন্ন করলেন। এ যেন কোনও ট্যাবলেট, খাইয়ে দিলেই রোগী সুস্থ হয়ে আপন মনেই কাজ করতে শুরু করবে। তার সেই মোয়া নিয়ে তখনও কিছু রোমান্টিক তরুণ-তরুণী এখানে ওখানে ছুটে বেড়াতে লাগল।

আর এখানেই আমাদের সমস্যা। ওদের বিপ্লব কতটা এগোল কতটা পিছলো তা নিয়ে আমাদের কোনও মাথাব্যথা নেই। কোথায় ওদের ভুলত্রুটি তা নিয়েও আমরা চিন্তিত নই। আমাদের একমাত্র চিন্তা আইন-শৃঙ্খলার, খুন, জখম ও অন্যান্য অপরাধের। সন্ত্রাসকে দমনের।

চোদ্দই জুলাই গভীর রাতে চারুবাবুর গোষ্ঠীর কেন্দ্রীয় কমিটির নেতাদের আচম্বিতে পেয়ে গিয়ে গ্রেফতার করলাম। আর তাদেরই সূত্র ধরে পনেরোই জুলাই ভোরবেলায় কাক ডাকার আগে গ্রেফতার করলাম তাঁর দুই সঙ্গীসহ চারুবাবুকে।

চারুবাবু যে গ্রেফতার হতে পারেন এই ব্যাপারটাই তাঁর অন্ধ সমর্থকরা বিশ্বাস করত না, তারা তাঁকে ভগবানের আসনে বসিয়েছিল। তাদের দৃঢ় ধারণা ছিল, তিনি ভগবানের মতোই অদৃশ্যমান। পুলিশের কী সাধ্য তাঁকে ধরার?

কিন্তু বাস্তব যখন তাদের চিন্তার বিপরীতে গেল তখন তারা এই গ্রেফতারের প্রতিশোধ নিতে তাদের পুরনো খুনের রাস্তায়ই বেছে নিল।

আঠারোই জুলাই সকাল ন'টা পনেরো মিনিটের সময় কলকাতা আর্মড পুলিশের পঞ্চম ব্যাটিলিয়নের হাবিলদার মান বাহাদুর ঘালি তার ডিউটি শেষে ব্যারাকে ফিরছিল। সে প্রায় নিশ্চিন্ত মনে মানিকতলার বাগমারী রোড দিয়ে হাঁটছিল। কিন্তু তার জন্য যে বিপদ লুকিয়ে আছে, ওৎ পেতে আছে মৃত্যু তা তার ধারণার বাইরে।

একশ তিপ্পান্ন নম্বর বাড়ির সামনে হঠাৎ উদয় হলো ছ'জন নকশাল

তরুণ। চোখে তাদের প্রতিশোধের আগুন। হাতে হাতে বড় বড় চকচকে ভোজালি আর ছুরি। মান বাহাদুর কিছু বুঝে ওঠার আগেই ওরা ওকে ঘিরে ধরল। তিনজন ওকে জাপটে ধরল আর বাকি তিনজন ওর পেট লক্ষ্য করে চালাতে লাগল ছুরি। মান বাহাদুর একদিকে চিৎকার অন্যদিকে প্রাণ বাঁচানোর জন্য ছটফট করতে লাগল। কিন্তু ছুরি আর ভোজালির ক্রমাগত আঘাতে ওর শরীরের রক্ত বাইরে বেরিয়ে আসতে লাগল। মান বাহাদুর শ্রান্ত হয়ে নুইয়ে পড়ল। নকশালরা ওকে ছেড়ে পালাল। ওদের 'দেবতাকে' গ্রেফতারের প্রতিশোধ নেওয়া হয়ে গেছে। দেবতা কী এই প্রতিশোধে তুষ্ট হবেন?

মান বাহাদুরের চিৎকার শুনে ওকে বাঁচানোর জন্য ছুটে এল রিজার্ভ ফোর্সের পুলিশ। তারা তাকে নিয়ে গেল আর জি কর হাসপাতালে। মৃত। চারুবাবুর 'পুজোর থানে' ওকে বলি দেওয়া হয়েছে। বাগমারীর রাস্তায় ওর রক্তেভেজা স্থান থেকে ফুটে উঠবে 'ফুল'। চারুবাবুর 'স্বপ্ন'। কলকাতার রাস্তায় চারুবাবুর 'কৃষি বিপ্লব'।

উনিশ তারিখ দুপুর প্রায় দুটোর সময় মহাত্মা গান্ধী রোড ও স্ট্র্যান্ড রোডের সংযোগস্থলে কর্তব্যরত ট্রাফিক কনস্টেবল পূর্ণচন্দ্র ঘোষকে প্রায় একই কায়দায় ছুরি আর ভোজালি দিয়ে ক্ষতবিক্ষত করে খুন করল। ছিনিয়ে নিয়ে গেল তার রিভলবার। সেদিনই রাতে ওই খুনের অভিযোগে গ্রেফতার হলো চঞ্চল কর।

পরপর দু'দিন দুটো পুলিশ খুন করেই ওদের প্রতিশোধস্পৃহা শান্ত হলো না। 'শ্রদ্ধেয় নেতাকে' তুষ্ট করতে আরও আরও পুলিশ খুন করার জন্য ওরা হন্যে হয়ে ঘুরতে লাগল।

সন্ধে ছ'টা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে শ্যামপুকুরে দুর্গাচরণ ব্যানার্জি স্ট্রিট ও রবীন্দ্র সরণির মোড়ে একদল নকশাল থানার একটা জিপ সমেত জিপের আরোহী সমস্ত পুলিশ কর্মীকে উড়িয়ে দেওয়ার জন্য বোমা নিয়ে আক্রমণ করল। মুহুর্মুহু বোমাবর্ষণের মধ্যে ড্রাইভার উর্ধ্বশ্বাসে জিপ ছুটিয়ে দিল রবীন্দ্র সরণি দিয়ে। নকশালদের বোমাগুলি প্রায় সব ক'টাই লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো। শুধু একটা জিপের পেছনে আঘাত করার ফলে জিপের সামান্য ক্ষতি হলো। নকশালদের ইচ্ছাপূরণ হলো না। অফিসার ও কনস্টেবলরা সশরীরে শ্যামপুকুর থানায় ফিরে এলো। ওদের ক্রোধ বেড়ে গেল।

এই ক্রোধকে কাজে পরিণত করতে ওরা বাগবাজার স্ট্রিট ও পশুপতি বসু লেনের সংযোগস্থলে বোমা, গ্রেনেড নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

'শ্রেণীশত্রু' দেখতে পেলেই তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে খতম করে 'শ্রদ্ধেয় নেতার' গ্রেফতারের প্রতিশোধ নেবে।

প্রথম আক্রমণের এক ঘন্টা পর ওরা চারজন কনস্টেবল ও একজন অফিসারকে পেয়ে গেল। দেখেই ওরা অতি উৎসাহে "শ্রদ্ধেয় নেতা চারু মজুমদার জিন্দাবাদ" ধ্বনি দিতে দিতে বোমা ছুঁড়ে দিল। পুলিশের দলের প্রায় হাত পনেরো দূরে বোমাটা বিকট শব্দে ফাটল। অফিসার ও কনস্টেবলরা সতর্ক হয়ে গেল। ওরা পিছিয়ে বাগবাজার স্ট্রিটে বিভিন্ন বাড়ির আড়াল নিয়ে নকশাল দলের দিকে রাইফেল ও রিভলবার থেকে গুলি চালাল। নকশালরা বোমা ও গ্রেনেড ছুঁড়তে লাগল। ওদের কাছে সম্ভবত বোমা খুব বেশি মজুত ছিল না। মিনিট পনেরো পরে ওরা যুদ্ধে ক্ষান্ত দিয়ে পালাল। দু'পক্ষের কেউ হতাহত হলো না। ওদের প্রতিশোধ নেওয়াটা ফস্কে গেল।

পরদিন সন্ধে সাড়ে ছ'টার সময় শ্যামপুকুর থানা এলাকাতেই আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় রোড ও মোহনবাগান লেনের মোড়ে নকশালরা আবার বোমা নিয়ে আক্রমণ করল শ্যামপুকুর থানার পুলিশের একটা দলকে। পাল্টা আক্রমণে ওরা হতচকিত হয়ে পেছন ফিরে দৌড় লাগাতে শুরু করল। পুলিশের দল ওদের তাড়া করে ছ'জন নকশাল তরুণকে ওইখানেই হাতেনাতে গ্রেফতার করল।

এই সময় আমাদের একটা দল শিলিগুড়িতে ছিলাম। চারুবাবুকে গ্রেফতার করে তাঁর ঘর থেকে সে চিঠিপত্র পেয়েছিলাম, তার ভিত্তিতে ওখানে চারুবাবুর অনুগামী ক'জন নকশালকে গ্রেফতার করার জন্য।

কলকাতা ছাড়াও নকশালরা পশ্চিমবঙ্গের বেশ কিছু জায়গায় বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্তভাবে চারুবাবুর গ্রেফতারের প্রতিবাদ করতে প্রতিশোধ নিল। হ্যাঁ, খুন করে, আতঙ্ক ছড়িয়ে, স্কুল কলেজে হামলা করে।

আটাশে জুলাই চারুবাবু শেঠ সুখলাল করনানি হাসপাতালে মারা গেলেন। মারা যাওয়ার খবর ছড়িয়ে যাওয়ার পরও ওদের একটা গোষ্ঠী একইভাবে প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু সেটাও অসংগঠিত ভাবে করতে গিয়ে ক'দিন পর আবেগ কমে গেলে ওরা ঝিমিয়ে পড়ল।

অক্টোবর মাসের তিরিশ তারিখ সন্ধে সাড়ে সাতটার সময় বালিগঞ্জ থানার কনস্টেবল সকলদারি সিং ও হোমগার্ড কালীপদ মিস্ত্রি রাসবিহারী অ্যাভিনিয়ুতে কর্তব্যরত ছিল। চারজন নকশাল যুবক ওদের চারদিক থেকে এগিয়ে এল। ওদের কাপড় ব্যাগ থেকে বার করল রিভলবার ও ছুরি।

প্রথমেই ওদের একজন হোমগার্ড কালীপদ মিস্ত্রির তলপেট লক্ষ্য করে চালিয়ে দিল ছুরি। ছুরির আঘাত খেয়ে কালীপদ তার তলপেট দু'হাত দিয়ে চেপে প্রাণ বাঁচাতে দিল ছুট। ওর পেছনে একজন নকশাল যুবক তাড়া করল। কালীপদ ততক্ষণে রাস্তার পাশে একটা মিষ্টির দোকানে ঢুকে কোনও মতে আশ্রয় নিয়েছে।

কালীপদ ওদের হাতছাড়া হয়ে যেতে নকশালরা ঘিরে ধরল সকলদারি সিংকে। সকলদারি তার রিভলবার বার করে ওদের প্রতিরোধ করার আগেই ওরা ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারপর বুক মাথা ও তলপেটের ওপর ছুরির ফলার আঘাতে আঘাতে ওকে ছিন্নভিন্ন করে রাসবিহারী অ্যাভিনিয়ুর একশ পঁচাশি নম্বর বাড়ির সামনের রাস্তায় ফেলে দিয়ে "শ্রদ্ধেয় নেতা চারু মজুমদার জিন্দাবাদ" ধ্বনি দিতে দিতে রবীন্দ্র সরোবরের দিকে পালাল। যাওয়ার আগে ওরা সকলদারির কোমরে রাখা রিভলবার ও ছ'রাউন্ড গুলি হস্তগত করে সঙ্গে নিয়ে গেল।

সকলদারি ক্ষতবিক্ষত হয়ে ওর নিজের শরীরের রক্তনদীতে ভাসতে লাগল। গরীব কনস্টেবল সকলদারি নিজের 'মুক্তির' প্রয়োজনে চারুবাবুর "মুক্তিযোদ্ধাদের" হাতে প্রাণ দিয়ে ওদের মহৎ কর্ম করতে সাহায্য করল। সকলদারিকে ওই অবস্থায় রাস্তায় শুয়ে থাকতে দেখে আশেপাশের সাধারণ লোক ওকে একটা ট্যাক্সিতে তুলল। ততক্ষণে সকলদারির কলকাতা পুলিশের সাদা পোশাক লাল হয়ে গেছে। পোশাকের তলায় ওর শরীরের কাটা মাংস খুবলে বেরিয়ে এসেছে। ও নিঃসাড়ে ট্যাক্সির পেছনের সিটে শুয়ে আছে।

মিষ্টির দোকানের কর্মচারীরা ওই ট্যাক্সিতে তুলে দিল হোমগার্ড কালীপদকে। ট্যাক্সি ছুটল শরৎ বসু রোডের রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠানে। সেখানে ডাক্তারবাবুরা সকলদারিকে মৃত ঘোষণা করলেন। কালীপদকে হাসপাতালে ভর্তি করলেন। কালীপদ বেঁচে গেল। 'মুক্তির' জন্য বলিকাঠে চড়েও কালীপদ অল্পের জন্য বেঁচে গিয়ে 'শ্রেণীশত্রু' খতমের তালিকায় নিজের নাম তুলতে পারল না।

নভেম্বর মাসের বার তারিখ সন্ধেবেলা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে লেনিন সরণি ও রফি আহমেদ কিদওয়াই রোডের সংযোগস্থলে ট্রাফিক কনস্টেবল সুরেশ ভৌমিক ও অরবিন্দ কুণ্ডু রাস্তায় ট্রাফিক ডিউটি দিচ্ছিল। সাতটা কুড়ি মিনিট নাগাদ ওদের দু'জনকে ঘিরে ধরল ছ'জন অল্পবয়সী নকশাল তরুণ। ওদের হাতে হাতে খোলা বড় বড় ছুরি ও

ভোজালি। চারপাশের দোকান ও রাস্তার আলো সেই ছুরি ও ভোজালিতে পড়ে চকচক করছে। সন্ধের দারুণ ট্রাফিক ব্যস্ততার মধ্যে সুরেশ ও অরবিন্দ খেয়ালই করেনি কখন তারা ছ'জন নকশাল তরুণের ছুরির ঘেরাওয়ের মধ্যে বন্দি হয়ে গেছে।

যখন বুঝল তখন ওদের পেটে ঢুকে গেছে ছুরি, ছিনতাই হয়ে গেছে দুজনের রিভলবার।

সে সময় নকশাল আন্দোলনে কলকাতার সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষ তিতিবিরক্ত। নকশালদের প্রতিরোধ করার অনেকটা সাহসও সঞ্চয় করে ফেলেছে। সন্ধেবেলা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার সংলগ্ন ওই জায়গায় ওই ঘটনায় চারপাশের গাড়ি মুহূর্তে আটকে গেল। চারদিক থেকে হই হই রব।

চিৎকারে নকশালরা ভয় পেয়ে গেল। তারা সুরেশ ও অরবিন্দকে ছেড়ে নিজেদের প্রাণ বাঁচাতে যে যেদিকে পারল ছুটল। সুরেশ ও অরবিন্দ ওই রকম আহত অবস্থাতেও একজন তরুণ নকশালকে ধরবার জন্য তার পেছন পেছন তাড়া করল। নকশাল তরুণের হাতে ধরা খোলা ছুরি। ছুরির থেকে তখনও ঝরছে সুরেশ কিংবা অরবিন্দের রক্ত। ছুরিটা সে ফেলছে না, সেটাকে সে তার আত্মরক্ষার অস্ত্র হিসাবে ধরে রেখেছে।

গণ্ডগোলে দাঁড়িয়ে যাওয়া ট্রামে আরোহী হিসাবে ছিল তালতলা থানার কনস্টেবল আর বি সিং। সে হই হট্টগোল শুনে কৌতূহল দমন করতে ট্রাম থেকে উঁকি দিয়ে দেখল সুরেশ ও অরবিন্দের দশা। সে একলাফে ট্রাম থেকে নামল রাস্তায়, তারপর সুরেশদের সঙ্গে তাড়া করে ধরল সেই নকশাল যুবককে, যে 'বিপ্লব' ভুলে এক হাতে ছুরি ধরে আত্মরক্ষার জন্য দিশেহারার মতো ছুটছিল।

অন্য আর এক নকশাল তরুণ জনসাধারণের তাড়ায় ছুটতে শুরু করেছে সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারের পশ্চিমদিকে প্রিন্সেপ স্ট্রিট ধরে। তার ডান হাতে ধরা আমাদের ট্রাফিক কনস্টেবল থেকে ছিনিয়ে নেওয়া একটা রিভলবার, বাঁ হাতে লকলকে ছুরি।

উদভ্রান্তের মতো ছুটছে, পেছনে প্রায় সত্তর আশি জনের এক জনতার ঢল। একে ঘিঞ্জি রাস্তা তার ওপর জনতার রোষ, ওদের হাতে ধরা পড়লে যে সেটা খুব সুখকর হবে না, সেই আতঙ্কে সে এক চলন্ত অ্যাম্বাসেডর গাড়ির ড্রাইভারকে রিভলবার দেখিয়ে থামাল প্রিন্সেপ স্ট্রিট ও হসপিটাল স্ট্রিটের সংযোগস্থলে। তারপর জোর করে উঠে বসল গাড়ির পেছনের সিটে। গাড়িতে ড্রাইভার ছাড়াও আরোহী হিসাবে ছিলেন প্রফুল্ল কুমার আড্ডি ও হৃষিকেশ সামন্ত।

নকশাল তরুণ ড্রাইভারের কাঁধের কাছে রিভলবারের নল ঠেকিয়ে বলল, "জোরসে চালাও।" ড্রাইভার প্রায় নির্ভয়ে উত্তর দিল, "এখানে জোরে চালানো যাবে না।" ড্রাইভারের ঠাণ্ডা উত্তর শুনে নকশাল তরুণটা খেপে গিয়ে বলল, "জোরে না চালালে তোকে খুন করে দেব।"

ড্রাইভার নিরুত্তর, সে বরং গাড়ির দৌড় আরও আস্তে করে দিল। তখনও পেছন থেকে ছুটে আসছে জনতার ঢেউ। তাদের চিৎকার ও বিক্ষিপ্ত ভাবে ছোঁড়া ইঁটের টুকরো ছিটকে ছিটকে আছড়ে পড়ছে গাড়ির চারদিকে। গাড়ির ড্রাইভার ও আরোহী দু'জন নির্বিকার। ওদের কোনও তাড়াহুড়া নেই। তাতে নকশাল তরুণের রাগ আরও বেড়ে গেল। সে এবার ক্ষিপ্ত হয়ে ড্রাইভারের সঙ্গে প্রায় মল্লযুদ্ধ শুরু করল।

ফলে, ড্রাইভার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়ি তুলে দিল রাস্তার বাঁ দিকের ফুটপাতে। গাড়ি দাঁড়িয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে প্রথমে ড্রাইভার ও তার পাশে বসা সামন্তবাবু ও পেছনের সিটের আরোহী আড্ডিবাবু গাড়ি থেকে নেমে গেলেন। তখন বাধ্য হয়ে নকশাল তরুণটাও গাড়ি থেকে বেরিয়ে এল রাস্তায়।

আড্ডিবাবু সমস্ত ব্যাপারটায় এত বিরক্ত হয়েছিলেন যে, প্রচণ্ড রাগত স্বরে নকশাল তরুণকে বললেন, "কে তুমি? কি চাও, এখান থেকে কেটে পড়।"

নকশালটা আড্ডিবাবুর কথা শুনে আরও বন্য হয়ে গেল। একদিকে জনতার তাড়া, অন্যদিকে মুক্তির নৌকা অ্যাম্বাসেডর গাড়িটা ফুটপাতে উঠে স্থবির। সে দিশেহারা হয়ে আড্ডিবাবুকে বলল, "আমি কে? আমি তোর বাপ।" তারপর হাতের রিভলবার থেকে সরাসরি আড্ডিবাবুর দিকে তাক করে চালিয়ে দিল গুলি। গুলি লাগল সোজা আড্ডিবাবুর বুকে।

"মাগো" চিৎকার করে বুকে হাত দিয়ে আড্ডিবাবু প্রিন্সেপ স্ট্রিটের ফুটপাতের ওপর পড়ে গেল।

নকশাল তরুণটি তখন তার রিভলবার থেকে চালাতে শুরু করেছে এলোপাতাড়ি গুলি। গুলি লাগল দুই পথচারির।

জনতা আরও ক্ষিপ্ত। তাদের ছোঁড়া ইঁটের টুকরো, পাথর ধেয়ে আসছে নকশাল তরুণটির দিকে। কোনওটা তার গায়ে লাগছে, কোনওটা লাগছে না। সে তখন বেপরোয়া, একবার করে 'শ্রদ্ধেয় নেতা জিন্দাবাদ' ধ্বনি দিচ্ছে আর জনতার উদ্দেশে গুলি চালাচ্ছে।

সাইকেলে চড়ে যাচ্ছিলেন দর্শন সিং। আসতে আসতে দূর থেকে সমস্ত ঘটনাটা লক্ষ্য করছিলেন সর্দারজী। নকশাল তরুণটার পেছনে এসে ঝপাং

করে সাইকেলটা রাস্তায় ফেলে দিয়ে তিনি দু'হাতের বের দিয়ে চেপে ধরলেন ওকে। নকশাল তরুণটার আর নড়াচড়ার ক্ষমতা নেই। তার দু'হাতে ধরা রিভলবার আর ছুরি তখন অকেজো। মাটির দিকে তাদের মুখ। সর্দারজীর বাহুর ঘেরাটোপ থেকে সে ছাড়া পাওয়ার জন্য ছটফট করতে লাগল। সর্দারজী তার সমস্ত শক্তি দিয়ে একইভাবে চেপে ধরে আছেন।

এভাবে কয়েকটা মুহূর্ত। ক্ষিপ্ত জনতার একটা অংশ দ্রুত এসে নকশাল তরুণের হাত থেকে নিয়ে নিল রিভলবার ও ছুরি। ওর সমস্ত শক্তি শেষ। কিল, চড়, ঘুষি এসে পড়ছে ওর ওপর।

খবর পেয়ে তালতলা থানার পুলিশ এসে হাজির। ওরাই জনতার রোষ থেকে ওকে বাঁচাল। উদ্ধার হলো রিভলবার।

এবার অন্য কাজ। আড্ডিবাবু, গুলিতে আহত দুই পথচারি ও কনস্টেবল সুরেশ ও অরবিন্দকে নিয়ে ওরা ছুটল কলকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। আড্ডিবাবু ততক্ষণে সব রকম চিকিৎসার ঊর্ধ্বে, তাঁর শরীর তখন পোস্টমর্টেম ঘরে যাওয়ার অপেক্ষায়। চারুবাবুর মন্ত্রশিষ্যর বিপ্লবের পথের বলি তখন শান্তভাবে শুয়ে। পোস্টমর্টেম রিপোর্টে অবশ্য লেখা থাকবে না, তিনি 'বিপ্লবের জন্য' মৃত। অন্যদের ভর্তি করা হলো ওই হাসপাতালে।

জনতার হাতে আহত নকশাল তরুণকে সুস্থ করার জন্য নিয়ে যাওয়া হলো পুলিশ কেস হাসপাতালে। সে সুস্থ হয়ে উঠল, সম্ভবত আরও কিছু আড্ডিবাবুকে খুন করার জন্য।

ওদের 'শ্রদ্ধেয় নেতার' মৃত্যুর বদলা নিতে ওরা শিলিগুড়ি, মানকুণ্ডু ও কলকাতায় ক'টা পুলিশ ও আড্ডিবাবুদের মতো নিরীহ লোককে খুন করল। বিপ্লব কতটা আরও এগিয়ে গেল তা ওরাই জানে।

নকশালদের মূল স্রোত তখন চারুবাবুর অসার রাজনীতি বুঝে অন্য পথ নিলেও মহাদেব মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্ব দ্বিতীয় কেন্দ্রীয় কমিটি নামে একদল নকশাল চারু মজুমদারের পথকে অনুসরণ করতে লাগল। এ দলে যোগ দিল নিশীথ ভট্টাচার্য, আজিজুল হক।

কেমন এই নকশাল নেতা মহাদেব মুখোপাধ্যায়? তাঁর রাজনৈতিক চেতনা ও তাত্ত্বিক জ্ঞান কতটা গভীর। যাঁর হাতে গেল 'চারুবাবুর বিপ্লবের' ভার?' 'বিশ্ববিপ্লবের' দায়িত্ব?

মহাদেববাবুর নিজের হাতে তাঁর এক কমরেডকে লেখা চিঠি এখানে হুবহু তুলে দিচ্ছি, তাতেই তাঁর জ্ঞানের পরিধি ও গভীরতা স্পষ্ট। চিঠিটা লিখেছেন বাহাত্তর সালের বাইশে অগস্ট। চিঠিটা:

প্রিয় কমরেড ছানুদা, আমাদের নয়নের মণি শ্রদ্ধেয় নেতা কমরেড

চারু মজুমদারকে শয়তানের দল হত্যা করেছে। শয়তানের দলেরা ভেবেছে এইভাবে বিপ্লবের অগ্রগতিকে রোধ করবে। কিন্তু শয়তানেরা জানে না বিপ্লবের অগ্রগতি আরও আরও বৃদ্ধি পাবে। সশস্ত্র শ্রেণী সংগ্রামের আগুনে ওরা পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে। শ্রদ্ধেয় নেতা কমরেড চারু মজুমদার যে ভারতের বিশেষ অবস্থার বিশেষ বিশ্লেষণকারী। তিনিই নিজ হাতে বিপ্লবের মশাল ভারতের মাটিতে জ্বালিয়ে ছিলেন। তিনিই তৈরি করেছেন নকশালবাড়ি, শ্রীকাকুলাম, মাগুরজান। তিনিই চেয়ারম্যানের চিন্তাধারা ভারতবর্ষে প্রথম প্রয়োগবিদ। তিনিই ভারতবর্ষের বিপ্লবী কর্তৃত্ব। তাই আজকে আমাদের এই চরম ভাগ্য বিপর্যয়ের সময়ে তাঁর হাতে গড়া পার্টিকে শক্তিশালী করতে দরিদ্র ভূমি কৃষকের ও শ্রমিকের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে, গণফৌজ গড়ে মুক্তাঞ্চল সৃষ্টি করতে হবে। তাঁর স্বপ্নের ভারতবর্ষকে ৭৫ সালের মধ্যে মুক্ত করতেই হবে। ইতিহাস আমাদের এই দায়িত্ব দিয়েছে। আমাদের এটা স্বীকার করতেই হবে যে, আমাদের নয়নের মণি শ্রদ্ধেয় নেতা কমরেড চারু মজুমদারকে আমরা রক্ষা করতে পারিনি। ইতিহাস আমাদের কাছে কৈফিয়ত চাইছে। কি কৈফিয়ত দেব? বিজয়ের পরেও থাকবে পরাজয়। আমরা পারিনি শ্রদ্ধেয় নেতাকে রক্ষা করতে। আমাদের আজ রক্ত দিয়ে প্রাণ দিয়ে শহীদের দুনিয়াতে শ্রদ্ধেয় নেতা কমরেড চারু মজুমদার আর অন্যান্য শহীদ কমরেডদের সঙ্গে দেখা করতেই হবে। এই শপথ আমাদের আজকের দিনের শপথ। আজকের কাজ এই হত্যাকাণ্ডের বদলা নেওয়া, শ্রদ্ধেয় নেতার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করা, সংগ্রামকে জোরদার করা, জনতার গভীরে নিয়ে যাওয়া, গণমুক্তি ফৌজ গড়ে তুলে মুক্তাঞ্চল সৃষ্টি করা। তার হাতে গড়া পার্টিকে আরও শক্তিশালী করা। শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা। শ্রদ্ধেয় নেতা শিখিয়েছেন, 'নীতিনিষ্ঠভাবে দু'লাইনের লড়াই চালিয়েই সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

আপনার সঙ্গে দেখা করার প্রয়োজন দারুণভাবে অনুভব করছি। ওখানকার সমস্ত বীর গণমুক্তি ফৌজের কমরেডস ও অন্যান্য কমরেডরা আমার সশস্ত্র বিপ্লবী অভিনন্দন গ্রহণ করুন।

লাল সেলাম
মহাদেব মুখার্জী

'ভারতবর্ষের বিপ্লবের অধিপতির' এই লেখা পড়লেই পরিষ্কার, তার রাজনৈতিক গভীরতা কতখানি। আবেগসর্বস্ব ক'টি স্লোগান, চারুবাবুর নামে মন্ত্র পড়া, আর ক'বার 'করতে হবে', 'করতে হবে' ছাড়া তাঁর চিঠিতে তাঁর অধীনাস্ত ক্যাডাররা কি পাবে? এমনকী তিনি যে মার্কসবাদ সম্পর্কেও

সামান্যতম অবগত ও বিশ্বাসী নন, তাও এই চিঠিতে স্বীকৃত। তাই তিনি লিখতে পেরেছেন, 'আমাদের এই চরম ভাগ্যবিপর্যয়ের সময়ে'। মার্কসবাদীরা আবার কবে ভাগ্যে বিশ্বাসী হয়ে গেল? তাছাড়া কল্পনা ও ভাববাদের চরম নিদর্শন হিসাবে লিখেছেন, 'প্রাণ দিয়ে শহীদের দুনিয়াতে শ্রদ্ধেয় নেতা আর অন্যান্য শহীদ কমরেডদের সঙ্গে দেখা করতেই হবে।' বিপ্লবীদের কি দারুণ সচেতনা! মার্কসীয় দর্শনের প্রতি কি গভীর আস্থা!

মহাদেব মুখোপাধ্যায় ও তাঁর অনুগামীদের মনোভাবটা অন্য নকশালদের প্রতি এমন ছিল যে, অন্যরা আর 'নকশালবাড়ি' নামটাই উচ্চারণ করার যোগ্য নয়। এমন কি এরা কানু সান্যাল, সৌরেন বসুদের সঙ্গে কথা বলাও বন্ধ করে দিয়েছিল। এই গোষ্ঠী রাজনীতির টানাপোড়েনে নকশাল আন্দোলন সমগ্র তিয়াত্তর সাল জুড়ে ভাটা পড়ে গিয়েছিল। এতে আমাদের সমস্যা একদিকে কিছুটা কমে গেল।

কিন্তু একদিকে সমস্যা কমে গেলেও, অন্যদিকে বেড়ে গেল। এ যেন নদীর একদিক ভেঙ্গে অন্যদিক গড়ার মতো।

এবারের সমস্যাটা এল, একেবারে বিপরীত দিক থেকে। বাহাত্তর সালের বিধানসভার নির্বাচনী প্রহসনের মাধ্যমে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ নিয়ে কংগ্রেস পশ্চিমবাংলায় ক্ষমতায় এল। মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশংকর রায়। সেই নির্বাচনের মাধ্যমে এমন সব বিধায়ক বিধানসভায় এল, যাদের দাপটে পশ্চিমবঙ্গবাসীর নাভিশ্বাস উঠে গেল। এরা কোনও আইনকানুনই মানত না। ওদের ইচ্ছা ও মুখের কথাই শেষ। সামন্ত প্রভুদের মতো। সিদ্ধার্থবাবুর কোনও নিয়ন্ত্রণ এদের ওপর ছিল না। ফলে এদের দাদাভিত্তিক বিভিন্ন গোষ্ঠীর ভেতর প্রায় প্রতিদিনই সংঘর্ষ একটা অনিবার্য রুটিন হয়ে গেল। আর সেই সংঘর্ষ থামানোর জন্য আমরা ছুটলেও 'আইনরক্ষক' দাদাদের হুকুমে আমাদের কার্যত প্রায় 'জগন্নাথ' হয়ে যাবার উপক্রম হলো।

এর সঙ্গে যোগ হলো আর এক সমস্যা। নকশালদের লুম্পেন অংশ নিজ নিজ এলাকার কংগ্রেসি দাদাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে কংগ্রেসে যোগ দিতে লাগল। জেলের ভেতর এই অংশের যারা ছিল তারা সেই সব দাদাদের অনুগ্রহে জেল থেকে বেরিয়ে আসতে লাগল। এবং দাদার বাহিনী শক্তিশালী করার গুরু দায়িত্ব নিতে লাগল। এরাই পরবর্তীকালে কংশাল হিসাবে পরিচিত হলো। দাদাদের প্রত্যক্ষ সহায়তায় এবং প্রশ্রয়ে কোনও কোনও অঞ্চলে এদের চোখরাঙানিও আমাদের বাহিনীর কাউকে কাউকে সহ্য করতে হলো। আইন-শৃঙ্খলার পরিস্থিতি সত্তর একাত্তরের নকশাল আন্দোলন

থেকে আয়ত্তে আনলেও কংগ্রেসীদের ক্ষমতার বিক্রমের জন্য আবার অবনতি হতে লাগল।

তিয়াত্তর সালটা এভাবেই পার হয়ে গেল। আদালতে আদালতে বন্দি নকশালদের বিরুদ্ধে খুন জখমের মামলা। তার জন্য আমাদের আইনী সাজ। কংগ্রেসীদের গুণ্ডা অংশকে গ্রেফতার করা ও মুক্তি দেওয়া। এভাবেই কেটে গেল।

এল চুয়াত্তর সাল। ইতিমধ্যে একটা জিনিস পরিষ্কার, নকশালদের নতুন সমীকরণের পর চারুবাবুর 'বিপ্লবের' পথের অনুগামীদের একমাত্র ধ্যানজ্ঞান, আদর্শ, রাজনীতি হলো চারুবাবুর নামে সারাক্ষণ 'ভক্তিগীতি' গাওয়া। এদের মধ্যে বাকি যে রাজনীতি আছে তা সবই ভাসা ভাসা এবং লক্ষ্যহীন। খুন করা ছাড়া এদের আর কোনও কার্যক্রম নেই।

চুয়াত্তরের ফেব্রুয়ারির পঁচিশ তারিখ সকাল সাতটার সময় শ্যামবাজার ট্রাফিক পুলিশ গার্ডের দুই কনস্টেবল প্রেমচাঁদ রবিদাস ও রামধর মিশির যখন বি টি রোডের মুখে এক স্কুলের সামনে রাস্তায় ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের ডিউটি দিচ্ছিল তখন নকশালদের সাতজনের একটা দল ছুরি, ভোজালি ও লোহার রড নিয়ে ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে 'কাজ' করতে শুরু করল। প্রেমচাঁদ ও রামধর রাস্তায় চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল। নকশালরা প্রথমেই ওদের রিভলবার দুটো হস্তগত করল। রামধর কোনওমতে উঠে ওদের আক্রমণ প্রতিহত করতে করতে আত্মরক্ষার জন্য দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটতে শুরু করল কিন্তু প্রেমচাঁদ পারল না। সে ছুরি, ভোজালির কোপ খেয়ে ওখানেই চিরদিনের মতো শুয়ে পড়ল।

মে মাসের চার তারিখে জোড়াসাঁকো থানার অধীনে চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিয়ু ও মুক্তারামবাবু স্ট্রিটের সংযোগস্থলে সকালবেলা ডিউটি দিচ্ছিল দু'জন ট্রাফিক কনস্টেবল। আটটা তখনও বাজেনি। বাড়িতে বাড়িতে গৃহকর্তা প্রতিদিনের বাজার সেরে ফেরেনি। চা পর্ব শেষ করে নিত্যদিনের দ্বিতীয়পর্ব শুরু করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। কিন্তু চারুবাবুর 'কর্তৃত্বকে' যারা 'প্রতিষ্ঠিত' করতে বদ্ধপ্রতিকর, পঁচাত্তর সালকে 'মুক্তির' সাল করতে শপথবদ্ধ, যারা খুন করে জনগণের মনের ভেতর 'দাবানল' জ্বালানোর স্বপ্নে বিভোর, তাদের পরিকল্পনা অন্য। সেই গোষ্ঠীরই ছ'জন 'তারকা' হাতে হাতে ছুরি, ভোজালি ও পাইপগান নিয়ে ধরল ওই দু'জন কনস্টেবলকে।

শুরু হলো চারুবাবুর 'হাতে গড়া পার্টির' সদস্যদের অ্যাকশান। প্রথমেই ওদের ছুরি ঢুকে গেল কনস্টেবলদের পেটে। ওরা পেট চেপে রাস্তায় বসে পড়ার আগেই ওদের সঙ্গে থাকা গুলিভর্তি পয়েন্ট থ্রি এইট রিভলবার ছিনিয়ে নিল।

একটা 'কাজ' সমাধা করার পর এবার শুরু করল 'আসল কাজ'। ভোজালি দিয়ে কোপ। কনস্টেবলদের 'প্রতিক্রিয়াশীল' রক্তে স্নান করে নিজেদের 'শুদ্ধ' করা। স্নান করতে করতে ওরা পরম শ্রদ্ধায় মন্ত্রোচ্চরণ করতে লাগল, 'শ্রদ্ধেয় নেতা কমরেড চারু মজুমদার জিন্দাবাদ!' 'শ্রদ্ধেয় নেতা মরেনি, মরবে না।'

রাস্তায় চলমান গাড়িঘোড়া থমকে গিয়ে রাস্তা বন্ধ। কেউ কেউ গাড়ি ঘুরিয়ে অন্যপথ খুঁজতে ব্যস্ত। কোন কোন পথচারি 'শুদ্ধপর্বের' যজ্ঞ আড়চোখে দেখে দ্রুত অন্তর্ধানের জন্য দুরুদুরু বুক নিয়ে ছুট। কেউ কেউ বা খোপের আড়াল থেকে 'বিপ্লবের কর্মকাণ্ড' দেখে আতঙ্কে খোপের দরজা জানালা বন্ধ করে স্তব্ধ।

মিনিট পাঁচেক। নকশালরা স্নান সেরে ভক্তিভরে মন্ত্রোচ্চারণ করতে করতে পাপস্খলন করার পর ঈশ্বরের আশীর্বাদ গ্রহণ করার মতো উল্লসিত মুখ করে নতুন যজ্ঞের আয়োজন করতে চলে গেল।

মে মাসের সকাল আটটার সময়ই ওই ব্যস্ত রাস্তা প্রায় শুনশান। যাদের 'চেতনা বাড়ানোর' জন্য এই যজ্ঞ তারা সব কোথায় গেল? তারা কোলাহল ভুলে নীরব কেন? রক্তাক্ত দুটো পুলিশ কনস্টেবলের দেহ উন্মুক্ত রাস্তায় চিৎ হয়ে শুয়ে আছে, তা দেখে তারা দলে দলে ঘর ছেড়ে রাস্তায় নেমে 'বিপ্লবে' যোগ দিচ্ছে না কেন?

খবর পেয়ে জোড়াসাঁকো থানা থেকে জিপ ও ভ্যানে করে পুলিশ এল। কনস্টেবল ধীরেন্দ্র কর মহাপাত্রের গলা দু'ফাঁক। কণ্ঠনালীর সব কিছুই প্রকাশ্যে চলে এসেছে। একবার দেখলেই যে কোনও লোক বলে দেবে, ধীরেন্দ্রের দেহ আর কোনওদিন নিজ থেকে নড়াচড়া করবে না। এই ঘোষণা করার জন্য ডাক্তার হওয়ার প্রয়োজন নেই। অন্যজনের অবস্থাও শোচনীয় কিন্তু সে মৃত নয়, হয়তো যজ্ঞের সময় সামান্য অসতর্ক হয়ে এই ভুল নকশালরা করে গেছে। দুটো দেহ নিয়েই জোড়াসাঁকোর পুলিশ ছুটল হাসপাতালের দিকে, লক্ষ্য যদি দ্বিতীয় জন বেঁচে যায়।

ক্ষীণবল শক্তি নিয়ে এইরকম দু'একটা খুন ছাড়া চারুবাবুপন্থীরা চুয়াত্তর সাল জুড়ে আর কিছুই করতে পারল না।

ডিসেম্বরের প্রথমেই আবার ওদের নেতা মহাদেব মুখোপাধ্যায় ওরফে ছোটদা আই বি-র হাতে ধরা পড়লেন। তাঁকে ওরা জেরার জন্য নিয়ে এলো ওদের লর্ড সিনহা রোডের অফিসে। আই বি'র লকআপে চোদ্দই ডিসেম্বর সকাল সাড়ে সাতটার সময় কাপড়ের একপ্রান্ত জানালার রডের সঙ্গে বেঁধে নিজের গলায় কাপড়ের অন্যপ্রান্ত ফাঁস লাগিয়ে তারপর ঝুলে

আত্মহত্যা করতে গেলেন মহাদেববাবু। পাহারাদারের তৎপরতায় ওঁর চেষ্টা ব্যর্থ হলো। ব্যর্থ হয়ে তিনি কাঁদতে শুরু করলেন। সম্ভবত নিজ প্রচেষ্টায় তিনি 'শহীদের দুনিয়ায়' গিয়ে 'শ্রদ্ধেয় নেতা চারু মজুমদারের' সঙ্গে দেখা করতে না পারার দুঃখে হতাশ হয়ে কাঁদতে লাগলেন।

মহাদেববাবু যদি সেই চেষ্টায় সফল হতেন তবে অবশ্যই তিনি তাঁর কমরেডদের চোখে 'শহীদ' হতেন। কারণ পুলিশ লকআপে মৃত্যু হলেই ওরা প্রচারমাধ্যমকে সঙ্গে নিয়ে প্রচার করত যে, মহাদেববাবু পুলিশের অত্যাচারের ফলেই মৃত্যুবরণ করেছেন। সুতরাং তিনি 'শহীদ'।

মহাদেববাবু কি জন্য আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলেন? আত্মহত্যা যে একটা ব্যাধি সে প্রশ্নে না গিয়েও এটা বলা যায় এটা একটা তৎক্ষণাৎ আবেগের চরম পরিণতি। ওঁর ক্ষেত্রে কোন আবেগটা কাজ করেছিল সেটা উনি ভাল বলতে পারবেন। তবে একটা কথা বলা যায়, চরম ব্যর্থতা যে এখানে ওঁর মনের ভিতর একটা কাজ করেছিল তা নিশ্চিত। তাছাড়া সন্ত্রাসবাদীদের মনের ভিতর যে আত্মহননের একটা প্রবল আবেগগত ক্রিয়া কাজ করে সেটা ইতিহাসে বহুবার প্রমাণিত। নয়ত গ্রেফতার এড়ানোর জন্য বা গ্রেফতার হলে তারা ব্যর্থতার থেকে পালিয়ে যাওয়ার এই সহজ রাস্তাটা বেছে নেবে কেন?

সন্ত্রাসবাদের জন্মই হয় হতাশার থেকে। যুক্তি, বুদ্ধি, বাস্তবতার থেকে 'কিছু একটা করার' প্রবণতা এবং আবেগই এখানে প্রধান বিচার্য বিষয়। সেখান থেকেই চারুবাবুপন্থীরা কোনওদিন মুক্ত হতে পারেনি। সেইজন্যই 'শহীদের দুনিয়া', 'শ্রদ্ধেয় নেতার কর্তৃত্ব' প্রভৃতি যুক্তি বুদ্ধিহীন আবেগতাড়িত বাকসর্বস্ব স্লোগানই ওদের মূল রাজনীতি ও কার্যক্রম।

সুতরাং ওই রাজনীতির ধারক ও বাহক যে আত্মহত্যা করতে যাবে তাতে আর আশ্চর্যের কি আছে। তবে আমাদের জন্য আরও বিস্ময় প্রতীক্ষা করছিল।

মহাদেববাবুকে পাঠানো হলো আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে। তিনি জেলের কোনও ওয়ার্ডে না গিয়ে অসুস্থ হিসাবে ভর্তি হলেন জেল হাসপাতালে। তখন ওই জেলের জেলার ছিলেন আবার সাঁইবাবার ভক্ত। বন্দিদের তিনি সাঁইবাবার অনুরাগী করতে রোজ সন্ধেবেলা নিয়ম করে জেলের ভিতরের স্থায়ী মাইক্রোফোন মারফত সাঁইবাবার গুণকীর্তনের ক্যাসেট শোনাতেন। ওই জেলারের এক বিশাল 'পীড়ন বাহিনী' ছিল। ওই বাহিনীর সবাই সাজাপ্রাপ্ত কয়েদী। তারা জেলের ভিতর অতিরিক্ত সুযোগ সুবিধা পাওয়ার জন্য এই বাহিনীতে যোগ দিত।

স্বভাবতই জেলার যখন সাঁইবাবার ভক্ত, বাহিনীর সবাইও রাতারাতি সাঁইবাবার

ভক্ত হয়ে গেল। জেলের অন্য বন্দির পছন্দ হোক বা না হোক তাঁকেও বাধ্য হয়ে রোজ সকাল সন্ধেই সাঁইবাবার ভজন শুনতে হতো।

ওই জেলে ঢুকেই ক'দিনের মধ্যে মহাদেববাবু এই ব্যাপারটা বুঝে গেলেন। তিনিও জেলারের সুনজরে থাকার জন্য হঠাৎ সাঁইবাবার ভক্ত হয়ে গেলেন। জেলারের কাছে আবদার করলেন সাঁইবাবার বাণীসম্বলিত বই তাঁকে দেওয়ার জন্য। এই একটা ক্ষেত্রেই ওই জেলার উদার ছিল। সাঁইবাবা সংক্রান্ত বই কেউ চাইলে সেটা তিনি তাকে দান করতেন। মহাদেববাবুও জেলারের কাছ থেকে ওই বিষয়ের ওপর সাত আটটা বই পেলেন।

বই পেয়ে মহাদেববাবু সেগুলি হাসপাতালে তার বিছানায় মাথার কাছে পরম যত্ন করে সাজিয়ে রাখলেন এবং নিয়মিত ভাবে বইগুলি পড়তে শুরু করলেন। 'শ্রদ্ধেয় নেতার' বাণী ভুলে তখন তিনি সাঁই ভজনায় মগ্ন হলেন।

তাঁকে এই রূপান্তর সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হলে তিনি নির্বিকারচিত্তে বলতেন, "আরে, সাঁইবাবা 'জনগণের সেবা' নিয়ে কি বলেছেন, সেটা দেখছি।" আসলে জেলারের পীড়ন বাহিনীর হাত থেকে নিজেকে আড়াল করার জন্যই তিনি এসব পড়ছেন তা কখনও স্বীকার করতেন না। ওই 'জনগণের' নামেই নিজের কৃতকর্ম ঢাকতে চাইলেন। নিজের রাজনীতি ও মতাদর্শের ওপর বিন্দুমাত্র আস্থা থাকলেও এ কাজ তিনি করতে পারতেন না। আবার তিনিই কানু সান্যাল, সৌরেন বসুদের 'দু'নম্বর বিপ্লবী' বলে গালাগালি দিতেন। কানুবাবুরাও কিন্তু তখন ওই জেলে, তাঁদের কিন্তু কখনই দরকার হয়নি 'সাঁইবাবা জনগণের জন্য' কি কাজ করছেন তা জানার।

এসে গেল পঁচাত্তর সাল। চারুবাবুর স্বপ্নের বছর। তাঁর ভবিষ্যৎবাণী অনুযায়ী 'ভারতবর্ষের মুক্তির বছর'। কিন্তু কার হাত ধরে আসবে সেই 'মুক্তি'! কোথায় সেই 'মুক্তিযোদ্ধারা'! দিন দিন ক্ষীণ হতে হতে চারুবাবুর মতাদর্শে বিশ্বাসী নাবালকেরা গুটিকয়েক। তারা জানেই না ভারতবর্ষ কাকে বলে। কি তার সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক অবস্থান। কোন প্রদেশের কি বৈচিত্র্য, কি তাদের ইতিহাস, কি ভৌগোলিক অবস্থান, কিছুই এরা জানে না।

আর এদের নেতৃত্বেই নাকি আসবে ভারতবর্ষের 'মুক্তি'। 'মুক্তি' কি কোনও অলৌকিক ব্যাপার যে কিছু ছাইভস্ম উড়িয়ে দিলেই প্রতিপক্ষ কাবু হয়ে আত্মসমর্পণ করবে।

চারুবাবুর 'পঁচাত্তর সালের' মুক্তির ঘোষণার মধ্যেই একটা জিনিস পরিষ্কার, ভারতবর্ষ নামক দেশ সম্পর্কে তাঁরই কোনও ধারণা ছিল না। এবং সশস্ত্র

বিপ্লব সম্পর্কেও তাঁর প্রকৃত কোনও জ্ঞান ছিল না। তাই নির্দ্বিধায় ঘোষণা করেছিলেন যে, "পঁচাত্তর সালই হবে ভারতবর্ষের মুক্তির সাল।"

ব্যাপারটা যেন শিশুদের খেলা। শিশুরা যেমন হাতে একটা খেলনা পিস্তল পেলে নিজেকে সর্বশক্তিমান ভেবে ঠ্যাঁই ঠ্যাঁই নকল গুলি ছুঁড়ে সবাইকে হত করে তার বশ্যতা স্বীকার করাতে বাধ্য করায়, চারুবাবুও বোধহয় তাঁর 'বিপ্লবটা' ওই ধরনের কিছু একটা ভেবেছিলেন। নয়ত .কোন বাস্তবতার উপর দাঁড়িয়ে তাঁর এই ঘোষণা ?

পঁচাত্তর সালের জরুরি অবস্থায় চারুবাবুর 'মুক্তির স্বপ্ন' কোথায় যে ভেসে উধাও হয়ে গেল আমরা বাস্তবিকপক্ষে তার কোনও আঁচই পেলাম না। এদিক ওদিক লক্ষ্যহীন দু'একটা ছোট ঘটনা ছাড়া নকশালরা কোনও ঘটনাই ঘটালো না।

পঁচাত্তর সালকে নকশালরা নয়, ইন্দিরা গান্ধী জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে ভারতবর্ষের ইতিহাসে নির্দিষ্ট করে রাখলেন। চারুবাবুর "ভারতমাতা বিপ্লবের গর্ভযন্ত্রণায় ছটফট করছে"—এর স্থানে ইন্দিরা গান্ধীর জরুরি অবস্থার ঘোষণায় ছটফট করছে হয়ে গেল। মিশা, কাফেপোসা প্রভৃতি আইনে বিরোধীপক্ষকে অবাধে গ্রেফতার করে বন্দি করতে হলো।

নকশালদের বিপ্লব নয়, শাসকদলের দাপট সামলাতেই আমাদের পঁচাত্তর সাল পার হয়ে গেল।

পঁচাত্তরের কেলেন্ডারের শেষ পাতার দিনগুলি ফুরিয়ে গিয়ে ছিয়াত্তর সাল এল। পৃথিবীর বয়সের হিসাব আমরাই রাখি, পৃথিবী নিজে রাখে না। সে নির্বিকার, কোথায় কোন অঞ্চলে তার কোলের ভিতর কোন প্রাণী জন্মাল, কোন প্রাণীর মৃত্যু হলো, সে সম্পর্কেও সে চির উদাসীন। মানুষের কোন গোষ্ঠী কি বিপ্লব করল, কে কার বুকে ছুরি মারল, কে কার খাবার কেড়ে নিল, কে কার জন্ম ও মৃত্যুর জন্য দায়ী সব ব্যাপারেই সে উদাসীন। সে নিজের চক্রে, নিজের ভাবে সূর্যের চারপাশে ঘুরছে। তাতেই তার আনন্দ, তাতেই তার জীবন।

কিন্তু জীবনচক্রে আমরা তো আর এত উদাসীনভাবে চলতে পারি না। আমাদের তো একটা সমাজ আছে, একটা আইন আছে, বাধ্যবাধকতা আছে। আমাদের সেই হুকুমেই চলতে হয়। আমাদের কোনও নির্দিষ্ট কক্ষপথ নেই যে সেই পথে ঘুরে ঘুরে কাটিয়ে দেব দিন। আমরাই আমাদের জীবনের কক্ষপথকে করেছি জটিল, সমস্যা জর্জরিত। আমাদের যে বড় বেশি লোভ বড় বেশি আকাঙ্ক্ষা। সেই সব লোভ আর আকাঙ্ক্ষাকে জীবনের চেয়ে অনেক বড় হিসাবে দেখি। তাই যত সরলরেখায় আমরা বাঁচতে পারতাম

তাকে প্রতিনিয়ত খুন করছি আমরা। আমরাই ঠিক করছি আমাদের মৃত্যুর দিন, আমরাই আমাদের মৃত্যুর জন্য দায়ী!

জরুরি অবস্থার তুমুল বিতর্কিত সময়ের মধ্যে তখনও দু'মাস বয়স হয়নি ছিয়াত্তর সালের। দিনটা ছিল চব্বিশে ফেব্রুয়ারি। আমরা তখন লালবাজারেই অফিসে বসে আছি। দুপুর গড়িয়ে সবে বিকেল হচ্ছে, ঘড়িতে সময় সাড়ে তিনটের স্টেশন ছাড়িয়েছে কি ছাড়াইনি। খবরটা এল। খবরটা হৃদয়ঙ্গম করে হজম হওয়ার পর মনে হলো এর চেয়ে লালবাজারের মধ্যে একটা বজ্রপাত হলেও এত চমকাতাম না। আমরা অফিসে ছড়িয়ে ছিটিয়ে যারা বসেছিলাম, খবরের ধাক্কা সামলিয়ে মিনিট খানিকের মধ্যে তৈরি। যেতে হবে এক বিধ্বস্ত যুদ্ধক্ষেত্রে।

লালবাজারের গোয়েন্দা দফতরের তিনতলা থেকে নিচের চাতালে নেমে গাড়িতে ঝপাঝপ বসে পড়লাম, আমি, উমাশংকর, শচী মজুমদার, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়। আমাদের সঙ্গে অন্য গাড়িতে বোম স্কোয়াডের দু'জন অফিসার ও কনস্টেবল।

গাড়ি ছুটল দক্ষিণ দিকে। আমাদের গন্তব্যস্থল প্রেসিডেন্সি জেল। খবরের ভিত্তি তো ওখানেই। খবরটা হলো, ওই জেলের গেট ভেঙ্গে বহু নকশাল পালিয়েছে। কত জন পালিয়েছে, খবরদাতা বলতে পারেনি।

গাড়ি ছুটছে। কিন্তু মনে মনে আমার নিজেরই চুল ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে করছে। কারণ রাতদিন মাসের পর মাস, বছরের পর বছর বহু পরিশ্রমের পর ওদের গ্রেফতার করে আমরাই ওদের জেলখানায় আটক করেছি। আর জেল কর্তৃপক্ষ কি না আমাদের পরিশ্রমের সামান্যতম কোনও মূল্য রাখতে পারল না। প্রচণ্ড বিরক্তিতে আমাদের দলের প্রত্যেকেই প্রায় নিশ্চুপ। কথার যোগান গলায় আটকে আছে।

কতজন পালাল, কারা কারা পালাল কিছুই জানি না। যতক্ষণ না প্রেসিডেন্সি জেলে নিজেরা গিয়ে তদন্ত করতে পারছি, ততক্ষণ জানতেও পারব না কারা পালাল। প্রেসিডেন্সি জেলে এমন কিছু চারু মজুমদার পন্থী নকশাল আছে যারা গলাকাটার রাজনীতির সার্বিক অসারত্ব প্রমাণ হয়ে যাওয়ার পরেও বিশ্বাস করে ওই গলা কেটেই তারা ভারতবর্ষের 'বিপ্লব' সম্পূর্ণ করবে। আর ওদের এই বিশ্বাসের একমাত্র মূল ভিত্তি হলো, কথাটা বলেছেন তাদের 'শ্রদ্ধেয় নেতা' স্বয়ং, সুতরাং ওটা বেদবাক্য।

থ্যাকারসে রোড থেকে পূব দিকে নেমে প্রেসিডেন্সি জেলের মূল গেটের সামনে আমরা বিকেল চারটের সামান্য আগে পৌঁছলাম। গেটের সামনে ভিড় পুলিশ ও জেল সিপাইয়ের। তাদের সামান্য দূরে বন্দিদের সঙ্গে

সাক্ষাৎপ্রার্থীদের আত্মীয়স্বজন। তাদের চোখ মুখ উদ্বিগ্ন। পুলিশ ও জেল সিপাই মিলিতভাবে তাদের সরিয়ে দিচ্ছে উত্তর দিকে।

জেল গেটের ভেতর আমরা সদলে ঢুকলাম। গেটের পাশেই তখনও পড়ে আছে দুটো নকশাল যুবকের মৃতদেহ। একজনকে দেখেই চিনতে পারলাম। দমদমের স্বদেশ ঘোষ। অন্যজনকে চিনতে পারলাম না। ওরা জেল গেটে পাহারারত কলকাতা পুলিশের আর্মড গার্ড কিংবা সি আর পি জওয়ানদের গুলিতে মারা গেছে।

জেলের ভেতর জেল অফিস পুরো ছত্রখান। দেখলেই বোঝা যায় ওখানে একটা যুদ্ধ হয়ে গেছে। একটা টেবিল চেয়ারও সোজা দাঁড়িয়ে নেই। টেলিফোনের তার ছেঁড়া। টেলিফোনের রিসিভার আর ক্রেডেল দুটো বিচ্ছিন্ন অবস্থায় দু'পাশে। জেলের কাগজপত্র চারদিকে ছড়ানো। মূল গেটের ভাঙ্গা তালাটা মেঝেয় পড়ে আছে। তার স্থানে অন্য একটা তালা এনে মূল গেটে কেউ লাগিয়েছে। গেটের পাশেই বড় বড় দুটো লোহার রড, একটা ছুরি। বোমা ও বোমার আগুনে জায়গায় জায়গায় ঝলসে যাওয়ার চিহ্ন। দেওয়ালে একটা বড় ঘড়ি। থমকে দাঁড়িয়ে আছে। কাঁটা দুটো দাঁড়িয়ে আছে তিনটে বারো মিনিটে। পোড়া কাপড়ের টুকরো ছড়িয়ে ছিটিয়ে। তাজা রক্তের দাগ জেল গেটের ভেতরে চাপ চাপ হয়ে জ্বলজ্বল করছে। জেল গেটের ভেতরে রাখা বড় দাঁড়িপাল্লার বাটখারাগুলি এদিক ওদিক। সমস্ত পরিবেশে তখনও বোমার বারুদের গন্ধ।

জেল সুপারিনটেন্ডেন্ট আর এন মুখোপাধ্যায়, ডেপুটি সুপরিন্টেন্ডেন্ট অমিতাভ গঙ্গোপাধ্যায়, ডিসিপ্লিন অফিসার কালীপদ রাহা এবং সদ্য বদলী হয়ে আসা জেলার পরিমলবাবু বিহ্বল। এত বড় ঘটনায় কিছুটা হতচকিত। ওঁদের চোখ মুখ দেখলেই বোঝা যায়, ওঁদের প্রশাসনিক ত্রুটির জন্যই যে এই ঘটনা সংঘটিত হতে পেরেছে তা মেনে নিয়েছেন।

কতজন নকশাল পালিয়েছে আমরা পৌঁছানোর পর জেল কর্তৃপক্ষ সঠিকভাবে বলতে পারল না। ওরা সেই সংখ্যা নিরূপন করার জন্য জেলের ভেতর ওয়ার্ডারদের নির্দেশ দিয়ে অপেক্ষায় আছে, সঠিক সংখ্যাটা জানার জন্য। তারা এলে, জানব।

আমরা প্রেসিডেন্সি জেলে পৌঁছাবার আগেই হেস্টিংস থানার অফিসারইন-চার্জ পি চট্টোপাধ্যায়, অফিসার জে এম চট্টোপাধ্যায়, এম আই খান, আমাদের ওয়ারলেস গাড়ি নিয়ে আলিপুরের জেল অঞ্চল পাহারারত সার্জেন্ট কৃত্তিভূষণ সুর পৌঁছে গেছে।

নকশালরা জেল গেট খুলে জেলের উত্তরপুব দিকে ডেপুটি সুপারিন্টেন্ডেন্টের

কোয়ার্টারের উঠোন পেরিয়ে পুবদিকের আদিগঙ্গা পার হয়ে ভবানীপুরের শশীশেখর বসু রোড, মদন পাল লেন, গোবিন্দ বসু রোড, সুবার্বন স্কুল রোড় ধরে দৌড়ে পালিয়ে গেছে। আদিগঙ্গার পাড় থেকে তাদের কিছু চটি জেলের সিপাইরা কুড়িয়ে নিয়ে এসে জেল গেটের সামনে স্তূপ করে রেখেছে। ওইসব দেখে আমাদের ভেতরে ওদের ওপর আরও রাগ চড়ে গেল। আসল সময়ে ওদের আটকে রাখতে পারল না, কিছু চটি কুড়িয়ে এনে বীরত্ব দেখাচ্ছে।

দেরি করে লাভ নেই। তদন্তে নেমে পড়লাম। ইতিমধ্যে আমরা ক'জন পলাতকের নাম জেনে গেছি, তারা হচ্ছে নিশীথ ভট্টাচার্য, আজিজুল হক, অজিত চক্রবর্তী, অনন্ত সিংয়ের মামলার আসামি স্বপন ঘোষ, অজয় দে ওরফে ভোম্বল। এদের বেশির ভাগই থাকতো প্রেসিডেন্সির 'পয়লা বাইশ' এবং 'তেইশ চুয়াল্লিশ' সেলে।

জেল গেট থেকে ঢুকে পুবমুখী বাঁদিক দিয়ে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে উত্তর দিকে একটা গেট। ওই গেটের ভেতর ঢুকলেই প্রথমে এক এক করে পর পর বাইশটা সেল। এই বাইশটা সেল নিয়েই 'পয়লা বাইশ' সেলের নাম। বাইশটা সেলের পর আবার একটা গেট। সেই গেট পার হয়ে একইভাবে পরপর আরও বাইশটা সেল, এই সেলের সম্মিলিত ওয়ার্ডের নাম 'তেইশ চুয়াল্লিশ'। এগুলি সবই ব্রিটিশ আমলে তৈরি। জেলখানার ভেতর সবচেয়ে বেশি সুরক্ষিত। এখানেই জেল প্রশাসন সবচেয়ে উগ্র নকশালদের রাখত।

আমরা যখন ওই সেলগুলিতে তল্লাশি করতে গেলাম তখন তার ভেতরে কয়েকটা সেলে কয়েকজন বন্দি ছাড়া বাকি প্রায় সবাই ফাঁকা। আমাদের দেখে ওরা সবাই সন্ত্রস্ত। আমরা তদন্তে যাওয়ার আগেই জেল সিপাইরা ওদের নির্দিষ্ট সেলে সেলে আটক করে দিয়েছে।

ইতিমধ্যে আমরা জেল সিপাইদের কাছ থেকে জেনে নিয়েছি, কোন কোন সেলে পলাতক নকশালরা ছিল। 'পয়লা বাইশ' সেলের ওয়ার্ডে ওদের নেতা নিশীথ ভট্টাচার্য, আজিজুল হক, অজিত চক্রবর্তী, গোপাল মজুমদাররা ছিল, 'তেইশ চুয়াল্লিশ' সেলের ওয়ার্ডে যারা আছে তাদের মধ্যে থেকে রামু বৈদ্য, বিমলেন্দু ঘোষাল, তাপস বিশ্বাস, প্রশান্ত চৌধুরি, তাপস সরকার ও মিশায় ধৃত গজপাল সিংকে পাওয়া যাচ্ছে না। তার একটাই অর্থ, ওরা পালিয়েছে।

ছোট ছোট সেলগুলিতে ঢুকে তল্লাশি চালাচ্ছি। প্রায় সব সেলগুলিরই ভেতরের চিত্র এক। জেল প্রশাসনের দেওয়া কম্বল, অ্যালুমিনিয়মের থালা,

গ্লাস, বাটি। নিজেদের আনা বিছানার চাদর, বালিশ, গামছা, জামা কাপড়। কিছু বই, কাগজ, পেন, পেন্সিল, ওষুধ, নকশালদের পত্রিকা ইত্যাদি। কোনও ঘর থেকেই ষড়যন্ত্রের সূত্রের কোনও ঠিকানা খুঁজে পাচ্ছি না। শচী, অরুণরা সেলে সেলে ওদের জিনিসপত্তর ঘেঁটে বারবার একই কথা বলছে, "না, স্যার কিছু পাচ্ছি না।"

আমি প্রতি সেলেই ওদের সঙ্গে ঢুকে তল্লাশির ওপর নজর রাখছি। প্রতি সেলেই একটা ব্যাপার আমার নজরে আসছে যে, সেলের একটা কোণে পোড়া বিড়ি সিগারেটের টুকরো আর টুকরো গুলির আশেপাশে দুমড়ানো মোচড়ানো কাগজের টুকরো ইতস্তত ছড়ান। যেন কোনও কিছু লিখছিল, পছন্দ হয়নি, ফেলে দিয়েছে।

শচীরা একবারের জন্যও ওই কাগজগুলি খুলে দেখছে না, ভেতরে কি লেখা আছে। আমি শচীকে বললাম, "দেখ তো শচী ওই কাগজের টুকরোগুলিতে কি লেখা আছে।" শচী আমার নির্দেশ পেয়ে একটা কাগজ তুলে ওর চোখের সামনে টান করে মেলে ধরে বলল, "ও কিছু নয় স্যার, কতগুলি এ বি সি ডি লেখা।" আমি ওকে কোনও উত্তর না দিয়ে ঝপ করে ওর হাত থেকে কাগজের টুকরোটা হাতে নিয়ে মেলে ধরলাম। সত্যিই কবিতার আকারে এ বি সি ডি লেখা একেবারে জেড পর্যন্ত। মোট চারটে করে লাইন। প্রতি লাইনের ওপর যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগের চিহ্ন। আর প্রতি লাইনের পাশে এক দুই তিন থেকে সাত সংখ্যা পর্যন্ত।

টুকরোর ওপর ওইভাবে সংখ্যা, চিহ্ন আর অক্ষর দেখে ভেবে পেলাম না ওইগুলি কি উদ্দেশে লেখা। আমি আরও দুই একটা কাগজের টুকরো বিড়ি সিগারেটের ছাইগাদা থেকে তুলে নিলাম। তারপর আশ্চর্য হয়ে দেখলাম, প্রতিটিতে যোগ বিয়োগ গুণ ভাগের চিহ্ন সহকারে এক দুই তিন চার সংখ্যাগুলি অংকের আকারে লেখা, কিন্তু ওইগুলি যে কোনও অংকের সমাধানের উত্তর খোঁজার জন্য লেখা হয়নি তা পরিষ্কার। কারণ একই লাইনে যোগ বিয়োগ গুণ ভাগের চিহ্নযুক্ত পরপর সংখ্যা সমেত কোনও অংক হতে পারে না। তাছাড়া সমাধান করার কোনও প্রয়াস ওই কাগজগুলির কোনও অংশে দেখা গেল না। আমি ওই কাগজগুলি সযত্নে টান টান করে পকেটে পুড়লাম। আমার দৃঢ় ধারণা হলো, এর ভেতর থেকেই আমি ওদের ষড়যন্ত্রের রহস্য উদ্ধারের দিশা খুঁজে পাব। তারপর আমি প্রতি সেল থেকে কাগজের টুকরো সংগ্রহ করে আমার পকেটের ছোট্ট সংগ্রহশালায় চালান করতে লাগলাম।

'পয়লা বাইশ', 'তেইশ চুয়াল্লিশ' সেল ওয়ার্ডের পলাতক নকশালদের খালি সেলগুলি তল্লাশি করে আমরা এবার প্রেসিডেন্সি জেলের অন্য ওয়ার্ডগুলিতে তদন্ত করতে গেলাম। একুশ, সতেরো, পাঁচ ও চার নম্বর ওয়ার্ডগুলিতে একের পর এক ঘুরলাম। যেখানে যেখানে ওরা থাকতো সেই সব বিশেষ বিশেষ কোণগুলিতে গিয়ে ওদের ফেলে যাওয়া জিনিসগুলি বাজেয়াপ্ত করে সংগ্রহ করতে লাগলাম।

যে কজন নকশাল পালিয়েছে, তার থেকেও আরও অনেক বেশি সংখ্যায় নকশাল বন্দি প্রেসিডেন্সি জেলে রয়েছে। তাদের অধিকাংশকেই আমি চিনতাম। তদন্ত করতে গিয়ে তাদের সঙ্গেও আমাদের দেখা হলো। দু'চারজনের সঙ্গে দু'চারটে করে সামান্য কথাও হলো। একসময় ওরা সবাই চারুবাবুর একনিষ্ঠ অনুগামী ছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে ওরা খতমের রাজনীতির আদর্শ থেকে বেরিয়ে এসেছে। জেল পালানো নিয়ে আমি এদের কারও সঙ্গে একটাও কথা বললাম না, কারণ আমি জানি জেল পালানোর ষড়যন্ত্র নিয়ে এরা নিশ্চয়ই কিছু জানতো না বা জানলেও এরা আমায় সেই প্রসঙ্গে একটাও সঠিক উত্তর দেবে না। যে গাছ থেকে একটাও ফল পাওয়ার আশা নেই, অযথা সেই গাছ নাড়া দেব কেন? সুতরাং মনসংযোগ অন্যদিকে দেওয়াই ভাল, যেখান থেকে ফল লাভের আশা আছে।

জেল গেটে পৌঁছে, নকশালদের পালানোর ঢঙ দেখে প্রথমেই আমাদের কাছে একটা জিনিস পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, ষড়যন্ত্রটা ওরা বহুদিন ধরে করেছে। এত বড় অ্যাকশান দু'চারদিনের সারাংশ নয়। দীর্ঘদিনের পরিণতি। এবং এই দীর্ঘদিন ধরে অত্যন্ত গোপনে এবং সাবধানতায় এটা ওরা একটু একটু বুনেছে। ষড়যন্ত্রকে বাক্সে বন্দি রেখে এগিয়ে যাওয়ার মধ্যে অবশ্যই নিপুণতার দরকার। বিশেষ করে জেল ও জেলের বাইরের সংযোগগুলির ক্ষেত্রে। এক্ষেত্রে ওদের দক্ষতা দারুণ।

তবে নকশালদের মানসিকতা সম্বন্ধে একটা বিষয়ে আমি নিশ্চিত যে, যারা এই ষড়যন্ত্রে অংশ গ্রহণ করেনি তারা জানলেও সেটা ফাঁস করে দেবে না, বা ভণ্ডুল করে দেবে না, বরং প্রয়োজন হলে গোপনে সামান্য সাহায্যও করে দেবে। গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে যতই লড়াই হোক চারুবাবুর বিপরীত গোষ্ঠীর নকশালদের এই উদার মানসিকতা ছিল। যদিও চারুবাবুপন্থী নকশালদের এই মানসিকতা নেই, কারণ তারা তো তাদের বিরোধী কোনও নকশালদের 'বিপ্লবীর' স্বীকৃতিই দিত না,—উল্টে সুযোগ পেলেই তারা তাদের খুন করতেও দ্বিধা করেনি।

পুরো জেলটা ঘুরে, প্রয়োজনীয় তদন্ত সেরে যখন আমরা জেল গেটে

পৌঁছলাম তখন প্রায় ছ'টা বাজে। সেলে সেলে ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে বন্দিদের রাতের জন্য গরাদে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে।

প্রেসিডেন্সি জেলের মাঝখানেই একটা বিরাট পুকুর আছে। পুকুরের চারপাশে গাছ। তাছাড়াও বড় বড় গাছ আছে পুবদিকে, দক্ষিণ দিকে। সেই সব গাছে সামান্য দূরত্বে থাকা চিড়িয়াখানা থেকে উড়ে এসে বাসা বাঁধে পানকৌড়ি ও শীতের মৌসুমী পাখিরা।

ফাল্গুন মাসের সন্ধ্যায় প্রেসিডেন্সির পুকুরে নেমে এসেছে গাঢ় অন্ধকার। আশেপাশের গাছের পাখিরা নিচের মানুষের উত্তেজনা ভুলে পালকে মুখ গুঁজে ভোরের প্রথম আলোর অপেক্ষায় চোখ বুজেছে। দু'চারজন তখনও ঘরে ফিরছে। কেউ বা ঠিকমত আয়েসি ডাল না পেয়ে সামান্য উত্তেজিত, নিজস্ব স্বরে তা প্রকাশ করে রাতযাপনের দাঁড় খোঁজার জন্য ব্যস্ত। সম্পূর্ণ অন্ধকার নামার আগে তার ঘর দরকার।

আমি নিশ্চিত, বিকেল সোয়া তিনটের সময়, যখন জেল গেটের সামনে নকশালদের ছোঁড়া বোমা, গুলি ও সি আর পি-র পাল্টা গুলির বিকট বিকট আওয়াজ হচ্ছিল তখন একটা পাখিও গাছগুলিতে বসে ছিল না। টা-টা শব্দে ডানা ঝাপটিয়ে প্রায় পাগলের মতো যে যেদিকে পেরেছে উড়ে পালিয়েছে, কেউ গেছে পশ্চিমে জাতীয় গ্রন্থাগারের বাগানের বড় বড় গাছগুলির আশ্রয়ে, কেউ বা পুবের টলির নালা পেরিয়ে আরও আরও দূরে। সন্ধে নামার সঙ্গে তারা ফিরে এসেছে নিজস্ব নীড়ে। তাদের স্মৃতিতে নেই বিকেলের সেই বোমা গুলির অস্থিরতার শব্দ। 'স্মৃতি' বলে ওদের মগজের কোষে কিছু নেই। তাই ওরা শান্তিতে কাটায় ওদের জীবন। মানুষের যে এখানেই দায়! সে ভুলতে পারে না।

মানুষ কিন্তু তিন ঘন্টার মধ্যে নিরাপদ স্থান ছেড়ে আবার যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরে এসে রাত কাটাত না। ওরা মানুষ নয়, তাই ফিরে এসেছে। রাত কাটাবে গাছের সঙ্গে, ওদের ছোট্ট ছোট্ট হৃদয়গুলি ভয়ে একটুও কাঁপবে না।

জেল গেটে পৌঁছেই জেল কর্তৃপক্ষের কাছে শুনলাম, ওঁরা ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে আসামি গুনে অবশেষে সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, মোট বিয়াল্লিশ জন নকশাল পালিয়েছে। কর্তৃপক্ষ পলাতক আসামিদের একটা নামের তালিকা আমাদের হাতে দিলেন। নিশীথ ভট্টাচার্য, আজিজুল হকরা ছাড়াও পালিয়েছে নবকুমার ভট্টাচার্য, অসিত বরণ বিশ্বাস নামে দু জন ফাঁসির আসামি, ছ'নম্বর সেলে ওদের রাখা হয়েছিল। এটা জানতে পেরে আরও আশ্চর্য হয়ে গেলাম। কারণ নিয়ম অনুযায়ী ফাঁসির আসামিকে একটা আলাদা ওয়ার্ডে একটা সেলে

রাখতে হয়। সেখানে জেলের অন্য বন্দিদের যাতায়াত নিষিদ্ধ। সেলে চব্বিশ ঘন্টাই আটক থাকতে হয় ফাঁসির আসামিকে। শুধু স্নান করার সময় ও দিনের বেলা বিশেষ শারীরিক প্রয়োজনে জেল সিপাইয়ের বিশেষ প্রহরায় তাদের সেল থেকে বার করা হয়। কাজ শেষ হলে আবার তাদের সেলের ভেতর ঢুকিয়ে দেওয়া নিয়ম। প্রতি ফাঁসির আসামির জন্য আলাদাভাবে জেল সিপাই নিয়োগ করা হয়।

অথচ এই নিয়মের ফাঁক দিয়ে কি করে ওই ফাঁসির আসামিরা জেল পালানোর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলো, কি করেই বা তারা ঠিক পালানোর সময় সেল থেকে মুক্ত হয়ে একেবারে জেল গেটে পৌঁছে গেল তা সত্যিই আশ্চর্যের। একটা সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, অন্যদের সঙ্গে নবকুমার ও অসিতের নিয়মিত যোগাযোগ খুব ভালভাবে ছিল। নিয়মিত যোগাযোগ ছাড়া সঠিক সময়ে তারা কিছুতেই জেল গেটে পৌঁছাতে পারত না। যে সিপাইরা ওদের পাহারায় ছিল, তারা নিশ্চয়ই ওর ঘনিষ্ঠ ছিল, কারণ ঘনিষ্ঠতা ছাড়া তারা কেন নবকুমার ও অসিতের সেলের তালা খুলে দিল? এবং ওরা যদি শারীরিক প্রয়োজনীয়তার মিথ্যা অজুহাত দিয়ে ওদের সেলের তালা খুলতে বাধ্য করায় তবুও সেলের থেকে বাইরে এসে ওয়ার্ডের মূল গেটের তালা তারা কিভাবে খুলল? এবং ছুটে পালানোর সময় পাহারায় নিযুক্ত সিপাইরা বা কি করছিল। তাদের আটকাতে পারল না? না কি আটকানোর চেষ্টাই করেনি?

সমস্ত ঘটনার বিবরণ শুনে একটা জিনিস একেবারে ধপ্‌ধপে পরিষ্কার যে জেলের প্রশাসন ছিল একেবারেই ঢিলেঢালা, খোলামেলা। এবং তার জন্য জেল কর্তৃপক্ষই পুরোপুরি দোষী। আর খোলামেলা পরিবেশের জন্যই নকশালরা সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে বিস্তৃতভাবে নিজেদের এই ষড়যন্ত্রকে ছড়াতে পেরেছে। প্রায় অবাধে বোমা, মলটভ ককটেল, ছুরি, ভোজালি বাইরে থেকে আমদানি করেছে। জেল গেটে বাধাহীন ভাবে এসেছে। তারপর বিয়াল্লিশ জনের বিশাল দল নিয়ে পালিয়েছে।

তল্লাশি করতে করতেই আমরা জেনে গেছি যে, জেল হাসপাতালে সিপাই রামযুধ সিং মারা গেছে। সে জেল গেটের পাহারার মূল সিপাই ছিল। নকশালরা ছুরি মেরে তার থেকে চাবি কেড়ে নিয়েছে। অন্য সিপাই নিমাই সাহাকে অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে শেঠ সুখলাল কারনানি মেমোরিয়াল হাসপাতালে এবং আহত সিপাই রঘুনাথ রামকে ভর্তি করানো হয়েছে শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে। ওর শরীরেও প্রবেশ করেছে নকশালদের ছোঁড়া বোমার টুকরো।

মিশায় বন্দি স্বদেশ ঘোষ ছাড়া সংঘর্ষে যে নকশাল যুবকটি মারা গেছে তার নাম কালো হালদার, মেদিনীপুরের বাসিন্দা, মিশায় গ্রেফতার হয়ে প্রেসিডেন্সি জেলে আটক ছিল।

থানা ঘুরে একই সঙ্গে চলে যাবে স্বদেশ, কালো হালদার আর জেল সিপাই রামযুধ সিংয়ের মরদেহ মোমিনপুরের মর্গে। একই ডাক্তার একই টেবিলে ওদের দেহ রেখে কাটাছেঁড়া করবে। চারুবাবুর বিপ্লবের সাক্ষী হিসাবে মর্গের ডাক্তারবাবুরা যে এমন কত দেহ নিয়ে কাঁটাছেঁড়া করেছেন একমাত্র তাঁরাই জানেন।

যে তিনজনের জীবনের মূল্যে নিশীথবাবুরা জেল থেকে পালালেন সেই মূল্যের বিনিময়ে তাঁরা কতটা উপকার করবেন ভারতবর্ষের জনগণের? 'জনগণের সেবা' করার জন্য ওঁদের হাতে আছেটা কি? কতগুলি অর্থহীন আপ্তবাক্য আর মূল্যহীন আবেগ, যা কিনা ভারতীয় সমাজ ও জনগণের জীবনের কাছে সম্পূর্ণভাবে অর্থহীন।

জীবনের বিনিময়ে যদি জীবনই না দিতে পারি তবে জীবন নেওয়ার অধিকার কোথায়? নিশীথবাবুরা কোনওদিন এই সত্য গভীরভাবে উপলব্ধি করেননি বা চিন্তাও করেননি। ছেলেমানুষী গড্ডালিকা প্রবাহে ভেসে গেছেন। মৃত্যুতেই তাঁদের উল্লাস, তাঁদের আনন্দ!

সন্ধে নেমে গেছে অনেকক্ষণ, জেল গেটের স্তব্ধ হয়ে যাওয়া ঘড়িতে তবু সেই তিনটে বেজে বারো মিনিট। আমাদের যেন চোখে আঙুল দিয়ে প্রতি মুহূর্তে জানান দিচ্ছে, নকশালদের হানার সময়টা, যেন সাবধান করে বলছে 'ভুলো না।' আমাদের অফিসাররা প্রত্যক্ষদর্শীর জবানবন্দী লিখছে। মাঝে মধ্যে দু'চারটে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়ে জেনে নিচ্ছে, প্রশ্নের উত্তর।

যাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে, তাদের মধ্যে যেমন জেলখানার অফিসার, কর্মচারী ও সিপাই আছেন তেমনই বন্দি কয়েদীরাও আছে, যারা জেল গেটে তখন কর্মরত ছিল বা ঘটনার সময় কাছে ছিল।

প্রত্যক্ষদর্শী অনেক, তাদের কথাও এক ধারায় নয়। কেউ বলছে, প্রথম বোমাটা ছুঁড়েছিল বাইরে থেকে, যারা জেল পালানোর সাহায্যকারী হিসাবে এসেছিল তারা, কেউ বা বলছে প্রথম বোমাটা ছুঁড়েছিল আটক নকশালরা। প্রচণ্ড বোমাবর্ষণ যে নকশালরা করেছিল, সে ব্যাপারে কারও দ্বিমত নেই। সংখ্যায় এত যে, তার হিসাব কেউ দিতে পারল না। হঠাৎ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রত্যেকে যে যার ভূমিকায় ব্যস্ত, কে বোমার সংখ্যার খোঁজ রাখবে?

প্রেসিডেন্সি জেল গেটের সামনের বড় বাঁধানো চত্বরে যে দু'জন মৃত নকশালের দেহ পাওয়া গিয়েছে, তাদের সঙ্গেও তাজা বোমা পাওয়া গেছে।

কালো হলদারের কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ থেকে একটা বাক্সবোমা ও দু'টো সকেট বোমা পাওয়া গেছে, স্বদেশের শরীরের কাছে একটা বোমা পাওয়া গেছে। সম্ভবত ওটা ওর হাতে ছিল, পিছন থেকে ওর পিঠে রাইফেলের গুলি লাগতে ও পড়ে যাওয়ার সময় ওর হাত থেকে বোমাটাও ছিটকে পড়েছে। কিন্তু ফাটেনি। ফাটলে ওর দেহ টুকরো টুকরো হয়ে অংশগুলি এদিক ওদিক ছিটকে যেত। বোমা যে ওরা প্রচুর মজুত করেছিল তা এদের দেখেই বোঝা যায়।

জেলের ভেতরে এত বোমা তো একদিনে প্রবেশ করেনি। বেশ কিছুদিন ধরে ঢুকেছে। যেগুলি ওরা মজুত করেছে সেগুলি তো আর পায়ে হেঁটে যায়নি।

এখন প্রশ্ন, কারা ওদের যোগান দিয়েছে? এই যোগান দেওয়ার ক্ষেত্রে জেলখানার কোনও কর্মচারীর হাত আছে কী? থাকলে তারা কোন পর্যায়ের কর্মচারী? পলাতক নকশালদের গ্রেফতার করতে পারলে এই প্রশ্নের মীমাংসা হবে। বোমাগুলি মজুত করার ক্ষেত্রে ওদের সাহায্য করেছে কে? জানতে হবে।

ঘটনার সাধারণ বিশ্লেষণ করলেই পরিষ্কার যে, জেল কর্তৃপক্ষ নকশালদের সেল ও ওয়ার্ডগুলি নিয়মিত কেন, মাঝে মধ্যেও তল্লাশি করত না। অথচ এটা ওদের নিয়মিত বাধ্য কাজের মধ্যে পরে। এতটা উদাস ওরা কি জন্য হলো? শুধু কি জেলের বাইরে ওদের কর্মকাণ্ড স্তিমিত হয়ে যাওয়ার জন্যই জেল প্রশাসন গা ঢিলে দিয়েছিলেন? নাকি তারা অন্য কাজে অতিরিক্ত যুক্ত হয়ে যাওয়ার ফলে এদিকটা খেয়াল রাখেননি?

সমস্যা এখন আমাদের ঘাড়ে। আমাদেরই সমাধান করতে হবে। জেল পালানো বিয়াল্লিশ জন নকশাল তো চুপচাপ বসে থাকবে না। বড় আকারে না হলেও ছোট আকারে গণ্ডগোল পাকানোর চেষ্টা করবে। এটা করবে ওদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যই। নিজেরা যে কত খাঁটি 'বিপ্লবী' কতটা 'শ্রদ্ধেয় নেতার' অনুগামী সেটা প্রমাণ করতেই বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্তভাবে দু'চারটে খুন করবে। খুন করা ছাড়া খাঁটি বিপ্লবী থাকার প্রমাণ ওরা দিতে পারে না। এটাই ওদের একমাত্র পথ।

অভিজ্ঞতার আলোতে জানি, পলাতক বিয়াল্লিশ জন চাইবে যত তাড়াতাড়ি পারে ওরা কলকাতা ত্যাগ করে অন্যত্র আশ্রয় নিতে। নিজের এলাকায় গিয়ে ওরা আত্মগোপন করবে না। এত বোকা ওরা নয়। পরিচিত পরিবেশে আশ্রয় নিলে যে সেই খবর আমরা পেয়ে যাব সেটাও ওরা জানে। তাই এখন আমাদের দরকার, কলকাতা ছেড়ে বাইরে যাওয়ার সবরকম রাস্তাগুলির

ওপর নজরদারি রাখা। কিন্তু নজরদারি রাখলেই যে ওদের আমরা সহজে পেয়ে যাব সেটাও কোনও নিশ্চিত নয়। তার প্রথম কারণ, নজরদাররা ওদের চেনে না। দ্বিতীয় কারণ ওদের চেহারাগুলি অতি সাধারণ, তাই অনায়াসে মানুষের সঙ্গে মিশে পালিয়ে যেতে পারে।

আমাদের নির্ভর করতে হবে, শুধু ওদের ভুল পদক্ষেপের ওপর। আর ভুল যে ওরা করবে তাও নিশ্চিত, কারণ পলাতক নকশালদের অধিকাংশের বয়সই কম। অভিজ্ঞতাও কম। ওদের ভেতর উত্তেজনাই বেশি। সে উত্তেজনাই ওদের ভুল পদক্ষেপ করতে বাধ্য করাবে। তাই জেল পালানোর এক ঘণ্টার মধ্যে কলকাতার আসা যাওয়ার পথগুলির ওপর নজর রাখার জন্য সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

তদন্ত সেরে আমরা এবার ফিরে যাব লালবাজার। নকশালদের ফেলে যাওয়া জিনিসপত্র, কাগজ, বই সব নিয়ে যাব। সূত্র বার করার জন্য। ওদের একজন জেল গেটের উত্তর পশ্চিম কোণে তাঁবু খাটিয়ে পাহারারত সি আর পি-র চতুর্থ ব্যাটেলিয়নের কনস্টেবলদের হাতে ধরা পড়েছে। না, সে পলাতক বন্দি নয়। বাইরে থেকে যে দলটা পালানোর সাহায্য করতে এসেছিল সে ওই দলের সদস্য ছিল। সেই যুবক কালীপদ দাস একাত্তর সালে গ্রেফতার হয়ে মিশা আইনে প্রেসিডেন্সি জেলে বন্দি ছিল। পরে মুক্তি পেয়ে বাইরে যায়, কিন্তু জেলে তার কমরেডদের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। এবং সেই সূত্রেই জেল পালানোর ষড়যন্ত্রে যুক্ত।

কালীপদ জেল গেটের সামনে জেল প্রাচীরের ওপরে যে এক নম্বর গুমটি আছে, যেখানে সি আর পি-র জওয়ানরা রাইফেল নিয়ে পাহারা দেয়, সেই এক নম্বর গুমটিতে বোমা ছুঁড়ে পালানোর সময় গণ্ডগোলে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে থ্যাকারসে রোডের ওপর একেবারে সি আর পি-র তাঁবুর সামনে চলে যায় এবং গ্রেফতার হয়। সেই কালীপদকেও আমরা নিয়ে যাব। তার থেকে অন্য নকশালদের খোঁজ পাওয়ার আশায়।

লালবাজারে ফিরে এসে আমরা নকশাল আন্দোলন দমন শাখার অফিসাররা চিন্তা করতে শুরু করলাম, কোন পথে কোন সুতো ধরে আমরা উড়ন্ত ঘুড়িকে নিচে টেনে নামিয়ে হস্তগত করব।

এমন সময়ই বিস্ফোরণ, ঘটনার নয়, খবরের। খবর পেলাম বালি থানার পুলিশ দিল্লি রোডের ওপর এক চলন্ত ট্যাক্সি থামিয়ে জেল পলাতক তিন নকশাল তরুণকে গ্রেফতার করেছে। তারা ট্যাক্সি নিয়ে শ্রীরামপুরের দিকে যাচ্ছিল।

এটা যে সতর্ক নজরদারির ফল, তা আর কাউকে বলে দিতে হবে

না। খবর শুনে আমি প্রথমেই জানতে চাইলাম, ধৃতদের মধ্যে নেতা স্থানীয় কোনও নকশাল আছে কিনা। কেউ সঠিক উত্তর দিতে পারল না।

ছুটলাম। বালি থানা আর লালবাজার থেকে কতদূর। আমাদের দলের গাড়ি ঘন্টা দেড়েকের মধ্যে পৌঁছে গেল।

ওরা থানার গারদে আটক। আমরা গারদের সামনেই ওদের দেখতে গেলাম। ওদের তিনজনের মধ্যে একজনকে চিনতে পারলাম। বাকি দু'জনকে নয়। আমাদের দেখে ওরা হতাশ মুখে আমাদের দিকে তাকাল। ওদের দেখেই বুঝলাম, এত দ্রুত যে ওরা আবার গারদের পিছনে ঢুকে যাবে তা ওরা কল্পনাও করতে পারেনি। তাই সমস্ত শরীর জুড়েই নেমে এসেছে নীরব হতাশা। জেল পালানোর চরম উত্তেজনার পর অতর্কিতে গ্রেফতার এবং আবার বন্দি, ওদের শরীরে ক্লান্তির মেঘ ছেয়ে এসেছে। যে যুবকটাকে দেখেই চিনতে পারলাম, ওর নাম বিমলেন্দু ঘোষাল, বাহাত্তর সালে সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারের কাছে একটা খুনের মামলায় গ্রেফতার হয়ে প্রেসিডেন্সি জেলে ছিল। ওর জামা কাপড়ে চাপ চাপ রক্ত, সম্ভবত নিজেদের ছোঁড়া বোমার স্পিলন্টারের টুকরো ওর শরীরে লেগেছে। আর সেই ক্ষত থেকেই রক্ত বেরিয়েছে। নিরাপদ আস্তানার খোঁজে ছোটার তাগিদে চিকিৎসারও সুযোগ পায়নি।

তিনজনকেই লালবাজার নিয়ে এলাম। না, ওদের মধ্যে কেউ নেতা নেই। বিমলেন্দু ছাড়া বাকি দু'জন রামু বৈদ্য ও তাপস বিশ্বাস। রামু বিচারাধীন ও তাপস মিশা আইনে ধৃত হয়ে প্রেসিডেন্সির তেইশ চুয়াল্লিশ সেলে বন্দি ছিল।

বিমলেন্দুকে জিজ্ঞাসাবাদ করার আগেই চিকিৎসার জন্য পুলিশ কেস হাসপাতালে পাঠাতে হলো। তাপস, রামু ও কালীপদর থেকে মূল ষড়যন্ত্রের একটা কাঠামো পেলেও অন্য নকশালরা কে কোথায় আশ্রয় নিয়েছে তা জানতে পারলাম না। এখন আমরা ষড়যন্ত্রের যে কাঠামো পেয়েছি তাকে নাড়াচাড়া করে ভেঙ্গে ভেঙ্গে তল্লাশি করার পরিকল্পনা করলাম।

সেদিনই গভীর রাতে হানা দিলাম টালিগঞ্জ থানার অধীনে একটা বাড়িতে। বাড়িটা ছাব্বিশ নম্বর ডাঃ দেওদর রহমান রোড। সেই বাড়িতে দুটো ঘর ভাড়া নিয়ে থাকে সমরেশ চৌধুরি বা সরোজ চৌধুরি। ওর সঙ্গে থাকে বিনয় চক্রবর্তী ও নিরঞ্জন দত্ত। তিনজনেই কলকাতা রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার কর্মী। ষড়যন্ত্রের যে কাঠামো পেয়েছি, তাতে জানতে পেরেছি ওই ঘরে ষড়যন্ত্রের একটা মূল শিবির ছিল। ওরা তিনজনই অংশগ্রহণ করেছে। তাছাড়া নিতাই রায়, তাপস ঘোষ, হিমাংশু গুঁইন এবং বীরেন্দ্র পাল চৌধুরি নামের

আরও একজন ওই কলকাতা রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার কর্মচারী নিয়মিত সমরেশের ভাড়া নেওয়া ঘরে এসে বৈঠক করত। উদ্দেশ্য জেল ভাঙ্গা।

সেদিনই আমরা হানা দিলাম। ঘর বন্ধ। তালা ঝুলছে। পালিয়েছে। না কি, ভেতরে কেউ আছে, বাইরে থেকে তালা দিয়ে আমাদের ধন্ধে ফেলার ফন্দি করেছে। সাক্ষী রেখে তালা ভেঙ্গে ঘরে ঢুকলাম। অন্ধকার। টর্চের আলোয় চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম। না, ঘরে কেউ নেই। চারদিকে ছড়ানো জিনিসপত্র, উদভ্রান্ত।

আমরা কাউকে না পেয়ে স্বাভাবিক ভাবেই কিছুটা হতাশ। তবে ওদের যে পাব না তা আমরা লালবাজার থেকে আসার সময়ই আন্দাজ করেছিলাম, কারণ ওরা নিশ্চয়ই জেনে গেছে, আমাদের হাতে ওদের ক'জন ধরা পড়ে গেছে। অর্থাৎ ওদের গোপনীয়তা ফাঁস হয়ে যাওয়ার রসদ আমাদের হাতে এসে গেছে। সুতরাং ওরা আর কেন নববধূর সাজে বসে থাকবে আমাদের অপেক্ষায় ?

হতাশায় মগ্ন হলে আমাদের চলবে না। শুরু হলো তল্লাশি। একে একে পেলাম আট বোতল বোমা বানানোর মশলা, তিনটে হ্যান্ড গ্রেনেড, চারুবাবুর বক্তব্য সম্বলিত নকশালদের বেশ কিছু প্রচারপত্র, সার্জিকাল কটন এবং আরও সব অন্যান্য টুকিটাকি। কিন্তু নেতাদের চলাফেরার রাস্তার কোনও ঠিকানার সন্ধান পেলাম না।

লালবাজারে ফিরে এলাম একটা ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে যে, কাঠামোর খড়কাঠগুলি ঠিকঠিকই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সাজাতে আমরা সক্ষম হয়েছি। তা না হলে, সঠিক জায়গায় হানা দিতে পারতাম না। আর এটাই অপরাধী ধরার প্রথম ধাপ। শূন্যে ভাসলে কোথায় পাব ওদের? শূন্যের বদলে এক দুই তিন করে সিঁড়ির ধাপ তৈরি করতে হবে। যত বেশি ধাপ তৈরি করতে পারব তত উঠতে পারব ওপরে। পেয়ে যাব আকাঙ্ক্ষিত আলো। গ্রেফতার করতে পারব অপরাধীদের।

জেল ভাঙ্গার দিনই যতটা সাফল্য পেলাম, তারপর দু'দিন কোনও সাফল্য পেলাম না। তবে পাব, কাঠামোর থেকে সেই রকমই সংকেত পেলাম।

চতুর্থদিন গ্রেফতার করলাম প্রদ্যুৎ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। হুগলির ত্রিবেণী থেকে। ওকে তিয়াত্তর সালেও গ্রেফতার করেছিলাম, কিন্তু অল্প ক'দিন প্রেসিডেন্সি জেলে আটক থাকার পর আদালতের নির্দেশে ও মুক্তি পেয়ে বাড়ি ফিরে যায়।

ওকে গ্রেফতার করার পর যা জানতে পারলাম তাতে আমাদের মাথার চুল ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে করল। কারণ প্রদ্যুৎ স্বীকার করল, জেল ভেঙ্গে

আজিজুল, প্রশান্ত চৌধুরী, নিশীথবাবু, ভোম্বল ও অজিত চক্রবর্তী সেদিন রাতে ওর ত্রিবেণীর বাড়িতেই রাত কাটিয়েছে। অর্থাৎ সেদিন ওর বাড়িতে হানা দিলে জেল ভাঙ্গার মূল মাথাদের একসঙ্গে আমরা পেয়ে যেতাম। পেয়ে গেলে আমাদের পরিশ্রম অনেক কম হতো। তারপর টুকটুক করে একে একে আমরা বাকিদের তুলে নিতাম। কিন্তু হয়নি। সহজে হয়নি। বুঝে গেছি, হবে না। প্রদ্যুৎ জানিয়েছে, পঁচিশ তারিখ সকালেই সে ওই পাঁচজনের সঙ্গী হয়ে হুগলিরই একটা গ্রামে পৌঁছে দিয়েছে, আত্মগোপন করার জন্য।

অর্থাৎ ওরা এখন খোলা পাখি, যে যেদিকে আকাশ পাবে, সে সেদিকে উড়ে যাবে। এক খেপে মাছ উঠবে না। জাল নিয়ে দীঘির এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্তে আমাদের ছোটাবে। কোনও খেপে পুঁটি উঠবে, কোনও খেপে বোয়াল, কোনও খেপে কিছুই না। তবু বিরামহীনভাবে আমাদের জাল ফেলতেই হবে এপারে ওপারে। এ চরে, ও চরে।

একদিকে জরুরি অবস্থার টানাহেঁচড়া শাসক দলের চোখরাঙানি ও নানা রকম বায়নাক্কা সামলানো, অন্যদিকে তাদের বিরোধীদের গ্রেফতার করে আটক করা। তার উপর জেল পলাতক নকশালদের গ্রেফতার করার ভাবনা আমাদের বিরামহীন ভাবে ছোটাতে লাগল।

উনত্রিশ তারিখে গ্রেফতার হলো অরবিন্দ দাস। না, ও পলাতক বন্দি নয়, জেল ভাঙ্গার এক সপ্তাহ আগে প্রেসিডেন্সি জেল থেকে ছাড়া পেয়ে বাইরে বেরিয়েছিল। কিন্তু জেলের নেতাদের নির্দেশে বাইরে বেরিয়েই জেল ভাঙ্গার ষড়যন্ত্রে অংশ নিয়ে জেল ভাঙ্গার দিন বাইরের নকশালদের সঙ্গে মিশে বোমা হাতে জেল গেট আক্রমণ করে। ওর আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু ছিল এক নম্বর গুমটির সি আর পি-র কনস্টেবল।

সেদিনই প্রেসিডেন্সি জেলের সিপাই ব্যারাক থেকে জেল সিপাই অর্জুন পুরকায়স্থকে গ্রেফতার করা হলো। জেল ভাঙ্গার দিন বিকেল তিনটে থেকে সন্ধে ছ'টা পর্যন্ত ওর ডিউটি ছিল ফাঁসির আসামির সেলে। কিন্তু সেই সেল থেকে ফাঁসির দুই আসামি নবকুমার ভট্টাচার্য ও অসিত বিশ্বাস পালিয়ে যায়। কি জন্য অর্জুন ওদের সেলের গরাদ খুলে দিল, সেই প্রশ্নের মীমাংসার জন্যই ওকে গ্রেফতার করা। নব আর অসিত কোন যাদুমন্ত্রে ওকে বশ করল জানতে হবে তাও। রাজনীতি, ঘুষ, গাফিলতি? কিসের ছোঁয়ায় ওর ভ্রান্তি হলো?

অর্জুন হাউমাউ করে কেঁদে ফেলল। খালি বলতে লাগল, "আমি ভুল

করেছি স্যার, আমি ভুল করেছি, আমি বুঝতে পারিনি। রোজই ওরা সেলের বাইরে একটু বার হয়, গল্পগুজব করে আবার ঢুকে যায়। সেদিনও—"

"চুপ কর।" অর্জুন ধমক খেল।

ধমক খেয়ে অর্জুন চুপ করে গেল। কিন্তু কান্না থামল না।

একে নিয়ে কী করব ভেবে পেলাম না। তবে ওর কথাবার্তায় একটা জিনিস পরিষ্কার যে সে মূল ষড়যন্ত্রের অংশীদার ছিল না। প্রথমত, সেদিন যে ওকে ফাঁসির সেলে পাহারাদার হিসাবে দায়িত্ব দেওয়া হবে তা ও আগে জানত না। ষড়যন্ত্রে অংশগ্রহণ করলে সে নিজের তাগিদে ওখানে দায়িত্ব নিত কিংবা জেল গেটের দায়িত্বে থাকত, তাহলে নকশালদের পালানোটা আরও সহজ হতো।

আর নকশালরাও এত বড় একটা ষড়যন্ত্র করে ভাগ্যের হাতে নিজেদের পালানোর ব্যবস্থা ছেড়ে দিত না। ওরা এমনভাবেই পরিকল্পনা করেছিল যে, ফাঁসির সেলে যেই পাহারায় আসুক না কেন তাকে দিয়েই ওরা সেলের গরাদ খুলে বাইরে বার হবে। তাই ওরা সিপাইদের সঙ্গে প্রচণ্ড ঘনিষ্ঠ হয়ে একেবারে বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার করত। যাতে তারা ঠিক দিনে ঠিক সময়ে ওদের গরাদ খুলে দিতে কোনও দ্বিধায় না পড়ে যায়। ওরা সিপাইদের বিশ্বাস অর্জন করে ফেলেছিল, আর তারই শিকার স্বয়ং অর্জুন। তবে, অর্জুনকে গ্রেফতার করে ওর থেকে আমরা প্রেসিডেন্সি জেলের প্রশাসনের ভেতরকার সব গলদের খবর পেয়ে গেলাম।

খবর আমরা আগেও পেয়েছিলাম কিন্তু এত ব্যাপকভাবে পাইনি। শুনে আমাদের মনে হলো ওটা কি জেলখানা না অতিথিশালা?

এবং অর্জুনের দেওয়া তথ্য থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে এলাম যে, ওখান থেকে নকশালদের না পালানোটা আশ্চর্যজনক। ওরা শুধু জেল গেটের বাইরে আমাদের পুলিশবাহিনী ও সি আর পি-র পাহারাদারদের ভয়েই এতদিন অপেক্ষা করেছিল। নয়ত, অনেক আগেই ওরা পালাতে পারত। সব শুনেও আমাদের কিছুই করার নেই, কারণ জেলের বাইরে পাহারার গাঁটগুলি আরও শক্ত করা ছাড়া জেলের ভেতরে আমাদের কিছুই করার নেই। ওটা আমাদের এক্তিয়ারের বাইরে। সম্পূর্ণভাবে জেল প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণে।

ক্যালেন্ডার মার্চ মাসে ঢুকে পড়েছে। এক তারিখ চলে গেল, দু'তারিখও চলে গেল, আমাদের নতুন কোনও অগ্রগতি নেই। শুধু টুকটাক সূত্র আসতে লাগল। সেগুলি কার্যকরী করে তুলবার মতো প্রয়োজনীয় রসদ

এল না। তিন তারিখে চাঁপাতলা ফার্স্ট বাই লেন থেকে লক্ষ্মণ সাউ নামে এক জেল পলাতক নকশাল আমাদের জালে ধরা পড়ল। পঁচাত্তরের মার্চ মাস থেকে লক্ষ্মণ মিশায় বন্দি হয়ে প্রেসিডেন্সি জেলে ছিল। ও একেবারে নিচুতলার ক্যাডার। ওর সাহায্যে নতুন করে কোনও আলোকপাত হলো না। তবে একটা ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত হলাম যে জেল পলাতকরা কোনও সংগঠিত ভাবে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেনি। বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্তভাবে যে যেদিকে পেরেছে নিজ নিজ দায়িত্বে আত্মগোপন করে আছে।

আসলে ওদের মূল সংগঠনই ছিন্নবিচ্ছিন্ন। সুতরাং সেই অসংগঠিত বাহিনী কি করে ওদের এক সূত্রে বেঁধে পরিকল্পনা মাফিক পলাতকদের আত্মগোপন করে থাকার জন্য আস্তানার ব্যবস্থা করবে?

আমাদের জন্য এটা একটা যেমন সুবিধার দিক, আবার অন্যদিকে অসুবিধারও দিক। সুবিধার দিক, এরা কোনও অভিজ্ঞ পরামর্শ ও সাহায্য পাবে না। সুতরাং ভুল করে ধরা পড়বে। অসুবিধার দিক, একজনকে গ্রেফতার করলেও তার থেকে অন্যজনের খবর নাও পেতে পারি কারণ ওদের ভেতর যোগাযোগের অভাব। এটা আমাদের সমস্যায় ফেলবে। আমরা কোনও ধারাবাহিক শিকল তৈরি করতে পারব না।

কোনও বড় দলকে গ্রেফতার করতে গেলে একের থেকে আর এক, এইভাবে ধারাবাহিকভাবে এগিয়ে যাওয়াই সহজ পদ্ধতি। অপরাধীরাও সেটা জানে। তাই দলের কোনও সদস্য গ্রেফতার হলেই ওরা শিকল ভেঙ্গে নতুন স্থানে চলে যায়। আর আমরাও চেষ্টা করি ওদের যোগাযোগ ছিন্ন করার আগেই ওদের আস্তানায় পৌঁছে যেতে।

সেদিক দিয়ে দেখলে, লক্ষ্মণকে গ্রেফতার করে আমাদের খুব বেশি লাভ হলো না। শুধু গ্রেফতারের তালিকায় একটা নতুন নামের সংযোজন হলো।

মার্চের একটার পর একটা করে দিন চলে যাচ্ছে, আর আমাদের প্রতীক্ষার সময় প্রলম্বিত হতে লাগল। স্বাভাবিকভাবেই, দুঃশ্চিন্তাও বাড়তে লাগল। দুঃশ্চিন্তা, এরা কোথায়? এবং করছেটা কি? তবে নতুন করে কোনও সংঘর্ষ বা খুন এরা করেনি।

আট তারিখে জেল সিপাই নিমাই সাহা শেঠ সুখলাল কারনানি হাসপাতালের বিছানায় মারা গেল। আমাদের অ্যাসিস্টেন্ট সাব ইন্সপেক্টর সুখরঞ্জন কর ওকে প্রচণ্ড অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করে এসেছিল। জেল গেটের ভেতর নকশালদের ছোঁড়া মলটভ ককটেলে ওর সারা শরীরই প্রায় পুড়ে

গিয়েছিল। নিমাই মারা যাওয়ার পর জেল পালানোর ঘটনায় মৃতের সংখ্যা দাঁড়াল চার। চারুবাবুর লোকেরা 'ভারতবর্ষে বিপ্লব' সমাধা করে নিমাইয়ের 'মৃত্যুর ঋণ' শোধ করে দেবে?

এগারো তারিখে খবর পেলাম ব্যারাকপুরে জেল পলাতক দু'একজন নকশাল আছে। কিন্তু ব্যারাকপুরে কোথায়? কোন বাড়িতে?

ব্যারাকপুরে আজিজুলের আগেও আস্তানা ছিল। মিঃ স্নেহানবিস নামে বঙ্গবাসী কলেজের এক কর্মচারীর বাড়ি ছিল আজিজুলের একসময়কার ঠিকানা। সেটা অবশ্যই নিশীথবাবুর যোগাযোগের ফসল। ওই বাড়িরই এক ঘরে আজিজুলের রোমান্টিক জীবনের এক অধ্যায়ের সূচনা ও পরিণতি।

সেটা উনসত্তর সালের শেষ কী সত্তর সালের প্রথম। 'খতম' রাজনীতির আমদানি তখনও ব্যাপকভাবে হয়নি। আজিজুলসহ অনেকেই তখনও আত্মগোপন করেনি বা তেমন পরিস্থিতিও হয়নি। অসুস্থ আজিজুল মিঃ স্নেহানবিশের বাড়িতে শুয়ে নিজের চিকিৎসায় মগ্ন। সেখানেই ওর সঙ্গে সুন্দরী, শিক্ষিতা মণিদীপা বকসির সঙ্গে আলাপ।

কি করে? মণিদীপা তখন আর এক তরুণ নকশাল নেতা দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রেমিকা। দু'জনের ভালবাসা গভীর। সবে যৌবনের সিঁড়িতে পা রাখা দুই তরুণ-তরুণীর অবাধ্য প্রেম যেমন হয় ওদের সম্পর্কও ছিল তেমনিই। মণিদীপা প্রায় প্রতিদিন দুপুরে দিলীপের ভবানীপুরের শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোডের বাড়িতে দিলীপের ঘরে সময় কাটাত। ওদের তখন আদর্শ ও প্রেম মিলেমিশে একাকার।

দিলীপের মনে 'বিপ্লবের' উত্তাল ঢেউ। সেই ঢেউয়ের বাহন হয়ে নিজের কমরেডদের প্রতি তীব্র ভালাবাসার উদয়। আজিজুল ব্যারাকপুরে মিঃ স্নেহানবিশের বাড়িতে শুয়ে আছে। তাকে পরিচর্যার জন্য তেমন কাউকে পাওয়া যাচ্ছে না, সেটা দিলীপ জানত। সেই খবরে দিলীপ ওরফে কানু ওরফে সুনীল সম্ভবত বিচলিত ছিল, ওর মনে হয়েছিল, আজিজুল তাড়াতাড়ি সুস্থ না হলে 'বিপ্লবের' ক্ষতি হবে। সে তাই এক সিদ্ধান্তে এল। এবং সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সে তার আত্মারও চেয়ে প্রিয় তার প্রিয়তমা মণিদীপাকে এক নিভৃত দুপুরে অনুরোধ করল, ব্যারাকপুরে গিয়ে সে আজিজুলকে পরিচর্যা করে যেন তাড়াতাড়ি সুস্থ করে তুলতে সাহায্য করে।

দিলীপের প্রস্তাব শুনে মণিদীপা প্রথমে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল। তার কারণ ব্যারাকপুরে মণিদীপা গেলে দিলীপের সঙ্গে প্রতিদিন সাক্ষাৎ সম্ভব নয়। সেটা মণিদীপার কাম্য ছিল না।

কিন্তু দিলীপের গম্ভীর মুখ দেখে মণিদীপা চুপ করে গেল। সে নিজেও ভাবল 'বিপ্লবের' প্রয়োজনে এক 'কমরেডকে' সুস্থ করে তোলা তারও দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। মণিদীপা দিলীপের প্রস্তাব মেনে নিল। দিলীপের 'বিপ্লবী' মন ও প্রয়াসের জন্য মনে মনে মণিদীপা গর্ব অনুভব করল। ভাবল, সে ঠিক লোককেই বেছেছে।

মণিদীপা 'বিপ্লবের' কাজে ব্যারাকপুরে যাতায়াত শুরু করল। আজিজুলকে তাড়াতাড়ি সুস্থ করে তোলার কাজে মনোনিবেশ করল। সেটা মণিদীপা আন্তরিকভাবেই 'বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের' অঙ্গ হিসাবে ভাবল।

ব্যস। আজিজুলের কাছে সুযোগ এসে গেল। সে নিজের সান্নিধ্যে একটা সুন্দরী, শিক্ষিতা, আদর্শবান গোটা যুবতীকে পেয়ে হাতে স্বর্গ পাওয়ার মতো আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠল।

অবশ্যই ধূর্ত আজিজুল তার উত্তেজনাকে প্রকাশ করল না। ধীরে কিন্তু স্থির লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য সে তার কথার তীর দিয়ে প্রথমেই মণিদীপার মন থেকে দিলীপের প্রেমকে উৎখাত করতে ব্রতী হলো।

কৃশ, ক্ষীণজীবি প্রায় চল্লিশ বছর বয়স্ক আজিজুলের একটাই অস্ত্র। তা হলো তার কথার জাল। ওকে দেখে, ওর কথা শুনে একটা সময় আমার মনে হয়েছিল, এই লোকটা বিপ্লব-টিপ্লবের খেলা না খেলে যদি চিটিংবাজি ব্যবসা করত তবে বহুদূর পর্যন্ত 'উঠতে' পারত। কারণ প্রতারকদেরও একটাই অস্ত্র, সেই 'কথা'। তাছাড়া সমাজে যারা কৃশকায়, দুর্বল লোক, যারা শক্তি ও সামর্থ্যে অন্যের চেয়ে পিছিয়ে পড়ে তারা তখন স্বাভাবিকভাবেই 'কথা বলে' অন্যের উপর আধিপত্য করতে চায়। আজিজুলও সেই পথের পথিক।

নকশালদের দলের ভেতর নেতা হওয়ার যে কটা পন্থা ছিল, তার মধ্যে 'বড় বড় আদর্শ ও প্রতি কথায় চারুবাবুর বাণী উচ্চারণ করারও একটা অলিখিত পথ' ছিল। আজিজুল এই পথটা আঁকড়ে ধরেছিল। হো চি মিনের মতো দাড়ি রেখে, চোখ দুটো ভাবালু করে সে তার আশেপাশের কচিকাঁচা কিশোর-কিশোরীদের 'বিপ্লবের স্বপ্ন' দেখিয়ে 'নেতা' হয়ে গিয়েছিল। মার্কসবাদের সঙ্গে তার সম্পর্ক কতদূর সেটা বিশ্লেষণ করার লোক কোথায়?

মণিদীপাকে অপ্রত্যাশিত ভাবে নিজের নাগালে পেয়ে সে একইভাবে কথার জাল দিয়ে তার মনের ভিতর নিজের আসন সাজাতে লাগল। প্রথমদিকে কথার বিষয়বস্তু আবশ্যিকভাবেই, 'বিপ্লব'। কারণ মণিদীপার কাছে 'বিপ্লবের' বিষয়বস্তুটা ছিল সহজেই গ্রহণযোগ্য। আর হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়ার রঙমহল

গ্রামের কৃষিজীবী পরিবারের গ্রাম্য যুবক, পরবর্তীকালে ভাগ্যান্বেষণে কলকাতায় এসে বেকবাগান রোডে সাময়িক যার বাস সেই আজিজুলের কাছে 'বিপ্লব' ছাড়া অন্য কোনও বিষয়বস্তুও ছিল না, যা দিয়ে বৌবাজারের লালবিহারী ঠাকুর লেনের উচ্চশিক্ষিত পরিবারের ডাক্তারের কন্যা যুবতী মণিদীপাকে আয়ত্ত করা যায়। সে তাই নিয়ম করে মণিদীপার মনে 'বিপ্লবের' মায়াজাল বিস্তার করতে লাগল। মণিদীপার মনে আত্মত্যাগের দীপ জ্বালাতে লাগল।

আজিজুলের কথার ভিতর মণিদীপা কি বুঝেছিল তা মণিদীপাই জানে। সম্ভবত সে বুঝেছিল, দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের থেকেও আজিজুল বড় 'বিপ্লবী নেতা'। আর তাই তাকে সুস্থ রাখা 'বিপ্লবের' জন্য অত্যন্ত জরুরি। আর তাকে 'বিপ্লবের প্রেরণা' যোগাতে দরকার তার কাছে আত্মসমর্পণ। সে তার এতদিনের প্রেমকে ত্যাগ করে 'বিপ্লবের প্রয়োজনে' আজিজুলের কাছে নিজেকে সঁপে দিল।

মণিদীপা ও আজিজুলের বিয়ের খবর শুনে মণিদীপার বাড়ির লোকজনের মতো নকশালদের দলেরও বহু সদস্য চমকে উঠেছিল। কারণ, কেউ খুঁজে পেল না কোন আকর্ষণে মণিদীপার মতো তরুণী আজিজুলকে গ্রহণ করল। আজিজুলের মধ্যে কোনও নারীকে আকর্ষণ করার কোনও বস্তুই ছিল না। মণিদীপা কিন্তু 'বিপ্লবী আবেগেই' আত্মত্যাগ করল। তবে ভারতবর্ষের 'বিপ্লবের' নামে আজিজুলের একটা বড় 'বিপ্লব' সম্পন্ন হলো।

ব্যারাকপুরে জেল পলাতক নকশালের দু'একজন আত্মগোপন করে আছে এখবর শুনে প্রথমেই আজিজুলের কথা মনে পড়ল।

আজিজুল যে তার পুরনো আস্তানায় থাকবে না তা জানা আছে। এত বোকামি সে করবে না। খবর নিলাম, ব্যারাকপুরের কোনও এক নকশাল যুবক প্রেসিডেন্সি জেলে ছিল, ইদানীং মুক্তি পেয়ে বেরিয়েছে। এই খবর পেতে বেশি বেগ পেতে হলো না। একটা ব্যাপার আমরা লক্ষ্য করেছিলাম, চারুবাবুপন্থী নকশালরা তাদের 'খতমের লাইনের' চরম বিপর্যয়ের জন্য জনগণ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পর তারা আর নতুন করে কারও বাড়িতে আত্মগোপনের জায়গা পাচ্ছে না। অবিশ্বাস আর ভয়ে কোনও মানুষ তাদের আর পছন্দ করছে না। সুতরাং তারা পুরনো যোগাযোগের ওপর আস্থা রাখা ছাড়া অন্য কোনও উপায়ও খুঁজে পাচ্ছে না এবং সেই যোগাযোগের গিঁটগুলিও আলগা হয়ে এসেছে।

ব্যারাকপুরের দীপক চট্টোপাধ্যায় ওরফে কমল একাত্তর সাল থেকে প্রথমে বিচারাধীন বন্দি হিসাবে পরে মিশায় বন্দি হয়ে পঁচাত্তর সালের ফেব্রুয়ারি

পর্যন্ত প্রেসিডেন্সি জেলে ছিল। আজিজুল সত্ত জেলে বন্দি অন্য নকশালদের সঙ্গে তার যোগাযোগ থাকার সম্ভাবনা একশ ভাগ।

বারো তারিখ রাতে আমাদের সাব-ইন্সপেক্টর অমিত মজুমদারের নেতৃত্বে আরও ক'জন জুনিয়র অফিসার সমেত একদল কনস্টেবলকে পাঠালাম দীপকের বাড়িতে হানা দিতে।

তের তারিখ ভোরে অমিতরা ব্যারাকপুর থেকে লালবাজারে ফিরে এসে লালবাজারে আমার কোয়ার্টারে ওদের রাতের অভিযানের ফল জানাতে কলিং বেল টিপল।

আমি বেরিয়ে এলাম। দরজা খুলেই প্রথমে দেখলাম অমিতের শুকনো মুখ। রাত জেগে ওদের অভিযান যে ব্যর্থ হয়েছে তা ওদের মুখে আর শরীরে লেখা। তা মুহূর্তে পড়ে নিতে আমার অসুবিধা হলো না।

আমি ওকে প্রশ্ন করার আগেই ও বলল, "কাউকে পেলাম না স্যার, এমনকী দীপককেও নয়।"

ওর কথা শুনে আমি নিজেই ধন্ধে পড়ে গেলাম। কারণ আমার কাছে নিশ্চিত খবর ছিল যে দীপকের বাড়িতে কাউকে না কাউকে পাওয়া যাবে। অথচ অমিতরা ব্যর্থ হয়ে ফিরে এল, তাতে আমার সূত্রের ওপর অবিশ্বাস জন্মাল। কিন্তু যে সূত্র থেকে আমার খবর এসেছিল সে যে এমন বাজে খবর দেবে তাতেও মন সায় দিল না।

আমি তাই খানিকটা আশ্চর্য হয়ে অমিতকে জিজ্ঞাসা করলাম, "কাউকে পেলে না? কিচ্ছু না?"

অমিত তার মুখে ব্যর্থতার করুণ অভিব্যক্তি নিয়ে বলল, "না স্যার, তেমন কাউকে পেলাম না। যখন খালি হাতে ফিরে আসব ভাবছি, তখন ভাবলাম, একেবারে খালি ফিরব, তাই ওই বাড়ি থেকে একটা বুড়ো লোককে তুলে এনেছি, ওকে জিজ্ঞেস করে যদি দীপকের খোঁজ পাওয়া যায়।"

"কোথায় বুড়োটা?" জানতে চাইলাম।

"আমাদের ডিপার্টমেন্টে বসিয়ে রেখেছি।" অমিত জানাল।

"চল, গিয়ে দেখি, কাকে ধরে এনেছ।" আমি অমিতকে নিয়ে আমার কোয়ার্টার থেকে নিচে নেমে আমাদের দপ্তরের দিকে চললাম।

ফাল্গুনের শেষ, আর ক'টা দিন বাকি আছে চৈত্রের প্রখরে ঢুকে যাবে বাংলাদেশ। ভোরের হাওয়ায় এখনও রয়েছে সামান্য শীতের টান, শিশিরের ভেজা ভাব। এসব ভোরে প্রত্যেকের মনেই কেমন যেন আবছা মনকাড়া একটা উদাসী উদাসী প্রেম জাগে। প্রকৃতিকে বড় আপন মনে হয়।

কিন্তু হায়রে, লালবাজারের ভেতর বিরাট বাঁধান চাতালে প্রকৃতি কোথায়! টবে লাগান দু'চারটে ফুলগাছের পাতার ফাঁকে হাওয়া কখনও ঢুকে পরেই বুঝে যায় সে ভুল জায়গায় চলে এসেছে। পালায়। বোঝে, এ বড় কঠিন ঠাঁই, আইন আর শাসন ছাড়া এর চৌহদ্দিতে অন্য কিছুর স্থান নেই।

বেশির ভাগ ভোরেই লালবাজারে একই চিত্র। হই-হুল্লোড়, চিৎকার চেঁচামেচি নেই, নেই কর্মব্যস্ততা। সে সব শুরু হয় সকাল ন'টা দশটা থেকে। এখন রাতজাগা সিপাইরা ডিউটির পর তাদের বাড়ি বা ব্যারাকে ফেরার জন্য কিছুটা উদগ্রীব। তাদের ক্লান্ত চলাফেরা।

লুঙ্গির ওপর আমার গায়ে একটা পাঞ্জাবি চাপানো। অমিতদের নিয়ে আমি আমাদের দফতরে অমিতের ধরে আনা এক বুড়োকে দেখতে চলেছি। ওরাও ক্লান্ত পায়ে আমার সঙ্গে হেঁটে চলেছে।

কোয়ার্টার থেকে আমার দফতরের দূরত্ব মিনিট তিনেক। ঘড়ির কদম ফেলার আগেই আমরা পৌঁছে গেলাম আমাদের প্রায় ফাঁকা দফতরে। রাতজাগা ক'জন কনস্টেবল ছাড়া কেউ নেই।

কি জানি কাকে দেখব, কিছু না পেয়ে কাকে গ্রেফতার করে এনেছে অমিতরা এই কৌতূহল নিয়ে আমি প্রশ্ন করলাম, "কোথায় তোমার বুড়োটা, অমিত?"

অমিত ডান হাতটা দিয়ে একটা নির্দিষ্ট দিক দেখিয়ে বলল, "ওই তো স্যার।"

দেখলাম পায়জামা, পাঞ্জাবি পরিহিত গায়ে একটা নোংরা মতো আলোয়ান জড়িয়ে একটা লোক মেঝেতে বসে আছে। লোকটা তার রোগা দু'পায়ের হাঁটুর মাঝখানে তার মাথাটা গুঁজে রেখেছে।

আমি ওর দিকে দু'পা এগিয়ে বললাম, "দেখি ভাই আপনার মুখটা।" লোকটা তার দু'পায়ের ফাঁক থেকে মাথাটা তুলে ভাবলেশহীন দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল। আমি ওকে দেখেই চমকে উঠলাম।

এ তো আজিজুল। সেই হো চি মিন দাড়ি, কোটরাগত চোখ, উঁচু চোয়াল। ঝুলে পরা কণ্ঠনালী। কপালের সামনের দিকে টাক। বাঁ কানের উপরের অংশ সুগঠিত নয়।

আমি পাশে দাঁড়ানো অমিতকে জড়িয়ে ধরলাম। আমার উচ্ছ্বাস দেখে অমিত ব্যাপারটা বুঝতে পারেনি, কেন আমি ওকে বুকে চেপে ধরেছি। ও তাই কিছুটা হতভম্ব।

আমি অমিতকে আমাদের দফতরের বাইরে লম্বা ঝুল বারান্দায় টেনে

নিয়ে এসে বললাম, "তুমি দারুণ কাজ করেছ অমিত, ওই বুড়োটাই আজিজুল! জেল-পালানোর একটা মাথাকেই তুমি ধরে এনেছ!"

আমার কথা শোনার পর অমিত সহ বাকি দলটার সবার মুখে হাসি ফুটল।

আমার মুখেও স্বাভাবিকভাবে হাসি। জেল-পালানোর অন্যতম প্রধান আসামি আমাদের হাতে। একটু খুশি তো হবই। মনে মনে আমি আমার দূতকে ধন্যবাদ দিলাম। খবরটা ও ঠিকই দিয়েছে। ওর প্রতি আমি আমার কৃতজ্ঞতা অনুভব করলাম।

অমিতদের কাজে খুশি হয়ে আমি তখনকার মতো ওদের ভাল নাস্তা খাওয়ানোর ব্যবস্থা করলাম। আজিজুলের জন্যও। আমি কোয়ার্টারে ফিরে এলাম।

পরে এসে আজিজুলকে নিয়ে বসব। জিজ্ঞাসাবাদের ঝুলি নিয়ে। নাস্তা খাওয়ার পর আজিজুলকে সেন্ট্রাল লকআপে পাঠানোর নির্দেশ দিয়ে এলাম। কোনও কনস্টেবল বা অফিসার কোনওদিন আজিজুলের একটা চুল টেনেও দেখেনি। ভয়ে। চুল টানলেও যদি আজিজুলের মৃত্যু হয়, তখন খুনের দায়ে সে কাঠগড়ায় উঠে যাবে। এতটাই ক্ষীণজীবী আজিজুল। সত্তরের জুনের পঁচিশ তারিখ যখন আজিজুল পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুলিশের হাতে প্রথম গ্রেফতার হয় তখনও ওর গায়ে হাত দিয়ে কেউ জ্বর মাপেনি। তারপর সতেরই জুলাই থেকে আজিজুল জেলে বন্দি। পালানোর আগে সে প্রেসিডেন্সির 'পয়লা বাইশ' সেলে থাকত।

দশটার সময় দফতরে ফিরে এসে আজিজুলকে আমাদের লালবাজারের সেন্ট্রাল লকআপ থেকে ডাকিয়ে নিয়ে এলাম। চা সিগারেট দিলাম। সরু কাঁপা কাঁপা হাতে ও সিগারেট টানতে টানতে চা খেতে লাগল। আমি ওর হাতদুটোর দিকে তাকিয়ে ভাবলাম, এই হাত দিয়ে সে কী করে জেলসিপাই রামযুধ সিংহের মাথায় পাঁচ কিলোগ্রামের বাটখারা দিয়ে মারল। রামযুধ সেদিনই জেল হাসপাতালে মারা যায়।

মানুষ যখন ক্ষিপ্ত, উন্মাদ হয়ে যায় তখন বোধহয় নিজের শারীরিক সক্ষমতা বাড়িয়ে 'অসম্ভব' কাজ করতে পারে। ওরা এটা 'বিপ্লবী জেদ' নামে অভিহিত করবে। ওদের 'বিপ্লবী জেদ' মানে নিরপরাধ মানুষকে খুন করা। ওদের 'বিপ্লবী জেদ' মানে হেমন্ত বসু, বিচারপতি কিরণলাল রায়, উপাচার্য গোপাল সেনকে খুন করা। এরকম 'বিপ্লবী জেদ' আমরা পঞ্জাবে, আসামে কিংবা কাশ্মীরে মুজাহিদদের মধ্যে দেখেছি।

'বিপ্লবী জেদ' একটা সারা জীবনের প্রক্রিয়া। কখনও সে আদর্শগত ক্ষেত্রে আপোষ করে না। আরামের আশ্রয় খুঁজে বেড়ায় না। 'শত্রুর' কাছে আত্মসমর্পণ করে নিজেকে বিকিয়ে দেয় না।

অজিজুলের চা খাওয়া শেষ। এবার ওর থেকে কথা আদায় করতে হবে। ষড়যন্ত্রের অন্যতম মূল কারিগর সে। বিপ্লবের আগুন নাকি ওর বুকে দাউ দাউ করে জ্বলে! কিন্তু আমার সামনে কাচুমাচু ভাবে ভাবলেশহীন মুখ নিয়ে বসে আছে।

ঠিক করলাম, ওর নির্লিপ্তভাব মুহূর্তে ভয়ের ভাবে নিয়ে আসতে হবে, নয়ত ওর মুখ থেকে সত্যি কথা আদায় করা যাবে না।

আমি চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে প্রথমেই জোরে ধমক দিয়ে বললাম, "যা জানিস তাড়াতাড়ি বল। অন্যরা কে কোথায় আছে।"

আমার রুদ্রমূর্তি দেখে ওর নির্লিপ্ত মুখ চমকে উঠে ভয়ার্ত হয়ে গেল। বিপ্লবের দাউ দাউ আগুন উধাও। মুখটা পাথরপোড়া ছাইয়ের মতো সাদা। কাঁপা হাত দুটো জড়ো করে ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে বলল, "আমাকে মারবেন না রুনুবাবু, আমি যা জানি বলছি।"

আমি আমার আগুন-ধরা মুখের আড়ালে মনে মনে হেসে উঠলাম। হাসির কারণ, ওকে মারব কোথায়। এক ঘা মারলেই ও মরে যাবে। খুনের দায়ে নিজে মরব নাকি! এমনিতেই ওর কমরেডরা আমার বিরুদ্ধে মোট আঠারোটা মামলা করেছে। সেগুলি আদালতে ঝুলছে। ওকে মেরে মামলার সংখ্যা কী উনিশে নিয়ে যাব? এত বোকামি কী আমরা করব? তাছাড়া নখদন্তহীন, কিছু বুলিসর্বস্ব, ছিন্নমূল লোকেদের অযথা কঠিনভাবে প্রত্যাঘাত করতে যাব কেন?

ওরা মনে মনে নিজেদের যতই সুউচ্চ পর্বতের চূড়াতেই বসাক না কেন, আমরা ওদের একটা ফাঁপা ক্যানেস্তারা ছাড়া কিছুই ভাবি না। আমাদের চিন্তা, ওদের করা খুন, জখম, সংঘর্ষগুলি থামানো ও সেইসব মামলা ঠিক মতো সাজিয়ে ওদের শাস্তি দেওয়া।

প্রেসিডেন্সি জেল ভাঙ্গার ঘটনা এর থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। ওখানেও ওরা দু'জন জেল সিপাই খুন করেছে, আহত করেছে দশ জনকে। আমাদের লক্ষ্য ওদের গ্রেফতার করা। মামলা সাজানো। শাস্তি দেওয়া।

আজিজুল আমার চোখের দিকে তাকিয়ে কোনওমতে বলল, "আমি আর একটু চা খাব।"

আমি চা আনার নির্দেশ দিয়ে ওকে বললাম, "চা আসছে, বলতে শুরু কর। প্রথমে বল, কে কোথায় আছে।"

আজিজুল শূন্য দৃষ্টি নিয়ে মিনমিন করে উত্তর দিল, "বিশ্বাস করুন, এখন কে কোথায় আছে, আমি কিছুই জানি না। ত্রিবেণীতে প্রদ্যুতের বাড়িতে প্রথম দিন রাত কাটিয়ে আমরা হুগলির একটা জায়গায় যাই, কিন্তু নিশীথদারা আমাকে ফেরৎ পাঠায় হাতের চিকিৎসার জন্য। আমি বাধ্য হয়ে ব্যারাকপুরে ফিরে দীপকের বাড়িতে আশ্রয় নিই, আর সেখান থেকেই—" আজিজুল ওর গায়ের আলোয়ানটা সরিয়ে ওর ব্যান্ডেজ বাঁধা বাঁ হাতটা দেখাল। বলল, "'গুলি লেগেছিল।"

"হুঁ।" ব্যান্ডেজের অবস্থানটা দেখলাম। গুলি আর বেঘৎখানি ভেতরের দিকে লাগলেই ওর দেহ স্বদেশের সঙ্গে মোমিনপুরের পোস্ট মর্টেমের টেবিলে গিয়ে উঠত।

অন্য কোনও পলাতক আসামিদের কোনও খোঁজ ওর কাছে নেই শুনে প্রচণ্ড রাগ হলো। ধমকে উঠে বললাম, "খোঁজ নেই মানে, নিশ্চয়ই আছে, বলতেই হবে।" আমার থমথমে মুখের চেহারা দেখে আজিজুল প্রায় কেঁদে ফেলল। বলে উঠল, "বিশ্বাস করুন, আমি জানি না।"

বিশ্বাস করব? এদের? হাসলাম মনে মনে।

চা দিয়েছে। আজিজুল চায়ের কাপ তুলে নিয়েছে। ভাবছি, কি উপায়ে এর থেকে পাকা খবর বার করা যায়। একে হাল্কা বা ভারী কোনও ট্যাবলেটই খাওয়ানো যাবে না। বদহজম হয়ে যাচ্ছেতাই ব্যাপার হবে। ঠিক করলাম, ও আগে কি বলে, সেটা শুনি। তারপর অবস্থা বুঝে পদক্ষেপ।

"ঠিক আছে, কি জানিস, বল।"

আজিজুল ধীরে কিন্তু প্রায় গল্প বলার মতো বলতে শুরু করল, কবে ওরা প্রেসিডেন্সিতে ওদের পার্টির জেল কমিটি তৈরি করেছে, সেই কমিটিতে কে কে ছিল। তাদের কাজ কি ছিল, কবে থেকে ওরা জেল থেকে পালানোর ষড়যন্ত্র শুরু করেছে। কে কে ওদের মদত দিয়েছে। সব। অবশ্যই ওর মতো করে।

আমরা যে কাঠামোটা ঠিক করেছিলাম, ওর কথা শুনে তাতে কিছু কিছু জায়গায় খড় লাগাতে লাগলাম। মূর্তির শরীর খানিকটা ফুটে উঠল। ওর কথা কষ্টিপাথরে পরীক্ষা করতে হবে। কতটা সত্য, যাচাই করে দেখতে হবে। ওকে পুরোপুরি বিশ্বাস করার কোনও কারণ নেই।

প্রায় ঘণ্টা দুয়েক ওর কথা লিপিবদ্ধ করে ওকে আমাদের সেন্ট্রাল লকআপের ডাক্তার মিসেস প্রতিমা চট্টোপাধ্যায়ের কাছে পাঠিয়ে দিলাম। চিকিৎসার জন্য। ওখান থেকে আদালতে যাবে।

আদালত থেকে ফিরলে, আবার জেরা করব। আমরা সবাই এবার হিসাব

মেলাতে বসব। হিসাব মিলবে কি? কে জানে। হিসাব মেলা ভীষণ কঠিন। কিন্তু মেলাতেই হবে। আমাদের চাকরির কাছে সেটাই দাবি।

আমাদের মধ্যে একটা অলিখিত নিয়ম আছে যে, আমরা আমাদের সোর্স পরস্পরের থেকে লুকিয়ে রাখব, এবং কেউ কারও সোর্স জানার চেষ্টাও করব না। সেই সোর্স ঠিকমতো কার্যকরী রাখতে দফতর থেকে পাওয়া অর্থ ছাড়াও অনেক সময় নিজের পকেট থেকে টাকা খরচ করতে হয়।

এ নিয়ে যে একটা প্রচ্ছন্ন দুর্নীতিও হয় তাও সত্যি। এমন অনেক অফিসার আছেন যাঁরা দফতর থেকে নিয়মিত 'সোর্সমানি' নেন কিন্তু সেই টাকা না কোনও সোর্সকে দেন না কোনও সোর্স তৈরি করেন। উল্টে সেই টাকাটা নিজের পকেটস্থ করেন।

স্পেশাল ব্রাঞ্চে এমন একজন অফিসারকে দেখেছিলাম, যিনি বেশ মোটা অঙ্কের 'সোর্সমানি' নিতেন কিন্তু তার থেকে একটা পয়সাও কাউকে দিতেন না। তার কোনও সোর্সই ছিল না। অথচ তার ওপর দায়িত্ব ছিল বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির দৈনন্দিন কার্যকলাপের ওপর নজর রাখা ও আগাম দফতরে জানান। সেই খবর রাখার জন্য তার অধীনে সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলির ভেতর সোর্স থাকার কথা। ছিল, তা কাগজে কলমে। সেই ভিত্তিতে তিনি টাকা হস্তগত করতেন। কিন্তু তিনি দফতরে খবর দিতেন কি করে?

দিতেন। স্পেশাল ব্রাঞ্চে প্রতিদিন খুব ভোরে কলকাতায় প্রকাশিত প্রতিটি দৈনিক পত্রিকা আসে। সেই অফিসার প্রতি ভোরে অফিসে এসেই ওই কাগজগুলি প্রথমে পড়ে নিতেন এবং সেই পত্রিকার খবর অনুযায়ী একটা রিপোর্ট তৈরি করে দফতরে জমা দিয়ে অফিস থেকে চলে যেতেন। অর্থাৎ তারপর থেকে সারাদিন ছুটি। ভাব দেখাতেন, চললেন, পরের দিনের জ্যান্ত খবর যোগাড় করতে।

খবর তো সবাই আনে। প্রশ্ন, সেই খবরের মূল্য কতখানি? যে খবরে আমাদের কোনও কাজ হয় না, সেই খবর মূল্যহীন। ব্যারাকপুরের খবরটা আমাকে ভালই দিয়েছিল। আজিজুল আমাদের গারদে। সেই সূত্রই চোদ্দ তারিখে আর একটা খবর দিল।

সেই খবরের ভিত্তিতেই গ্রেফতার করলাম এন্টালির সুরেশ সরকার রোডের গজপাল সিংকে। একাত্তর সালের এপ্রিলে ওকে আমরা প্রথম গ্রেফতার করি। তখন সে বিচারাধীন হিসাবে প্রেসিডেন্সি জেলে ছিল। তিয়াত্তরের জুন থেকে মিশায় বন্দি হয়ে তেইশ চুয়াল্লিশ সেলে আটক।

গাট্টাগোট্টা গজপালকে কিছু ট্যাবলেট খাওয়ানো হলো, কিন্তু বিশেষ কোনও

কাজে এল না। সামান্য কিছু নতুন সূত্র। আজিজুল আর গজপালের উত্তরে একটা জিনিস পরিষ্কার পলাতক আসামিরা কেউ স্থায়ী আত্মগোপনের জায়গা পাচ্ছে না। ফলে নিজেরাই আতঙ্কে ছুটে বেড়াচ্ছে।

জেলের ভিতরে বসে ওরা বাইরের 'বিপ্লবের' যে গল্প শুনতো তার ছিটেফোঁটারও অস্তিত্ব না দেখতে পেয়ে ওরা দিশেহারার মতো নিজেদের পিঠ বাঁচাতে ব্যস্ত।

জেলে থাকাকালীন যে কোরাস ওদের প্রাণ চঞ্চল রাখতো তা বাইরে তার ভাষা পাল্টে একক সঙ্গীতে রূপান্তরিত। উত্তাপ পরিণত আতঙ্কে। আজিজুল আর গজপালকে আবার জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। পুনঃ 'জেলবিপ্লবী' ভব।

জেলে গিয়ে আজিজুল আবার ওর অভ্যাস মতো বড় বড় বিপ্লবের কথা বলতে শুরু করল। কিন্তু কে ওর কথা শুনবে, কারণ সবাই বুঝে গেছে, ওদের জন্য কোনও জলাশয় অপেক্ষা করে নেই, যেখানে ওরা মাছ হয়ে খেলতে পারবে।

জলাশয়ই যদি থাকবে, তবে, আজিজুলের মতো আগুন খাওয়া বিপ্লবী জেল ভেঙ্গে পালিয়ে আবার মাত্র পক্ষকালের মধ্যেই কেন জেলে ফেরৎ এল? কিন্তু আজিজুলের মতো চারুবাবুর শিষ্যরা এই বাস্তবতা স্বীকার করবে না। স্বীকার করবেই বা কি করে? স্বীকার করলেই তো ওদের হাত থেকে তথাকথিত বিপ্লবের দাদাগিরি চলে যাবে। আর সেটা চলে গেলে বাকি জীবন চলবে কি করে? ওটাই তো একমাত্র সম্পদ। যা ভাঙ্গিয়ে ভাঙ্গিয়ে জীবনের বাকিটা সময় দাদাগিরি করে কাটাতে হবে। শ্রম ছাড়াও পাকস্থলীর রসদ যোগাড় হবে।

তিরিশ তারিখ সন্ধ্যেবেলা রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার মানিকতলা বাসডিপোর কন্ট্রাক্টর বীরেন্দ্র পাল চৌধুরিকে গ্রেফতার করলাম। নয়ই এপ্রিল গ্রেফতার হলো স্বরাজ চৌধুরি ও বিনয় চৌধুরি নামে লেক বাস ডিপোর কন্ট্রাক্টর। এরা ডাঃ দেওদর রহমন রোডে বাড়িতে বসে প্রেসিডেন্সি জেল ভাঙ্গার সহায়তার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল।

আজিজুল সহ অন্যদের গ্রেফতার করে একটা নিশ্চিত খবর আয়ত্তে এনেছি যে, জেলের বাইরে থেকে ভেতরে বোমার মশলা, পাইপগান, গুলি এবং চিঠিপত্র আদানপ্রদান করত একটা যুবতী মেয়ে। সে শিয়ালদহ অঞ্চলের এক ডাক্তারের কন্যা। সে তার নকশাল ভাইয়ের সঙ্গে জেলখানায় সাক্ষাৎ করতে প্রতি শনিবার যেত এবং আদানপ্রদানের কাজটা নিপুণভাবে সম্পন্ন করত।

ওর বাড়ি আমরা চিনি। ডেন্টাল কলেজ সংলগ্ন। ওর সম্পর্কে খোঁজ নিয়ে ওর পরিচয়ও আমরা পেয়ে গেছি। ওই অঞ্চলের যুব কংগ্রেসের এক নেতা আমাকে সব খবরাখবর যোগান দিচ্ছে। ওই নেতাকেই আমি মাস ছয়েক আগে ডেন্টাল কলেজে হামলার জন্য গ্রেফতার করে কড়া ধাতের ট্যাবলেট খাইয়েছিলাম। তারপর জামিনে ছেড়ে দিয়েছি, সেই থেকে সে আমার ওই অঞ্চলের চোখ।

সেই চোখ জানিয়েছে, ওই যুবতী মেয়েটি উদ্ধত, একগুঁয়ে এবং ভ্রষ্টা। বিশ বাইশ বছর বয়সেই সে অন্তত দশ বারোজন ছেলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে প্রেম করেছে। যৌবনের কুঁড়ি আসার পর থেকে সে প্রেমহীন একটা দিনও কাটায়নি। না কাটাক। তাতে আমার কোনও প্রয়োজন নেই। আমার দরকার ওকে। আসামি হিসাবে। নজরদারি রেখেছি। বাড়িতে মাঝে মধ্যে আসছে। কয়েক মিনিট পর উধাও। রাত্রিযাপন অন্য আস্তানায়।

আজিজুলকে গ্রেফতার করার পর আর যা সাফল্য তা খুব বড় নয়। বড় কোনও নেতাকে জালে আটকাতে পারিনি। ভাবলাম, ডাক্তারের এই কন্যাকে গ্রেফতার করতে পারলে যদি অন্য বড় নেতার হদিস পাওয়া যায়, সেই চেষ্টা করতে দোষ কি? ওকে গ্রেফতার করার জন্য ঝাঁপ দিলাম।

আমার ওই চোখ জানাল, বর্তমানে যুব কংগ্রেসেরই এক নেতার সঙ্গে ওই মেয়েটি প্রেমে মশগুল। প্রথমে আমি শুনে খানিকটা আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম। অদ্ভুত ধরনের এই সম্পর্ক। নকশাল মেয়ে কি না যুব কংগ্রেসের কর্মীর সঙ্গে প্রেম করছে? যাদের ওরা খিস্তি খেউড় না করে জলস্পর্শ করে না, তাদেরই নেতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা। আদর্শের কি রূপ! চারুবাবুপন্থীদের দ্বারাই যে এটা সম্ভব তা হৃদয়ঙ্গম করতে দু'তিন মিনিট সময় লাগল। ঠিক এই রকম সম্পর্ক পরে আরও অনেক দেখেছি।

চোখ জানিয়েছে ওই যুব কংগ্রেসী নেতাটি কোথায় কখন থাকে। জরুরি অবস্থায় কংগ্রেসীদের গায়ে হাত দেওয়া মানে সোজাসুজি আগুনে নিজেকে সঁপে দেওয়া। দাপটের তেজে আমরাও লালবাজারে স্বাভাবিক কাজ করতে পারি না।

ঠিক করলাম, যা হয় হবে, ওই যুব কংগ্রেসী নেতাকে লালবাজারে 'তুলে' নিয়ে আসব। ওর থেকেই ওর নকশাল প্রেমিকার হদিস বার করব। নরমে না হলে গরমে। তবে যুব কংগ্রেসীদের জন্য যে এলাচ দারুচিনির দরকার হয় না তা অভিজ্ঞতা দিয়েই জানি। ওদের আস্ফালন অন্যত্র।

এগারোই এপ্রিল দুপুরবেলা ওই নেতাকে ধর্মতলা অঞ্চলের এক অফিস থেকে 'তুলে' সোজা লালবাজারে নিয়ে এলাম।

আমার সাদা বা কালো যে রূপেরই প্রচারিত নামের জন্য হোক, প্রেমিকপ্রবর এক কথাতেই তার প্রেমের কথা স্বীকার করে নিল। ট্যাবলেট খাওয়ানোর ঝামেলা এড়ানো গেল। এবার দ্বিতীয় ধাপ, ওর সাহায্যে ওর প্রেমিকাকে আমাদের মুঠোয় আনা।

জানতে চাইলাম, "এখন কখন কখন তোর সঙ্গে দেখা হয়?"

বলল, "ঠিক নেই। বেশির ভাগ সময় ও যোগাযোগ করে নেয়। কোনও জায়গা বলে, আমি সেখানে চলে যাই।"

"কবে শেষ দেখা হয়েছিল?"

"পরশুদিন সন্ধেবেলা।"

"আবার কবে দেখা হবে?" জিজ্ঞাসা করলাম।

"এখনও ঠিক হয়নি। ও কোথায় থাকে তাই আমি জানি না।"

যুবকটি যুবকই। ওদের বহু প্রৌঢ় নেতার মতো 'যুব' কংগ্রেসী নয়। ওর কথা এবং শরীরের লেখা পড়তে লাগলাম। আপাত বিশ্বাসযোগ্য। কিন্তু যতই ওর কথা বিশ্বাসযোগ্য হোক না কেন, ওকে লাগামছাড়া ছেড়ে দেওয়া যাবে না। ওকে ধরে রেখেই ওর প্রেমিকাকে টেনে আনতে হবে। বিশ্বাস করে ছেড়ে দিলে ও কি করবে তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। যতই হোক, আমরা যে ওর সাহায্যে ওরই প্রেমিকাকে গ্রেফতার করতে চাইছি। প্রেমিকার প্রতি ওর তো দুর্বলতা থাকবেই। আর সেই দুর্বলতা থেকে ও যদি ওর প্রেমিকাকে আমাদের প্রয়াসের কথা জানিয়ে দেয় তবে প্রেমিকা নিশ্চয়ই আমাদের জন্য অপেক্ষা করে থাকবে না। সুতরাং ওর প্রেমিকাকে হস্তগত না করে ওকে আমরা ছাড়তে পারি না।

জানি, মেয়েটি দুপুর নাগাদ মাঝে মধ্যে বাড়ি আসে। সম্ভবত, টাকা পয়সার জন্য। সেটা নিয়েই সে আবার ছুট।

এখানেই একটা সুযোগ নিতে হবে। যুবকটিকে বললাম, "ওর বাড়িতে একটা ফোন কর, দেখ বাড়িতে এসেছে কিনা।" ফোন করল।

উল্টো দিকে যে ফোন ধরেছে তাকে যুবকটি বলল, "মাসীমা, আমি বলছি। ও কখন আসবে?"

উত্তর শুনতে পেলাম না। ফোনের মুখটা ডান হাতের তালু দিয়ে চেপে ধরে আমাকে বলল। মা ধরেছেন। কি বলব?

বললাম, "জিজ্ঞেস কর, আজ আসবে কি না। আসলে কখন? বল, তোর ওকে ভীষণ দরকার, জরুরি।"

যুবকটি মাথা নেড়ে আমার কথায় সম্মতি জানিয়ে ফোনের মুখ থেকে

হাতটা সরিয়ে বলল, "মাসীমা, ও কিআজ আসবে?" প্রশ্নের উত্তর শোনা গেল না।

যুবকটি বলল, "ঠিক আছে আমি আবার ঘন্টাখানেক পর ফোন করব, আসলে বলবেন, আমার ফোনের জন্য যেন অপেক্ষা করে।" যুবকটি ফোন রেখে আমার দিকে তাকাল। ওর মুখে অল্প অল্প ঘাম। উত্তেজনায়। কোন কূল রাখবে ভেবে পাচ্ছে না। যুব কংগ্রেসী নেতাটি যে নকশালদের মামলায় জড়াবে না তা ওর চলনে বলনে প্রমাণিত। বলল, "উনি বলছেন, আজ আসলেও আসতে পারে। আমি তাই বললাম, এক ঘন্টা পর ফোন করব, ঠিক বলেছি না?"

যুবকটি তার নিরপেক্ষতা প্রমাণ করার জন্য আমার কাছ থেকে ওর কথার যুক্তির প্রশংসা চাইছে। বললাম, "ঠিকই বলেছিস। তবে তোর কথা অনুযায়ী বাড়িতে অপেক্ষা করবে তো?"

যুবকটি হাসল। হাসির অর্থ, ওর একশভাগ বিশ্বাস, থাকবে। বলল, "নিশ্চয়ই থাকবে। আমাকে ও এখন এড়াতে পারবে না। আমাকে ওর দরকার।" যুবকটির কথার প্রত্যয়ে আমারও মনে সামান্য নিশ্চয়তা জাগল।

এক ঘন্টা অনেক সময়। এই সময়টা কি বসে থাকব? ঢুকে পড়লাম যুব কংগ্রেসের অন্তরালে। যুবকটিকে নিয়ে। এরা খুবই তরল। খবর সংগ্রহ করতে বিশেষ পরিশ্রম করতে হয় না। মাঝে মধ্যে একটা করে টোকা দিয়ে গেলেই অনেক তথ্য জানা যায়। আমিও তাই-ই করতে লাগলাম। আমার কোনও বিশেষ উদ্দেশ্য নেই। একদিকে সময় কাটানো, অন্যদিকে যা পাওয়া যায় তাই খবরের ব্যাঙ্কে চালান করে দেবার লক্ষ্যে ওকে বকিয়ে যাচ্ছি।

মাঝখানে ওর কথার ফাঁকে টোকা দিয়ে ওর সঙ্গে ওই ডাক্তারের নকশাল মেয়েটির সঙ্গে কিভাবে আলাপ ও প্রেম হলো তাও জেনে নিয়েছি। পরে কোনও কাজে দেবে কিনা জানি না। তবে জেনে রাখতে দোষ কি? অধিক জেনে রাখা পুলিশি কাজে দারুণভাবে কাজে লেগে যায়।

ঘড়িতে দেখলাম, এক ঘন্টা পার। যুবকটি আমার আতিথেয়তা পেয়ে বকবক করেই যাচ্ছে। এখন আর ওর কোনও কথা কানে ঢুকছে না। নির্দিষ্ট কাজের সময় যে পারে এসে দাঁড়িয়েছে। আমি ইচ্ছে করেই আরও দশ মিনিট পার হতে দিলাম। ততক্ষণে কলকাতার বুকে চৈত্রশেষের দাবদাহের তেজ অনেকটা কমে গেছে। আমার মন এখন ফোনের দিকে। সেই এখন আমার দেবদূত!

বললাম, "সময় হয়েছে, ফোন কর।"

যুবকটিকে আমি আমাদের কন্ট্রোল রুম থেকে লাইন চেয়ে ফোনের রিসিভারটা ধরিয়ে দিলাম। এবারও ফোনের অন্যপ্রান্তে ওর প্রেমিকার মা। জিজ্ঞাসা করল, "মাসীমা, ও এসেছে?" উত্তর শুনতে পেলাম না।

যুবকটি উত্তর শুনে উত্তেজিত। আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। যুবকটি বলল, "ঠিক আছে ওকে দিন।"

আমি রিসিভারের মুখ চেপে যুবকটিকে খালি বললাম, "কুড়ি মিনিট অন্তত কথা বলে যা, আমরা পৌঁছে যাচ্ছি।" ওর কাছে একজন অফিসারকে বসিয়ে দিলাম, যাতে ও আমাদের কথা ওর প্রেমিকাকে আগাম জানাতে না পারে, আর সময়ের নির্দিষ্ট মাপকাঠির আগে ও যেন ফোন না ছেড়ে দেয়।

ফোর্স আমি প্রস্তুত রেখেছিলাম। দফতরের নিচে অ্যাম্বাসাডার মজুত। আমি, উমাশংকর, শচী, অমিত ক'জন কনস্টেবল নিয়ে দুটো গাড়িতে দিলাম ছুট। লালবাজার থেকে মৌলালীর মোড়ের কাছে একশ পনের নম্বর আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় রোডের ডাক্তার অমরেন্দ্র নাথ ঘোষালের বাড়ি কুড়ি মিনিটের মধ্যে পৌঁছাতে হবে। তার আগে হলে আরও ভাল। কতক্ষণ যুব কংগ্রেসী যুবকটি ওর প্রেমিকার সঙ্গে ফোনের তরঙ্গের মধ্যে দিয়ে জমাট প্রেম করতে পারবে তার নিশ্চয়তা কোথায়?

পনের মিনিটেই গন্তব্যস্থলে হাজির। দ্রুত কনস্টেবলরা বাড়ি ঘিরে ফেলেছে। সদর দরজায় পাহারা। বাড়িটা সরু গলির ভেতর। পেছন দিক দিয়ে পালানোর উপায় নেই। অন্য বাড়ির দেওয়াল।

আমরা বাড়ির ভেতর ঢুকে গেলাম। পুরানো আমলের দোতলা বাড়ি। বড় বড় ঘর। আমাদের প্রথম লক্ষ্য যে ঘরে ফোন আছে, সেখানে পৌঁছানো। পৌঁছালাম, কিন্তু নেই। আমাদের লক্ষ্যবস্তু নেই।

আমরা হন্যে হয়ে এঘর ওঘর সব ঘর খুঁজতে লাগলাম। নেই। ডাক্তারগিন্নী উদভ্রান্ত। তিনি আমাদের বারবার বলে চলেছেন, তাঁর মেয়ে চলে গেছে। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস হচ্ছে না। কি করে এত তাড়াতাড়ি পালাল, আমরা বুঝতেই পারছি না। আমার যুব কংগ্রেসী যুবকটির উপর রাগ হতে লাগল। ভাবলাম, ওই বোধহয় কোনওভাবে আমাদের আগমনের বার্তা তার প্রেমিকাকে জানিয়ে দিয়েছে। তাই, মেয়েটি আমাদের পদার্পণের আগেই পালিয়েছে। ঠিক করলাম, লালবাজারে ফিরে ওই যুব কংগ্রেসী নেতাটিকে খানিকটা ট্যাবলেট খাওয়াবো। ওর বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কার হিসাবে। কথা ছিল, কুড়ি মিনিট ও ফোনে আটকে রাখবে, আর সেই সময়ের মধ্যে আমরা পৌঁছে

যাব। আমরা আমাদের হিসাব ঠিক রেখেছি। সেই হিসাব রাখতে গিয়ে আমাদের গাড়ি প্রায় ডাকাতদের মতো ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটেছে। অথচ ওই যুবকটি চুক্তি ভঙ্গ করেছে।

আমরা হতাশ। এত কাণ্ডের পর শিকার হাতছাড়া হলে হতাশ তো হবই। অথচ এই মেয়েটিকে আমাদের দরকার। যা খবর পেয়েছি, তাতে নিশ্চিত, ষড়যন্ত্রের বাইরের অংশে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ও অন্যতম প্রধান। অনেক কিছু জানে। ওর সেই জানাটা আমাদেরও জানা দরকার।

কিন্তু পাখি আমাদের ধোঁকা দিয়ে ডানা ছড়িয়ে চলে গেছে। দোতলা থেকে আমরা প্রত্যেকেই নিচে নেমে এসেছি। একতলার ঘরগুলিতে তল্লাশি শেষ। লালবাজারে খালি হাতে ফিরে যাব। কিন্তু এভাবে ফিরে যেতে কি মন চায়? স্যাঁতসেঁতে আবছা অন্ধকার সিঁড়ির নিচটায় আমরা এসে দাঁড়িয়েছি। মেয়েটির মা সিঁড়ির ক'ধাপ উপরে আমাদের বিদায়ের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছেন। আমরা চলে গেলে তিনি সদর দরজা বন্ধ করে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলবেন। ওনার ছেলে বিমলেন্দু ঘোষাল জেলে, তার ওপর মেয়েকেও জেলে পাঠাতে আমরা এসেছি। এক্ষেত্রে আমাদের ব্যর্থতা ওর কাম্য। হয়তো তিনি ঈশ্বরের কাছে আমাদের ব্যর্থতা চেয়ে মানত করছেন!

কিন্তু বিদায় নিতে আমার মন চাইছে না। খালি মনে হচ্ছে, আছে। কোথায়ও আছে, এই বাড়ির কোনও আনাচে কানাচে, গুপ্ত খোপের অন্তরালে। কিন্তু কোথায় সেই খোপ, যা আমাদের চোখের আড়ালে রয়ে গেছে? দেখার তো কিছু বাকি নেই। সম্ভাব্য প্রতিটা কোণ আমাদের দেখা হয়ে গেছে। তবে কোথায় যেতে পারে পাখি?

সিঁড়ির নিচে একটা বড় কালো মোবিল অথবা থিনারের ড্রাম, তাতে ঘুঁটে ভর্তি। আর টুকিটাকি প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় জিনিস ছড়ানো, যত্নের কোনও ছাপ নেই। হঠাৎ আমি মিসেস ঘোষালকে ড্রামটার দিকে নির্দেশ করে প্রশ্ন করলাম, "ওটা কি?"

তাঁর মুখ হঠাৎ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। সামলে নিলেন। তারপর কর্কশ গলায় বললেন, "দেখতে পাচ্ছেন না, ওটা ঘুঁটের ড্রাম।" মুখের রঙের হঠাৎ পরিবর্তন ও গলার অস্বাভাবিক কর্কশতা আমাকে অন্য ইঙ্গিত দিল। আমি অন্য গন্ধ পেলাম।

ড্রামটার দিকে তাকালাম। ভর্তি, টায়টায়। অর্থাৎ আজই ওটাতে ঘুঁটে ভর্তি করা হয়েছে। এত বড় ড্রামে ঘুঁটে ভর্তি করার সময় নিয়ম অনুযায়ী ঘুঁটের গুঁড়ো মেঝেতে বেশ ভাল মাপেরই পড়ে থাকবে। কিন্তু নেই। দুটো ঘুঁটে পড়ে আছে। তার অর্থ ঘুঁটে ভর্তি করার পর মেঝে পরিষ্কার করা

হয়েছে। না, হয়নি, কারণ ঘুঁটের গুঁড়ো তো শুধু আলগাভাবে পরিষ্কার করা যায় না, অন্য ময়লার সঙ্গে পরিষ্কার করতে হবে, অথচ অন্য ময়লাতে মেঝে ভর্তি। তার মানে ঘুঁটে আজ ভর্তি করা হয়নি, অথচ ঘুঁটেতে ড্রামটা টইটুম্বর। রহস্যটা কি ?

এগিয়ে গেলাম। আবছা অন্ধকারে ড্রামের ওপর মাথা ঝুঁকিয়ে ঘুঁটের ওপর দৃষ্টি দিতেই আমার স্বর নেমে এল।

দেখলাম, ঘুঁটের ওপর ক'টা চুল। লম্বা। মেয়েদের। আলগাভাবে শুয়ে আছে। ডগার দিক ঘুঁটের খাঁজে নিশ্চিত ঘুমিয়ে আছে। গোড়ার দিক ড্রামের তলে হারিয়ে গেছে। আমার ঠোঁটের কোণে সামান্য আলগা হাসির ঝিলিক আমার অফিসাররা ও মিসেস ঘোষাল কি দেখতে পেলেন ?

ওরা প্রত্যেকে আমার দিকে কৌতূহলী চোখ নিয়ে তাকিয়ে আছেন। জানি, মিসেস ঘোষালের হৃদপিণ্ড ওঠানামা এখন দ্রুত গতিতে হচ্ছে। পাশে গিয়ে দাঁড়ালে ধকধক আওয়াজ শোনা যাবে।

আমি আর অপেক্ষা করলাম না। দর্শকদের যন্ত্রণা দিয়ে লাভ কী ? ডান হাতটা ড্রামের ওপর নিয়ে গেলাম। পনের কুড়িটা ঘুঁটে সরিয়ে হাতটা ঘুঁটের ভেতর চালিয়ে দিয়ে নির্দিষ্ট লক্ষ্যটা মুঠিতে ধরলাম। তারপর দিলাম উপরের দিকে টান।

একমাত্র মিসেস ঘোষাল ছাড়া প্রত্যেকের দৃষ্টিই বোবা। কারণ যার ঘাড়ের কাছে চুলের গোছা ধরে আমি ঘুঁটের পর্দা সরিয়ে মঞ্চে তুলেছি সে একটা মেয়ে। যুবতী। যাকে ধরতে আমরা দুপুর থেকে ফাঁদ পেতে এতদূর এসেছি। যে এতক্ষণ লুকোচুরি খেলায় আমাদের গো-হারান হারিয়ে জিতে চলেছিল। প্রায় জিতেই গিয়েছিল।

মিসেস ঘোষাল বেশ শব্দ করে কেঁদে উঠলেন। মেয়েটি আমার দিকে আগুন ছুঁড়ে তাকিয়ে আছে। আমি বললাম, "নন্দিতা, ভালই খেলেছ, এবার লালবাজারে যেতে হবে।" আমি ওর চুলের গোছাটা মুঠো থেকে মুক্ত করে দিলাম।

নন্দিতাকে টেনে তুলতেই ঝপঝপ করে ড্রামভর্তি ঘুঁটে বাইরে মেঝেতে পড়ে গেছে। নন্দিতা আস্তে আস্তে নড়েচড়ে ড্রাম থেকে বেরিয়ে এল। ঘুঁটেগুলো ড্রামের নিচে নেমে গেল।

শ্যামলা, দোহারা, আমাদের দিকে আগুন ছড়ালেও ওর ওই দৃষ্টিতেও যুবক খুনের স্পষ্ট ইঙ্গিত। আর সারা .শরীরে ছড়িয়ে আছে নব যৌবনের আকর্ষণীয় চটক। হানাদারদের কামান বিরত রাখাই কষ্টদায়ক।

মিসেস ঘোষাল সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে মুখে আঁচল চেপে কাঁদছেন। বললাম,

"মিসেস ঘোষাল, এবার আপনি সদর দরজাটা বন্ধ করে দিন, আমরা চললাম।"

নন্দিতাকে নিয়ে আমরা বেরিয়ে এলাম। লালবাজার। রাস্তায় আমরা একটাও কথা বলিনি। প্রত্যেকেই বোধহয় এই দুই অঙ্কের নাটকের ঘোরে সামান্য বেহুঁশ। নন্দিতাও একটা কথা বলেনি। হয়তো ও ওর অংক মেলাতে চিন্তিত। কিভাবে গ্রেফতার হলো তা ওর বুদ্ধির বোধগম্য হচ্ছে না।

দফতরে এসে নন্দিতাকে অন্য ঘরে নিয়ে গেলাম। ওর প্রেমিকপ্রবর যে তখনও আমার ঘরে বসে। আমাদের অভিযানের ফলের ওপর ওর গতি নির্ভর। নন্দিতার গ্রেফতার ওর কাম্য। তাহলেই ওর মুক্তি।

নন্দিতাকে বসিয়ে আমি আমার ঘরে গেলাম। যুব কংগ্রেসের নেতাটি বসে আছে। সামান্য চিন্তিত। আমি বললাম, "এবার তুই যেতে পারিস। নন্দিতাকে পেয়েছি।"

যুবকটির মুখ একবার উজ্জ্বল হলো। পরমুহূর্তেই সামান্য বিষণ্ণ। জিজ্ঞেস করল, "ও কবে ছাড়া পাবে রুণুদা?"

"কি করে বলব। তবে দু'চার বছরের আগে তো নয়।" বললাম।

"এতদিন?" উদগ্রীব জিজ্ঞাসা।

"তার বেশিও হতে পারে, এখনই বলা যাচ্ছে না। কোর্টের ব্যাপার। তুই এখন যা, পরে আমার সঙ্গে দেখা করিস।" সাফল্যের মিষ্টি মেশানো তৃপ্তিদায়ক গলায় উত্তর দিলাম।

"আচ্ছা।" যুবকটি আস্তে আস্তে হাঁটতে লাগল। আমাদের হাতে ওর প্রেমিকাকে সমর্পণ করে লালবাজার থেকে বেরিয়ে গেল।

নন্দিতাকে আমি আমার ঘরে নিয়ে এলাম। এবার জেরা শুরু করব। নন্দিতাকে এনে ওই চেয়ারটাতেই বসালাম, যেখানে দুপুর থেকে এতক্ষণ ওর প্রেমিক বসে ছিল। জীবননাট্যের এ এক অদ্ভুত পর্ব। প্রেম-কাব্যে এই ঘটনার পংক্তি কোনখানে স্থান পাবে, কে জানে?

নন্দিতা মাথা নিচু করে বসে আছে। কি ভাবছে, সেই-ই জানে। হঠাৎ ও মুখ তুলে আমাকে বলল, "রুণুদা আমাকে মারবেন না, আমি সব বলে দেব।" আগুন ছড়ানো চোখের ছ'টা এখন পাল্টে গেছে। সেখানে কাতর আবেদনের মিনতি।

ওকে একটাও প্রশ্ন করার আগে কেন ও নিজের থেকে মারার কথা বলল? আমার নামের প্রচলিত প্রবাদ থেকেই কি ও আতঙ্কে সমর্পণ করল? না কি অন্য কোনও গূঢ় তথ্য আছে?

ভাবলাম, একটা টোকা দিই। সমর্পণের রহস্যটা জেনে নিই। সুবিধা

হবে। নকল রাগের ছাপ মুখের অভিব্যক্তিতে ফুটিয়ে একটু জোরের সঙ্গে বললাম, "কেন, তোকে মারব না কেন? তুই কি আলাদা?"

নন্দিতা প্রায় কান্না জড়ানো গলায় বলে উঠল, "না, না, মারলে আমি মরে যাব।"

"মরে যাবি, কেন?"

নন্দিতা প্রশ্ন শুনে চুপ। আমি ধমকিয়ে আবার জিজ্ঞাসা করলাম, "মরে যাবি কেন?"

নন্দিতা গলার স্বর নামিয়ে পরিষ্কার ভাষায় বলল, "আমার পেটে বাচ্চা।"

কালবৈশাখীর ঝড় এল নাকি? গুম গুম করে বাজ পড়ার শব্দ। আমিও চমকে উঠে অপ্রস্তুত। কুমারী মা'র মাথা অধোগতি। বজ্র ছুঁড়ে তার প্রতিক্রিয়া দেখার অপেক্ষায়।

হতভম্ব আমি হজম করার সময় নিলাম। দু'মিনিট। প্রশ্ন ছুঁড়লাম, "কারিগরটি কে?"

নন্দিতার আর লজ্জা নেই। অবলীলায় কারিগরটির নাম জানাল। সে ওই যুব কংগ্রেসী নেতাটি।

নাম শুনে আমি কি হাসব? ভাবলাম, হায়রে, নন্দিতা কি জানে তার পেটের বাচ্চাটির বাবাই ওকে গ্রেফতার করতে আমাকে সাহায্য করেছে। যাকে ও সবচেয়ে বেশী বিশ্বাস করে নিজের সবকিছু নিবেদিত করেছে সেই ওর সঙ্গে চরম বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। প্রেম দেবী কি অলক্ষ্যে মুচকি হাসছেন?

প্রশ্ন করলাম, "ক মাসের?"

বলল, "মাস দু'য়েকের কাছাকাছি।"

আমি আর দেরি করলাম না। এমনিতেই আমাদের নামে অসংখ্য বদনাম। কুৎসিত গল্প নকশালদের একাংশ বাজারে ছেড়েছে। নন্দিতাকে নিয়ে আর একটা রসালো গল্প বানানোর সুযোগ দেওয়া যায় না। ওকে আমি আমাদের সেন্ট্রাল লকআপের ডাক্তারের কাছে পরীক্ষার জন্য পাঠিয়ে দিলাম।

ঘণ্টাখানিক পর ডাক্তারের রিপোর্ট পেলাম। নন্দিতার স্বীকারোক্তি সত্য। পরদিনই ওর ডাক্তার পিতাকেও লালবাজারে ডাকলাম। এবং নন্দিতার সামনেই নন্দিতার শারীরিক অবস্থার কথা জানালাম। ডাক্তার ঘোষাল আমার কথা শুনে চুপ করে রইলেন। লালবাজারে বসে নিজের কুমারী মেয়ের মা হওয়ার ঘটনা শুনে তার কি মনের অবস্থা হতে পারে তা খানিক আন্দাজ করতে পারছি। তিনি তো তার 'বিপ্লবী' ছেলে বিমলেন্দুর কাণ্ড জানে না। বিমলেন্দু যে প্রেসিডেন্সি জেলের ভেতর কুখ্যাত দাগী খুনী জয়হিন্দ নন্দীর সমকামিতার

শরিক তা তিনি জানেন না। সেখানে বিমলেন্দুর ভূমিকা নারীর আর জয়হিন্দের ভূমিকা পুরুষের।

আমি ডাক্তার ঘোষালকে বললাম, "ভেবে আর কি করবেন, পরে একটা ব্যবস্থা নেবেন। এখন আমি খালি আপনাকে জানিয়ে রাখলাম।"

ডাক্তার ঘোষাল মাথা নত করে আমার কথা শুনলেন। উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, "আমি যাচ্ছি। যা ব্যবস্থা করার করবেন। কি আর বলব।" তিনি চলে গেলেন।

নন্দিতা অবশ্য ওর জানা সব কথাই আমাকে বলল। কিভাবে ও জেলখানায় জিনিসপত্তর পাঠাতো। কিভাবে চিঠি আদানপ্রদান করত। জেলখানার কোন ডাক্তারবাবু ওর বাবার বন্ধু ছিলেন, সেই বন্ধুত্বের সুযোগ নিয়ে ওই ডাক্তারবাবুর কোয়ার্টারে গিয়ে ওই কোয়ার্টারে কাজ করতে আসা আসামিদের হাত দিয়ে কিভাবে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস পাঠাতো তাও জানাল। কোন ডেপুটি জেলার ওকে ওর ভাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের দিন অতিরিক্ত সময় দিয়ে সাহায্য করতেন, তাও বলল।

নন্দিতাই আমাকে ওদের সাংকেতিক চিঠিগুলির পাঠোদ্ধারে সাহায্য করল। যে চিঠিগুলি আমি নিশীথবাবু, আজিজুল ও অন্যান্যদের সেলের ময়লা থেকে কুড়িয়ে পেয়েছিলাম সেই চিঠির এ বি সি ডি ও যোগ বিয়োগ গুণ ভাগের অর্থ কি তা জানতে পেরে আমাদের বানানো ওদের ষড়যন্ত্রের কাঠামোতে আমি মাটি চাপাতে পারলাম। আস্তে আস্তে মূর্তির অবয়ব ফুটে উঠতে লাগল।

নন্দিতাকে প্রেসিডেন্সি জেলে পাঠিয়ে দিলাম। পয়লা জুন জেল কর্তৃপক্ষ মারফৎ ষোল নম্বর মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে নন্দিতা আবেদন করল ডাক্তার গীতা চৌধুরির তত্ত্বাবধানে সে গর্ভপাত করাতে চায়। তার আবেদন যেন আদালত মঞ্জুর করেন।

আদালত তার আবেদন মঞ্জুর করার পর নন্দিতা তার দেহ থেকে যুব কংগ্রেসী নেতার চিহ্ন মুছে দিল।

ইতিমধ্যে আঠেরই এপ্রিল পাঁচু মল্লিক আমাদের জোড়াবাগান এলাকায় ধরা পড়ল। ওর দেওয়া খবরের ভিত্তিতে গ্রেফতার হলো টালা পাম্পিং স্টেশনের প্রশান্ত চৌধুরি। কালো, চশমা পরিহিত, সাধারণ উচ্চতার, মাঝারি গড়নের প্রশান্তকে গ্রেফতার করে আমাদের দারুণ লাভ হলো। কাঠামোতে লাগানোর জন্য ওর থেকে অনেক মাটি পাওয়া গেল। প্রেসিডেন্সি জেলে বিচারাধীন বন্দি থাকাকালীন ও দড়ি হাজত ও তেইশ চুয়াল্লিশ সেলে ছিল।

এবং জেল ভাঙ্গার ষড়যন্ত্রে আগাগোড়া লিপ্ত ছিল। ওর স্বীকারোক্তিতে ষড়যন্ত্রের মূল চিত্রটা ব্যাপকভাবে সামনে এল।

জেল থেকে পালিয়ে প্রশান্তও ত্রিবেণীর প্রদ্যুৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল এবং ত্রিবেণী থেকে হুগলি হয়ে ও আর নিশীথবাবু বর্ধমান শহরের এক হোটেলে পরিচয় গোপন রেখে ক'দিন আত্মগোপন করে ছিল। ওর কাছ থেকে জানতে পারলাম, বাকি পলাতকেরা মেদিনীপুর, হুগলি, বর্ধমান, পুরুলিয়া জেলায় ভবঘুরের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওদের সামান্য সাহায্যের জন্যও ওদের পার্টির কারও হাত পাওয়া যাচ্ছে না। পার্টিও নেই, হাতও নেই।

গ্রেফতার হলো ইন্দ্রনাথ বক্সি নামের আর এক পলাতক নকশাল যুবক। বিচারাধীন বন্দি ইন্দ্রনাথ আলিপুর স্পেশাল জেলে ছিল কিন্তু জেল ভাঙ্গার আগে চোখের চিকিৎসার জন্য সে প্রেসিডেন্সিতে বদলি হয়ে যায় এবং পালানোর সুযোগ পেয়ে পালিয়ে যায়।

আজিজুল ওদের সাহায্যকারী হিসাবে আমাদের যে কটা বাইরের নকশাল যুবকের নাম জানিয়েছিল, তাদের ক'জনকে গ্রেফতার করেছি, ক'জনকে চিহ্নিত করতে পারলেও তপন সরকার নামে একটা ছেলেকে নির্দিষ্ট করতে পারছিলাম না।

নির্দিষ্ট করলাম নন্দিতা ও প্রশান্তকে গ্রেফতার করার পর। ওদের কাছেই জানতে পারলাম তপন ওর ছদ্মনাম। আসল নাম রাধাকান্ত দে। সিমলা স্ট্রিটের তাপস সরকারের ঘনিষ্ঠ কমরেড।

তাপসকে আমরা খুনের মামলায় পঁচাত্তরের মার্চ মাসে গ্রেফতার করে প্রেসিডেন্সি জেলে পাঠিয়েছিলাম। ও ওই জেলে তেইশ চুয়াল্লিশ সেলে ছিল। রাধাকান্ত ওর সঙ্গে ওর ভাইয়ের পরিচয় দিয়ে জেলখানায় সাক্ষাৎ করতে যেত এবং ষড়যন্ত্রের উন্নতির খবরাখবর যোগান দিত। আজিজুল ওকেই জেল থেকে সবচেয়ে বেশি তাপসের মারফৎ নতুন কাজের নির্দেশ দিত।

নন্দিতা ও প্রশান্তর কাছেই জানতে পারি, জেলের ভেতর বোমার মশলা, যা নন্দিতা ও তাপসের মাধ্যমে ঢুকেছিল তার বেশির ভাগই যোগান দিয়েছিল ওই রাধাকান্ত। শুধু তাই নয় জেল ভাঙ্গার দিন বাইরে থেকে প্রথম বোমাটা রাধাকান্তই ছুঁড়েছিল। এবং সেটা ছিল ভেতরের নকশালদের কাছে ওদের 'আগমনবার্তার ধ্বনি'। যুদ্ধ শুরুর শঙ্খনিনাদ।

মে মাসের চোদ্দ তারিখ ওকে পেয়ে গেলাম। ট্যাবলেট খাওয়ালাম। মূর্তির মাটি আরও মজবুত হয়ে কাঠামোতে জমাট হলো।

বাইশ তারিখ উত্তরপাড়া থেকে গ্রেফতার হলো বেহালার নিতাই দে। চুয়াত্তর সাল থেকে প্রায় বছর দুয়েক নিতাই প্রেসিডেন্সি জেলে বিচারাধীন বন্দি হিসাবে ছিল, ওখানেই সে আজিজুলদের ঘনিষ্ঠ হয় এবং নির্দেশ পায় নন্দিতা ও রাধাকান্তদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে জেল ভাঙ্গার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতে। সেই নির্দেশ অনুযায়ী নিতাই ডাঃ দেওদর রুস্তমন রোডের বাড়িতে গিয়ে অন্যান্যদের সঙ্গে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করে জেল ভাঙার খেলায় মেতে যায়।

নিতাইয়ের সঙ্গেই আই বি অফিসারদের হাতে উত্তরপাড়ায় গ্রেফতার হলো আর এক নকশাল তরুণ তপন কুমার ঘোষ। নিতাই খোলাখুলি সবই স্বীকার করেছিল। এবং তপন আর সে যে জেলখানার অন্য নকশালদের সঙ্গে মাঝেমধ্যে দেখা করে ষড়যন্ত্রের অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত করত তাও জানিয়েছিল। এরা দু'জনেই জেল ভাঙ্গার সময় বাইরে থেকে বোমা ছুঁড়ে জেল থেকে পালাতে সাহায্য করেছিল।

প্রণব চক্রবর্তী মিশার আসামি। চুয়াত্তরের ফেব্রুয়ারি থেকে প্রেসিডেন্সি জেলে বন্দি। পায়ে চোট, এই অজুহাতে সে একটা ক্র্যাচ নিয়ে হাঁটাচলা করত। পালানোর দিন সে হাতে একটা ছোরা নিয়ে ক্র্যাচটা লাঠির মতো ব্যবহার করে সিপাইয়ের পিঠে বাড়ি দিয়ে পালিয়ে গেল ছুটতে ছুটতে। বিমলেন্দুদের সঙ্গে একই ট্যাক্সিতে সে প্রায় বালি পর্যন্ত গিয়েছিল। কিন্তু বিবেকানন্দ সেতু পার হওয়ার পর সে ট্যাক্সি থেকে নেমে বেলুড়ের দিকে চলে যায়। ট্যাক্সি থেকে বালি থানার পুলিশ উদ্ধার করে ওর পরিত্যক্ত ক্র্যাচটা। সেই থেকে সে এখানে ওখানে হন্যে হয়ে ঘুরে ঘুরে গ্রেফতার এড়িয়ে চলছিল। কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারল না। নদিয়ার এক গ্রাম থেকে জুন মাসের চার তারিখ সকালে আমাদের স্পেশাল ব্রাঞ্চের অফিসারদের হাতে ধরা পড়ে সোজা লালবাজার সেন্ট্রাল লকআপে চলে এল। ওর থেকেই আমরা নদিয়ায় ওদের দ্বিতীয় সেন্ট্রাল কমিটির কাজকর্মের চিত্রটা মোটামুটি পাই। বিপ্লবের গতি কতটা, কতদূর ছড়িয়েছে তাও আন্দাজ করতে পারি। গ্রেফতার হওয়ার পর হতাশ প্রণব বুঝে গিয়েছিল ওদের নতুন নেতাদের ক্ষমতা। যে চার নম্বর ওয়ার্ডে সে পালানোর আগে ছিল সেখানেই আবার ওকে পাঠিয়ে দেওয়া হলো।

জুন মাসেরই আট তারিখ মেদিনীপুর থেকে জেল পলাতক ফাঁসির আসামি নবকুমার ভট্টাচার্যকে গ্রেফতার করা হলো। চব্বিশ তারিখ মুর্শিদাবাদ থেকে গ্রেফতার করে আনলাম উত্তর কলকাতার নকশাল দিলীপ কর্মকারকে। চুয়াত্তর

সাল থেকে সে প্রেসিডেন্সির সতের নম্বর ওয়ার্ডে বিচারাধীন হিসাবে বন্দি ছিল।

ভোম্বল। ভাল নাম মৃণাল কান্তি দে ওরফে অজয় দে। নিমতায় বাড়ি। কালো, মাঝারি উচ্চতার দোহারা চেহারা। চেহারায় কোনও বিশেষত্ব নেই। খুনের রাজনীতির উচ্চ মার্গীয় কর্মকাণ্ডে জেলখানার বাইরে ওর বিশেষ 'অবদান' নেই। কারণ এই রাজনীতি আমদানির প্রথম পর্বেই সত্তর সালের আঠাশে জানুয়ারিতে ও গ্রেফতার হয়ে বিচারাধীন বন্দি হিসাবে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে চলে যায়। সেখানে সে নেতা বনে যায়। জেলগুলিতে তখন আস্তে আস্তে তরুণ নকশালরা একে একে বন্দি হয়ে আসতে থাকে। ভোম্বল তাদের হস্তগত করে নিজেকে সে জেলের নেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে। ওর একমাত্র সম্বল ছিল ক্রমাগত ভাবে 'শ্রদ্ধেয় নেতা'র নামে ভজনা করা। দ্বিতীয় আর কোনও পন্থা নয়। এবং সেই ভজনার সূত্র ধরেই জেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কারণে অকারণে ঝামেলা সৃষ্টি করা।

প্রায় পাঁচ বছর আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে কাটিয়ে ভোম্বল চলে এল প্রেসিডেন্সি জেলে। ততদিনে সে একটা মামলায় দণ্ড পেয়ে পাঁচ বছরের সাজা খাটতে শুরু করেছে। প্রেসিডেন্সি জেলে এসেও ও আজিজুল, নিশীথ ভট্টাচার্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নেতার স্থানে পৌঁছে যায়। মুখে সারাদিন যে চারুবাবুর নাম করে যেতে পারবে সে কেন দ্বিতীয় সারিতে বসে থাকবে? নকশালদের এই গোষ্ঠীর কাছে তখন মার্কসবাদের প্রথম এবং শেষ ব্যাখ্যা হচ্ছে চারু মজুমদার। কারণ ওরা বিশ্বাস করত সমস্ত মার্কসবাদ সরবতের মতো গুলে পান করে চারুবাবু তার নির্যাসটা ওদের কাছে পৌঁছে দিয়েছে। সুতরাং অন্য কিছু পড়া বা আলোচনা করার দরকারই নেই। সবটাই সময়ের অপচয়।

জেল পালানোর দিন ভোম্বল জেল কয়েদি মহঃ নাজির ওরফে ভুট্টোর বানানো ছুরি হাতে প্রথমেই জেল গেটে এসেছিল এবং সিপাই নিমাই সাহার তলপেটে ঢুকিয়ে ওটার কার্যকারিতা পরীক্ষা করেছিল।

জেল থেকে পালিয়ে সেই ভোম্বল প্রথম রাতটা কাটাল ত্রিবেণীতে প্রদ্যুৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি। তারপর একেবারে উধাও। যে নকশালরা এতদিন জেলের ভেতর 'বিপ্লবী ভোম্বলদা' বলতে অজ্ঞান তারাও জানল না সে কোথায় হাওয়া হয়ে গেল। একদম জানত না বলা যায় না। জানত আজিজুল এবং অন্য একজন। আজিজুল জানত সে পশ্চিমবঙ্গ ছেড়ে অন্য রাজ্যে চলে গেছে। কোথায়? বিহার, অন্ধ্র, অসম? না, খুব সম্ভব মধ্যপ্রদেশ।

কিন্তু মধ্যপ্রদেশ তো আর একটা ছোট জায়গা নয়, আমাদের দেশের সবচেয়ে বড় রাজ্য। কোথায় গেলে পাব ওকে?

আজিজুলের কাছে এর সঠিক উত্তর ছিল না। যার কাছে ছিল তাকে আমরা খুঁজে পেলাম। সে আমাদের একটা দলকে নিয়ে গেল মধ্যপ্রদেশে নয়, মধ্যপ্রদেশের পুরনো রাজধানী নাগপুরে। সেই আমাদের দলকে দেখিয়ে দিল ভোম্বলের আস্তানা। জুলাই মাসের তিন তারিখ রাত্রিবেলা আবার ভোম্বল আমাদের হাতে এল।

বেচারা ভোম্বল! রাজনীতি থেকে পালাতে চেয়েছিল, আমরাই ওকে আবার 'বিপ্লবী' বানিয়ে জেলে পাঠিয়ে দিলাম! আইন যে অপরাধীর পিছু ছাড়ে না। 'বিপ্লবের' ছোঁয়াচ থেকে দূরে গিয়ে লুকিয়ে নতুন করে হয়তো সে বাঁচতে চেয়েছিল। কিন্তু আমাদের লম্বা হাত তার স্বপ্নে বাধা দিয়ে তাকে নিয়ে এল আবার প্রেসিডেন্সি জেলের সেলে। ভোম্বল আবার জেলে গিয়ে পুরনো স্লোগান আওড়াতে লাগল।

অভিজ্ঞতায় দেখেছি, তদন্তকারী দলও খেলার মাঠের একটা টিমের মতো। সঠিক দিশায়, প্রত্যেক সদস্য যদি যৌথভাবে এগিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে ঝাঁপিয়ে পরে তবে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে হয় না। দরকার শুধু, সদস্যদের যৌথভাবে চলার মানসিকতা ও পরিচালকের সেই পরিবারকে চালনার সুকৌশল দক্ষতা।

কাজ করার মানসিকতা নিয়েই প্রত্যেকে পুলিশে আসে। কিন্তু কাজের বদলে তাকে এক সময় শুধু টাকা উপার্জনের যন্ত্রে পরিণত করে দেয় অদক্ষ পরিচালক ও অধিনায়করা।

একটা কথা আমি পরিষ্কার ভাবে বুঝেছিলাম। লুকিয়ে টাকা উপার্জন আমি বন্ধ করতে পারব না। আমি তাই পন্থা নিতে বাধ্য হলাম যে 'কাজ দাও, টাকা নাও'। 'কাজ দিলে আমি চোখ বুঝে থাকব।' এই কৌশলে আমি আমার টিমের অফিসার ও অন্য সদস্যদের থেকে কাজ আদায় করে নিয়েছি। গঙ্গা জল ছিটিয়ে যে সমাজের কোনও অংশকেই আজ আর বিশুদ্ধ করা যাবে না এই সারমর্মটা তখনই যদি আমি না বুঝতাম তাহলে অনেক তদন্তও সফলভাবে করতে পারতাম না।

আমার দফতরের সিপাইরা তো আমার সাক্ষাৎপ্রার্থীদের থেকেও আড়ালে টাকা আদায় করত। ঘটনাটা আমি বহুদিন পর্যন্ত জানতামই না। জানলাম আমার দিদির কাছ থেকে।

দিদি এসেছেন কোচবিহার থেকে আমারই কাছে। তিনি ট্রেন থেকে

নেমে সোজা লালবাজারে এসে আমার কোয়ার্টারে না গিয়ে আমাকে দেখার জন্য দফতরে হাজির। আমি আমার চেম্বারে। দিদির হাজিরার খবর জানিই না। তিনি যে কোয়ার্টারে না গিয়ে দফতরে চলে আসবেন তাও আমার চিন্তার বাইরে।

চেম্বারের বাইরে আমার দেহরক্ষী কনস্টেবল অঞ্জন দাঁড়িয়ে ছিল। দিদিকে সে চেনে না। দিদি খোলামনে তাকে প্রশ্ন করেছেন, "আপনার সাহেব কি আছেন?"

অঞ্জন গম্ভীরভাবে জানাল, "আছে, কিন্তু দেখা করতে হলে আমাকে পঞ্চাশ টাকা বকশিস দিতে হবে।"

আশ্চর্য হয়ে দিদি প্রশ্ন করলেন, "কেন? বকশিস কেন?"

একইভাবে অঞ্জন দিদিকে তার আইনের কথা জানাল। "এটাই নিয়ম, রুণুবাবুর সঙ্গে দেখা করতে হলে আমাদের পঞ্চাশ একশ দিতেই হবে। নয়ত দেখা হবে না।"

দিদি নিয়মের বার্তা শুনে অবাক। গজগজ করতে করতে আমাদের দফতর থেকে নিচে নেমে আমার কোয়ার্টারের দিকে হাঁটা দিলেন।

দুপুরে কোয়ার্টারে লাঞ্চ সারতে গেলাম। দিদি আমার প্রিয় কোচবিহারের হাওয়া নিয়ে এসেছেন, মনে মনে আনন্দ হচ্ছে। মা, বাবা, দাদা, বৌদির খবর শুনলাম। শুনতে শুনতেই খাওয়া দাওয়া সারা হলো। দিদি কি কি আমার প্রিয় খাদ্য ও মা কি কি আমার জন্য দিয়ে দিয়েছেন তা শুনেও খুব খুশি মনে আবার দফতরের দিকে ফিরে যাওয়ার উদ্যোগ করতেই দিদি আমায় জিজ্ঞেস করলেন, "হ্যাঁ রে রুণু, তোর সঙ্গে দেখা করতে গেলে আজকাল টাকা দিতে হয় না কি? তুই কি ভগবান হয়ে গেলি না কি রে?"

দিদির অদ্ভুত ধরনের অভিযোগ শুনে আমি থ। অবাক হয়েই জানতে চাইলাম, "তার মানে?"

দিদি হাসি হাসি মুখে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "তার মানে? শোন, আমি আজ এখানে এসেই তোকে দেখতে তোর দফতরে গিয়েছিলাম, এক সিপাই তোর সঙ্গে দেখা করার বিনিময়ে পঞ্চাশ টাকা চাইল। এটাই না কি নিয়ম। আমি আর কি করি, ভাবলাম আমার ভাইটা বোধহয় ভগবান হয়ে গেছে, এখানে দর্শন না করে ওকে কোয়ার্টারেই দক্ষিণা ছাড়া দর্শন করব। তারপর চলে আসি।"

দিদির কথাতেই আমি যা বোঝার বুঝে গেছি। আমার উদারতার সুযোগ

নিয়ে ওরা কতদূর নেমে গেছে এটা ভাবতেই আমার মাথায় আগুন জ্বলে গেল।

আমি প্রায় ছুটতে ছুটতে দফতরের দিকে চললাম। যে কনস্টেবলের নামে দিদি অভিযোগ করল ওকে আমি আসার সময়ও দফতরের সামনের বেঞ্চিতে বসে থাকতে বলে এসেছি। আমি যে ছুটে ওর 'শ্রাদ্ধ' করতে আসছি সে ও ঘুণাক্ষরে জানে না। যে ভদ্রমহিলার কাছে সকালে পঞ্চাশ টাকা চেয়েছে সে যে আমার দিদি তাও জানে না। সুতরাং সে নির্বিঘ্নেই আছে। জানতে পারলে অন্তত লালবাজার ছেড়ে যে পালাতো তা আমি জানি। কারণ মুখের তোড়ের সঙ্গে যে লাথি কিলও ওর কপালে জুটতে পারে এ ব্যাপারে ও নিশ্চিত। কারণ ও আমাকে অনেকদিন ধরে কাছ থেকে দেখছে। দেহরক্ষী হিসাবে কাজ করছে। ছেঁচড়ামো যে আমার একেবারে না-পছন্দ সেটা খুব ভালভাবেই জানে।

প্রায় উড়ে চলে এলাম দফতরে। বেঞ্চিতে নেই। কোথায় গেল অঞ্জন। শুনলাম, আশেপাশেই আছে। অন্যদের বললাম, "ডাক।" দফতরে অন্য কনস্টেবলরা আমার চালচলন দেখেই বুঝে গেছে 'কিছু একটা হয়েছে'। আমি যথাসম্ভব নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করছি, যাতে ওরা আমার ভেতরের উত্তাপ বুঝে ওকে ডাকার বদলে গিয়ে না বলে 'পালা'।

মিনিট পাঁচেক পর এল। এবং আমার মুখের তোড়ের সঙ্গে ওর বাঁ গালে সপাটে পড়ল আমার ডান হাতের চড়। আশেপাশে দাঁড়িয়ে থাকা অফিসাররা ওকে সরিয়ে নিয়ে গেল। ততক্ষণে আমার বাছা বাছা শব্দের সঙ্গে সবাই শুনে গেছে কি অপরাধে ওই সিপাইটা আমার চড় হজম করল।

এরপর তিনদিন ও দফতরে এলেও আমার মুখোমুখি হলো না। অন্য একজনকে দেহরক্ষী হিসাবে নিয়োগ করলাম। যদিও আমি ওকে অন্য বিভাগে বদলির কোনও সুপারিশ করলাম না। কারণ ও কিন্তু কাজের ছিল। এবং আমি এও জানতাম, যতই আমি হম্বিতম্বি করে ওকে এবং ওর অন্য সঙ্গীদের এই সব কুকীর্তি করতে বারণ করি না কেন, ওরা করবেই। সুতরাং অদৃশ্য একটা ভয় দেখিয়ে ওদের থেকে কাজ আদায় করাটাই আমার মুখ্য অভিপ্রায় হয়ে উঠেছিল। এই পদ্ধতি আমি আমার কর্মজীবনে সর্বত্র চালিয়ে এসেছি। কারণ আমি জানি বদলি খেলোয়াড় যে ভালো খেলবেই তার কোনও নিশ্চয়তা নেই, কিন্তু গুণ না থাকলেও দোষ নিয়েই সে মাঠে নামবে। সুতরাং অযথা ঝুঁকি নিয়ে লাভ কী? যে বুনোটে সাজিয়েছি

সংসার, তাকে নিয়েই চল হে সখী। অঞ্জন এরপরও আমার নাম ভাঙিয়ে অনেক কুকীর্তি করেছিল। শুধু অঞ্জন কেন অন্য অনেক সিপাই এমনকী বেশ কিছু আমার অধস্তন অফিসারও আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার সুযোগ নিয়ে আমার অজান্তে অবাঞ্ছিত কাজ করেছে। আর সেই সব 'কাজের' প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আমি অংশীদার না হয়েও কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে দুর্নামের ভাগীদার হতে হয়েছে আমাকে।

অঞ্জনরা থাকবেই, এতে ভয় পেলে চলবে না। এদের দিয়েই চাষ করিয়ে ফসল ফলাতে হবে। অঞ্জনরাই সংখ্যায় বেশি, ব্যতিক্রম দু'একজন। সেই ব্যতিক্রম দিয়ে তো আর পুরো বাহিনী চালানো যাবে না।

সাতই জুন নাগপুর থেকে ভোম্বলকে কলকাতায় নিয়ে এল আমাদের অফিসাররা। ওর থেকে আমরা জেলের ভেতরের ষড়যন্ত্রের খবর ছাড়া অন্য খবর খুব বেশি পেলাম না। কারণ ভোম্বল সবার সঙ্গেই যোগাযোগ ছিন্ন করে নাগপুরে পালিয়ে ছিল। এমনকী মুর্শিদাবাদে ওদের পুরনো সঙ্গী তুষার এবং মেদিনীপুরের নকশাল হারুর কাছে যে দুটো দল আশ্রয়ের জন্য গিয়েছিল তারাও যে পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ছিটকে এদিক ওদিক চলে গেছে সেই খবরও ওর কাছে ছিল না। ও আর নতুন করে কোনও খবর রাখারই চেষ্টা করেনি।

সেদিনই দুপুরবেলা। আমরা সবাই আমাদের দফতরেই বসে আছি। এক ভদ্রলোক এলেন। নাম বললেন, সাধন দাসশর্মা। বললেন, তিনি ধানবাদের মাইনিং কলেজের ইনসট্রাকটর। এরপর তিনি যে কারণে আমাদের কাছে এসেছেন সেটা শুনতে আমরা সামান্য প্রস্তুতও ছিলাম না। তিনি বললেন, "আমার ধানবাদের কোয়ার্টারে নিতাই মাহাতো নামে এক জেল-পালানো নকশাল দুই একদিনের মধ্যে থাকতে আসবে।"

মিঃ দাসশর্মার কথা শুনেই নড়েচড়ে বসলাম। জিজ্ঞেস করলাম, "ঠিক কবে ?"

তিনি বললেন, "আমি আজ সন্ধের ট্রেনে ধানবাদ ফিরে যাচ্ছি। দিনটা সঠিকভাবে তখনই জানতে পারব। তবে দুই একদিনের মধ্যেই আসছে। আপনারা লোক পাঠান। দেরি করবেন না।"

বললাম, "আপনার কথামতো যা আন্দাজ করছি, তাতে পরশুদিন আমাদের লোক পাঠানোই ঠিক হবে।"

মিঃ দাসশর্মা সামান্য চিন্তা করলেন, বললেন, "ঠিক আছে, পরশুই পাঠান। সকালের গাড়িতে।"

এরপর ওনার সঙ্গে আমাদের কোথায় কখন দেখা হবে, তা নিয়ে আলোচনা হলো। তিনি চলে গেলেন। উনি চলে যাওয়ার পর আমরা এই অযাচিত সুযোগের সদব্যবহারের জন্য পরিকল্পনা করে ফেললাম।

কথা মতো ন'তারিখ সকালে আমাদের অফিসার শচী মজুমদার, প্রদীপ ঘোষের নেতৃত্বে একটা ছোট টিম ধানবাদের উদ্দেশ্যে রওনা হলো।

ধানবাদের কানাড়া ব্যাঙ্কের এক শাখার ম্যানেজার দুলাল চক্রবর্তী ছিল আমাদের বিশেষ পরিচিত । তিনি একাই একটা ভাড়া বাড়িতে থাকতেন। শচী ও প্রদীপরা ওর বাড়িতেই আস্তানা গাড়লো।

ব্যবস্থা অনুযায়ী মিঃ দাসশর্মা শচীদের সঙ্গে ঠিক সময়ে দেখা করে বললেন, "এখনও আসেনি, তবে আজই সন্ধেবেলায় আসবে।" এরপর তিনি শচী ও প্রদীপকে নিয়ে গেলেন তার কোয়ার্টারটা চিনিয়ে দিয়ে পরবর্তী ছকটা সাজাতে। দুলালবাবুর বাড়ি থেকে খুব একটা দূরত্ব ছিল না দাসশর্মার কোয়ার্টার। রিকশায় চড়ে শচীরা খুব তাড়াতাড়ি পৌঁছে গেল।

মিঃ দাসশর্মার কোয়ার্টারের পেছনে আর একটা একতলা কোয়ার্টার। সেই কোয়ার্টারের বাসিন্দারা ছুটিতে পটনা চলে গেছে। সদরে বড় বড় তালা ঝুলছে। ওই কোয়ার্টারের পেছনেই বিশাল ধানক্ষেত। লাল মাটি ফুঁড়ে সবুজ ধানগাছ তিরতির করে বর্ষার আকাশের দিকে তাকিয়ে ছোট ছোট বাতাসের ছোঁয়ায় নিজের মেজাজে দুলছে।

মিঃ দাসশর্মা শচীদের ঘুরিয়ে তার কোয়ার্টারটা দেখালেন। সদরের রাস্তা ছাড়াও, কোয়ার্টারের পেছনের দিকে দরজা আছে, যেখান দিয়ে বেরিয়ে অনায়াসে যে কেউ ধানক্ষেতের বিস্তৃত মাঠ দিয়ে উধাও হয়ে যেতে পারে। অন্ধকারে কিছুই বোঝা যাবে না।

পর্যবেক্ষণের পর শচীরা গৃহকর্তার অনুরোধে চা জলখাবার খেলো। তারপর সন্ধের পরিকল্পনা কষতে বসল। মিঃ দাসশর্মার কোয়ার্টারের সামনে রাস্তার উল্টোদিকেই একটা বেশ বড় মাঠ। ফাঁকা। ওই মাঠের বাঁ দিকে একটা ছোট্ট নালা। তার ওপর একটা কালভার্ট।

ঠিক হলো, সন্ধে নামার খানিকক্ষণ পরই শচীরা ওই কালভার্টে এসে বসবে। অন্ধকারে ওখানে কে বসে আছে দূর থেকে বোঝা যায় না। ওরা লক্ষ্য রাখবে কোয়ার্টারের দিকে। মিঃ দাসশর্মা আসামি হাজির হলে দু'বার দেশলাই কাঠি জ্বালাবেন, নয়ত একবার, অর্থাৎ আসেনি।

কথাবার্তা শেষ করে শচীরা দুলালবাবুর বাড়িতে ফিরে এল। দুপুরে একটা জবরদস্ত ঘুম মেরে বিকেলে চলে গেল স্থানীয় থানায়। অফিসার-ইন-চার্জকে

উদ্দেশ্য জানিয়ে চারজন স্থানীয় কনস্টেবল নিয়ে ওরা চলে এল আবার নিজেদের আস্তানায়।

সন্ধে নেমে এল। পুরো দলকে মাঠে ছড়িয়ে দিয়ে শচী ও প্রদীপ বসল কালর্ভাটের ওপর। ঘড়ি এগিয়ে চলেছে। দৃষ্টি মিঃ দাসশর্মার কোয়ার্টারের দিকে।

দূর থেকে কোনও এক বস্তি থেকে ঢোলের বেসুরো তালের সঙ্গে ভেসে আসছে রামধুন। তারই পাল্টা হিসাবে অন্যদিক থেকে আসছে হিন্দি ছবির চটুল গান। এই সুর আর গানের সঙ্গে মিলিয়েই যেন কালর্ভাটের নিচ দিয়ে কুলকুল ধ্বনিতে বয়ে যাচ্ছে জল।

রাত সাড়ে আটটা। হঠাৎ একটা দেশলাই কাঠি জ্বলে উঠল মিঃ দাসশর্মার কোয়ার্টারের সদর দরজার সামনে। তাহলে কি আসেনি? নিতাই কি নবদ্বীপ ছাড়েনি? ভাবনা মিলিয়ে যাওয়ার আগেই দ্বিতীয় কাঠিটা জ্বলজ্বল করে জ্বলতে লাগল শচীদের দুঃশ্চিন্তার ধোঁয়া নিভিয়ে দেবার জন্য। ওরা উঠে দাঁড়াল। পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী এগিয়ে চলল। মিঃ দাসশর্মা দেশলাই কাঠি জ্বালিয়ে সদর দরজা বন্ধ করে ভেতরে ঢুকে গেছেন।

শচী স্থানীয় দু'জন সিপাই ও আমাদের একজন কনস্টেবলকে নিয়ে কোয়ার্টারের পেছন দিকে গিয়ে দাঁড়াল, যাতে প্রদীপরা সামনে গিয়ে দরজায় ঘা দিলে আসামি পেছন দিক দিয়ে পালাতে না পারে। প্রদীপ সদরে গিয়ে দরজা খোলার জন্য টোকা দিতে লাগল।

ভেতর থেকে মিঃ দাসশর্মা বেশ উঁচু গলায় প্রশ্ন করলেন, "কৌন হ্যায়?"

পরিষ্কার বাংলায় প্রদীপ উত্তর দিল, "একটু দরজা খুলুন, দরকার আছে।"

কি দরকার আছে মিঃ দাসশর্মা ভালই জানেন, তবু নিজেকে নিরপেক্ষ প্রমাণ করার জন্য বেশ চিৎকার করে বললেন, "আরে কে সেটাই তো জিজ্ঞেস করছি।"

প্রদীপ বলল, "খুললেই বুঝতে পারবেন, আমরা ডাকাত নই, ভয়ের কিছু নেই।"

মিঃ দাসশর্মা দরজা খোলার জন্য এগিয়ে গেলেন। মুখে বলতে লাগলেন, "কে রে বাবা, কিছু বলে না কেন?"

নিতাই মাহাতো জেল-পলাতক আসামি। সবসময় সন্ত্রস্ত, অতিরিক্ত সতর্ক। শব্দে গন্ধে বিপদের বার্তা অনুমান করার চেষ্টা করে। জানে, সামান্য পিছলেই সোজা আবার জেলের ভেতর সশরীরে ভূপতিত হবে। আজিজুল সহ অনেকেরই যে সেই গতি হয়েছে সেটাও জানে। সে তাই মিঃ দাসশর্মা সদর দরজা

খুলতে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নিজের বাঁচার রাস্তা পরিষ্কার রাখার জন্য কোয়ার্টারের পেছনের দরজাটা খুলে রাখতে গেল। সন্দেহ সঠিক হলে ওই রাস্তা ধরে আবার নিরুদ্দেশ হয়ে যাবে।

মোটা কাঠের দরজার কাঠের আলগা খিল। যতটা সম্ভব কম আওয়াজ করে নিতাই সেটা খুলল। বাইরে দাঁড়িয়ে শচীসহ সিপাইদের কানে অবশ্যই সেই অল্প শব্দও পরিষ্কারভাবে প্রবেশ করল। নিতাই খিলটা হাতে রেখেই কপাটটা টেনে খুলে রেখে পালানোর সামান্য বাধাও সরিয়ে রাখতে গিয়েই স্তম্ভিত।

বাইরে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে চারটে ছায়ামূর্তি। যেটুকু বিবরণ নিতাইয়ের চেহারা সম্পর্কে শচী জানত তাতেই সে বুঝে গেছে খিল হাতে ওর সমানে পাথর হয়ে যে দাঁড়িয়ে আছে ওরই জন্যই তারা আজ ভোরে হাওড়া স্টেশনে ট্রেন ধরে ধানবাদে এসেছে।

নিতাইকে কোনও ভাবনার সময় না দিয়েই শচী সোজা লাফ মেরে খিল সমেত ওকে জাপটে ধরল। শচীকে সাহায্য করতে বাকি কনস্টেবলরা এগিয়ে এসে নিতাইকে শক্ত হাতে ধরে দড়ি দিয়ে ওর হাত বেঁধে দিল। আলগা হয়ে খিল মেঝেতে ঝপাং করে পড়ে গেল। সদর দরজা দিয়ে ঢুকে প্রদীপরাও পেছনের দিকে চলে এসেছে। সঙ্গে মিঃ দাসশর্মা। তিনি খানিকটা অভিনয় করলেন। কি কারণে নিতাইকে গ্রেফতার করা হলো জানতে চাইলে শচীরা 'পরে শুনতে পাবেন' বলে নিতাইকে নিয়ে থানার দিকে না গিয়ে প্রথমেই দুলাল চক্রবর্তীর বাড়িতে ফিরে এল।

থানায় নিয়ে না যাওয়ার প্রধান কারণ, কাগজে কলমে গ্রেফতারি লুকিয়ে রাখা। একবার গ্রেফতারী দেখালেই আসামিকে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আদালতে হাজির করাতে হবে এবং আদালতের অনুমতি নিয়েই তাকে নিয়ে আসা যা... শচীরা ওই পথে না গিয়ে তাই নিতাইকে নিয়ে নিজেদের আয়ত্তে রাখল।

নিতাইয়ের আসল বাড়ি মুর্শিদাবাদের বহরমপুরের গোরাবাজারে। কালো, মাঝারি উচ্চতার, গাট্টাগোট্টা বছর তিরিশ একত্রিশের যুবক নিতাইয়ের মুখ একবার দেখলেই চিহ্নিত করতে কোনও অসুবিধাই হবে না। কারণ মুখের গরন ছিল চৌকা ধরনের, জোরা ভ্রূর নিচে চোখ দুটো কোটরে। আবার বাঁ চোখের তলায় গভীর একটা কাটা দাগ। কণ্ঠনালী ঝুলে আছে সামনের দিকে।

শচীরা গ্রেফতারের খবর আমাকে জানাতেই পরদিন ভোরবেলা আমি

উমাশংকর ও অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে একটা গাড়িতে চড়ে বেরিয়ে পড়লাম ধানবাদের উদ্দেশে।

দুপুরের রোদ মাথায় নিয়ে আমরা দুলালবাবুর বাড়িতে পৌঁছালাম। আসামি দেখলাম। শচী ও প্রদীপরা বেশ মেজাজেই আছে। নিতাইয়ের চালচলন ও কথাবার্তায় প্রথমেই আমার মনে হলো একে দিয়ে আমার 'কাজ' হবে।

আমি ওকে সরাসরি বললাম, "এই নিতাই তুই চা বানাতে পারিস।" নিতাই ওর মুর্শিদাবাদি স্বরে বলল, "চা কেন, আমি অনেক কিছুই বানাইতে পারি।"

"তবে বানা। আগে তোর হাতের চা খাই।" আমি বলার সঙ্গে সঙ্গে নিতাই দুলালবাবুর রান্নাঘরের দিকে চলে গেল। নিতাইকে প্রায় বিনা পাহারাতেই শচীরা ছেড়ে রেখেছে।

দশ মিনিটের মধ্যে নিতাই একেবারে ট্রেতে সাজিয়ে আমাদের জন্য চা নিয়ে এল।

কাপ হাতে নিয়ে নিতাইকে বললাম, "বস।" নিতাই আমাদের মাঝখানে মেঝেতে বসল।

বললাম, "বল।" নিতাই শচী ও প্রদীপকে আগের দিন রাতে অনেক কথাই বলেছিল। সেই বলা কথাগুলোই আবার বলল। তাছাড়া জেল থেকে পালিয়ে কোথায় কোথায় ঠোক্কর খেতে খেতে ধানবাদে এসে পৌঁছেছিল তাও জানাল। ধানবাদ অঞ্চলে জেল-পলাতক আর কোন আসামি আছে তাও বলল।

সব শুনে বললাম, "দেখ নিতাই, তোকে আমরা কিছু বলব না। তুই শুধু ওদের ধরিয়ে দে।"

নিতাই এক কথাতেই রাজি হয়ে গেল। এরপর নিতাইকে চোপ রেখে কিভাবে ওর অন্য কমরেডদের গ্রেফতার করা যায় তার একটা রূপরেখা আঁকা হলো।

এরপর নিতাইকে দুলালবাবুর বাড়িতে একা রেখেই আমরা আমাদের মতো বেরিয়ে পড়তাম। নিতাই আমাদের জন্য রান্না করে রাখত। আমরা ফিরে এসে খেতাম।

নিতাইও নিতাইয়ের কাজে নেমে পড়েছিল। রূপরেখা অনুযায়ী ও ওই অঞ্চলের ওদের কমরেডদের সঙ্গে একাই যোগাযোগ করে ঝরিয়ার একটা বাড়িতে বারো তারিখ রাতে আলোচনাসভা ডাকল। আলোচনার বিষয়বস্তু, 'ভেঙ্গে পরা সংগঠনকে কিভাবে নতুন করে গুছিয়ে গড়া যায়।' ওই আলোচনায় যোগ দেবে জেল-পলাতক দু'জন নকশাল তরুণ।

বারো তারিখ সকালে নিতাই শচীকে নিয়ে সভাগৃহটা দেখিয়ে দিল। প্রায় বরাকরের কাছাকাছি একটা পুরনো পরিত্যক্ত কোয়ার্টার। কোনও কয়লাখনির কর্মচারীদের একসময়কার বাসস্থল। দরজা আছে, জানালায় কপাট বা কোনও রকম আড়াল নেই। ফাঁকা। ওই বাড়ির ভেতরেই অন্ধকারে রাত আটটায় বরাকর ঝরিয়া অঞ্চলের নকশালরা আলোচনায় বসে ঠিক করবে কিভাবে, কোন পথে তারা আবার মাথা ঝাঁকিয়ে উঠে বসবে। নিতাইদের উদ্যোগে সবাই ওখানে একত্রিত হয়ে গুরুগম্ভীর আলোচনায় মগ্ন হবে। ঠিক আছে, ওরা আটটায় সভা শুরু করবে, আর আমরা ন'টা নাগাদ ওই বাড়ি ঘিরে ফেলব। তারপর আমরা আমাদের কাজ সমাধা করে কলকাতার রাস্তায় গাড়ি ছুটিয়ে দেব।

দুপুরবেলা আমরা বেশ জমিয়ে খেয়ে ছোট করে ভাতঘুম দিলাম। বিকেলবেলা নিতাই চলে গেল। আহ্বায়ককে মিটিংয়ে একটু আগেই যেতে হয়। এটাই নিয়ম। সেই নিয়মকে সম্মান জানাতেই নিতাইয়ের প্রস্থান।

শচী ও প্রদীপ স্থানীয় থানায় গিয়ে ফোর্সের বন্দোবস্ত করল। তিনটে গাড়ি নিয়ে আমরা সন্ধে সাতটা নাগাদ বেরিয়ে গেলাম একটা অদ্ভুত হানা দিতে। আসামি দিয়ে অন্য আসামিদের গ্রেফতার করতে। শিক্ষিত হাতি দিয়ে যেমন বন্য হাতিকে ধরা হয়, পদ্ধতিটা অনেকটা ওই রকম। আমাদের হানা সার্থক হবে নিতাইয়ের চতুর পদক্ষেপের ওপর। উল্টে বলা যায় ওর কমরেডদের সঙ্গে ও কত সুন্দর অভিনয় করে বিশ্বাসভঙ্গ করতে পারে তার ওপর। সকালে শচী ওই বাড়িটা দেখে এসেছে, সুতরাং আমাদের যেতে কোনও অসুবিধাই হলো না।

পৌনে ন'টার সময় শচীরই নির্দেশে তিনটে গাড়ি বাড়িটা থেকে অনেকটা দূরে রাখা হলো। পরস্পরের থেকে বেশ খানিকটা করে দূরত্ব বজায় রেখে। তারপর আমরা বাড়িটার দিকে পায়ে পায়ে এগিয়ে যেতে শুরু করলাম। আস্তে আস্তে আমরা অন্ধকারে মিশে যেতে লাগলাম। বাড়িটা ক্রমশ এগিয়ে আসতে লাগল। জানালার খোলা জায়গা দিয়ে দেখতে পেলাম বাড়ির ভেতরের মৃদু আলো। সম্ভবত মোমবাতি জ্বালিয়ে ওরা গোল হয়ে বসে 'বিপ্লবের' অগ্রগতি সম্বন্ধে আলোচনা শুরু করেছে।

ঠিক ন'টার সময় ওই বাড়িটাকে ঘেরাও করা সম্পন্ন হলো। তখনও জানি না, টোপের আকর্ষণে আমাদের দুই লক্ষ্যবস্তু ভেতরে এসে বসেছে কিনা, যদিও আমাদেরই পরিকল্পিত মিটিং তবু আমরা সতর্ক, কারণ নিতাই যদি বিপরীত ভাবে বিশ্বাসভঙ্গ করে তবে আমাদের বিপদ। আমাদের অস্ত্রে আমাদেরই ঘায়েল করতে পারে।

বন্ধ দরজার কপাট ঠেলতেই আওয়াজ করে খুলে গেল। অরুণ আর শচী সামনে আমি আর উমাশংকর ঠিক ওদের পেছনে। প্রদীপ বাইরের ফোর্সের তদারকিতে।

দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে নকশালদের কেউ একজন ঝপ করে মাঝখানে রাখা মোমবাতিটা নিবিয়ে দিল। অন্ধকার। হুমকি ছাড়লাম। "কেউ নড়বি না।" কিন্তু তা কি হয়? বন্দি হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে যে কোনও প্রাণীই পালানোর চেষ্টা করে।

ধুপধাপ আওয়াজের মধ্যে শচীর হাতের টর্চ তীব্র হয়ে জ্বলে উঠতেই দেখা গেল দশ বারজন যুবক ভীত চোখে আগন্তুকের পরিচয় জানার চেষ্টায় দরজার দিকে দৃষ্টি ফেলে পালানোর উপায় খুঁজছে। কেউ দাঁড়িয়ে আছে, কেউ তখনও বসে, কেউ বা হামাগুড়ির ভঙ্গিমায়। আলো জ্বলে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই দেখলাম এক তরুণ খোলা জানালার খালি জায়গা দিয়ে লাফিয়ে পালানোর চেষ্টা করার সঙ্গে সঙ্গেই বসে থাকা একজন নকশাল নিচ থেকে ওর পা টেনে ধরে ওর প্রয়াস ব্যর্থ করে দিচ্ছে।

দেখলাম, নিচ থেকে যে পালাতে উদ্যত তরুণের পা চেপে ধরে আছে সে আর কেউ নয়, আমাদের টোপ নিতাই মাহাতো। ওই তরুণ জানালার খোলা জায়গার ইঁট চেপে ধরে ছটফট করছে আর বলছে, "এই নিতাই কি করছিস কি, ছাড়।"

নিতাই বলছে, "ছাড়ব না।" অরুণ এগিয়ে গিয়ে ওই তরুণের একটা হাত চেপে ধরতেই নিতাই পা ছেড়ে দিল। বলল, "গৌর, বেকার চেষ্টা করছিস, পুরো বাড়িই ঘেরা, পালাতে গেলে গুলি খেতিস।"

গৌর ওর দিকে কটমট করে তাকিয়ে রইল। দঙ্গলের মধ্যে থেকে আর একটা ছেলেকে গ্রেফতার করলাম। প্রদীপ সেনগুপ্ত। এই দু'জনই জেল পলাতক আসামি। বাকিরা ঝরিয়া বরাকর অঞ্চলের নকশাল। ওদের বিরুদ্ধে আমাদের কোনও অভিযোগ নেই। তাই গ্রেফতারও করলাম না। ওরা 'বিপ্লব' করুক।

আমরা প্রদীপ, নিতাই আর গৌরকে নিয়ে রাস্তায় অন্ধকারে দাঁড়ানো গাড়িতে নিয়ে গিয়ে উঠলাম। যাত্রা শুরু করলাম কলকাতার দিকে। গৌর উত্তর চব্বিশ পরগনার হাবড়া অঞ্চলের হিজলাপুকুর গ্রামের ছেলে। চুয়াত্তরের মার্চ মাস থেকে বিচারাধীন বন্দি হিসাবে প্রেসিডেন্সি জেলের দড়ি হাজতে ছিল। জেল ভাঙ্গার দিন ছুরি হাতে রামযুধ সিংকে আক্রমণও করেছে। প্রদীপ ঝরিয়ারই বাসিন্দা। গ্রেফতার হয়ে আলিপুর স্পেশাল জেলে প্রথমে বন্দি থাকার পর চিকিৎসার জন্য সে ফেব্রুয়ারির তিন তারিখে প্রেসিডেন্সি

জেলে বদলি হয়ে যায়। ওখানে চার নম্বর ওয়ার্ডে থাকার সুযোগে প্রণবের কাছ থেকে জেল পালানোর ষড়যন্ত্রের খবর শুনে নিজেও দলে যুক্ত হয়ে যায়। পালায়।

তেরোই জুন ভোরবেলায় ওদের তিনজনকে নিয়ে আমরা লালবাজারে এসে পৌঁছালাম। আমরা গৌর ও প্রদীপকে আদালতে হাজির করালাম। নিতাইকে আদালতে নিয়ে গেলাম না। ওকে যে আমরা গ্রেফতার করেছি তা গোপনই রাখলাম। কারণ ওকে দিয়ে আরও 'কাজ' করাতে পারব এই আশায়। সুতরাং লালবাজারে অনির্দিষ্টকাল রাখতে পারব। একবার আদালতে গ্রেফতারী নথিভুক্ত করালে তো আর অনির্দিষ্টকাল আমাদের হেফাজতে রাখতে পারব না। জেলে পাঠিয়ে দিতে হবে। এইভাবে আদালতের অগোচরে রাখাটা বেআইনী। এই বেআইনী পদ্ধতি আমরা এর আগে এবং পরেও নিয়েছি। অবশ্যই ওইসব আসামির সাহায্যে অন্য আত্মগোপনকারী আসামিদের গ্রেফতার করার জন্য। যে আসামিরা সাহায্য করে তাদেরই আমরা এইভাবে ব্যবহার করেছি।

যে রাতে অর্থাৎ বারোই জুন রাতে যখন আমরা গৌর আর প্রদীপকে বিহার বাংলার সীমান্ত অঞ্চলে নাটকের মঞ্চ সাজিয়ে গ্রেফতার করি, ঠিক সেই সময়ই আমাদের অফিসার অমিত মজুমদার একটা ছোট দল নিয়ে মৌড়িগ্রাম-আন্দুল অঞ্চল থেকে গ্রেফতার করে আনল জেল ভাঙ্গার বাইরের অংশের অন্যতম ষড়যন্ত্রকারী স্বপন বসু ওরফে রামকে।

স্বপন যে বাড়িতে আত্মগোপন করেছিল সেই বাড়ির গৃহকর্তা দীপক ধরই সেদিন বিকেলে নিজে লালবাজারে আমাদের দফতরে হাজির হয়। আমি তখন ধানবাদে। দীপকবাবু আমাদের নকশাল দমন শাখায় তার আগমনের কারণ জানায়।

সেই কারণ অনুযায়ী অমিত একটা দল নিয়ে দীপকবাবুর সঙ্গে চলে যায় হাওড়ার মৌড়িগ্রামে। স্টেশনের কাছেই গাড়ি রেখে দক্ষিণ দিকে রেললাইন বরাবর এগিয়ে যায়। পথনির্দেশক দীপকবাবুই তাদের আমন্ত্রণ জানায়। স্বপনকে গ্রেফতার করে অমিতরা নিয়ে আসে লালবাজারে। সরকারী কর্মচারী স্বপন একসময় বিবাদী বাগে সক্রিয়ভাবে নকশাল আন্দোলনে জড়িয়ে যায়। বাহাত্তর সাল থেকে আত্মগোপন করে মেদিনীপুর ও হাওড়া জেলায় ওদের পার্টির সংগঠন তৈরিতে নিজেকে নিয়োগ করে। জেল ভাঙ্গার কাণ্ডারীদের অন্যতম স্বপন এতদিন গ্রেফতার এড়িয়ে চললেও নিজেদের সমর্থকদের দ্বারাই সে শেষ পর্যন্ত ধরা পড়ে।

স্বপনকেও আমরা আদালতে হাজির করালাম না। কারণ ওদের মূল

যোগাযোগকারী হিসাবে অনেকের গতিবিধিই ও জানত। সেটাই আমাদের জানতে হবে এবং ওর সাহায্য আমাদের নিতে হবে। দু'একদিনের মধ্যেই আমার প্রতি ওর আস্থা আমি অর্জন করে নিলাম।

মেদিনীপুরে ওদের অন্যতম প্রধান সংগঠক তুহিন সামন্তের খবর পেলাম। তমলুকে ওকে গ্রেফতার করল প্রদীপ ঘোষ ও শচী।

গ্রেফতার করার পর প্রদীপরা ওকে নিয়ম অনুযায়ী নিয়ে এল তমলুক থানায়। তুহিন সামন্তের গ্রেফতারের খবর শুনে তখনকার মেদিনীপুর জেলার পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট রজত মজুমদার নিজে চলে এলেন তমলুক থানায়। আসামিকে নিয়ে আরও দু'একটা জায়গায় হানা দেওয়ার অজুহাতে তুহিনকে নিয়ে সোজা নিজের জিপে চড়ে উধাও হয়ে গেলেন। প্রদীপরা থানাতেই অপেক্ষা করতে লাগল। মজুমদার সাহেব ফিরলে তারা আসামিকে নিয়ে কলকাতার দিকে যাত্রা করবে।

এক ঘণ্টা পার হয়ে গেল, অথচ 'আধঘণ্টার মধ্যে ফিরছি' এই কথা বলে গিয়েছিলেন মজুমদার সাহেব। প্রদীপরা স্বভাবতই খানিকটা উদ্বিগ্ন। ওরা আমাকে লালবাজারে সমস্ত ব্যাপারটা ফোন করে জানাল। থানার অফিসার-ইন-চার্জের কাছে জানতে চাইল, মজুমদার সাহেবের ফিরতে কি কারণে দেরি হচ্ছে। তিনি উত্তর এড়িয়ে গিয়ে শুধু একই রেকর্ড বারবার বাজিয়ে গেলেন, "আসবেন, আসবেন।"

টেলিফোনে প্রদীপের কথা শুনে আমার কেমন একটা সন্দেহ হলো, বললাম, "তোমরা চলে এস। ওদের বলে এস, আসামিকে যেন লালবাজারে ওরা পাঠিয়ে দেয়।"

তুহিনের সঙ্গে প্রেসিডেন্সি জেল ভাঙ্গার সরাসরি কোনও যোগ ছিল না। সে শুধু ওদের কমরেডদের আত্মগোপন করার ব্যবস্থা করত। যে স্বল্পসংখ্যক সমর্থক ও কর্মী তখনও এদিক ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল তাদেরকে পুঁজি করেই তুহিনরা জেল-পলাতকদের গোপন আস্তানার ব্যবস্থা করত।

কিন্তু এদের অভিজ্ঞতা এত কম যে, এরা বুঝতই না এতজন চিহ্নিত জেল-ভাঙ্গা আসামিকে লুকিয়ে রাখতে কত বড় এবং ব্যাপক সংগঠন দরকার। দরকার কতখানি জনসমর্থন। এই বোধ ছিল না বলেই ওদের মূল সংগঠকও আমাদের হাতে ধরা পড়ে লালবাজারে চলে এল।

আমার নির্দেশ পেয়ে প্রদীপরা তাদের গাড়ি কলকাতার দিকে ছুটিয়ে দিল। ঘণ্টা তিনেক অপেক্ষা করে আমি লালবাজার থেকে বেরিয়ে আমার সন্দেহ সঠিক কিনা তা যাচাই করতে লর্ড সিনহা রোডের আই বি'র অফিসে এসে হাজির হলাম।

আমার সন্দেহ অমূলক নয়। ঢুকেই শুনলাম, মজুমদার সাহেব মেদিনীপুর থেকে এক নকশাল নেতাকে গ্রেফতার করে সোজা এখানে নিয়ে এসেছেন। মজুমদার সাহেবের কী উদ্দেশ্য সেটা আমি আগেই বুঝে গিয়ে আই বি'র অফিসে এসেছি, সেটা প্রমাণিত হতেই আমার পেটের ভেতর মোচড় দিয়ে গুরগুর করে হাসির হল্লা অনুভব করলাম। মুখে তার আলতো ছোঁয়া ফুটে বের হলেও মূর্তিমান হয়ে প্রকাশ পেল না। নাটক যে জমে যাবে তা আমি তখনই টের পেলাম।

তখন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুলিশের আই জি ছিলেন অমিয় সামন্ত। মজুমদার সাহেবের 'হাতে' ধৃত আসামিকে দেখতে তিনিও লর্ড সিনহা রোডে চলে এসেছেন। মজুমদার সাহেব আমি আসার আগেই বোধহয় সবিস্তারে কিভাবে তুহিনকে গ্রেফতার করেছেন সেই ঘটনা তাঁকে বলছিলেন। আমার আগমনের খবর শুনে সামন্ত সাহেব তার ঘরে আমাকে ডেকে পাঠালেন। ওখানে মজুমদার সাহেব ছাড়া আরও বেশ ক'জন উচ্চপদস্থ অফিসার আছেন। ধৃত আসামিও এক কোণায় চুপচাপ বসে আছে।

মজুমদার সাহেব বহুদিনের পরিচিত। তিনি যখন পুলিশে চাকরি করতেন না, আই পি এস হননি, তখন থেকেই আমরা পরিচিত। আমার সঙ্গে একাত্তর সালে শুধু মাত্র অ্যাডভেঞ্চারের নেশায় দমদমে একবার নকশালদের কিভাবে মোকাবিলা করি তা দেখতে গিয়েছিলেন।

আমাকে দেখেই তিনি বলে উঠলেন, "এই তো আপনাকেই খুঁজছিলাম, একটা আসামিকে আপনাদের হাতে দেওয়ার জন্য আজই গ্রেফতার করেছি।" আমি নিজের পেটের ভেতর হাসির হল্লা দমন করে কোনও মতে জানতে চাইলাম, "কোথা থেকে গ্রেফতার করেছেন স্যার?" তিনি জায়গার নামটা সত্যই বললেন, "তমলুক থেকে।"

আমি এবার সরাসরি আই জি সামন্ত সাহেবের দিকে তাকিয়ে বললাম, "কিন্তু স্যার, ওই আসামিকে তো মজুমদার সাহেব গ্রেফতার করেননি, গ্রেফতার করেছে আমাদের অফিসাররা।"

সামন্ত সাহেব আমার কথা শুনে খানিকটা বোধহয় অবাকই হলেন। বললেন, "সে কি করে হয়, রজত বলছে ওরা ধরেছে।"

সমস্ত ব্যাপারটা আমার কাছে একেবারে পরিষ্কার হয়ে গেছে। আমাদের বদলে মজুমদার সাহেব নিজেদের ভাগে কৃতিত্বটা নেওয়ার জন্য এই রকম একটা কাণ্ড করে বসেছেন।

মজুমদার সাহেবকে অপদস্থ করার আমার ব্যক্তিগতভাবে কোনও রকম ইচ্ছা নেই। কিন্তু এখানে যে আমি কলকাতা পুলিশের প্রতিনিধি। কি করব

ভেবে পাচ্ছি না। একবার ভাবছি চুপ করে যাই। আমাদের বদলে ওরা যখন কৃতিত্বটা চাইছেন, আমরা দাবি প্রত্যাহার করে নিই। কারণ শেষফল তো সেই একই! আসামি তো আমাদের হাতেই আসবে। কিন্তু যে অলিখিত প্রতিযোগিতা আমাদের ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুলিশের মধ্যে আছে সেই প্রতিযোগিতার অহমিকাবোধ আমাকে চুপ থাকতে দিল না।

আমি সামন্ত সাহেবকে বললাম, "স্যার, আমাদের অফিসাররা তুহিনকে গ্রেফতার না করলে আমি কি করে এখানে এলাম? ওদের কাছে খবর পেয়েই আমি এসেছি।"

সামন্ত সাহেবের ভ্রূ সামান্য কুচকে গেল। মজুমদার সাহেব বললেন, "ভুল শুনেছেন, আমাদের তমলুকের ফোর্স ওকে ধরার পর আপনাদের দু'চারজন ওখানে যায়। ওরাই বোধহয় আপনাকে খবর পাঠিয়েছে।"

এই রকম অবস্থার কোনও দিন মোকাবিলা করতে হয়নি। কে কোন আসামিকে গ্রেফতার করেছে এই টানাপোড়েনের মুখোমুখিও হইনি। কিভাবে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করব ভেবে পাচ্ছি না। সাধারণ কেউ হলে ধমক ধামক দিয়েই সত্য স্বীকার করিয়ে নিতে পারতাম। কিন্তু এক উচ্চপদস্থ আই পি এসকে তো আর অসম্মানজনক কোনও কথা বলা যায় না। তার ওপর একেবারে সামন্ত সাহেবের সামনে।

মনে হলো, সামন্ত সাহেবকে বলে দিই কিভাবে মজুমদার সাহেব আসামিকে আমাদের অফিসারদের বসিয়ে রেখে কলকাতায় নিয়ে এসেছেন। বললাম না।

তবু উত্তর একটা দিতে হবে। বললাম, "না স্যার। আপনি যে এখানে আসামিকে নিয়ে আসছেন তা ওরা জানেই না। আমাকে পুরো ঘটনাটা বলতে আমিই অনুমান করে এখানে চলে এসেছি। এবং সেটা যে সত্যি তাও দেখতে পাচ্ছি।"

মজুমদার সাহেব কি বলতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় সামন্ত সাহেবের আর্দালি এসে আমাকে বলল, "স্যার লালবাজার থেকে আপনার খোঁজে ক'জন এসেছেন, তারা বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন, আপনার অপেক্ষায়।" ওর খবরের জন্যই একটা কান আমার সজাগ ছিল। কারণ লালবাজার থেকে এখানে আসার সময় আমি আমার দফতরে বলে এসেছিলাম, প্রদীপরা লালবাজারে ফেরার সঙ্গে সঙ্গেই তাদের যেন লর্ড সিনহা রোডে আই বির অফিসে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। পরিস্থিতি যে মসৃণ হবে না, সেটা টের পেয়েই আমার আগাম সতর্কতা।

আর্দালির খবর শুনে আমি সামন্ত সাহেবের অনুমতি নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম। প্রদীপ ও শচী দাঁড়িয়ে আছে। ওদের সঙ্গে দু'চার কথা বলে আমি ওদের সঙ্গে নিয়েই আবার সামন্ত সাহেবের চেম্বারে ঢুকলাম। এবার আর এটা ওটা ফেলে দান নেওয়ার চেষ্টা নয়, সরাসরি রঙের টেক্কা আসরে ফেলে প্রতিপক্ষকে মাৎ করার জন্য সামন্তসাহেবের সামনে দাঁড়িয়ে বললাম, "স্যার ওরা যখন বলছেন, আসামিকে ওরা গ্রেফতার করেছেন, তাহলে ওদের বলুন না, আসামির হাতে যে হ্যান্ডকাপ লাগানো আছে তার চাবিটা দেখাতে।"

কথাটা বলে জিতে গেছি এমন ভাব করে আমি একবার মজুমদার সাহেবের মুখের দিকে তাকালাম। ফ্যাকাসে মুখ দেখেই বুঝে গেছি মজুমদার সাহেবের হাতের সুতোয় বাঁধা ঘুড়ি ভোঁ কাট্টা হয়ে নাচতে নাচতে আকাশের অনিশ্চিত হাওয়ায় উড়ে গেছে। তিনি তবু লাটাইয়ের সুতো গোটানোর চেষ্টায় একবার নিজের ট্রাউজারের পকেট হাতড়াতে লাগলেন। ভাবখানা, চাবিটা খুঁজছেন, পাচ্ছেন না।

প্রদীপ ততক্ষণে তার পকেটে রাখা হাতকড়ির চাবিটা বের করে সামন্ত সাহেবের দিকে দেখিয়ে বলল, "এই যে স্যার, আমার কাছে চাবি। আমিই ওকে গ্রেফতার করে হ্যান্ডকাপ লাগিয়েছি। তখন থেকে এটা আমার কাছে।" এরপর আর কি বলার আছে?

প্রদীপ তুহিনের দিকে এগিয়ে গিয়ে চাবি দিয়ে হাতকড়ি একবার খুলে আবার লাগিয়ে দিয়ে চাবির সঠিকত্ব প্রমাণ করে দিল। সবাই চুপ। কিছু যে বলার নেই।

আমিই সামন্ত সাহেবকে বললাম, "এবার আমরা আসামিকে নিয়ে যাই স্যার।"

তিনি বললেন, "হ্যাঁ।" মজুমদার সাহেব বেকায়দায় পরে বলে উঠলেন, "আরে আমি ওদের হাতেই আসামিকে তুলে দেওয়ার জন্যই তো এসেছি।" সামন্তসাহেব উত্তরে কি বললেন তা আর শোনার অপেক্ষায় না থেকে আমরা তুহিনকে নিয়ে বেরিয়ে এলাম। জানি না, তারপরে মজুমদার সাহেবকে কি পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হয়েছে।

তুহিনকে নিয়ে আমাদের বেশি পরিশ্রম করতে হয়নি। নিজের থেকেই বিস্তৃতভাবে ওদের পরিস্থিতির পূর্ণ বিবরণ আমাদের জানিয়ে দিল। আসলে ওরা নিজেরাই নিজেদের অবস্থান সম্পর্কে এত হতাশ হয়ে গিয়েছিল যে, যতটা জেদ ও রাজনীতির ওপর আস্থা থাকলে নির্ভর করা যায়, সেটাই

আর ওরা দেখতে পাচ্ছিল না। তাই গ্রেফতারের সঙ্গে সঙ্গে ওদের মিছিল করে ভেঙ্গে পড়া।

পরদিনই নির্দিষ্ট খবরের ভিত্তিতে শচী ও অমিত মজুমদার ঘাটাল থেকে গ্রেফতার করল জেল ভাঙ্গার অন্যতম নেতা অজিত চক্রবর্তী ও রবীন পাত্রকে। তেত্রিশ চৌত্রিশ বয়সের অজিতের ডাকনাম ছিল বেনু, তাছাড়া ওকে ওর কমরেডরা টেরামাস্টার নামেও ডাকত। কারণ ওর দৃষ্টিটা ছিল টেরা। বাহাত্তর সাল থেকে অজিত প্রেসিডেন্সি জেলের পয়লা বাইশের সেলে বন্দি ছিল।

মধ্য কলকাতার পঞ্চাননতলা লেনের রবীন মিশায় বন্দি হিসাবে সতের নম্বর ওয়ার্ডে থাকত। ঘাটাল থেকে গ্রেফতার করে শচী ও অমিত ওদের সোজা লালবাজারে এনে তুলল। এদের গ্রেফতারীও গোপন রাখলাম। কারণ ততক্ষণে আমরা নিশিথ ভট্টাচার্যের আস্তানার সন্ধানের একটা সূত্র পেয়ে গেছি। ওদের দুজনের খবর পেয়ে গেলে নিশিথবাবু যদি আবার মিলিয়ে যান, এই আশংকাতেই এত গোপনীয়তা।

অদ্ভুত খবর পেয়েছি। খবর হলো, হুগলির খানাকুলে একটা নতুন কালভার্ট হয়েছে। তার কাছেই একটা প্রাইমারি স্কুল আছে। সেখানে তিনি শিক্ষকতা করছেন। এবং সেই সূত্রেই স্কুলের কাছে গ্রামের ভেতর এক কৃষকের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছেন।

কোথায় পাব তারে? নতুন কালভার্টটারে?

খানাকুল তো আর একেবারে ছোট জায়গা নয়, যে অল্প আয়াসেই কালভার্ট পেয়ে যাবে, আর তার কাছে প্রাইমারি স্কুল এবং সেই কৃষকের বাড়ি, যেখানে অন্য পরিচয় দিয়ে আত্মগোপন করে আছেন জেল পলাতক নকশাল নেতা নিশিথ ভট্টাচার্য। আমরা রওনা হওয়ার আগে ঠিক করে নিয়েছি খানাকুল থানায় আমরা কোনও আগাম খবর জানাব না কিংবা ওদের কাছে নতুন কালভার্টের ঠিকানাও জিজ্ঞাসা করব না। কারণ অভিজ্ঞতায় আমরা দেখেছি ওই সব অঞ্চলে হাওয়ার চেয়েও দ্রুত খবর ছড়িয়ে পড়ে এবং অনিবার্যভাবে তা আসামির সজাগ কানে পৌঁছে গিয়ে আমাদের অভিযান ব্যর্থ করে দেয়। সুতরাং সেই ঝুঁকি নিতে যাব কেন? যা করার আমরাই করব, তার জন্য যত সময় এবং পরিশ্রমই হোক না কেন। আর বাধ্য হয়ে যদি স্থানীয় থানার সাহায্য নিতেই হয় তবে তা নেব অন্যভাবে। পরিস্থিতি বিবেচনা করে।

আমরা তিনটেয় গাড়িতে দুপুরবেলা অফিসার আর কনস্টেবলরা খানাকুলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম।

সন্ধের সামান্য আগে আমরা পৌঁছে গেলাম। শ্রাবণের শেষ। চারদিকে মাঠের ভেতর কোমর পর্যন্ত জলে শরীর ডুবিয়ে ধানগাছ মাঠে দাঁড়িয়ে আছে। তার শরীর থেকে সবুজ আলো ঠিকরে বের হচ্ছে।

চারদিকে খানা নালা পুকুর সব জলে টইটুম্বুর। কৃষকেরা এখন মাছ ধরতে ব্যস্ত। হাঁটুর অনেকটা উপরে গামছা বা একটা ছোট ন্যাকড়া মতো জড়িয়ে তার সঙ্গে একটা দড়ি বাঁধা টুকরি কোমরে ঝুলিয়ে হাতে হাতে খেপলা জাল বা ঝাঁপ জাল নিয়ে এদিক ওদিক ঘুরছে। কাদামাটির রাস্তায় আমাদের জুতো পরা পা পিছলে পিছলে বাধা সৃষ্টি করলেও ওদের অভ্যস্ত খালি পা নির্বিঘ্নে পৃথিবীর বুকে ছুটছে।

আমাদের মতো আগন্তুকদের দিকে ওরা কৌতূহল নিয়ে বারবার দৃষ্টি ফেললেও জানতে চাইছে না আমাদের হঠাৎ কি কারণে আগমন। কী আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে আমরা ওদের অঞ্চলে হাজির।

আমরা এখানে খুঁজতে এসেছি একটা নতুন কালভার্ট, যার কাছেই আছে একটা প্রাইমারি স্কুল। প্রথমে আমাদের ওই নতুন কালভার্টকে আবিষ্কার করতে হবে। তারপর যা কিছু।

ওখানে পৌঁছে আমরা বিভ্রান্তিতে পড়লাম। মুশকিল হলো খানাকুলের চারদিকের রাস্তাঘাট আমাদের মধ্যে কেউ ভালোভাবে চেনে না। সুতরাং আমাদের স্থানীয় পুলিশের সাহায্য নিতেই হবে। নয়ত দেখা যাবে আমরা একই রাস্তায় বারবার ঘুরে মরছি। ঠিক হলো, খানাকুল থানায় যাব কিন্তু আমরা যে এক নকশাল নেতার তল্লাশিতে এসেছি সেটা বলব না। বলা হবে, একটা ডাকাত ধরতে এসেছি। আমাদের পথ দেখানোর জন্য দু'জন কনস্টেবল চাই। প্রয়োজন হলে আমরা আরও ফোর্সের সাহায্য নেব। থানা থেকে বেশ খানিকটা দূরে আমরা দুটো গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করলাম। উমাশংকর আর শচী একটা গাড়ি নিয়ে থানায় চলে গেল।

ভরা বর্ষায় ওই অঞ্চলে গাড়ি চালানো আর গাড়ি চড়ার অর্থ যে কোনও সময় শরীর থেকে হাত-পা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার আশংকায় ভয়ে ভয়ে থাকতে হবে।

উমাশংকর আর শচীরা থানার দিকে চলে যাওয়ার পর আমরা আর কি করি একটা চায়ের দোকানে ঢুকে চা খেতে লাগলাম। দোকানদারের সঙ্গে কথায় কথায় আলাপ জমিয়ে নিলাম। দোকানটা শুধু চায়ের নয়, খাবারদাবারও তৈরি করে। আমরা ঠিক করলাম, অভিযান শেষ করে রাতে ফেরার আগে ওর দোকানেই খেয়ে যাব।

দোকানদার প্রস্তুত। বলল, "কি খাবেন বাবু?"

বললাম, "কি খাওয়াবে?"

"যা বলবেন, তাই বানিয়ে দেব।"

উত্তর শুনে আমরা ওকে বললাম, "ঠিক আছে বানাও, কুচো মাছভাজা, ডাল, ভাত আর ডিমের ঝোল।"

"কটার সময় খাবেন বাবু?"

"এই ধর সাড়ে আটটা, ন'টা।" বলে ফেললাম। ভাবলাম এখানে সন্ধে হলেই রাত। কতক্ষণ আর লাগবে একটা নতুন কালভার্ট খুঁজে পেতে? আর এই অন্ধকার বর্ষার রাতে ঝোপঝাড়ের অজানা রাস্তায় নিশিথবাবু তার নিশ্চিত আস্তানা ছেড়ে বাইরে কোনও জায়গায় গিয়ে আড্ডায় জমবে না। সুতরাং একবার কালভার্ট পেলেই মিনিট কুড়ি পঁচিশের মধ্যেই ওকে আমরা গ্রেফতার করতে পারব। তারপর সোজা চলে আসা যাবে এই দোকানে। নিশীথবাবুকেও এখানে রাতের খাবার খাওয়ানো যাবে।

উমাশংকর ও শচী তাদের গাড়িতে স্থানীয় থানার দু'জন কনস্টেবলকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের কাছে এল। ওরা ওই দু'জনকেই পুলিশের পোশাকের বদলে সাদা জামা কাপড়ে নিয়ে এসেছে, যাতে দূর থেকে কেউ চিনতে না পারে যে ওদের গ্রামে পুলিশ আসছে। অফিসার-ইন-চার্জের সঙ্গে ওদের সাক্ষাৎ হয়নি। তিনি পরিবার নিয়ে সিনেমা দেখতে গিয়েছেন। রাতে ফিরবেন। জরুরি অবস্থার ব্যস্ততায় তিনি পরিবারকে সময় দিতে পারেন না। তাই আজ সময় দিতে তিনি একটু বিনোদনে গিয়েছেন।

অন্ধকার নেমে গেছে। মাঠগুলো সব কালো হয়ে গেছে। ছোট ছোট গ্রামের ভেতর গৃহস্থের বাড়িতে হ্যারিকেনের আলোর টুকরো টুকরো দ্যুতি ছাড়া বাকি সবটাই অন্ধকার গ্রাস করেছে। কোনও রাস্তাতেই আলোর কোনও ব্যবস্থা নেই। সুতরাং রাস্তায় কোথায় কোন গর্ত, তার আকার এবং বিস্তৃতির কোনও আন্দাজই কেউ ঠাহর করতে পারে না। স্থানীয় বাসিন্দারা তাদের অতি পরিচিত রাস্তায় ঠিক তার বাড়ির উঠোনে হাঁটার মতোই অনায়াসে সেইসব ঢেউ খেলানো রাস্তা পার হয়ে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে চলে যাচ্ছে। তাদের হাসির হররা কিংবা কথাবার্তায় অভিযোগের কোনও বিতৃষ্ণা নেই। সবকিছুই যেন তারা ছেড়ে দিয়েছে কোনও এক অজানা অদৃষ্টের হাতে। এতেই যেন তারা সুখী। কে জানে, কোন উপলব্ধিতে তাদের এই আচরণ। হয়তো তারা জানে, অভিযোগেও কোনও অংক মিলবে না, জীবনের তরীটা এইভাবেই টেনে যেতে হবে।

অসুবিধাটা আমাদের। একে আঁঠালো কাদা, তার ওপর চূড়ান্ত অসমান এবং গাঢ় অন্ধকার রাস্তা। হাঁটবো কি করে?

তবু হাঁটছি। আমরা যে পুলিশ। 'না' বলে বাড়িতে গিয়ে বিছানায় গা এলিয়ে দিতে পারব না। আইনভঙ্গকারীকে গ্রেফতার করে তাকে চার দেওয়ালের খাঁচায় আটক করাটাই আমাদের কাজ। কারও প্রতি অভিযোগ, অভিমান আমাদের সাজে না।

আমরা এক দঙ্গল লোক হাঁটছি। একটাই অসুবিধা, আমাদের সঙ্গে আছে মাত্র দুটো টর্চ। সেগুলি একবার করে জ্বললে অন্ধকার ফাটিয়ে রাস্তার অবস্থান দেখানোর পরই যখন নিভে যাচ্ছে তখন অন্ধকারটাও যেন দ্বিগুণ হয়ে আরও আমাদের দৃষ্টিপথের খেই বিভ্রান্তিতে ঠেলে দিচ্ছে।

কোথায় সেই আকাঙ্ক্ষিত কালভার্ট? স্থানীয় দুই সাহায্যকারী কনস্টেবলও বলতে পারছে না। পারলে তো আমাদের পরিশ্রমের পারদ বিন্দুতে নেমে যেত।

প্রায় ঘণ্টা খানেক হাঁটার পর একটা কালভার্ট পেলাম। দেশলাই জ্বালিয়ে হাত ঘড়িতে দেখলাম, মাত্র সাড়ে সাতটা। কালভার্টটা তো পেলাম। কিন্তু তার পাশে স্কুল কই? চারদিকে তো খোলা মাঠ। আশেপাশে কোনও জনবসতি নেই। কালভার্টের ওপর আমরা সবাই দাঁড়িয়ে পড়লাম। মনে মনে সবাই কি একই ভাবনা ভাবছি? ভাবলাম, "যাক, আসল না পাই, তার দোসরের দেখা তো পেয়েছি।" এতক্ষণ হাঁটার পথে কেউ না কেউ কথা বলছেই, কালভার্টের ওপর দাঁড়িয়ে হঠাৎ সবাই চুপ। শুধু ওই ছোট্ট সিমেন্টের বাঁধানো সেতুর নিচ দিয়ে খলখলিয়ে চলে যাচ্ছে জল, তারই আওয়াজ।

আমি একটা টর্চ হাতে নিলাম। কালভার্টের একপাশে জলের ওপর টর্চের আলো ফেললাম। বড় বড় ঘুনি বা আটল বসানো। আটলের ওপর একটা খ্যাপলা জালকে বুক চিতিয়ে জলের হাতখানিক ওপরে টাঙিয়ে দিয়েছে। শোল জাতীয় মাছ তার চলার পথে অবাঞ্ছিত আটলে ধাক্কা খেয়ে লাফিয়ে পালাতে গেলে ওই খ্যাপলা জালের বুকের ওপর পড়বে। ঠিক যেভাবে প্রেসিডেন্সি জেল ভেঙ্গে জেল পলাতকেরা আমাদের জালে এসে টপাটপ পড়ছে। জল ওদের বুক পেতে রাখছে কই?

নীরবতা ভেঙ্গে বললাম, "চল।"

আমাদের দঙ্গল আবার এগিয়ে যেতে লাগল। কোন দিকে? সেটা একমাত্র স্থানীয় থানার কনস্টেবল দু'জনই জানে। আমরা শুধু চলেছি কালভার্টের খোঁজে। জানি, আমাদের সেটা পেতেই হবে।

কোনখানে কোনখানে প্রাইমারি স্কুল আছে, আর তার পাশে কালভার্ট কতটা থাকার সম্ভাবনা, সেটুকু খেয়াল যদি কনস্টেবলেরা করতে পারত, তবে এভাবে আমাদের অহেতুক অনিশ্চিতভাবে ঘোরাত না। যদিও মুখে ওরা সেটা স্বীকার করছে না। বাস্তবে যে ওরা প্রাইমারি স্কুলেরও খোঁজ সঠিকভাবে রাখে না তা আমরা বুঝেই গেছি। অগত্যা চল রে পুলিশ, অপরাধীর টানে।

কিন্তু চলতে বললেই তো আর চলা যায় না। প্রত্যেকের জুতো জোড়াই কাদায় ডুবে অন্তত পাঁচ গুণ বেশি ভারি হয়ে গেছে। কে কখন আছাড় খেয়ে রাস্তায় ভূপতিত হবে তার ঠিক নেই। শরীরের ভারসাম্য বজায় রেখে অজানা পথে অন্ধকার চিরে হাঁটা কি সহজ? এইসব রাস্তায় খালি পায়ে হাঁটা বরং অনেক নিরাপদ।

আধঘণ্টা পর আরও একটা কালভার্ট পাওয়া গেল। কিন্তু পুরনো। এই কালভার্টের দু'দিকে বসার জন্য বাঁধান চাতাল আছে। বসে পড়লাম। খানিকটা দূরেই ছোট একটা জনপদ। সেখান থেকে কুকুরের ডাক মাঝে মাঝে ভেসে আসছে। বিরতিতে গোয়ালঘর থেকে বাছুরের আকুতি।

আমাদেরও সাময়িক বিরতি। অন্ধকারে সবাই বসে ফুসফুসে দম ভরে নিচ্ছি। শ্রাবণের বৃষ্টিভেজা হাওয়া আমাদের শরীরকে ক্লান্ত করে দিচ্ছে। অজস্র ঝিঁঝিঁ পোকা আর ব্যাঙের ডাক সারা চরাচর জুড়ে। আমি সবার মনের কথাটাই বলে ফেললাম, "একটু খেলে হতো না?" অরুণ বলল, "কিন্তু সঙ্গে তো নেই স্যার।"

"তা তো জানি। থাকলে কি চুপচাপ কেউ থাকত?"

অরুণই বলল, "আমি যাব স্যার? নিয়ে আসব?"

"কোথায় যাবি? আমরা কি তোর জন্য এখানে বসে থাকব? বাদ দে, আগে যে জন্য এসেছি, সেটা করি, তারপর।" নিজেরই প্রস্তাব নিজে কেটে দিতে একটা সম্মিলিত দীর্ঘশ্বাস খানাকুলের আকাশে মিলিয়ে গেল। আমি জানি, অরুণকে বললে ও ঠিক নিয়ে আসত। ওর অসম্ভব উদ্যম। একেক সময় উদ্যমের চোটে ক্ষতিও করে বসে। ক'দিন আগে ধানবাদে দুপুরবেলা ওকে পাঠিয়েছিলাম বিয়ার আর দুটো হুইস্কির বোতল আনতে। অরুণ জিপ চালিয়ে ছুটল। জিপের সামনেই ওর পায়ের কাছে বিয়ারের ক্রেট ও হুইস্কির বোতল একসঙ্গে রেখে যখন আমাদের আস্তানার সামনে

পৌঁছে ব্রেক চেপে গাড়ি দাঁড় করাল আমরা দোতলার ঘর থেকে ওর আগমনবার্তা পেয়ে ছুটে এসে দেখি, ঠিক। আমরা ঠিক আওয়াজই আন্দাজ করেছি। ব্রেকের চোটে বিয়ার আর হুইস্কির বোতল সব লাফিয়ে এ ওর গায়ে পড়ে চুরমার। আর তারই আওয়াজে আমাদের ছুটে আসা।

কি বলব? পরিষ্কার করে আবার ছুটল ওগুলি দ্বিতীয় বার আনতে। গাড়ি চালাতে ওর দক্ষতার কাছে আমাদের দফতরের অন্য কেউ ধারে কাছে আসতে পারত না।

জিপ চালিয়ে এই খানাকুলে আসার পথেই এক ছুটন্ত মোরগকে "আমি এটাকে মারছি স্যার" বলে অনুমতির অপেক্ষা না করে সত্যিই ওটাকে চাপা দিয়ে চলে এল। সাহসিকতা ও অ্যাডভেঞ্চারিজমে ওর তুলনা হয় না।

সেইজন্যই ওকে আমি আমার সঙ্গে সব অভিযানেই রাখি। এমন কী যখন হঠাৎ কোনও আসামির খবর পেয়ে অভিযানে যেতে হয়, অথচ এদিকে অরুণ ছুটি নিয়ে বাড়ি চলে গেছে তখনও আমি অরুণকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে এসে আমাদের দলে সামিল করে নিই। এইরকম পরিস্থিতিতে ও অনেকবার আমার হাতে ধরা পড়ে লজ্জায় কাতর হয়েছে।

চুয়াত্তর সালের মাঝামাঝি, একদিন আমি সন্ধেবেলায় একটা খবর পেয়ে, সেই খবরের ভিত্তিতে রাত বারোটা নাগাদ অভিযানে যাব ঠিক করলাম। ক'জন ফেরার নকশাল যুবককে গ্রেফতার করতে যাব। অরুণ বিকেলবেলায় আমার কাছ থেকে ছুটি নিয়ে চলে গেছে। ওর খোঁজে দু'জন কনস্টেবলকে দু'জায়গায় পাঠালাম। যেখানে ওকে পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। তারা ফিরে এসে জানাল, "পাওয়া যায়নি।"

ভাবলাম, কোথায় যেতে পারে? বাড়িতে? অথচ বাড়িতে ওর স্ত্রী নেই, শ্বশুরবাড়ি গেছে, সেটা আমাকে জানিয়েছে। তাহলে কোথায় যাবে? আমার মনে সন্দেহ হলো। আমার সঙ্গে দীর্ঘ দিন থাকার ফলে ওর মনের অলিগলি আমি সবই জানতাম।

সন্দেহ নিরসন করতে আমি একটা গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। ড্রাইভার ছাড়া আর কেউ নেই।

অরুণ উল্টাডাঙার কোয়ার্টারে থাকে। সোজা ওর কোয়ার্টারে এলাম। দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। তার অর্থ ভেতরে কেউ আছে। কে থাকতে পারে? আমার সন্দেহটা কি তবে ঠিক?

কলিং বেলটা বেশ জোরে দু'তিনবার বাজালাম। ভেতর থেকে অরুণের গলা, "কে?"

বেল বাজিয়েই চললাম। ওর বোধহয় ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছিল, বিরক্তিতে বলে উঠল, "কে রে বাবা? এই সময়ে।" অরুণ দরজা খুলল।

সামনেই আমাকে দেখে ভূত দেখার চোখ নিয়ে বলল, "আপনি স্যার?"

বললাম, "কেন, আসতে পারি না?"

অরুণ হে হে করে হেসে উঠে বলল, "না, না, স্যার তা কেন?"

ও কিন্তু দরজা থেকে সরে আমাকে ভেতরে ঢোকার আমন্ত্রণ জানাচ্ছে না। আমিই আলতো করে পাস কাটিয়ে ঘরের ভিতর ঢুকে পড়ে একটা চেয়ারে বসে পড়লাম। অরুণ একটা খাটে বসল। ওকে দেখেই বুঝলাম, বাড়ি ফিরে ভাল করে স্নান টান সেরে গায়ে পাউডার ছড়িয়ে আরাম করার উদ্যোগ করছে।

জিজ্ঞেস করলাম, "কি রে বাড়িতে তো কেউ নেই?"

অরুণ অবলীলায় জানাল, "না স্যার, কেন স্যার?"

বললাম, "তো তুই বাড়িতে বসে কি করছিস? চল আমার সঙ্গে, রেইড আছে।"

"এখন স্যার?" প্রায় চমকে উঠে প্রশ্ন করল।

অরুণের প্রতিটা প্রশ্নের দিকে একটা কান রেখে দিলেও অন্য একটা কান ও চোখ খুঁজে যাচ্ছে আমার সন্দেহের সূত্র। কি কারণে অরুণ একেবারে সন্ধেবেলায় একা বাড়িতে বসে আছে। ও তো বাড়িতে একা একা বসে থাকার লোক নয়। বিশেষ করে সুযোগ পেলেই নারীসঙ্গ ওর ভীষণ প্রিয়। সেটাও বাদ। আমার কাছে অবিশ্বাস্য লাগছে।

মনের মধ্যে যখন উত্তর পাওয়ার জন্য যুদ্ধ চলছে, ঠিক তখনই ওই ঘরের লাগোয়া একটা বাথরুম থেকে জল পড়ার আওয়াজ শুনতে পেলাম। আমার ঠোঁট আলগা হলো হাসির জন্য।

অরুণকে জিজ্ঞেস করলাম, "কি রে বাড়িতে কেউ নেই তো বাথরুম থেকে জলের আওয়াজ আসছে কেন?"

অরুণ জলের আওয়াজেই ঘাবড়ে গিয়েছিল। আমার প্রশ্নের জবাবে বলল, "ও কেউ নয় স্যার!" বললাম, "সে কি রে? মনে হচ্ছে কেউ স্নান করছে।"

আমার কাছে ধরা যে পড়ে গেছে তা ও খুব ভালভাবেই জানে। হে হে করে মুখটা হাসিতে ভরিয়ে বলল, "ও স্যার কাজের মেয়েটা।"

আমি যেন কিছু বুঝতে পারিনি এমন ভাব নিয়ে জানতে চাইলাম, "তা ও এখন তোদের বাথরুমে স্নান করছে কেন?"

আমার প্রশ্নের জবাব ওর কাছে নেই। বলল, "একটা নতুন সাবান

দিয়েছি ওকে, স্নান করার জন্য, ওর গায়ে বড় গন্ধ, আমার কষ্ট হয় স্যার।"

কি বলব। পরিষ্কার স্বীকারোক্তি। তবু মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, "শালা—। তোর বউ বোঝে না?"

"না-না-স্যার, বুঝলে কি আর আস্ত রাখত? তবে ওকে আমি বউয়ের বিছানায় জায়গা দিই না। অন্য খাটে।"

কথাগুলি অরুণ এমনভাবে বলল যেন এতেই ওর সবকিছু শুদ্ধ, সাত খুন মাপ। আমি উত্তর না দিয়ে তাকিয়ে আছি। অরুণ এরপর কি বলবে ভেবে না পেয়ে বলল, "মেয়েটা রান্না করে ভাল।" নিজের দোষ ঢাকতে ওই মেয়েটা কত ভাল সেটা বোঝাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

মেয়েটার গুণকীর্তন শুনে আমার কি লাভ? বললাম, "তুই কখন আসতে পারবি সেটা বল।"

ও বলল, "ঘন্টা দেড়েকের মধ্যেই আসছি স্যার।" আমি আর কথা না বাড়িয়ে ওর ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে পড়লাম। আমি ইচ্ছে করলে ওকে আমার সঙ্গেই জোর করে নিয়ে আসতে পারতাম, কিন্তু যে মানসিক যন্ত্রণা নিয়ে অরুণ আমার সঙ্গে আসত, তাতে তার স্বাভাবিক প্রফুল্লতা ব্যাহত হতো। আমি তাই ওকে ওর বহু প্রতীক্ষিত কাজ সেরে উল্লসিত চিত্তেই লালবাজারে আসার সুযোগ দিলাম। এতে কাজ ভাল পাওয়া যায়।

আমার হাতে ধরা পড়া এটাই ওর ক্ষেত্রে প্রথম নয়। আরও হয়েছে। সেদিনও অরুণ দুপুরবেলা আমার থেকে ছুটি নিয়ে বাড়ি চলে যায়। অজুহাত, স্ত্রীকে নিয়ে ওকে শ্বশুরবাড়ি যেতে হবে। ছুটি না দিলে বাড়িতে দক্ষযজ্ঞ। ওর কাতর মুখের আবেদন শুনে আমি ছুটি মঞ্জুর করতেই অরুণ ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল।

খানিকক্ষণ পরই একটা খবরের ভিত্তিতে আমি ছক কষতে শুরু করলাম পরদিন ভোরবেলায় কাঁচরাপাড়ায় একটা অভিযানের। অরুণকেও আমাদের দরকার। কারণ ওইদিককার রাস্তাঘাটগুলি ওর নখদর্পণে। ঠিক করলাম, একটু বেশি রাতে ও শ্বশুরবাড়ি থেকে ফিরে এলে ওকে গাড়ি পাঠিয়ে তুলে আনব। ওর সঙ্গে যোগাযোগের একটাই অসুবিধা ছিল। ওর বাড়িতে কোনও টেলিফোন ছিল না।

সিদ্ধান্ত নিয়ে আমি অন্য কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ি। এমন সময় পড়ন্ত দুপুরে আমারই এক যুবক গুপ্তচর হাজির।

সে এসেই অন্য কোনও প্রসঙ্গ আলোচনার আগেই বলল, "এক্ষুণি অরুণদাকে ডেকার্স লেনে দেখে এলাম।"

ওর কথা শুনেই আমার মস্তিষ্কের চিন্তার কোষগুলি ভেতর থেকে ঘন্টা বাজাতে লাগল। বুঝলাম, অরুণের অজুহাতে কোনও গর্ত আছে। কারণ লালবাজার থেকে ও প্রায় ঘন্টাখানেক আগে চলে গেছে, এতক্ষণে ওর উল্টাডাঙার কোয়ার্টারে পৌঁছে যাওয়ার কথা, তার বদলে ও লালবাজারের ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে ডেকার্স লেনে কি করছে?

আমি যুবকটিকে তবু ধন্ধে ফেলার জন্য বললাম, "সে কি রে, ঠিক দেখেছিস তো?"

আমার গুপ্তচর দারুণ আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে বলল, "ঠিক দেখব না অরুণদাকে? আমাকে দেখে হাসল, হাত নাড়ল, তারপর মেট্রোপোল হোটেলে ঢুকে গেল।"

গন্ধ আমি যা পাওয়ার পেয়ে গেছি। ওর শেষ বাক্যে তা সম্পূর্ণ হলো। কারণ ওই হোটেলের ঘরগুলি যে দুপুরবেলা সব ভর্তি থাকে এবং তা কোনও না কোনও আদম আর ইভের জোড়ায় জোড়ায়, সেই খবর আমাদের কাছে ছিল। সুতরাং অরুণের অজুহাতের গর্ত আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল।

আমি এবার দৃশ্যটাকে পরিষ্কার করার জন্য যুবকটাকে জিজ্ঞেস করলাম, "ওর সঙ্গে আর কে ছিল?"

বলল, "একজন বেশ স্বাস্থ্যবান, লম্বা চওড়া লোক ছিলেন।"

ওর কথা শুনে চিন্তা করে পেলাম না, কে হতে পারে অরুণের সেই বেশ স্বাস্থ্যবান লম্বা চওড়া সঙ্গী? জানতে চাইলাম, "আর কেউ ছিল না?"

যুবকটি বলল, "আর কাউকে বুঝতে পারিনি, ওরা খুব তাড়াতাড়ি হোটেলের ভেতর ঢুকে গেল।"

ওর কথা শুনে ঠিক করলাম, অরুণকে হাতেনাতে ধরব। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। যুবকটিকে বললাম, "বস, আমি আসছি।" তারপর কনস্টেবল শচীন ও পরিমলকে নিয়ে বেরিয়ে এলাম। ওদেরও বললাম না, আমি কোথায় যাচ্ছি।

গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলকে বাঁদিকে রেখে ওয়াটারলু স্ট্রিটে ঢুকে ডান দিকে ডেকার্স লেনে ঢোকার মুখের কাছে গাড়ি রেখে শচীনদের নিয়ে আমি ডেকার্স লেনে ঢুকে পড়লাম।

সস্তায় খাবারের দোকান আর পত্রপত্রিকার স্টলের জন্য ডেকার্স লেন বিখ্যাত। তাছাড়া আমাদের সার্জেন্টদের পরিচালনায় একটা ক্লাবও আছে।

সেই ইতিহাস অন্য। আমরা সোজা এলাম মেট্রোপোল হোটেলের একতলার রিসেপশনে।

রিসেপশনে যিনি বসেছিলেন, তাকে কোনও ভণিতা না করে সোজা জিজ্ঞেস করলাম, "অরুণ ব্যানার্জি কোন ঘরে আছে?"

তিনি আমাকে পাল্টা প্রশ্ন করলেন, "কোন অরুণ ব্যানার্জি? কোনও ঘরই ফাঁকা নেই সকাল থেকে। নতুন কেউ আসেনি।"

রিসেপশানিস্ট ভদ্রলোক একথা বলে আমাকে তার নিরপেক্ষতা বোঝানোর জন্য টেবিলের ওপর রাখা রেজিস্টার খুলে অরুণ ব্যানার্জির নাম খুঁজতে লাগলেন।

ওটা যে একটা চালাকি তা কি আর আমরা জানি না? কারণ দুপুরের ঘণ্টা দু'য়েকের জন্য যারা আসে তাদের নাম ওই রেজিস্টারে তোলা হয় না। নগদ টাকা দিয়ে ঘরের চাবি নিয়ে সোজা ওই সব আগন্তুক চলে যায়। তারা তখন নাম লেখানোর পরিস্থিতিতে থাকে না। এইভাবেই এদের ব্যবসা চলে।

রিসেপশানিস্ট ভদ্রলোকের ওই অভিনয় দেখতে তো আসিনি। আমার মাথায় কালো রুণুর রক্ত চড়চড় করে বাড়তে লাগল।

আমি ডান হাতটা রেজিস্টারের ওপর ফেলে বললাম, "ওই সব ঢপ ছাড়ুন, আমাকে বলুন অরুণ ব্যানার্জি কোন ঘরে আছে?" এ রকম দুর্বিনীত আচরণ বোধহয় তিনি কোনওদিন দেখেননি। আমার দিকে চোখ বড় বড় করে দেখলেন। আমি রেজিস্টারের ওপর হাতটা রেখেই কড়া গলায় বললাম, "এমন ভাব দেখাচ্ছেন যেন অরুণ ব্যানার্জিকে চেনেনই না।"

ঠিক সেই সময় হোটেলের এক কর্মী ওখানে উপস্থিত। আমাকে দেখেই বলল, "আরে রুণুদা, আপনি, কি ব্যাপার?"

ওই কর্মীটিকে আমি চিনতে পারলাম না। তা প্রকাশ না করেই বলে উঠলাম, "তখন থেকে জিজ্ঞেস করছি, অরুণ কোন ঘরে আছে জানাতে, উনি টালবাহানা করেই চলেছে। জানে না, আমার সঙ্গে ইয়ার্কি মারলে এক্ষুণি আমি ফোর্স আনিয়ে ঘরে ঘরে রেইড করিয়ে দু'নম্বরি ব্যবসা লাটে তুলে দেব।"

এবার রিসেপশনিস্ট ভদ্রলোক একটু ঘাবড়ে গেলেন। আমাকে যে কর্মীটি চিনেছিল সেই এবার ওকে বলল, "এনাকে চেনেন না? ইনিই রুণু গুহ নিয়োগী।"

ব্যাস কাজ হয়ে গেল। কালো রুণুর প্রচারের হাওয়া যে ওর কানেও পৌঁছেছে ওর মুখ দেখেই তা বুঝে গেছি।

এবার তিনি বললেন, "আমাকে এতক্ষণ বলেননি কেন স্যার?"

বললাম, "আপনাকে তো তখন থেকে জিজ্ঞেস করে যাচ্ছি অরুণরা কোন ঘরে আছে তা জানাতে। আর আপনি তখন থেকে এমন ভাব করছেন যেন আপনি ওকে চেনেনই না।"

তিনি কাঁদো কাঁদো হয়ে বললেন, "আমাকে পরে মেরে ফেলবে স্যার।"

এবার আমার হাসি পেল। হাসলাম না। বললাম, "ভয় নেই। ও আমার আন্ডারেই কাজ করে। বলুন এখন কোন ঘরে আছে। তার ডুপ্লিকেট চাবিটা দিন।"

"স্যার, ডুপ্লিকেট চাবি?"

"হ্যাঁ। আবার অভিনয় শুরু করবেন না। ডুপ্লিকেট চাবিটা যে আপনার কাছেই আছে সেটা আমি জানি।" প্রায় ধমকে উঠলাম। ওর গলা ধরে গেছে ভয়ে। একটা চাবির তাড়া থেকে ডুপ্লিকেট চাবি বের করতে করতে বলল, "কিন্তু ওই ঘরটাকে কি আপনি চিনবেন? আমি সঙ্গে একজন লোক দিচ্ছি।"

বললাম, "লাগবে না। এই হোটেলের সব ঘর আমি চিনি। পঞ্চাশ ষাট দশকে কলকাতার বহু নামী ফুটবলার এই হোটেলে থাকত, আমিও কিছুদিন থেকে গেছি। সব চিনি। এখন এটাকে কি নরক বানিয়ে ফেলেছেন। ছিঃ।"

ওর থেকে চাবিটা ছিনিয়ে নিয়ে বললাম, "বলুন কত নম্বর ঘর।" তিনি জানালেন, "ওই ঘরের তো কোনও নম্বর নেই, ছাদের একেবারে চিলে কোঠায়। ওরা যখন আসে সব ভর্তি ছিল। অপেক্ষা করল না। বলল, ওই চিলেকোঠাই চলবে।"

ওর কথা শুনে আমার হাসি পাচ্ছিল। আমি অপেক্ষা করলাম না। আমি আমার অধস্তন অফিসার 'আসামি' অরুণকে হাতেনাতে ধরতে এসেছি, আমি শচীন ও পরিমলকে রিসেপশনে দাঁড় করিয়ে রাখলাম, যাতে ওখান থেকে কেউ ফোন করে অরুণকে আমার আগমনের খবর আগাম না দিতে পারে। তবে যতদূর জানি ওই ঘরে কোনও ইন্টারকাম ফোন নেই। তবে নতুন করে লাইন লাগাতেও পারে। ঝুঁকি নিয়ে লাভ কি? ইন্টারকামে অরুণ আমার কথা শুনলে পালাতে গিয়ে যে কোন রকম কাজ করে বসতে পারে।

ওই ঘরটায় যাওয়ার রাস্তা একেবারে মসৃণ নয়। এদিক ওদিক ঘুরে যেতে হয়। পৌঁছে গেলাম।

হাতের চাবিটা দরজার লকের গর্তে ঢুকিয়ে আস্তে আস্তে চাপ দিতে লাগলাম। যাতে ভেতরের অভিযাত্রিরা কেউ টের না পায়।

সাবধানতা সত্ত্বেও খট করে একটা আওয়াজ হলো। খট করে আওয়াজ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ভেতর থেকে কে বাজখাঁই গলায় বলে উঠল, "কে, কে?"

হাঁকের সঙ্গেই চড়চড় করে কিছু একটা ভারি জিনিস মেঝের ওপর ঘষার আওয়াজও কানে এল। আমার এরপর আর অপেক্ষা করা চলে না। আমি দরজার হাতল ঘুরিয়ে দরজাটা হাট করে খুলে ফেললাম। ভেতরে কোনও ছিটকানি নেই, দরজা হাঁ করে দাঁড়িয়ে গেল। আমিও হাঁ।

ভেতরে এতক্ষণ অন্ধকার ছিল। দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে শেষ বিকেলের আলো খোলা ছাদ বেয়ে দরজা দিয়ে ঘরের ভেতর আছড়ে পড়ে আমার মতো সামান্য থমকে গেল।

দৃশ্যটা হৃদয়ঙ্গম করতে আমার খানিক সময় লাগল। পুলিশি জীবনে হরেকরকম দৃশ্যেরই মুখোমুখি হয়েছি। কিন্তু এরকম দৃশ্যের সম্মুখীন হইনি। সবচেয়ে বড় তফাৎ এখানে কাউকে তথাকথিত 'গ্রেফতার' বা উদ্ধার করতে আসিনি এবং যাদের 'ধরতে' এসেছি সেই 'আসামি' আমাদেরই বাহিনীর।

ছোট ঘর। ঘরে একটাই চৌকি ছিল। তার ওপর বিছানা। আর আসবাব বলতে একটা পুরনো হাতলবিহীন চেয়ার। চেয়ারের ওপরে একটা স্টিলের জলের জগ। আমি দেখলাম, চৌকিটা ঘরের মাঝখানে আড়াআড়ি ভাবে দাঁড় করানো ছিল। সেটা এখন কাৎ হয়ে একদিকে শুয়ে আছে। বিছানা মেঝেতে পাতা।

আমি ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে কে একজন বলে উঠল, "রুণু তুই!" আমি ঘরে পা দিয়েই প্রশ্নকর্তার মুখের দিকে তাকিয়েই চিনতে পারলাম, আমার গুপ্তচর যুবক কাকে স্বাস্থ্যবান পুরুষ হিসাবে অরুণের দোসর বলে বলতে চেয়েছিল। সেইই আমার বর্তমান প্রশ্নকর্তা। জগদীশদা। জগদীশ ধর। জোড়াসাঁকো থানার সার্জেন্ট। ব্যায়ামবীর। মহাজাতি সদনের পেছনে একটা ব্যায়ামাগারে তার নিত্য যাতায়াত। মাঝারি উচ্চতার, কালো জগদীশদা আমার চেয়ে বয়সে বড়। কলকাতা পুলিশে ওর সবচেয়ে বড় নাম ছিল পারিপাট্য হিসাবে। জুতোর পালিশ থেকে জামাপ্যান্টের ইস্ত্রি সবসময় টানটান।

সেই জগদীশদা এখন আমার সামনে দাঁড়িয়ে। ওর শরীরের ওপরের অংশে একটা গেঞ্জি ছাড়া আর একরত্তি সুতোও নেই। আমাকে প্রশ্ন করেই উঠে দাঁড়িয়ে দু'হাত দিয়ে ও লজ্জা ঢাকার চেষ্টা করছে। ওর সঙ্গিনী যে

মহিলা ছিল সে তখন তার কাপড়চোপড় কোথায় রেখেছিল তা খুঁজতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। জগদীশদার লজ্জা লজ্জা মুখটার দিকে তাকিয়ে হাসি পেল।

আমি তবু গম্ভীর হয়ে বললাম, "অরুণকে খুঁজতে এসেছি।" আমার কথা শুনে জগদীশদা একটা বোকার মতো হে হে শব্দ করে হেসে উঠল।

সেই হে হে হাসির কোনও সরাসরি অর্থ হয় না। হ্যাঁ বা না যে কোনও উত্তরেরই ওটা ইতিবাচক হতে পারে।

তবে জগদীশদার হে হে হাসি আর ঘরের পরিস্থিতির দ্রুত পর্যবেক্ষণে আমার কাছে আমার আগমনের পূর্ব মুহূর্তের দৃশ্যটা পরিষ্কার হয়ে গেল।

বুঝে গেলাম, ওরা হোটেলে মাত্র একটা ঘর পেয়ে সিদ্ধান্ত নেয়, ওই ছোট একটা ঘরকেই সাময়িকভাবে দুটো ঘর বানিয়ে দ্রুত ওরা 'কাজ' সেরে হোটেল থেকে প্রস্থান করবে। তাছাড়া ওদের শরীর অপেক্ষাও করতে চাইছিল না। সুতরাং ওরা ওদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ওই ঘরটায় এসে তাড়াতাড়ি চৌকি থেকে বিছানাটা নামিয়ে দু'ভাগ করে। দু'ভাগের মাঝখানে চৌকিটাকে আড়াআড়িভাবে শুইয়ে দিয়ে দু'পক্ষ পরস্পরের থেকে আড়াল করে যে যার সঙ্গিনীকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

আর ওদের ওই ব্যস্ততার সময় যখন আমি অনাহূতের মতো এসে পড়ি তখন দরজার সামনেই জগদীশদা উঠে বসার সময় পা লাগিয়ে চৌকিটাকে কাত করে ফেলে দেয় অরুণের শরীরের ওপর।

অরুণ তার পিঠে চৌকিটা পড়তেই বলে ওঠে, "এই জগদীশদা, কি করছ কি, আমি এদিকে, তুমি ভুলে গেছ।"

এই আওয়াজটাই আমি ঘরে ঢুকতে ঢুকতে অস্পষ্টভাবে শুনেছি। তারপর হঠাৎ অরুণ জগদীশদার মুখে আমার আগমনের বার্তা শুনে চৌকিটাকে পিঠের ওপর নিয়েই নিথর হয়ে শুয়ে অপেক্ষা করছে, দেখছে, জগদীশদা আমাকে ভুল বুঝিয়ে ঘর থেকে বের করে দিতে পারে কি না। তাহলে ও আমার হাত থেকে বেঁচে যায়। সে বাছা যে আমি নই সেটা অরুণও খুব ভালভাবে জানে। তবু সুযোগ নিতে আপত্তি কি? ও তো আর জানে না, ওর ঠিকানা দিয়েই হোটেলের কর্মীরা আমাকে চাবি সমেত এই ঘরটায় পাঠিয়েছে।

আমার ঘরে ঢোকা, পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ, সমস্ত ঘটনাটাই দ্রুত ঘটে গেল। আমি জানি, জগদীশদা তার গোপন অভিসারের অংশীদারের পিঠের ওপর থেকে চৌকিটা তুলে আমার সামনে বাকি দৃশ্যটা দেখিয়ে দেবে না।

আমিই তাই এগিয়ে গিয়ে কাত হয়ে থাকা চৌকিটা একটানে সোজা করে বললাম, "এই অরুণ উঠে আয়, তোকে আমি শ্বশুরবাড়ি পাঠাচ্ছি।"

অরুণের আর পালানোর উপায় নেই। ওর অবস্থা কাহিল। ওর চেয়ে ওর সঙ্গিনীর অবস্থা আরও কাহিল। সে বেচারি ক'টা টাকা রোজগার করতে এসে এই রকম ঝামেলায় পড়ে যাবে বুঝতে পারেনি। সে তখন অরুণের শরীরের তলায় চিড়েচেপ্টা হয়ে যাচ্ছে। পরিস্থিতির চাপে বেরিয়ে আসতে পারছে না। নিশ্চয়ই সে বেরিয়ে এসে এই দম বন্ধ করা ছটফটানির থেকে বাঁচতে চাইছে।

অরুণ উঠে দাঁড়াল। একই অবস্থা। জগদীশদা তবু দু'হাত দিয়ে লজ্জা ঢাকতে চেষ্টা করছিল। অরুণ আবার লজ্জার পরিমাণ জানাতে দু'হাত মাথার ওপর তুলে চুল ঘাঁটতে লাগল। ওর সঙ্গিনীর দশাও জগদীশদার সঙ্গিনীর মতো অবস্থা, ঘরের কোণে কাপড় খুঁজতে গেল।

চারটে উলঙ্গ নরনারী আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। মনে মনে একবার 'হায়রে পৃথিবী!' বলে আমি দরজার বাইরে দৃষ্টি দিয়ে অরুণকে বললাম, "তাড়াতাড়ি নিচে আয়, তোর জন্য আমি কাউন্টারে অপেক্ষা করছি।"

আর দাঁড়ানোর মানে হয় না, যে কাজে এসেছিলাম, সেটা হয়ে গেছে। আমি দ্রুত নিচে নেমে এসে অরুণের জন্য দাঁড়িয়ে রইলাম।

রিসেপশনে এসে চাবিটা ফেরৎ দিয়ে রিসেপশনিস্ট ভদ্রলোককে বললাম, "ধন্যবাদ। অরুণ আসছে।"

তিনি সামান্য ভয় পেয়েছেন, কোনওমতে বললেন, "স্যার দেখবেন, উনি যেন আমাদের—।"

আমি কথা শেষ করতে দিলাম না। বললাম, "ভয় পাওয়ার কিছু নেই। অরুণবাবু আপনাদের কিছু বলবে না।"

দু'তিন মিনিটের মধ্যে অরুণ একেবারে ভদ্রলোক সেজে নিচে নেমে এল। জগদীশদা নামেনি। তিনি সম্ভবত কাজ সম্পূর্ণ করেই নামবেন। নামুক। আমাদের তাতে কোনও দরকার নেই।

অরুণকে বললাম, "চল।" অরুণ লাজুক মুখে আমাদের সঙ্গে হোটেলের বাইরে এল।

বললাম, "শালা, এই তোর শ্বশুরবাড়ি যাওয়া। ভেবেছিলি আমাকে ফাঁকি দিয়েই এইভাবে চালিয়ে যাবি?" অরুণ কোনও কথা বলছে না। লাজুকভাবে হাসছে। আসলে ওর বলার মতো তো কিছু নেই।

বললাম, "এখন বাড়ি যা, রাতে রেইড আছে ন'টার মধ্যে লালবাজার আসবি।"

অরুণ যেন আমার হাত থেকে মুক্তি পেল, কোনও মতে "ঠিক আছে, ঠিক আছে" বলে প্রায় দৌড়ে উল্টো দিকে চলে গেল।

আমি পরিমল ও শচীনকে নিয়ে লালবাজারে ফিরে এলাম।

এই হচ্ছে অরুণ, সবসময় প্রাণশক্তিতে ভরপুর। সব কাজেই এক নম্বর। পিছিয়ে থাকার লোকই নয়, সেই অরুণকে যদি সত্যিই এই রাতের অভিযানে ঘোর বর্ষায় খানাকুল থানার কাছে আমাদের গাড়ি থেকে মদের বোতল আনতে বলতাম, ও ঠিক নিয়ে আসত। রাস্তাও ভুল করত না। যে কোনও রাস্তায় একবার গেলে ও ঠিক চিনে রাখত।

একটা নদীর পাড়ে এলাম। দ্বারকেশ্বর। বর্ষার রাতে বুক চিতিয়ে যেন ফুঁসছে। হুগলি জেলার এইসব অঞ্চলে মুণ্ডেশ্বরী, দ্বারকেশ্বর, জুলকা, দামোদর, কপালেশ্বরী, কেলেঘাই পালা করে প্রতি বছর বর্ষায় জনপদ ভাসায়। এখানকার স্থানীয় মানুষের অভ্যাস হয়ে গেছে। বন্যার সঙ্গে সংগ্রামের।

নদীর পাড় থেকে নেমে এলাম। যেদিকে যেতে বলছে, যাচ্ছি। রাত বাড়ছে। কোথায় সেই কালভার্ট? যার কাছে একটা প্রাইমারি স্কুল। আর স্কুলের কাছে এক কৃষকের বাড়িতে নিশিথ ভট্টাচার্য? মাঝখানে একফালি চাঁদ দেখা গিয়েছিল। সে দিগন্তের আমন ক্ষেতের কোন আড়ালে মুখ লুকিয়েছে কে জানে। দেখতে পাচ্ছি না। আমরা এক দঙ্গল ছায়ামূর্তি শুধু এগিয়েই যাচ্ছি।

রেডিয়ামের আলোয় ঘড়ির কাঁটা দেখলাম। রাত একটা। নিজের পেটের অবস্থাতেই বুঝতে পারছি, প্রত্যেকেরই পেটে ইঁদুরছানা ব্যস্ত হয়ে ছোটাছুটি করছে। ওদিকে হোটেলে নিশ্চয়ই সেই দোকানদার আমাদের জন্য ডাল ভাত মাছ ভাজা করে পথের দিকে তাকিয়ে বসে আছেন, ওর রান্নার সদগতির জন্য।

কিন্তু আমরা যে পুলিশ। সাধারণ সমাজের গড় নামতা পড়া কাজের বাইরে আমাদের কাজ। পাহারাদারের কাজ। সবাই ঘুমাবে, আমরা জেগে থাকব। শান্তিতে ঘুমাতে দেওয়াই আমাদের কাজ। সুতরাং আমরা হাঁটছি। হেঁটেই চলেছি। চারদিকে নিঃঝুম। আমাদের কথাবার্তা আর তার পরিণতিতে মাঝেমধ্যে গ্রাম্য কুকুরের ঘেউ ঘেউ ছাড়া জেগে আছে শুধু ব্যাঙ আর ঝিঁঝির ঝাঁক। যে যার কাজে ব্যস্ত। সৃষ্টির কি বিচিত্র রূপ!

ভোর পাঁচটা। কিলোমিটার হিসাবে কত হেঁটেছি জানা নেই। এবার সত্যিই দেখলাম একটা নতুন কালভার্ট। ওটা দেখতে পেয়েই আমরা যেন আবিষ্কারের উল্লাসে নেচে উঠলাম। কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করে এর চেয়ে বেশি

উল্লসিত হয়েছিলেন কিনা আমাদের জানা নেই। আমাদের বুক থেকে তরল হয়ে একটা পাথর নেমে গেল।

কলভার্টটা সম্পূর্ণ হয়নি। বর্ষার আগে বোধহয় ঢালাই হয়েছিল। কাঠ এখনও গায়ে সাঁটা। ওদিকে দেখে আমাদের লাভ নেই। ঠিক, কাছেই একটা প্রাইমারি স্কুল। এ পর্যন্ত খবর পাকা। এবার নিশিথবাবুর ঘরের হদিস পেতে হবে।

আমরা স্কুলের পাশের গ্রামের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলাম। ওইসব গ্রামে ভোর পাঁচটা মানে বিছানায় কেউ নেই, দৈনন্দিন কর্মে নিজেকে নিয়োগ করেছে।

আমাদের দলের একেবারে সামনের দিকে অমিত। গ্রামে ঢোকার মুখেই একজন গ্রামবাসীর সঙ্গে দেখা। অমিত তাকে জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা, মাস্টারমশাই কোথায় থাকেন?"

তিনি হাত তুলে দিক নির্দেশ করে বললেন, "হোই ঘরে।" গ্রামে ঢোকার মুখে একটা মাটির বাড়ির একটা ঘর দেখিয়ে তিনি আমাদের দিকে কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকাতে তাকাতে তাঁর কাজে চলে গেলেন। আমরা ওই ঘরের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলাম।

আমি আর উমাশংকর দলের পেছনে। আমাদের নিশীথবাবু চেনেন, দূর থেকে দেখলে পালানোর চেষ্টা করতে পারে। অমিত আর প্রদীপ এগিয়ে গেল। পেছন পেছন অন্যরা।

নির্দিষ্ট বাড়ির উঁচু মাটির বারান্দায় অমিত ও প্রদীপ উঠে নিশীথবাবুর গোপন ঘরের নিচু কাঠের দরজায় হাত দিতেই ওটা খুলে গেল। বারান্দায় বসা একটা অল্পবয়েসী ছেলে বলে উঠল, "মাস্টার তো ঘরে নাই, মাঠে গেছে।"

ভোরবেলায় এই "মাঠে যাওয়ার" অর্থ গ্রাম্য জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত লোকজনই বোঝে। অমিত তাই কিছু না বুঝেই ওই ছেলেটিকে প্রশ্ন করল, "এই ভোরে ও মাঠে গেছে? কোন মাঠে?"

ছেলেটা কি বুঝল বোঝা গেল না। একটু হেসে বলল, "বাবুরা বুঝি মাস্টারের বন্ধু?"

প্রদীপ তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ।" ছেলেটি বলল, "ওই পেছন দিকের মাঠে গেছেন, এক্ষুণি এসে যাবেন, বসেন না।"

অমিত আর প্রদীপ কথা বাড়াল না। বারান্দা থেকে নিচের উঠোনে নেমে এল। বাড়ির পেছনের মাঠের দিকে যাত্রা শুরু করল। আমরা যারা দাঁড়িয়েছিলাম, তারাও ওদের পেছন পেছন হাঁটা দিলাম।

বাড়ির পেছন দিকে ঝোপঝাড়ের একেবারে একটা ছোট জঙ্গল। বর্ষার কাঁচা জল পেয়ে ওগুলি লকলক করে এদিক ওদিক হাত বাড়িয়ে নিজেদের যৌবন জানাচ্ছে। ওই ঝোপের মাঝখান দিয়ে একটা সরু পথ। সেই পথই চলে যাচ্ছে মাঠে। ওই মাঠের আলে বসে ওই বাড়ির মানুষ ভোরবেলায় শরীর হাল্কা করে। নিশীথবাবুও ওই উদ্দেশে মাঠে গেছেন।

অমিত অল্পবয়সী যুবক। সবসময়ই অতিরিক্ত উত্তেজনায় ভরপুর। ও ঝোপঝাড় সরিয়ে এগিয়ে যেতে লাগল। যেতে গিয়েই হাত পায়ে লাগল বিচুটি গাছের পাতা। ব্যস আর যায় কোথায়, দাঁত মুখ খিঁচিয়ে চুলকাতে শুরু করল। প্রদীপ আর অরুণ হেসে ফেলল। অরুণ বলে উঠল, "ওগুলি শালা বিচুটি গাছ, চিনিস না?"

তখন আমাদের বিচুটি গাছ দেখার সময় নেই। সারা রাত হেঁটে লক্ষ্যের সীমানায় এসে পৌঁছেছি। এখন সেটা সম্পূর্ণ হলে তবে অন্য দিকে তাকানোর মতো মন হবে। অমিত একটু পিছিয়ে পড়তেই প্রদীপ আর শচী এগিয়ে গেল। অমিতও উঃ আ করে চুলকাতে চুলকাতে চলল।

মাঠ। আলের নিচে ধানক্ষেত। ধানক্ষেত ঘিরে হরেকরকম গাছ। বাংলার গ্রামের চিরযুগের একই ছবি। সেই মাঠের মধ্যেই একটা লোক ডানহাতে একটা ছোট টিনের কৌটা ঝুলিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। বর্ষার দ্রুত ধাবমান মেঘ সরিয়ে কর্ণপিতা তখনও উঁকি মারেননি। তাই লুঙ্গি পরিহিত লোকটার অবয়ব দেখতে পেলেও মুখের ছবি পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না। আমাদের থেকে অন্তত পঞ্চাশ ষাট হাত দূরে তিনি আস্তে আস্তে এগিয়ে যাচ্ছেন। হাঁটার ধরনটা অবশ্য গ্রাম্য নয়।

আমরা এবার একটু দ্রুত পা চালালাম। দূরত্ব খানিকটা কমে যেতেই শচী হাঁক পাড়ল, "মাস্টারমশাই, ও মাস্টারমশাই।" দাঁড়িয়ে গেলেন মাস্টারমশাই। তারপর ফিরে আমাদের দলের দিকে তাকিয়ে এগিয়ে আসতে লাগলেন। ওর আসা দেখে বুঝে গেছি, আমরা যে কারা তিনি ঠাওর করতে পারেননি। দু'দিক থেকে পরস্পরের মুখোমুখি হওয়ার জন্য হাঁটা।

হাত দশেক দূরত্ব। মাস্টারমশাই দাঁড়িয়ে গেলেন। আমি দেখে নিয়েছি। আমাদের খবর পাকা। নিশীথবাবুর আর পালানোর পথ নেই।

অরুণ এগিয়ে ওর হাত থেকে টিনের কৌটাটা নিয়ে বলল, "মাঠের কাজটা খানাকুল থানাতে গিয়েই করবেন। সারা রাত ধরে প্রচুর খাটিয়েছেন। চলুন।"

ওকে নিয়ে আমরা ওর আস্তানায় ফিরে এলাম। অমিত তখনও প্রাণপণে চুলকে যাচ্ছে। আমি বলে দিয়েছি, "জল লাগাস না, বেড়ে যাবে।" নিশীথবাবু

ওর ঘর থেকে টুকিটাকি ক'টা জিনিস নিল। লুঙ্গি ছেড়ে জামা প্যান্ট পরে বেরিয়ে এল। গৃহস্বামী খবর পেতেই এসে গেছেন। এসেছেন গ্রামের আরও অনেক লোক। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা উঠোন ভর্তি করে দাঁড়িয়ে আছে। বাড়ি ও গ্রামের অন্যপ্রান্তের মহিলারা একটু আড়াল করে দাঁড়িয়ে আমাদের দিকে দেখছেন।

নিশীথবাবু গৃহস্বামীকে বললেন, "এরা কলকাতার পুলিশ। আমাকে নিয়ে যাবে। একটা মাস্টার ঠিক করে নেবেন। চলি।"

আমরা নিশীথবাবুকে নিয়ে গ্রাম থেকে বেরিয়ে এলাম। বাচ্চা ক'টা ছেলে আমাদের দলের পেছন পেছন অনেকটা এল। দিগন্ত জোড়া ধানক্ষেতের মধ্যে দিয়ে কাঁচা রাস্তায় আমরা আবার হাঁটতে শুরু করলাম। নতুন কালভার্টকে শচী একবার চুমু খেয়ে নিল। বলল, "শালা কাল সারারাত তোর জন্য হেঁটেছি।"

আমরা হেসে উঠলাম। নিশীথবাবু গম্ভীর। স্থানীয় থানার কনস্টেবল দু'জনের এবার প্রচুর উৎসাহ। কারণ এদিক ওদিক ঘুরে নয়, এখান থেকে সোজা থানার রাস্তাটা বোধহয় ওরা চেনে।

নিশীথবাবু মাঝখানে। আমরা কেউ ওর সামনে, কেউ পেছনে। নিশীথবাবুর ক্ষেত্রে আমাদের একটা সুবিধা। পরিশ্রম করতে হয় না। নিজের থেকেই গলগল করে সব বলে দেয়। তবু কোনও প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করল না। এত ক্লান্ত। মনের সঙ্গে শরীরের কোনও সামঞ্জস্য নেই। দু'জন দু'দিকে চলেছে। সঠিক মাছকে জালে তুলে মন খুশি হলেও, শরীর সেই খুশির অংশীদার হতে পারছে না।

গ্রামের পর গ্রাম পার হয়ে যাচ্ছি। নিশীথবাবুকে বোধহয় ইতিমধ্যেই স্থানীয় বেশ কিছু লোক চেনেন, স্কুলের সুবাদে। তাদের চোখে বিস্ময়। আমাদের ওইদিকে কোনও মন নেই।

সবচেয়ে ভাল হয় একটা বিছানা পেলে। তা তো সম্ভব নয়। তার আগে খানাকুল থানা পেলেই চলবে। নিশীথবাবুকে ওখানে রেখে পেটে কিছু রপ্তানি করা অত্যন্ত জরুরি। পৌনে সাতটা নাগাদ থানায় পা দিলাম। চারপাশের গ্রাম ঘুম থেকে উঠে গা ঝাড়া দিয়ে কাজে নেমে পড়লেও থানা তখনও ঘুমন্ত। ক'জন কনস্টেবল ছাড়া আর কেউ নেই। শুনলাম, ওসি রাতেই ফিরেছেন।

আমরা লকআপে নিশীথবাবুকে চালান করে ফিরে এলাম সেই দোকানটায়, যেখানে আমরা গত সন্ধেয় খাবার বানানোর জন্য বলে গিয়েছিলাম। দোকানদার

আমাদের রুক্ষ, রাতজাগা, ঝোড়ো কাকের মতো চেহারা দেখে বোধহয় প্রথমে বোবা হয়ে আমাদের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন।

শচী হেসে বলল, "কি দেখছেন? আমাদের চেহারা? আমরা মশাই কুকুর, রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে আসামি ধরি। এসব দেখতে নেই।" এসব ব্যাপারে শচী দক্ষ, পরিস্থিতিকে চট করে হালকা করতে ওর জুড়ি নেই। দোকানদার ভদ্রলোকের অবাক চোখ কিছু নরম হতেই শচী বলল, "আমাদের খাবার-দাবার সব আছে তো, নাকি অন্য কাউকে বিক্রি করে দিয়েছেন?"

দোকানদার বললেন, "কি যে বলেন, তা কি পারি? তাছাড়া এ মুল্লুকে রাতে এত খাবার খাওয়ার লোক কই?"

শচী বলল, "তাহলে দিন।"

"ওই ঠাণ্ডা খাবার খাবেন?" দোকানদারের বিস্মিত প্রশ্ন।

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওতেই চলবে, ছুঁচোর যে গুঁতো চলছে পেটের ভিতর তাকে শান্ত করতে হবে তো।" অরুণ বলে উঠল। আমরা দোকানদারের কোনও আপত্তিই শুনলাম না। কসটিক সোডায় হাতের কাদা ছাড়িয়ে ওই তেরো চোদ্দ ঘণ্টার আগের তৈরি বাসি খাবারই খেতে শুরু করলাম। অমিত চুলকে চুলকে ওই খাবারটা খেতে লাগল। দোকানদার তখনও গাঁইগুঁই করে যাচ্ছেন।

নিঃশব্দে আমরা মিনিট পাঁচেকের মধ্যে ডাল ভাত ডিম, মাছভাজা একসঙ্গে মেখে খেয়ে ফেললাম। আমাদের দেখে যে কেউ মনে করবে, ওই গ্রামের দোকানের বাসি খাবার যে অত সুস্বাদু হতে পারে তা ওরা জানে না।

ওই বাসী খাবারের গুঁতোতেই পেটের ভেতরের ইঁদুরগুলোর ছুটোছুটি বন্ধ হতেই আমাদের নেতিয়ে পড়া শরীরগুলো চাঙ্গা হয়ে উঠল। আমাদের আর দেরি করার কারণ নেই। নিশীথবাবুকে নিয়ে আসতে সোজা চলে গেলাম খানাকুল থানায়।

থানায় যাদের হাতে নিশীথবাবুর ভার দিয়ে গিয়েছিলাম তারা লকআপ খুলে নিশীথবাবুকে বাইরে নিয়ে আসতেই বিপত্তি। একজন লম্বা, ধুতিপরা, শরীরে ভেজা গামছা জড়ানো, কপালে চন্দনের তিলক কাটা, হাতে একটা কঞ্চির সাঁজি, তাতে ক'টা টগর ফুল এক ভদ্রলোক হঠাৎ হেঁড়ে গলায় থানার সামনের উঠোন থেকে প্রায় চিৎকার করে বলে উঠলেন, "এই, এই, আমার আসামিকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে?"

থানার এক হেড কনস্টেবল শুধু জবাব দিল, "না স্যার, না স্যার। এরা——।" ভদ্রলোক একই ভাবে গলা উঁচিয়ে বলে উঠল, "থাম, আমাকে আর শেখাস না। আমি অর্ডার দিলাম না। আমার পারমিশন ছাড়া আসামিকে

নিয়ে যাওয়া হচ্ছে একি মামার বাড়ি নাকি?" ওর ওই চিৎকারের মধ্যেও আমি থানার এক কনস্টেবল থেকে জেনে নিয়েছি, ওই ভদ্রলোকই থানার ওসি। খুব ধার্মিক! সকালে বাড়িতে পুজোআর্চা করে তারপর অন্য কাজ করেন। সেই পুজোর জন্য নিষ্পাপ নিষ্পাপ চোখে মন্ত্র সহযোগে থানার বাগান থেকে ফুল তুলতে এসেছেন। আর তখনই আমাদের দেখে নিজের অধিকার জাহির করছেন।

ওসি যখন, তখন যথাযথ সম্মান জানাতেই হবে। আমিই এগিয়ে গিয়ে বললাম, "দেখুন, আসামিকে ধরে ওকে সামান্য সময়ের জন্য লকআপে রেখে আমরা একটু খেতে গিয়েছিলাম, কাল সারারাত ধরে আমাদের কিছু খাওয়া হয়নি। আপনি থানায় থাকলে এত বিপত্তি হতো না। এখন আমরা ওকে নিয়ে কলকাতায় ফিরে যেতে এসেছি।"

তিনি তবু নিজের ক্ষমতা প্রয়োগ না করে বিনা বাধায় আসামিকে আমাদের হাতে তুলে দিতে আপত্তি করে বললেন, "তা হয় না, তা হয় না। আমার এলাকায় আসামিকে ধরেছেন, আমাকে জানাননি, তারপর নিয়ে যাচ্ছেন, তখনও আমাকে কিছু জানাচ্ছেন না সেটা কি আমি চোখ বুজে দেখে যাব?"

ভাবলাম বলি, এখানে যে জেল-পলাতক আসামি দিব্যি প্রাইমারি স্কুলে মাস্টারি সহ আত্মগোপন করে দু'তিন মাস ধরে আছে তখন কি করে চোখ বুজেছিলে? আসল কাজের সময় কোনও পাত্তা নেই এখন খবরদারি করতে এসেছ! বলা হলো না। বললেই আরও অযথা ঝামেলা পাকাবে। আমাদের আরও দেরি হবে।

বললাম, "আরে এখানে ওকে গ্রেফতারী দেখালে আপনাকেই অযথা কোর্ট কাছারির ঝামেলা পোয়াতে হবে। কি দরকার আপনার এসব নকশালদের ঝুট ঝামেলা নেওয়ার?"

এবার বোধহয় কাজ হলো। বুঝল, দায়িত্ব বেড়ে যাবে। খানিকটা চুপসে গিয়ে বলল, "কাজ বাড়বে ঠিকই, কিন্তু।"

"কোনও কিন্তু-টিন্তু নয়। যেমন নিঃশব্দে এসেছিলাম, তেমনভাবেই ওকে নিয়ে আমরা লালবাজারে চলে যাচ্ছি। আমরা ওকে কলকাতায় গ্রেফতার করেছি বলে কাগজপত্রে দেখাব।" নিচু স্বরে ওকে বললাম।

তিনি বাঁ হাতের সাঁঝিটা দু'বার ঝাঁকিয়ে বললেন, "ঠিক আছে। তবে নিয়েই যান। আমি কিছু লিখব টিখব না।" তিনি আর কথা না বাড়িয়ে ভক্তিভরে গুনগুন করে মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে ফুল তোলার জন্য বাগানের গাছের দিকে এগিয়ে গেলেন।

আমরা আর অপেক্ষা না করে নিশীথবাবুকে নিয়ে সোজা লালবাজারের দিকে তিনটে গাড়ি চালিয়ে দিলাম।

জুলাই মাসের কুড়ি তারিখে যার বাড়ির থেকে আজিজুলকে গ্রেফতার করেছিলাম সেই দীপক চট্টোপাধ্যায় ও আর এক ষড়যন্ত্রকারী হিমাংশু গুইনকে আই বি অফিসাররা গ্রেফতার করে আমাদের হাতে তুলে দিলেন।

ওদের থেকেই খবর পেয়ে বেনিয়াটোলা স্ট্রিটের সুশীল দাসকে গ্রেফতার করা হলো। সুশীল মিশায় বন্দি হয়ে ক'মাস প্রেসিডেন্সি জেলে ছিল। একই দিনে জুলাই মাসের বাইশ তারিখ বালিগঞ্জের প্রদীপ সান্যালকেও আই বি অফিসাররা গ্রেফতার করতে সক্ষম হলো।

পঞ্চম ট্রাইবুনাল মামলার আসামি জেল-পলাতক বেহালার স্বপন সাহাকে একত্রিশ তারিখ গ্রেফতার করা হলো। জেল থেকে পালিয়ে স্বপন সাহা, গৌর দত্ত, প্রদীপ সান্যাল দেবু দত্তের ঘুটিয়াশরিফের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল। তারপর দু'দিন ওখানে কাটিয়ে আরও নিরাপদ আস্তানার খোঁজে যে যার মত বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল।

অগস্টের দু'তারিখ জেল ভাঙ্গার অন্যতম প্রধান ষড়যন্ত্রকারী চতুর্থ ট্রাইবুনালের আসামি স্বপন ঘোষকে শিলিগুড়িতে গ্রেফতার করা হলো। লালবাজারে ওকে আমদানি করার পর ওর থেকে খবর পেয়ে বহরমপুর রেলওয়ে স্টেশন থেকে আমাদের অফিসার প্রদীপ ঘোষ ও শচী মজুমদার খড়দার স্বপন চক্রবর্তীকে গ্রেফতার করে আনল।

কোচবিহারের পুলিশ উত্তর কলকাতার নকশাল যুবক কবীন্দ্র চক্রবর্তীকে গ্রেফতার করে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিল।

এর আগে আমরা ষড়যন্ত্রের সাহায্যের জন্য প্রেসিডেন্সি জেলের ডেপুটি জেলার অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়কে গ্রেফতার করে বেশ কিছু তথ্য জেনে নিয়েছি।

এই সমস্ত আসামিদের গ্রেফতার করার পর আমাদের কাছে জেল ভাঙ্গার চিত্রটা সম্পূর্ণভাবে পরিষ্কার হয়ে গেল। ষড়যন্ত্র কবে শুরু হয়েছিল। কারা এর নেতৃত্ব দিয়েছিল। কারা সাহায্য করেছিল। জেলের ভেতরের কি পরিস্থিতি হয়েছিল, সবই আমাদের কাছে ভাদ্রমাসের দুপুরের আকাশের মতো ঝকমকে পরিষ্কার।

আর একটা জিনিস পরিষ্কার যে, ওই সময় নকশালরা প্রেসিডেন্সি জেল না ভাঙ্গলেই বোধহয় আশ্চর্য হতাম আমরা। জেল প্রশাসনের এত ঢিলেঢালা চালচলন এত চোখ বুজে থাকার কারণও আমাদের কাছে পরিষ্কার।

সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার জরুরি অবস্থার সময় যখন চারদিকে আঁটসাঁট

ভাব। আইনের কড়া চোখের দাপানি তটস্থ করে রেখেছে, ঠিক তখনই প্রেসিডেন্সি জেল সবচেয়ে খোলা মাঠ, একেবারে মেলার পরিবেশ। আর এই সুযোগটাই নকশালরা কাজে লাগিয়েছিল।

ছিয়াত্তরের ফেব্রুয়ারিতে ঘটনা ঘটলেও, ওরা প্রস্তুতি শুরু করেছিল চুয়াত্তরের মাঝামাঝি। সে সময় চারুবাবুর অনুগামী নকশালরা ওই জেলে এক জেল পার্টি কমিটি তৈরি করে। সেই কমিটির সম্পাদক ছিল আজিজুল হক। অন্য সদস্যরা ছিল প্রশান্ত চৌধুরি, অজিত চক্রবর্তী, স্বপন ঘোষ ও গৌর দত্ত। এই কমিটির নেতৃত্বেই পুরো ষড়যন্ত্রটা ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে থাকে। আর তাতে পরোক্ষভাবে সাহায্য করে জেল প্রশাসন।

কিভাবে হয়েছিল এই পরোক্ষ সাহায্য?

পঁচাত্তর সালে জরুরি অবস্থার সময় 'কাফেপোসা' আইনে ধৃত কলকাতার অসংখ্য ব্যবসায়ীকে প্রেসিডেন্সি জেলে পাঠান হতো। এই ব্যবসায়ীদের অধিকাংশই ছিল মাড়োয়ারি, গুজরাটি ও সিন্ধি সম্প্রদায়ের। এই ধৃত ব্যবসায়ীদের ওপর ধারাবাহিক অত্যাচার চালাত যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত খুনের আসামি উত্তর কলকাতার যদু মিত্র লেনের পান্নালাল মিত্র ওরফে কানা পান্নার নেতৃত্বে আর এক খুনের আসামি সুবল কুণ্ডু ও পান্নার পুরনো সঙ্গী জয়হিন্দ নন্দীর বাহিনী। এরা সবাই কনভিক্ট ওভারসিয়ার বা 'মেইট' ছিল।

জেলের ভেতর প্রশাসন চালাতে কয়েদিদের এক অংশকে এই সুযোগ দিয়ে কার্যত তাদের দিয়েই অন্য আসামিদের ওপর সবরকম অত্যাচার, শাসন ও শোষণ চালানোর এটা একটা আইনী প্রক্রিয়া। প্রকৃতপক্ষে এরা এই সুযোগ পায় কর্তৃপক্ষের দালালী করে। এই বাহিনীই জেলের ভেতরে রাজত্ব চালায়। সুপারিটেনডেন্ট ও জেলারের নির্দেশ মতো এরাই কার্যত জেলের ভেতর আইনের রক্ষক ও ভক্ষক। প্রায় সর্বেসর্বা। এদের মাধ্যমেই সমস্ত দুর্নীতি ও দুষ্কর্ম চালায় জেল কর্তৃপক্ষ। বাইরের অন্য কোনও দফতরের দৃষ্টি জেলের ভেতরে না থাকার ফলে জেল কর্তৃপক্ষ আড়ালে এই কয়েদি বাহিনী দিয়ে কি ধরনের যে শাসন চালায় তা ভুক্তভোগীরা ছাড়া কেউ টের পায় না।

কাফেপোসায় ধৃত এক এক জন ব্যবসায়ী প্রেসিডেন্সি জেলে এলেই পান্নার দল তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ত। হ্যাঁ, কর্তৃপক্ষের সামনেই। যে খুনের দায়ে তার যাবজ্জীবন সাজা হয়েছিল সেই ঘটনার সময়ই নিজের বোমার স্প্লিন্টারে তার ডান চোখ এবং ডান হাতের তিনটে আঙুল উড়ে গিয়েছিল। ফলে ওর চেহারাটা বীভৎস লাগত।

ধৃত ব্যবসায়ীরা জেল গেটে ঢুকলেই পান্না সোজা তার থুতনি ধরে

বলত, "শুন, পানি কা শত্রু পান্না আর দুনিয়াকা শত্রু কানা।" ওর কথা শেষ হওয়ার পর ওর অন্যতম সেনাপতি মুখে বসন্তের দাগ ও লাল চোখ নিয়ে পাশে দাঁড়ানো সুবল ভুঁড়ি দুলিয়ে খ্যাঁ খ্যাঁ করে খেঁকশিয়ালের মতো হেসে উঠত। জয়হিন্দ কাঁধে লাগিয়ে দিত এক রদ্দা।

ব্যস অনেকেই কেঁদে ফেলত অথবা পা ধরে নিত। পরিস্থিতি ও পরিবেশটা এমন করে তুলত যে সোজা কথায় ওদের হাতেই যে ওদের বাঁচামরা নির্ভর করছে সেটা পান্নারা বুঝিয়ে দিত।

আত্মসমর্পণের পর পান্নার হুমকি, "লেখ শালা ঘর মে খত লেখ। এক লাখ রুপিয়া অভি মাঙাও। নয়ত তেরা দম ফোড় দে গা।"

এক লাখ টাকার কথা শুনেই অনেকে আবার কাঁদতে থাকে। দু'চার চড়, কিল, লাথি। এবার শুরু হয় দরাদরি। কিন্তু সেটা কখনই পঞ্চাশ হাজারের নিচে নামে না। 'প্রাণের দাম' স্থির হলে এবার সেই দাম মেটানোর জন্য লেখা হয় খত। সেই খত নিয়ে এবার ছোটে পান্নার নির্বাচিত কোনও জেল কর্মচারী বা সিপাই সেই ব্যবসায়ীর নির্দেশ অনুযায়ী তার বাড়ি কিংবা অফিসে।

যথাসময়ে টাকা আসত পান্নার হাতে। পান্না এবার সেই টাকা থেকে বিভিন্ন অংশীদারকে অংশ দিতে শুরু করত। জেল প্রশাসনের স্তর অনুযায়ী ভাগ হতো। ভাগ দিত তার অনুগত সিপাইদের ও চেলা জয়হিন্দ এবং সুবল কুণ্ডুকে। তবে মোটা অংশটাই সে নিজে আত্মসাৎ করত এবং পরদিন তার ভাইপো জেলখানায় ওর সঙ্গে দেখা করে সেই টাকা যদু মিত্র লেনের বস্তির বাড়িতে নিয়ে যেত।

এইভাবেই কানা পান্নার তখন গড় প্রতিদিন রোজগার ছিল ত্রিশ চল্লিশ হাজার টাকা। জেলে বসে কোনও কয়েদি এত টাকা রোজগার করেছে কিনা সারা পৃথিবীর গবেষকদের কাছে তা একটা বিশেষ গবেষণার বিষয় হতে পারে।

কফেপোসায় ধৃত ব্যবসায়ীরা পান্নাদের টাকা দেওয়ার বদলে পেত জেলের ভেতরের সুবিধা ও খানিকটা আরামদায়ক স্থান কিংবা জেল হাসপাতালের মোটামুটি পরিষ্কার আশ্রয়। ওখানে চিকিৎসার প্রয়োজন ছাড়াই ওরা নিশ্চিতভাবে থাকার সুযোগ ওরা পেত। কিন্তু একথোকে টাকা ঘুষ দিয়েছে বলেই যে ওরা একেবারে নিশ্চিত ছিল তা নয়। এবার পান্নারা গল্পের ছলে ব্যবসায়ীদের থেকে জেনে নিত সেই ব্যবসায়ীর কিসের ব্যবসা। কেউ বলত ঘড়ির ব্যবসা, কারও বা গহনা বা বিভিন্ন পাথরের। ব্যস এবার পান্না ও তার চেলাদের

নির্দেশ আসত বিদেশি ঘড়ি, হিরে, মুক্তোর। ওগুলিও যথানিয়মে চলে আসত।

শুধু পান্নারাই নয় জেলের অন্যান্য কর্মচারী ও সিপাইরাও আদায় করত ঘড়ি, শাল, পাথর, সোয়েটার, এমন কি জামাপ্যান্টের পিস থেকে শুরু করে বিছানার চাদর, তোয়ালে পর্যন্ত। আর বিদেশি সিগারেট ছাড়া তখন পান্নার দলের কোনও সদস্য তো অন্য সিগারেটে একটা টানও দিত না। সন্ধেয় সুবল আর জয়হিন্দের জন্য প্রতিদিন আসত হুইস্কির বোতল।

এত সুখ ওরা বাইরে কোনও দিন ভোগ করেনি। আসলে বাইরে তো আর ওরা আইনের শাসন নিজের কোমরে গুঁজে রাজত্ব চালাতে পারে না। তাই এই সুযোগও আসেনি।

পান্নার আবার মদ্যপানে আসক্তি খানিকটা কম ছিল, ওর আসক্তি ছিল গাঁজায়। নিজেদের ওয়ার্ডের নির্দিষ্ট আসনে বসে কলকের পর কলকে গাঁজায় ফুঁ মেরে পান্না তার শাগরেদদের নিয়ে উড়িয়ে দিত। প্রতি জেলেই সিপাইরা কয়েদিদের গাঁজা যোগান দেয়। এটা ওদের একটা অলিখিত ব্যবসা। কয়েদিদের সঙ্গে অনেকে নিজেরাও গঞ্জিকার নেশার সুখ ভোগ করে। জেল প্রশাসনের মদতে তখন কানা পান্নার কথা শুনবে না এমন কোনও সাধারণ বন্দি প্রেসিডেন্সি জেলে ছিল না।

একবার কাফেপোসায় ধৃত এক মাড়োয়ারি সম্প্রদায়ের ব্যবসায়ী জেল গেটে বন্দি হিসাবে ঢুকেই যথারীতি পান্নার ও তার দলবলের সম্মুখীন হলো। পান্না তার তিনটে আঙুলহীন কালো হাত দিয়ে ওই ব্যবসায়ীর থুতনিটা ক'বার ঝাঁকিয়ে বলল, "নতুন মাল আইস, শুনলে, পানি কা শত্রু পানা আউর দুনিয়াকা শত্রু এই কানা, আন্দার মে হামারা রাজ চলিস।"

ব্যবসায়ী ভদ্রলোক তখনও পান্নার ব্যবহার ও ঘোষণার গুরুত্ব বোঝেনি। সে কোনওমতে থতমত খেয়ে ব্যবসায়ীদের অভ্যস্ত বিনয়ে বলল, "ঠিক হায় বাবু, আভি ছোড়। বাদ মে—।"

পান্না ধমকে উঠে বলল, "বাদ মে কেয়া? অ্যাঃ বাদ মে কেয়া?" তারপর সুবলদের দিকে ফিরে বলল, "এই সুবলিয়া, এ কি বলে রে? বলে, বাদ মে।" তারপর হো হো করে হাসতে হাসতে ব্যবসায়ীটার থুতনিটা ধরে আবার নাড়তে নাড়তে বলল, "এই সুবলিয়া, এ শালেকে বোল দে ইঁয়া বাদ মে কুঁছ নেহি হোতা হ্যায়।"

সুবল ওর গুরুর নির্দেশ মতো ওকে বলল, "এই শালা ইঁয়া বাদ মে কুঁছ নেহি হোতা হ্যায়। গুরু যো বলতা হায় ওহি কর।"

ওই ব্যবসায়ী অবাক হয়ে প্রশ্ন করল, "কেয়া করে গা বাবু?"

পান্না ধমকে উঠে বলল, "ক্যায়া করেগা? লেখ শালে ঘর মে যত লেখ, উঁয়া সে এক লাখ রূপিয়া মাঙাও। নেহি তো—।" কথা শেষ হলো না। জেল অফিস থেকে কাগজ আর পেন নিয়ে এসে জয়হিন্দ ব্যবসায়ী ভদ্রলোকের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, "ইস মে লিখ।"

অবস্থা সঙ্গিন। বুঝতে অসুবিধা হলো না। তবু সে বলল, "ইতনা রূপিয়া হাম ক্যায়া সে মাঙায়ুঙ্গা?"

"চোপ, তাড়াতাড়ি লেখ।" কানা পান্নার ধমক। এই দৃশ্য দেখতে জেল কর্মচারী ও সিপাইরা অভ্যস্ত। তারাও যে এই প্রক্রিয়ার অংশীদার। সুতরাং তারা শুধু নীরবে দেখছেই না, হাসছেও। ওরা জানে পান্নার হাত থেকে ওর মুক্তি নেই। সুন্দরবনের বাঘের সামনে থেকেও মানুষ মুক্তি পেতে পারে কিন্তু তখন কানা পান্নার দলের থেকে কাফেপোসা আইনে ধৃত কোনও ব্যবসায়ীর টাকার বিনিময়ে ছাড়া মুক্তি নেই।

সেই ব্যবসায়ী বলল, "বিশওয়াস কিজিয়ে, ইতনা রূপিয়া হামারা নেহি হায়। হামার সব কুছ পুলিশ সিল কর দিয়া।"

"ওসব ভরঙের কথা আমাদের বলিস না। এক লাখ নেহি তো আশি হাজার মাঙা। নয়ত তুই বাঁচতে পারবি না। তোকে কাঁচা খেয়ে নেব।" পান্না বলল।

ব্যবসায়ী প্রায় কেঁদে ফেলে জানাল, "সাচ বলছি, হামারা পাস কোহি পয়সা নেই। হ্যাম কো মাফ কিজিয়ে। দো একশ দেনে সেকতা।" পান্না আবার হেসে উঠল, তারপর চেলাদের দিকে তাকিয়ে বলল, "এ মাল বলে কি রে, দো-একশ। শালা দো একশ আমার থেকে নিয়ে যা।" তারপর সুবলদের দিকে ফিরে বলল, "শালাকে ভেতরে নিয়ে চল, ওখানেই ওকে সাইজ করব। এ শালা পাকা মাল, ঝাড় না খেলে এ কিছু বার করবে না।"

সুবলরা ব্যবসায়ী ভদ্রলোকের দু'হাতের ডানা ধরে টানতে টানতে জেল গেটের থেকে ভেতরে নিয়ে গেল। প্রেসিডেন্সি জেলের গেটের ভিতরে সামনেই একটা বিশাল পুকুর। তার পাশেই একটা সিমেন্টের বড় চাতাল। সেখানে পান্নারা ওই ব্যবসায়ীকে নিয়ে গিয়ে পরিষ্কার ভাবে জানতে চাইল সে টাকা দিতে পারবে কিনা। ব্যবসায়ীও এবার পরিষ্কারভাবে জানাল, না, তার কাছে টাকা নেই, সে দিতে পারবে না।

ওর উত্তর শুনে পান্না রাগে থরথর করে কাঁপতে লাগল। ওর মুখের

ওপর প্রেসিডেন্সি জেলের ভেতর দাঁড়িয়ে 'না' বলছে, এতবড় দুঃসাহস! এর প্রতিকার করে ওকে বুঝিয়ে দিতে হবে, পান্না মনে মনে ভাবল। শুধু তাই নয়, অন্য যারা তার নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করছে না, মাঝে মাঝে উল্টোপাল্টা করছে, একে ভয় করে শিক্ষা দিয়ে তাদের দিকেও একটা বার্তা পৌঁছানোর দরকার।

চাতাল ঘিরে পান্নার বীরত্ব দেখার জন্য দাঁড়িয়ে আছে তার দলের সদস্যরা। তাদেরই একজনকে পান্না নির্দেশ দিল, "যা একটা সাঁড়াশি আর নোড়া জলদি লে আ।" সে 'বড় চৌকা' বা রান্নাঘরের দিকে ছুটল।

সাঁড়াশি আর নোড়া নিয়ে পান্না কি করবে তখনও সুবলরা ভেবে পাচ্ছে না। এমন ধরনের অস্ত্র তারা পান্নাকে প্রয়োগ করতে দেখেনি। নতুন কি খেলা কানা পান্না দেখাবে তার জন্য ওরা একদিকে উল্লসিত অন্যদিকে কৌতূহলী হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

আর পান্নার সামনে তখন ওই বেচারা ব্যবসায়ী ভদ্রলোক ভয়ে উদ্বেগে ঘামতে লাগল। প্রকৃতপক্ষে সে বুঝতেই পারছে না ঠিক কি ধরনের যমপুরীতে সে এসে দাঁড়িয়েছে। পান্নাদের পরিচয়ই বা কি তাও তখন ওর কাছে অজানা। প্রথম যে লোকই জেলে বন্দি হিসাবে যায় তার কাছে তখনও কনভিক্ট ওভারসিয়ারদের দাপটের সঠিক চিত্র জানা থাকে না। সেটা ক্রমশ প্রকাশ্যে আসে। পেছনের কোন শক্তির বলে ওরা বলীয়ান তাও তারপর তাদের কাছে জলের মতো পরিষ্কার হয়ে যায়। ওই সব ওভারসিয়াররা যে বস্তুতপক্ষে সাজাপ্রাপ্ত খুনি ও ডাকাত তাও তারা জানতে পারে। ওই সব খুনি ও ডাকাতরা যে জেলখানার প্রশাসনের অর্ধেক নিয়ন্তা তাও তখন তাদের জানা হয়ে যায়। সুতরাং ওই ব্যবসায়ী ভদ্রলোকও কিছুটা অবুঝের মতো পান্নার সামনে অপরাধী সেজে দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য হলো। মিনিট তিন কি চার, পান্নার চেলা ওর নির্দেশ মতো একটা সাঁড়াশি ও নোড়া নিয়ে এল।

জেলখানার সাঁড়াশিগুলো হয় সাধারণ সাঁড়াশির চেয়ে অনেক বড়। প্রথমত, ওগুলি এমনভাবে তৈরি করা হয় যার বেশি ওজন বইবার ক্ষমতা থাকে। দ্বিতীয়ত, ওগুলি তৈরিই হয় জেলখানার কারখানায়।

সেইরকম একটা বেঢপ সাঁড়াশি ও সম আনুপাতিক নোড়া নিয়ে এসে পান্নার চেলা বলল, "গুরু লে আইস।"

পান্না একবার ওর দিকে তাকিয়ে ইশারায় দাঁড়িয়ে থাকতে বলে মুহূর্তের মধ্যে ওই ব্যবসায়ীর বুকে ঘুষি মেরে ওকে চাতালের ওপর চিৎ করে শুইয়ে দিয়ে নিজে ওর বুকের ওপর হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল।

তারপর ওর বাঁ হাতটা চেলার দিকে উঁচিয়ে বলল, "সাঁড়াশি দিস।" চেলা সাঁড়াশিটা পান্নার হাতে তুলে দিল।

পান্না এবার ওই ব্যবসায়ীর মুখটা চেপে ধরে সেটা ফাঁক করাতে লাগল। আর চিৎকার করে বলতে লাগল, "জেল কা আন্ধার সোনা?" অন্যোদের নজর না পরলেও পান্না কিন্তু দেখে নিয়েছিল যে ওই ব্যবসায়ীর একটা দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধানো। সে ওই সুযোগটা নিয়ে ওকে শাস্তি দেওয়ার পরিকল্পনাটা আগেই ঠিক করে নিয়ে চাতালে শুইয়ে ওর বিক্রম দেখাতে লাগল।

সাঁড়াশির মুখটা ব্যবসায়ী ভদ্রলোকের মুখে ঢুকিয়ে সোনা বাঁধানো দাঁতে চেপে গায়ের জোরে টানতে লাগল। ওই টান মাড়ি কতক্ষণ সহ্য করবে? মিনিট খানেকের মধ্যে মাড়ির একটা অংশ সমেত রক্তমাখা কাঁচা দাঁতটা উঠে এল পান্নার হাতে।

ব্যবসায়ী ভদ্রলোক ওই কাঁচা দাঁত উপড়ে ফেলার অসহ্য ব্যথায় চিৎকার করতে লাগল। ওর সেই চিৎকার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উপভোগ করতে লাগল গোল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা সুবল ও জয়হিন্দরা। চিৎকার কিন্তু সারা প্রেসিডেন্সি জেলের চৌহদ্দি থেকেই শোনা গেল। আজিজুল, নিশীথবাবুর মতো 'বিপ্লবীরা'ও ওই আর্তনাদ শুনতে পেল। কিন্তু তারাও পান্নার বিরুদ্ধে কোনও কথা উচ্চারণ করল না। হয়তো তারা ভেবেছিল "শ্রেণীশত্রু মাড়োয়ারি ব্যবসায়ীর দাঁতটা উপড়ে ফেলার কাজটা কমরেড পান্না ঠিকভাবেই নিখুঁত কায়দায় পালন করছে।"

দাঁতটা উপড়ে ফেলে পান্না এবার রক্তমাখা দাঁতটা দু'হাতে নিয়ে নোড়া দিয়ে থেঁৎলিয়ে দাঁত থেকে খুলে নিল ছোট সোনার পাতটা। কাঁচা দাঁতের টুকরোগুলো পান্না ব্যবসায়ী ভদ্রলোকের রক্তাক্ত মুখে ঢুকিয়ে দিয়ে তার বুক থেকে উঠে দাঁড়াল বিজয়োল্লাসে। তারপর জল দিয়ে রক্ত ধুয়ে সে পকেটে রেখে দিল সোনার টুকরোটা। যন্ত্রণায় কাতর, চাতালে পড়ে ছটফট করতে থাকা, সেই ব্যবসায়ীকে দর্শকের ভূমিকায় এতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা দু'জন সিপাই নিয়ে চলল জেল হাসপাতালের দিকে।

জেল প্রশাসন বস্তুতপক্ষে পান্নার কাছে টাকার বিনিময়ে বশ্যতা স্বীকার করে আদিম কায়দায় চলছিল।

এই সুযোগটা নকশালরা ভালভাবেই নিয়েছিল। জেল প্রশাসন অন্য কাজে মগ্ন। কে কত টাকা লুটে নিতে পারবে সেদিকে ওদের দৃষ্টি নিয়োজিত। নকশালদের ওপর যে প্রখর নজরদারি রাখতে হবে সেই কাজটাই ওরা ভুলে গিয়েছিল। ওরা যে জেলখানায় অবাধে ঘোরাঘুরি করে নিজেদের

কাজ গুছিয়ে নিচ্ছে সেদিকে খেয়াল রাখার ওদের সময়ই ছিল না। এমন কী, জেলখানার নিয়ম অনুযায়ী বন্দিরা সপ্তাহে একদিন বাড়ির লোকজন বা বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ পায়। কিন্তু প্রেসিডেন্সি জেলের এই ডামাডোলের বাজারে এক একজন নকশাল বন্দি সপ্তাহে দু'তিনদিন বাইরের লোকেদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করত। শুধু তাই নয় একমাত্র প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর বন্দিরা ছাড়া কেউ জেল অফিসে বসে মুখোমুখি সাক্ষাতের সুযোগ পায় না। সাধারণ শ্রেণীর বন্দিরা ছোট তারের খোপ দিয়ে তাদের আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে কথা বলতে পারে। কোনও জিনিসপত্র ওইখান থেকে নিতেও পারে না দিতেও পারে না। নিয়ম অনুযায়ী যে কোনও জিনিস জেল অফিসে জমা দিতে হয় এবং ডেপুটি জেলার বা ওই স্তরের অফিসাররা ওই জিনিস পরীক্ষা করে নিষিদ্ধ কিছু না পেলে তখনই তা বন্দিদের হাতে দেওয়া হয়। কিন্তু সাধারণ নকশাল বন্দিরা ডেপুটি জেলার অমলেন্দুবাবুর সহায়তায় জেল অফিসে বসে সামনাসামনি সাক্ষাৎ করার সুযোগ করে নিয়েছিল এবং বিনা তল্লাশিতে সাক্ষাৎকারীর হাত থেকে জিনিস নিয়ে জেলের ভেতর ঢুকে যেত।

চিঠিপত্র তো এইভাবে সহজ পদ্ধতিতে আদান প্রদান করেছিলই, এমন কী, ছোরা, বোমার মশলা ও পাইপগান, মুড়ির টিন ও অন্য খাবারের মাধ্যমে ওরা আমদানি করেছিল।

বাইরের থেকে আদানপ্রদানের ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিল নন্দিতা ঘোষাল। ওর বাবা ডাক্তার হওয়ার সুযোগে ওই জেলের এক ডাক্তার ওর বাবার বন্ধু ছিলেন। নন্দিতা ওই ডাক্তারের জেল সংলগ্ন কোয়ার্টারে নিয়মিত যাতায়াত করত এবং ওই ডাক্তারের কোয়ার্টারে যে সব কম সাজাপ্রাপ্ত কয়েদিরা কাজ করতে আসত নন্দিতা ওদের মাধ্যমে বিভিন্ন জিনিস জেলের ভেতর অনায়াসে রপ্তানি করত।

অন্যদিকে যেহেতু ওর ভাই বিমলেন্দু জেলের অন্যতম 'নায়ক' জয়হিন্দের সমকামীর অংশীদার ছিল, সেহেতু ওর অনেক 'স্বাধীনতা' ছিল। জয়হিন্দের 'মহিলা' সহযোগীকে কারও বাধা দেওয়ার সাহস ছিল না। সে অমলেন্দুবাবুর মদতে নন্দিতার সঙ্গে প্রয়োজন মতো জেল অফিসে যে কোনও দিন সাক্ষাৎ করতে পারত এবং জিনিসপত্র বিনা তল্লাশিতে জেলের ভেতর নিয়ে যেতে পারত। এই সুযোগটা নকশালরা পুরোপুরি কাজে লাগিয়েছিল। একটু একটু করে ওরা ওদের প্রয়োজনীয় জিনিস জেলের ভেতর মজুত করছিল।

তাছাড়া জেলের ভেতর যে কামারশালা আছে সেখানে কর্মরত তিনজন কয়েদিকে নিজেদের দলে টেনে এনে ছুরি ও অন্যান্য জিনিসও তৈরি

করে নিয়েছিল। ডাকাতির আসামি কয়েদি মহঃ নাজির ওরফে ভুটো ছিল এদের প্রধান। জেল কমিটি ছাড়াও অস্ত্রশস্ত্র তৈরি ও মজুত করা, যোগাযোগ, নিজেদের ভেতরে কাজের অগ্রগতি দেখার জন্য ওরা একটা 'টেকনিক্যাল কমিটি'ও গঠন করেছিল। এই কমিটির সম্পাদক ছিল প্রশান্ত চৌধুরি, অন্য সদস্যরা হলো গজপাল সিং, কালো হালদার, তাপস সরকার, যদিও সমস্ত কাজটাই ওদের জেল কমিটি নিয়ন্ত্রণ করত। প্রতিদিনের অগ্রগতির বিশ্লেষণ ওরা জেল হাসপাতালে সকালের দিকে মিটিং করে করত।

অসুস্থতার ভান করে যে কোনও বন্দিই জেল হাসপাতালে যেতে পারে। জেল কমিটি ও ওদের টেকনিক্যাল কমিটির দায়িত্বপ্রাপ্তরা ওখানে এসে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলে পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা করে নিত। সেখানেই ওরা ঠিক করত বাইরে কার কার কাছে কি কি নির্দেশ পাঠাতে হবে এবং সেগুলি কবে কার্যকরী করতে হবে।

বাইরের ষড়যন্ত্রকারীরা মূলতঃ ছাব্বিশ নম্বর ডাক্তার দেওদর রহমান রোড, উত্তরপাড়ার ভদ্রকালিতে অতুল দাসের বাড়ি ও দমদম রোডে অশোক দাসের পানবিড়ির দোকানে নিয়মিত মিলিত হয়ে প্রেসিডেন্সি জেলের নকশালদের নির্দেশগুলি পর্যালোচনা করে পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা করত। সেই অনুযায়ী ওরা কালীপদ দাস ও সুবোধ দেকে ভার দিয়েছিল বোমার মশলা যোগাড় করতে, যেগুলি দিয়ে ভেতরের নকশালরা বোমা ও মলটভ ককটেল তৈরি করেছিল।

চুয়াত্তরের মাঝামাঝি সময় বেহালা থানার মামলায় যুক্ত আসামি নিতাই রায়কে জামিনে মুক্ত করে জেল কমিটি ওকে নির্দেশ দিল রাধাকান্ত দে, দীপক চট্টোপাধ্যায়, তপন বসু ও নন্দিতা ঘোষালের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে ষড়যন্ত্রটা সঠিকভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে।

জেল কমিটির নির্দেশ অনুযায়ীই রাধাকান্ত ও নন্দিতাই জেলের ভেতরের নকশালদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে দু'তরফের সেতুর কাজটা করত। চুয়াত্তরের মাঝামাঝি যে ষড়যন্ত্রটা ওরা শুরু করেছিল তারই পরিণতি হলো ছিয়াত্তরের ফেব্রুয়ারির চব্বিশ তারিখে।

অন্যদিনের মতো সেদিনও প্রেসিডেন্সি জেলে ভোর হলো, জেলখানার গাছে গাছে এবং নিকটবর্তী চিড়িয়াখানার আকাশ মুখরিত করে পাখিরা নিজস্ব ঢঙে ঘুম থেকে জেগে ওঠার জন্য জানান দিয়েছিল।

সেলে সেলে, ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে অন্যান্য বন্দিদের সঙ্গে নকশালরাও জেগে উঠেছিল। যারা ষড়যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত ছিল তারা খুব সম্ভবত আগের রাতে ঘুমায়নি। ভেতরে ভেতরে উত্তেজনায় ছটফট করে রাত পার করেছে। সেল

ও ওয়ার্ড খুলে দেবার পর স্বাভাবিকভাবে প্রাত্যহিক সব কাজ করার চেষ্টা করেছে। কাজের ফাঁকে ফাঁকে জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়েছে। কিন্তু যতই উত্তেজনা ঢাকার চেষ্টা করুক না কেন চোখে মুখে কিছু কিছু বহিঃপ্রকাশ নিশ্চয়ই হয়েছে কিন্তু তা খেয়াল করার লোক কই?

যাদের সেইসব খেয়াল করার কাজ তারা তো অন্য জরুরি কাজে ব্যস্ত। সেই ব্যস্ততার মাঝখানে নকশালদের গতিবিধি ও চালচলন লক্ষ্য রাখার এক মুহূর্তও সময় নেই। সকাল থেকে তো আর কাফেপোসায় ধৃত ব্যবসায়ীরা আসে না। তারা আসে সন্ধে নাগাদ। কিন্তু কাফেপোসায় বন্দিদের জন্য অন্য লোকেরা সকাল থেকেই জেল গেটে আসে। আসে খাবার ও অন্যান্য জিনিস নিয়ে।

সেই খাবার যখনই আসে, প্রথম সেগুলি ভোগে লাগায় পান্না, সুবল ও জয়হিন্দ আর তাদের চেলারা। তারপর তাদের উচ্ছিষ্টগুলি তারা পাঠিয়ে দেয় নির্দিষ্ট বন্দির কাছে। কাফেপোসায় বন্দিরা বেআইনীভাবে জেলখানায় বাইরে থেকে খাবার আনাত। অবশ্যই জেল কর্তৃপক্ষের দয়ায়।

আর পান্নার হুকুম মাফিক যে সব জিনিস আনাত তা পান্নারা নিয়ে নিত। প্রতিদিন সকাল থেকে তাই পান্নারা জেল গেট আলো করে অপেক্ষায় থাকত। সেদিনও এর অন্যথা হয়নি। যথারীতি খাবার এসেছে। পান্নারা খেয়েছে। উচ্ছিষ্ট পাঠিয়েছে।

ঠিক ছিল, বাইরে থেকে যারা আসবে, তারাই প্রথম বোম মেরে জেলের গেটে প্রহরারত সিপাইদের আক্রমণ করবে। সেই বোমার আওয়াজের সংকেতই বন্দি নকশালরা বুঝে যাবে সব কিছু ঠিক। সাক্ষাৎপ্রার্থীরা যখন আসবে তাদের মধ্যেই মিশে থাকবে বাইরের আক্রমণকারী নকশালরা। তাই বিকেল তিনটে থেকে পাঁচটার মধ্যে আক্রমণের জন্য নির্দিষ্ট হয়েছিল। ওই সময়টা নির্দিষ্ট করার আরও একটা কারণ ছিল। বাইরের নকশালরা ওদের জানিয়েছিল ওই সময়টায় গঙ্গায় ভাটা থাকে, সেই কারণে প্রেসিডেন্সি জেলের পুব দিক দিয়ে বহে যাওয়া টালির নালাতেও স্বাভাবিক কারণে জল খুব কম থাকবে, তাতে জেল থেকে পালানোর পর জেল পলাতকেরা সহজেই সেটা পেরিয়ে ভবানীপুরের রাস্তায় চলে যেতে পারবে। আরও একটা কারণ হচ্ছে ওই সময়টা জেল গেটে ডিউটি রত সিপাইদের ডিউটি পরিবর্তনের সময়, তখন ওরা একটু অন্যমনস্ক থাকে।

সেই অনুযায়ী তিনটে বাজার সামান্য আগে ভেতরের নকশালরা একে একে গল্পের ভান করে জেলের ভেতরের গেটের কাছে জমায়েত হচ্ছিল। ভাবটা যেন তারা অপেক্ষা করছে সাক্ষাতের জন্য। নিয়ম হচ্ছে জেলের

ভেতর কর্মরত কয়েদি একে একে ভেতরে গিয়ে বন্দিদের নিয়ে আসে। একই দিনে প্রত্যেকের সাক্ষাৎ হয় না। সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট বন্দির সাক্ষাতের দিন। কিন্তু সেসব আইন বহুদিন আগেই প্রেসিডেন্সি জেলে প্রাচীন হিসাবে অপ্রচলিত হয়ে গিয়েছিল! সুতরাং নকশালদের তাতে সুবিধাই হয়ে গিয়েছিল।

গেটের ভেতরে জমায়েত হওয়া নকশালদের প্রত্যেকের কাছেই কিছু না কিছু অস্ত্র ছিল। সেইসব অস্ত্র তারা শরীরের ভেতর লুকিয়ে রেখে তিনটে বাজার অপেক্ষা করছিল। কারও কাছে ছিল মলটভ ককটেল, কারও কাছে বোমা কিংবা অ্যাসিড বাল্ব, পাইপগান ও কারও কাছে বা জেলের কামারশালায় ভুট্টোর বানানো লোহার বিভিন্ন জাতীয় অস্ত্র।

প্রশান্ত চৌধুরি, গৌর দত্ত ও স্বপন ঘোষ জেলের ভেতর বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা নকশালদের মধ্যে অস্ত্রগুলি বাটোয়ারার দায়িত্বে ছিল। সেদিন সকাল থেকেই ওরা তিনজন ওই কাজে লিপ্ত ছিল। হাসপাতালের বারান্দায় ওয়ার্ডের ভেতরে ওরা নির্বিঘ্নে ওই কাজটা সকালবেলাতেই সম্পন্ন করে রেখেছিল।

পরিকল্পনা অনুযায়ী আক্রমণ করার জন্য জেল কমিটি তিনটে আলাদা আলাদা স্কোয়াড তৈরি করেছিল এবং তাদের প্রত্যেকের জন্য কাজও বিভক্ত করে দিয়েছিল।

প্রথম স্কোয়াডে ছিল বিমলেন্দু, ভুট্টো ও স্বদেশ ঘোষ। বিমলেন্দুর কাছে ছিল বোমা ও ছুরি। ভুট্টোর কাছে পাইপগান এবং স্বদেশের কাছে বোমা। এদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল জেল অফিস আক্রমণ করা যাতে কোনও জেলকর্মী আক্রমণের মুখে পড়ে ওদের কাজে ব্যাঘাত না ঘটাতে পারে। তাছাড়া এদের ওপর ন্যস্ত ছিল টেলিফোন লাইন কেটে এবং আপতকালীন সাইরেন বাজানোর লাইন বন্ধ করে যে কোনও সাহায্যের বন্দোবস্ত স্তব্ধ করে দেওয়া।

দ্বিতীয় স্কোয়াডে ছিল স্বপন ঘোষ, রামু বৈদ্য ও নন্দগোপাল বাগ। এদের কাজ ছিল জেল গেট আক্রমণ করে সেটা উন্মুক্ত করা। তৃতীয় স্কোয়াড গঠন করেছিল অজয় দে ওরফে ভোম্বল গজপাল সিং ও কালো হালদারকে নিয়ে। এদের কাছে ছিল বোমা, ছুরি ও মলটভ ককটেল। এদেরকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল জেল গেটের ডিউটিরত সিপাই ও অন্যান্যদের নিয়ন্ত্রণ করে কাবু করে ফেলার।

কথা ছিল, স্বপন ঘোষের নেতৃত্বে দ্বিতীয় স্কোয়াডটা প্রথমে জেলের

ভেতরে গেটে আক্রমণ করে জেল অফিসে ঢুকবে। ওদের পেছন পেছন প্রথম ও তৃতীয় স্কোয়াডের সদস্যরা ঢুকবে।

যে কোনও জেলে দুটো গেট থাকে। একটা বাইরের গেট বা চ্যালেঞ্জ গেট। অন্যটা ভেতরের গেট বা ইনার গেট। এই দুই মূল গেটের সঙ্গেই থাকে ছোট ছোট গেট। যা দিয়ে সাধারণভাবে সারাদিন লোকজন যাতায়াত করে। গাড়ি বা অন্য কোনও বড় জিনিস ঢোকাতে গেলেই একমাত্র বড় মূল গেট খোলা হয়।

যে সিপাইয়ের জেল গেটে গেট খোলা এবং বন্ধের ডিউটি থাকে তার কাছেই ছোট এবং বড় সব গেটের চাবি থাকে। তার কারণ সে যখন ভেতরের গেট খোলে তখন বাইরের গেট বন্ধ থাকে। আর বাইরের গেট খোলার সময় ভেতরের গেট বন্ধ থাকে। এর ফলে একসঙ্গে কখনও দুটো গেট খোলা থাকে না। কোনও বন্দিকে তাই গেট দিয়ে পালাতে গেলে সেই একজন সিপাই থেকে চাবি ছিনতাই করতেই হবে।

এই দুই গেটের মাঝখানটাতে থাকে জেলখানার অফিস, সুপারিন্টেন্ডেন্ট, জেলারের চেম্বার। ডেপুটি জেলার, ডিসিপ্লিন অফিসারের বসার জায়গা। আমদানি করা জিনিসপত্র রাখা ও ওজন করা ব্যবস্থা।

বাইরের কোনও লোক কাজে বা বিশেষ বন্দির সাক্ষাৎপ্রার্থীরা এলে ডিসিপ্লিন অফিসাররা তাকে পেতলের একটা টোকেন দেন, সেই লোক তার কাজ শেষ হয়ে গেলে বাইরে বেরিয়ে যাওয়ার সময় সেই টোকেনটা ডিসিপ্লিন অফিসারকে ফেরৎ দিয়ে যান। ওই টোকেনটা দেওয়ার অর্থ সে জেলখানার কর্মচারী বা বন্দি নয়।

বিকেল তিনটে দশ। জেলখানার বাইরে বোমার একটা বিকট শব্দ। বাইরের নকশালদের সংকেত। তারা এসেছে।

জেল সিপাই নিমাই সাহার কাছে ছিল জেল গেটের চাবির গুচ্ছ। সে যথারীতি একবার বাইরের ছোট দরজা খুলছিল আর বন্ধ করে ভেতরের ছোট দরজার চাবি খুলে কাউকে অফিসে আসার সুযোগ দিচ্ছিল, কাউকে আবার ভেতরে পাঠাচ্ছিল। বিকেলে ওই সময়টায় জেল গেটের সিপাইরা এমনিতে প্রচণ্ড ব্যস্ত থাকে, সাক্ষাৎপ্রার্থীদের আসা যাওয়ার জন্য।

বোমাটা যখন নকশালরা ছুঁড়েছিল তখন নিমাই সাহা ভেতরের ছোট দরজাটা খুলেছিল। নকশালরা সেটা দেখেই বোমাটা ছুঁড়েছিল কারণ ওই ছোট দরজাটা খোলা না পেলে তারা অনায়াসে দুই গেটের মাঝের জায়গাটায়

আসতে পারবে না। আর সেখানে আসতে না পারলে গেটে ডিউটিরত সিপাইয়ের কাছ থেকে চাবিও ছিনতাই করতে পারবে না। ওরা জানত সেই সুযোগটা ওদের নিতে হবে।

বোমা ছোঁড়া ও ভেতরের ছোট দরজাটা একসঙ্গে হওয়ার কারণে, স্বপন ঘোষের নেতৃত্বে ওদের দ্বিতীয় স্কোয়াডের সদস্যরা ভেতরে ঢুকে পড়ে নিমাই সাহার হাত থেকে চাবিটা ছিনিয়ে নিতে গেল। নিমাইয়ের সঙ্গে ধস্তাধস্তি শুরু হলো। নিমাই আবার ছোট গেটটা বন্ধ করার চেষ্টা করতে লাগল যাতে আরও বেশি নকশাল ভেতরে না আসতে পারে। কিন্তু তার সেই প্রয়াসে স্বপনরা তো বাধা দিতে লাগলই, অন্যদিকে প্রথম ও দ্বিতীয় স্কোয়াডের নকশালরাও হুড়মুড়িয়ে ঢুকে পড়তে লাগল।

নিমাই ছুটে অন্যদিকে পালাতে গেল। পারল না। ওকে ততক্ষণে ঘিরে ফেলেছে ভোম্বল, স্বপন, নব, নিশীথবাবু, বিমলেন্দুরা। নিমাই কোনও উপায়ান্তর না দেখে হাতের চাবির গুচ্ছ বাইরে ছুঁড়ে ফেলতে গেল। কিন্তু সেটা বাইরে গেল না। বড় গেটের লোহার গরাদে ছিটকে ভেতরেই আছড়ে পড়ল। ক্ষিপ্ত ভোম্বল নিমাইয়ের পেটে চালিয়ে দিল ছুরি।

গেট ইনচার্জ সিপাই রামযুধ সিং চাবিটা কুড়িয়ে হস্তগত করতে গেল। সেটা মেঝে থেকে তোলার সময়ই ছুটে এসে দিলীপ কর্মকার আর গৌর দত্ত ওর পেটে আর বুকে বসিয়ে দিল ছুরি। আজিজুল জেল গেটের ভেতরে রাখা একটা পাঁচ কিলোগ্রাম বাটখারা তুলে রামযুধ সিংয়ের মাথার মাঝখানে মারল এক ঘা। কাঁপতে কাঁপতে রামযুধ সিং প্রেসিডেন্সি জেল অফিসের মেঝেতে আশ্রয় নিল। মেঝে ভেসে যেতে লাগল রামযুধের রক্তে।

অন্যদিকে তখন অন্য দৃশ্য। ভোম্বল নিমাইকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দিয়েছে মলটভ ককটেল। নিমাইয়ের শরীর দাউ দাউ করে জ্বলছে। আর একটা অ্যাসিড বাল্ব ছুঁড়েছে তাপস। সেই বাল্বের অ্যাসিডে পূর্ত দফতরের দুই শ্রমিক হাবিব রহমান গাজি ও সুবল ঘোষের হাত পা পুড়ছে, ওরা প্রেসিডেন্সি জেলে সারাইয়ের কাজ সেরে বাড়ি যাওয়ার পথে জেল গেটের নকশালদের এই আক্রমণের মুখে পড়ে বিপ্লবের অ্যাসিডে জ্বলতে লাগল। ডিসিপ্লিন অফিসারকে ভুট্টো রিভলবারের সামনে দাঁড় করিয়ে রেখেছে।

স্বপন ঘোষ চাবি তুলে সামনের চ্যালেঞ্জ গেট খুলবার জন্য ব্যস্ত। একটার পর একটা চাবি লাগাচ্ছে। খুলছে না। উত্তেজনায় কাঁপা হাতে উল্টোপাল্টা হয়ে যাচ্ছে।

বাইরের সি আর পি ও প্রহরারত জেল সিপাইয়ের ওপর ক্রমাগত বোমা মেরে চলেছে রাধাকান্ত, তপন ঘোষ, সুবোধ দে, কালীপদ দাসেরা।

বোমার আওয়াজে চারদিক তোলপাড়। পুলিশ বাহিনীও পাল্টা রাইফেলের থেকে এদিক ওদিক গুলি চালাচ্ছে। বোমার আওয়াজে আর হাওয়া কেটে রাইফেলের গুলির ছুটন্ত তীব্র শিসের শব্দে পরিস্থিতি ও পরিবেশ আতঙ্কিত।

আতঙ্কিত সাক্ষাৎপ্রার্থীর বিরাট দল দিকবিদিক এলোপাতাড়ি ছুটছে। ভয়ে তারা দিকভ্রান্ত। বেশির ভাগই মহিলা, শিশু। কে কোন দিকে যাচ্ছে তার ঠিক নেই।

সঙ্গে আনা ব্যাগ তাদের হাত থেকে খসে পড়ছে। সেই ব্যাগেই তারা তাদের বাড়ির লোকেদের জন্য ছোটখাটো শুকনো খাবার, সাবান, জামা-কাপড় কিংবা বই এনেছে, সেগুলি ব্যাগ থেকে বেরিয়ে উদোম হয়ে গড়াগড়ি খাচ্ছে আর ছুটন্ত মানুষের পায়ের তলায় চিড়েচেপ্টা হয়ে ঠিকানা হারিয়ে শূন্য আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে।

নিমাই জ্বলছে। জ্বলতে জ্বলতে ও ঘুরপাক খাচ্ছে। তাকে উদ্ধার করতে কেউ এগিয়ে আসতে পারছে না। জীবন্ত নিমাই গায়ে দাউ দাউ আগুন নিয়ে ঘুরপাক খেতে খেতে একসময় লড়াইয়ের শক্তি হারিয়ে দপ করে মেঝেতে পড়ে গেল।

চাবি ছেড়ে স্বপন একটা রড তুলে নিয়ে গেটে লাগানো বড় পেতলের তালার মাঝখানে ঢুকিয়ে দিয়ে প্রাণপণে টানতে লাগল। তাকে সাহায্য করতে ছুটে এগিয়ে এসেছে রামু বৈদ্য ও গজপাল সিং। খট করে একটা আওয়াজ। খুলে গেছে। তালাটা খুলে ছুঁড়ে দিয়ে চ্যালেঞ্জ গেটটা দুপাশে মেলে দিয়ে হাট করে খুলে দিল।

আর দেরি কেন? এই মুহূর্তের জন্যই তো এতক্ষণ ওরা অপেক্ষা করছিল। এবার ছুট। ছুটতে ছুটতে তেতাল্লিশ জন বেরিয়ে গেল। পারল না শুধু স্বদেশ ঘোষ ও কালো হালদার। সিপাইদের পাল্টা গুলি ওদের পিঠে লাগতে ওরা চিরদিনের জন্য প্রেসিডেন্সি জেলের মূল গেটের সামনের বিশাল চাতালটায় শুয়ে পড়ল।

বাকিরা থ্যাকারসে রোড বা উত্তর পুব দিক দিয়ে ছুটে ডেপুটি সুপারিন্টেন্ডেন্টের কোয়ার্টার পেরিয়ে তারপর টালি নালা পেরিয়ে ভবানীপুরের দিকে চলে গেল।

ক'জন সিপাই ওদের পেছন পেছন তাড়া করতে করতে টালি নালা পর্যন্ত গেল। ওদের গুলিতে সামান্য আহত হলো বিমলেন্দু ঘোষাল, আজিজুল হক ও রামু বৈদ্য।

বাইরে থেকে যারা জেল পালানোর জন্য সাহায্য করতে এসেছিল তারাও

পালাল। একমাত্র কালীপদ দিশাহীন ভাবে ছুটতে গিয়ে সি আর পি ক্যাম্পে ঢুকে পড়ে গ্রেফতার হলো।

বিভ্রান্ত ও হতবাক জেল কর্তৃপক্ষ এবার কাজ দেখাতে কাজে নামল। দগ্ধ নিমাই সাহা ও রক্তাক্ত রামবৃধ সিংসহ অন্যান্য আহতদের জেল হাসপাতালে নিয়ে গেল।

জেলখানার ডাক্তাররা রামবৃধ সিংকে পরীক্ষা করে প্রথমেই ঘোষণা করল যে সে মৃত।

নিমাইকে নিয়ে গেল শেঠ সুখলাল করনানির হাসপাতালে। সেখানে তাকে এডওয়ার্ড ওয়ার্ডে ভর্তি করানো হলো। পূর্ত দফতরের শ্রমিকরা শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ভর্তি হলো।

তলপেটে ছুরির আঘাত নিয়ে কয়েদি শেখ মুসতাক ওরফে মামা রইল জেলখানার হাসপাতালের বিছানায়। তার দোষ, সে নকশালদের পালাতে বাধা দিয়েছিল, তাই সে তলপেটে ছুরির ফলায় আঘাত পেল। বাকি যারা অল্পবিস্তর আহত হয় তারাও জেল হাসপাতালের ডাক্তারদের চিকিৎসার উপর নির্ভর করে রয়ে গেল।

পালাতে বাধা দিয়েছিল হেমেন মণ্ডলও। তার আগের দিনই হেমেনকে গ্রেফতার করে মিশা আইনে বন্দি হিসাবে প্রেসিডেন্সি জেলে ঢুকেছিল। হেমেন পুরনো মস্তান। প্রেসিডেন্সি জেলে আটক বহু বন্দিই হেমেনের পূর্ব পরিচিত ও কেউ কেউ তার অনুগামী। প্রেসিডেন্সি জেলের তখন রামরাজত্বে সবারই অবাধ চলাফেরা। আর হেমেনের ক্ষেত্রে তো আরও খোলামেলা। জেলের চৌহদ্দির ভেতরে সে তার দলবল নিয়ে কলকাতার ময়দানে ঘোরার মতোই ঘুরে বেড়াচ্ছিল। নকশালদের আক্রমণের সময় হেমেন ও তার অনুগতরা ভেতরের গেটের সামনেই আড্ডা দিচ্ছিল। বোমা ও গুলির আওয়াজেই হেমেনরা বুঝে গিয়েছিল, নকশালরা কি ঘটনা ঘটাচ্ছে। আর যখন চ্যালেঞ্জ গেট ও ভেতরের গেট খোলা দেখতে পেল, তখন তো সেটা দিনের আলোর মতো পরিষ্কার। খোলা দুটো গেট দিয়ে সেই সময় সবাই বেরিয়ে যেতে পারে। বেরিয়েও যেত। সিপাইরা ভয়ে প্রায় স্থবির। ঠিক সেই সময় হেমেন ও তার অনুগামীরা বেশ কয়েকজন কয়েদি ও বিচারাধীন বন্দিকে আটকে রেখে তাদের পলায়নমুখী ইচ্ছাকে খুন করল।

হেমেনরা যদি ওই কাজটা না করত তবে চুয়াল্লিশ জনের বদলে পলাতক বন্দির সংখ্যাটা আরও বেশি হতো।

শুধু তাই নয়, আহত সিপাই ও অন্যান্যদের জেল হাসপাতালে স্থানান্তরিত করতেও হেমেন উদ্যোগ নিয়ে দ্রুত সমাধা করল।

মার্চ মাসের আট তারিখ দগ্ধ নিমাই যন্ত্রণা সইতে সইতে এডওয়ার্ড

ওয়ার্ডের বিছানায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে চারুবাবুর অনুগামীদের বিপ্লবের পায়ে নিজেকে বিসর্জন দিয়ে চলে গেল।

তেতাল্লিশ জন নকশাল দু'চোখের কল্পনার সাগরে ভাসতে ভাসতে তথাকথিত বিপ্লবের স্বপ্নে বিভোর হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। ওদের পুঁজি বলতে চারুবাবুর কিছু আপ্তবাক্য। যে আপ্তবাক্যগুলি অনেক আগেই অসার বলে প্রমাণিত হয়েছিল সাধারণ মানুষের কাছে। কিন্তু নকশালদের একটা গোষ্ঠী তা কখনও মেনে নেয়নি। সমাজে সবদেশেই এই রকম কিছু লোক থাকেই, যাদের চোখ আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেও তারা বাস্তবকে কখনও স্বীকার করে নিজেদের ভুল চিন্তাকে পরিত্যাগ করে না। আর এইসব অন্ধ ভাববাদী লোকেদের নিয়ে সমাজ সবসময় বিপদে পড়ে।

সেই বিপদ থেকে উদ্ধার করতে আমরা আবার কাজে নেমে পড়লাম। সেই কাজটা অনেক সহজ হয়েছিল কারণ এদের পেছনে বিন্দুমাত্র জনসমর্থনও ছিল না।

নকশালদের এই গোষ্ঠীর লোকেরা বিশ্বাসই করে না সমাজের পট পরিবর্তন করার জন্য এক উদ্বেল, স্বার্থহীন, আত্মত্যাগী গণসমুদ্রের উত্তাল সমর্থনের প্রয়োজন হয়। এবং সেটাই একমাত্র বিজয়ের চাবিকাঠি। এই চাবিকাঠি হাতে থাকলে শাসকগোষ্ঠীর কোনও স্তরের বাধাই পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে না। এক ব্যাপক ঘূর্ণিঝড়ের মতোই শাসকগোষ্ঠীর সব বাধা তোড়ে উড়ে যায়।

যে গোষ্ঠীর নেতা আজিজুল হকের মতো এক ভণ্ড লোক, সেই গোষ্ঠীর অবস্থা যে কতটা সঙ্গীন তা অন্তত আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না। কারণ আমরা পুলিশ দফতরে বসে আসল নকলের রূপরেখাটা অতি সহজেই ধরতে পারি। আমরা তো আর কোনও মুগ্ধতা ও অন্ধতার চশমা পরে অনুসন্ধান করি না। এবং কোনও যুক্তিবাদী ব্যক্তিও আগাগোড়া ভুলে ভরা একটা নীতি ও কৌশলে আবিষ্ট হতে পারে না। তাই আমাদের কাছে সহজেই সৎ ও ভণ্ডদের পার্থক্য ধরা পড়ে যায়।

জেল পলাতক ও তাদের সাহায্যকারী বাইরের নকশালদের গ্রেফতার করলেও সাতাত্তর সালে বামফ্রন্ট পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় আসার পর 'রাজনৈতিক বন্দি মুক্তির' সময় এরাও জেল থেকে মুক্তি পেয়ে আবার ওদের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ শুরু করে।

দ্বিতীয় কেন্দ্রীয় কমিটি নাম দিয়ে ওদের একটা অংশ আগেই পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অংশে অল্পবিস্তর সংঘর্ষ এবং দু'চারটে খুন করছিল। আজিজুলরা বেরিয়ে ওদের সঙ্গে যুক্ত হলো।

নদীয়ার রমেন সাহা তখন ওদের নেতা, ওর সঙ্গে যুক্ত হয়ে আমাদের স্পেশাল ব্রাঞ্চের অফিসার তারাপদ বসুকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র শুরু করল। রমেনরা প্রথমে আজিজুলের প্রস্তাব নাকচ করে দিলেও, আজিজুল ওদের বোঝাল, 'তারাপদ বসুর মতো একটা কলকাতা পুলিশ অফিসারকে খুন করতে পারলে পার্টির কর্মীরা আবার উৎসাহী হয়ে উঠবে এবং নতুন উদ্যমে কাজে নেমে পড়বে।'

তারাপদ থাকত ডানলপে কলকাতা পুলিশের কোয়ার্টারে। রমেন জপুর রোডের সৌমেন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে ভার দিল তারাপদের গতিবিধির ওপর নজর রাখার।

সৌমেন্দ্র একমাস ধরে তারাপদের ওপর নজর রাখল। দেখল, প্রতিদিন সকালে স্কুটার নিয়ে তারাপদ ডানলপ বাজারে বাজার করতে যায়। একা। তবে সবসময় সঙ্গে রিভলবার রাখে।

ব্যারাকপুরে স্নেহনবিশের বাড়িতে বসেই তারাপদকে হত্যা করার ছক করল আজিজুল ও রমেন। ঠিক হলো, ওকে হত্যা করতে যাবে রমেনের নেতৃত্বে পাঁচজনের স্কোয়াড। স্কোয়াডের সদস্য হলো রমেন, সৌমেন্দ্র, পশ্চিম পুটিয়ারির তপন ও আরও দু'জন তরুণ নকশাল।

জপুর রোডে সাইকেলের ব্যবস্থা করা হলো। নির্দিষ্ট দিনে সাইকেলে চড়ে রমেনরা বাজারে পৌঁছে গেল। রমেনের কাছে একটা পয়েন্ট নয় মিলিমিটারের পিস্তল এবং সৌমেন্দ্রের কাছে ছিল পয়েন্ট থ্রি এইট রিভলবার। বাকিদের কাছে পাইপগান, বোমা ও ছুরি।

তারাপদ ওই বাজারে পরিচিত তো ছিলই এমন কী জনপ্রিয়ও ছিল। সে প্রতিদিন বাজারে একটা নির্দিষ্ট স্থানে স্কুটার রেখে বাজার সেরে স্কুটার চালিয়ে কোয়ার্টারে ফিরে যেত। সাধারণ বাঙালির মতো বাজার করতে করতেই তারাপদও পরিচিত জনের সঙ্গে এটা ওটা কেনার ফাঁকে আড্ডায় জমে যেত।

কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে তখন নকশাল আন্দোলন একেবারে স্তিমিত। বিশেষ করে চারু মজুমদারের পথের অনুগামী দ্বিতীয় কেন্দ্রীয় কমিটির বিশেষ কোনও কাজকর্ম কলকাতা কেন্দ্রীক ছিল না। স্বাভাবিকভাবেই তারাপদও প্রায় নিরুদ্বেগ হয়ে চলাফেরা করত।

সেদিনও তারাপদ প্রতিদিনের মতো যথারীতি স্কুটারটা রেখে বাজারের থলি নিয়ে বাজার অভিমুখে যাওয়ার উদ্যোগ করছে। ও জানেই না আজিজুলের নির্দেশে রমেনরা ওকে ঘিরে ধরেছে।

রমেনই তারাপদের বুক লক্ষ্য করে প্রথম গুলি করল তারপর সৌমেন্দ্র পর পর ওর রিভলবার থেকে গুলি চালাল। সারা শরীরে গুলি নিয়ে তারাপদ আস্তে আস্তে বাজারের মাটিতে ঢলে পড়ল। হাত থেকে খসে গেল বাজারের থলি। রমেনরা দ্রুত এগিয়ে গিয়ে ওর কোমর থেকে নিয়ে নিল সার্ভিস রিভলবার।

নকশাল আন্দোলন নেই, তার মধ্যে সকালবেলা বাজারে পিস্তল রিভলবারের হঠাৎ গুলির আওয়াজে বাজারে আগত ক্রেতা ও বিক্রেতারা হতচকিত হয়ে আতঙ্কিত চোখে মুখে যে যেদিকে পারল পালাতে লাগল। এর মধ্যেই যারা তারাপদকে চিনত তারা দেখল রক্তাক্ত শরীরে তারাপদ মাটিতে শুয়ে আছে। বুঝতে অসুবিধা নেই, সে মৃত। তারাপদ স্থির হয়ে আকাশের দিকে চোখ খুলে শুয়ে আছে।

রমেন ইতিমধ্যে গরম গরম ভাষণ দিতে শুরু করেছে, 'পুলিশ খুনের মধ্যেই যে দেশের মুক্তি' তা জনসাধারণের উদ্দেশে বলে চলেছে। দু'তিন মিনিট বক্তৃতার পর ওরা কিছু হ্যান্ডবিল ছড়িয়ে বাজারের বাইরে রাখা সাইকেলে চেপে পালাল।

দমদম স্টেশনের কাছে, যে দোকান থেকে সাইকেল ভাড়া করেছিল, সেখানে জমা দিয়ে ওরা সোজা রওনা দিল ব্যারাকপুরে আজিজুলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে 'বিপ্লবী খুনের' খবরটা দিতে।

খবর শুনে আজিজুল উল্লসিত, আনন্দিত। তাড়াতাড়ি তিরিশ টাকা পকেট থেকে বার করে রমেন ও সৌমেন্দ্রকে মিষ্টি খেতে দিল।

রমেনরা যখন মিষ্টি খাচ্ছে, তারাপদর ডানলপের কোয়ার্টারে তখন ওর বৃদ্ধা মা জ্ঞান হারিয়ে শুয়ে আছেন। নাবালক ছেলে ওর মাকে জড়িয়ে ধরে আকাশ ফাটিয়ে হাউমাউ করছে। স্ত্রী পাথর। কথা বলার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে।

তারাপদ বসুর হত্যা নিয়ে দ্বিতীয় কেন্দ্রীয় কমিটি আজিজুলকে সমালোচিত করল।

আজিজুল উত্তরে জানাল, "ভুল হয়ে গেছে, তবে ও খুব অত্যাচারী ছিল।" ব্যস, অজুহাত খাড়া। 'বিপ্লবী' আজিজুল বলেছে, ভুল হয়ে গেছে, এরপর আর প্রশ্ন কিসের? আবার ওদের বিপ্লব এগিয়ে চলল।

এরপরও আজিজুল সহ অনেককেই নির্দিষ্ট অভিযোগে গ্রেফতার করে বিচারের জন্য কারান্তরালে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু সি পি আই (এম) পার্টির মন্ত্রী ও নেতাদের বদান্যতায়, বিশেষ করে যে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে

বুদ্ধ ভট্টাচার্য ও বিমান বসুকে বেইমান বসু ছাড়া আজিজুল অন্য নামে তাদের নাম উল্লেখই করত না, তাদেরই বিশেষ তদবিরে ওরা আবার বিনা বিচারে মুক্ত হয়ে বেরিয়ে গেল।

শুধু তাই নয় সরকারি আবাসন ও মিনি বাসের পারমিটও খুনের পুরস্কার হিসেবে জুটল। বাড়িতে দশ বারোটা বিড়াল পুষে নামকরা ইংরাজি মাধ্যম স্কুলে দুই সন্তানকে পড়িয়ে বিপ্লবের কোন ঝাণ্ডাকে তুলে রেখেছে তার হিসাব কার কাছ থেকে সাধারণ মানুষ পাবেন? তারাপদ বসুদের খুনীরা কী কারণে বিশেষ সুবিধা ভোগ করবে তা কি যারা সেই সুযোগ দিয়েছেন সেই সব মন্ত্রী ও নেতারা জনসাধারণকে জানাবেন কি?

সমাজ ও দেশের কি উপকার আজিজুলরা করেছে যে বিনাশ্রমে সমাজের অন্ন ধ্বংস করার অধিকার অনায়াসে আয়ত্ত করতে পারে? আজিজুলদের মতো লোকেদের হাতে অনেক রক্ত, তা ধুয়ে ফেলার জন্য তাদের হয়ে যারা মঞ্চ তৈরি করে দেন তার কি জানেন না, এই সব তথাকথিত প্রগতিবাদীরা আসলে ভণ্ড, সুবিধাবাদী, বক্তৃতাবাজ, অপদার্থ, পরাঙ্গপুষ্ট জীব। এইসব জীবেদের গা থেকে ঝেড়ে না ফেললে, যাদের এগিয়ে যাওয়ার সামান্যতমও সদুদ্দেশ্য আছে তারা কিছুতেই নিজেদের লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে পারবে না।

নকশালদের দল এখন অনেক গোষ্ঠীতে বিভক্ত। শুধু নকশালদের পার্টিই নয়, সব পার্টিই বিভিন্ন অংশে টুকরো টুকরো হয়ে বহুভাবে বিভক্ত। এসব যে নীতি ও কৌশলের জন্য হচ্ছে না তা ভারতবর্ষের জনসাধারণ বোঝেন। এ সবই শুধুমাত্র সুবিধাবাদের জন্যই, প্রত্যেকেই নিজ নিজ পকেটে একটা করে গোষ্ঠী, দল ও উপদল রাখতে চায়। তাই এভাবে বহুধাবিভক্ত।

ভারতবর্ষের মানুষ কোন পথে যাবে, কে বলবে?

ভারতবর্ষের মানুষকে গিনিপিগ হিসাবে হাজার বছর ধরে ব্যবহার করে এসেছে এর শাসক ও শোষকবৃন্দ। সেই শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে এখানে ওখানে বহু বিদ্রোহও হয়েছে। কখনও সেই বিদ্রোহে জনসাধারণ উপকৃত হয়েছে, কখনও হয়নি। কিন্তু সাধারণ মানুষ দলবদ্ধভাবে বিভিন্ন পন্থায় বেঁচে থাকার সংগ্রাম করে গেছে। এই দলবদ্ধভাবে সংগ্রামটাকেই শাসক ও শোষকশ্রেণী চিরদিন ভয় পেয়ে গেছে।

তাই বারবার ওই দলকে বিভক্ত করেছে নানা কৌশলে এবং সংগ্রামকে দুর্বল করে শাসকশ্রেণী নিজেদের আসন সংরক্ষিত রেখেছে।

কিন্তু সবচেয়ে যে বড় বীজটা তারা বপন করল তা হলো ধর্মের বিষ। ভারতবর্ষের উপমহাদেশে এই ধর্মের বিষটা নিপুণভাবে প্রয়োগটাই হয়ে গেল এই মহাদেশের সবচেয়ে ক্ষতিকারক দিক।

যে মস্তিষ্কের থেকে এই কৌশল আবিষ্কৃত হয়েছিল, নিঃসন্দেহে সেই ব্যক্তিই এই উপমহাদেশের সাধারণ মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু। এর নিপুণ প্রয়োগে যে জনসাধারণ এতদিন ধর্মকে ধর্মের জায়গায় একপাশে সরিয়ে একত্রে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও তার শাগরেদদের বিরুদ্ধে মরণপণ সংগ্রাম করছিল, তারাই তারপর 'ধর্ম' আফিমের তুমুল নেশায় আসল শত্রুকে সরিয়ে 'ধর্মের' নামে পরস্পরের বিরুদ্ধে আক্রমণ হেনে এই উপমহাদেশের সবচেয়ে কলঙ্কজনক ইতিহাস রচনায় মগ্ন হলো। এবং তার ফলস্বরূপ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ 'চিরস্থায়ী হানাহানির' বন্দোবস্ত করে গেল ধর্মের ভিত্তিতে দেশ ভাগ করে।

ধর্মের এই অন্ধ আবেগের ফল আমরা প্রতিনিয়ত টের পাচ্ছি। যে আবেগের কোনও গুরুত্ব মানুষের বেঁচে থাকার ক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র নেই, সেই আবেগই কত শত নিরীহ মানুষের প্রাণ নিয়ে নিচ্ছে এবং আরও নেবে। মানুষকে এই নেশায় বুঁদ করে রেখে, ধর্মের ঢাল ব্যবহার করে সবরকম অধর্মের কাজ করে চলেছে এই উপমহাদেশের এক শ্রেণীর শাসক। আর আমরা তার ফল ভোগ করছি।

উনিশশো চুরাশি সালের সতেরই মার্চ দোল উৎসবের রঙিন বিকেলবেলা গার্ডেনরিচ থানার অন্তর্গত ফতেপুর ভিলেজ রোডে একটা অতি সামান্য ঘটনা ঘটল। যে ঘটনার গুরুত্ব, তাৎপর্য সাধারণ নিরীহ, দরিদ্র ভারতবাসীর কাছে কিছু নয়। না থাকাটাই স্বাভাবিক।

ফতেপুর ভিলেজ রোডের জে একশ চুয়াল্লিশ নম্বরে মনয়ারা খাতুনের বাগানে ক'টি কিশোর একটা নারকেল গাছে উঠে কটা ডাব পেড়ে খেয়েছে। এই নিয়ে ঝগড়া। ঘটনাচক্রে কিশোরেরা ছিল হিন্দু এবং বাগানের মালিক মুসলমান।

এমন ঘটনা এই সমগ্র বাংলাদেশে কী আর ঘটেনি? নিঃসন্দেহে বলা যায় অন্তত কয়েক কোটি বার ঘটেছে। পাড়াপড়শির বাগানের নারকেল, ডাব, পেয়ারা পেড়ে খায়নি এমন ক'জন কিশোর, বালককে এই বাংলাদেশের আকাশের নিচে পাওয়া যাবে? এটা অতি পরিচিত একটা দুষ্টামি। এই

নিয়ে হইচই করার কোনও অর্থই হয় না। যারা হইচই করার চেষ্টা করে তাদের সমাজ মোটামুটি পাগলশ্রেণীর লোক হিসাবেই গণ্য করে।

মনয়ারা খাতুনের বাগানের ডাব চুরিও সামান্য কথা কাটাকাটির পর স্থানীয় কিছু লোকের উদ্যোগে থেমে গেল।

কিন্তু থামল না কিছু লোকের মনে। তারা ওই ঘটনার মধ্যে এই ধর্মের গন্ধ খুঁজে পেল এবং সেই ভিত্তিতে তারা সন্ধে নামার পর থেকে ওই এলাকায় গোপনে ধর্মের নামে উত্তেজনা ছড়াতে লাগল।

যদিও ডাব চুরির ঘটনা অতি তুচ্ছ হিসাবেই গ্রহণ করে কেউ এই ব্যাপারে গার্ডেনরিচ থানায় নালিশ করল না।

পরদিন সকাল হতে না হতে এই ঘটনা কিন্তু আর তুচ্ছ রইল না। রাতের প্রচারের ফল ফলতে লাগল। একটা ব্যাপার অতি পরিষ্কার, ধর্মান্ধ মানুষেরা অতি দ্রুত গুজব ছড়িয়ে দিতে পারে এবং সেই গুজবের সত্যতা কেউ যাচাই না করেই তা একেবারে শাখাপ্রশাখা বিস্তার করে দাবানল হয়ে ছড়িয়ে পড়ে।

এখানেও তাই হয়েছিল, গুজব মুখ থেকে মুখে মুখে দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিল। কী তারা ভিত্তি, কোথায় তার কেন্দ্রস্থল কিছুই কেউ জানে না। দুই সম্প্রদায়ের নিরীহ মানুষগুলোর মুখ উত্তেজনায় ফুলে উঠে টগবগ করে ফুটতে শুরু করেছিল।

এইক্ষণে কোনও যুক্তি, বুদ্ধি, বাস্তবতা, শিক্ষা কাজই করে না। অন্ধ আবেগ মানুষের মনুষ্যত্বকে খড়কুটোর মতো উড়িয়ে দেয়। নিরীহ মানুষগুলো ঠিক তখন ক্ষুধার্ত নেকড়ের মতো ব্যবহার করতে শুরু করে। ধর্মের কিছু অযৌক্তিক শ্লোগান ছাড়া তাদের মনে আর কিছুই থাকে না। 'কোন' ধর্মের জন্য 'কোন' ধর্মের কাজ করছে তা ওই মানসিক উন্মাদনায় মনেই থাকে না। 'কোন' ধর্মের প্রচার ও প্রসারের জন্য অন্য ধর্মের মানুষের রক্ত পান করতে চলেছে তাও মনে রাখে না।

গুজবের ভিত্তিতে দুই সম্প্রদায়ের মানুষের একটা অংশ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল। এবং তারই পরিণতিতে সকাল ন'টা থেকে ফতেপুর ভিলেজ রোডে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রায় হাজার খানেক দাঙ্গা-পিপাসু লোকের জমায়েত অনিবার্যভাবে একটা বড় সংঘর্ষের রূপ দিতে পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড়াল।

তাদের দেখে মনে হচ্ছিল যেন এই যুদ্ধ শেষেই জীবনের সমস্যার থেকে তারা মুক্তি পাবে। এই যুদ্ধই তাদের দরিদ্রতা থেকে মুক্তির পথ।

এই যুদ্ধই তাদের 'স্বর্গে' পৌঁছে দেবে। এই সব মানুষের কাছে তখন পরিচিত, অপরিচিত, ধনী, গরীব, সম্মানীয়, শয়তান কোনও কিছুর মাপকাঠি থাকে না। ধর্মের পরিচয়ই একমাত্র পরিচয়।

কিন্তু এই পরিস্থিতিও ওই অঞ্চলে কিছু শুভ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ মাথা ঠাণ্ডা রেখেছিল। তারই ফলস্বরূপ আমাদের লালবাজারের কন্ট্রোলরুমে সকাল দশটা নাগাদ একটা ফোন এল।

ফোন মারফৎ তিনি কন্ট্রোলরুমের অফিসারকে জানালেন, "ফতেপুর ভিলেজ রোডে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে যে কোনও মুহূর্তে দাঙ্গা লেগে যাবে। এক দেড় হাজার লোক জড়ো হয়েছে।"

কন্ট্রোলরুম থেকে স্থানীয় থানায় থানায় ও ডি সি পোর্টের অফিসে খবর দেওয়ার আগেই দাঙ্গা শুরু হয় গিয়েছিল। এখানে তো কোনও রেফারি নেই যে, 'খেলা' শুরু ও শেষ করার জন্য বাঁশি নিয়ে মাঠের মাঝে দাঁড়িয়ে নির্দেশ দেবে। উত্তেজিত, মানসিক রোগগ্রস্ত, ধর্মের উন্মাদনায় মত্ত জমায়েতের যে কোনও একটা অংশই দাঙ্গা শুরু করার বাঁশি বাজিয়ে দিলেই খেলা শুরু।

দু'তরফ থেকে দু'তরফের মানুষকে লক্ষ্য করে অবিশ্রান্ত ধারায় ইঁট, পাথর এবং বোমা নিক্ষিপ্ত হতে লাগল। সকালবেলাতেই গুরুম গুরুম বোমার আওয়াজ ওই অঞ্চলের আকাশকে জানান দিল কত বড় ধর্মযুদ্ধ তারা শুরু করেছে। (আকাশেই তো সব ঈশ্বরেরা থাকেন! তারা কী তখন ওই যুদ্ধরত সৈনিকদের বাহবা দিচ্ছিলেন?) বোমার সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার, চেঁচামেচি, কোলাহলের তুমুল শব্দ ওই অঞ্চলের শান্তিপ্রিয় মানুষের মনে ত্রাসের সঞ্চার সৃষ্টি করল।

কিন্তু বোমাতে কতক্ষণ থেমে থাকবে 'ধর্মযুদ্ধ'? 'ধর্মের সৈনিকেরা' পাগলের মত ছুটে ছুটে কতগুলি বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিল। অতি সাধারণ দরিদ্র মানুষের টিন, অ্যাসবেসটস, টালির ছাউনি দেওয়া বাড়িগুলি দাউ দাউ করে জ্বলতে লাগল।

সেই আগুন ও ধোঁয়াকে উপেক্ষা করে কতজন সৈনিক আবার ওইসব বাড়ি থেকে জিনিসপত্র লুট করতে শুরু করল। 'অন্য ধর্মের মানুষকে খুন কর, তারা ঘৃণ্য' কিন্তু তাদের জিনিস লুট করে সেগুলি ব্যবহার করা যায়। তাদের মহিলাদের ধর্ষণ করা যায়, কিন্তু তাদের শিশুদের ভালবাসা যায় না। এইসব অলিখিত নিয়মগুলি দাঙ্গাবাজেদের মধ্যে চল আছে। তাই আগুন লাগাবার পরই তারা লুট করতে নেমে পড়ল। ভয়ার্ত নারীদের

হাত ধরে টেনে নিয়ে গোপন জায়গা খুঁজতে লাগল। ওই পরিবেশেও তাদের শরীরের প্রয়োজনীয় অঙ্গ চাহিদা অনুযায়ী কাজ করে। মনে হয়, ওটাও ওদের ধর্মযুদ্ধের একটা অঙ্গ। উন্মত্ত মানুষেরা কখন যে কী করে তা কোনও জন্তুও বলতে পারবে না।

যাদের বাড়িগুলো আগুনে দাউ দাউ করে জ্বলে চোখের সামনে ছাই হয়ে যাচ্ছিল তারা তখন আগুনের ক্রমশ বাড়ন্ত থাবা থামাবে কী করে? লুঠ বন্ধ করবে কী করে, তখন যে তারা প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে উন্মাদের মত পলায়নরত। বহুকষ্টে, বহুশ্রমে তিল তিল সঞ্চয় করে যে আবাস, যে সাংসারিক জিনিস তারা বুকে ধরে বানিয়েছিল তা মুহূর্তে ধূলিসাৎ ও লুঠ হতে দেখেও তাদের কিছুই করার ছিল না।

কোন ধর্মগ্রন্থ যে এভাবে দাঙ্গা ও লুঠ করার ক্ষমতা দিয়েছে তা একমাত্র দাঙ্গাবাজেরাই জানে। অনিবার্যভাবেই প্রতিটা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় নেতৃত্ব দেয় দুষ্কৃতীরা। আর ওইসব দুষ্কৃতীদের নেতৃত্বেই সাধারণ মানুষের একটা অংশ ধর্মান্ধ হয়ে দাঙ্গায় মত্ত হয়ে ওঠে।

একটা অতি সামান্য ডাব চুরির ঘটনাকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় পরিণত করতে একমাত্র দুষ্কৃতীরাই পারে। আর এর জন্য অবশ্য দায়ী আমাদের দেশের একশ্রেণীর রাজনৈতিক দল ও নেতারা। ধর্মনিরপেক্ষতা বা সেকুলারিজমের যে তত্ত্ব আমরা মুখে বলি তা কতখানি মাটিতে প্রথিত হলো বা তার প্রসার কতটা কার্যক্ষেত্রে প্রসারিত হলো তা দেখার কেউ প্রয়োজনই মনে করে না। করবে কী করে? কারণ ধর্ম দিয়েই তো তাদের রাজনীতির অন্ন জোটে। নিরীহ মানুষের রক্ত ধর্মের নামে ঝরিয়েই তো তাদের কুর্সি দখল করতে হয়। ক'টা শতাব্দী যে লাগবে উপমহাদেশ থেকে এই অভিশাপের মুক্তি পেতে তা কে বলতে পারবে?

সুতরাং চৈত্রের সকালে বসন্তের হাওয়ায় প্রেমের বদলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার আগুন দাপিয়ে বেড়াতে লাগল ফতেপুর ভিলেজ রোডের খণ্ড আকাশে। হায়রে, মন্দিরে মন্দিরে উপাসনা বা আরতির ধ্বনি আর মসজিদের আজান সব তখন ওখানে থেমে গেছে।

আমাদের লালবাজারের কন্ট্রোল রুমের অফিসার ইন-চার্জ বার্তা পেয়েই প্রথমে খবর পাঠাল গার্ডেনরিচ থানায়।

তখন সকাল দশটা পনেরো। থানায় ডিউটিতে ছিল সাব-ইন্সপেক্টর ডি কে সিকদার। সে শুনল, ফতেপুর ভিলেজ রোডে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের দুই গোষ্ঠী দাঙ্গা বাধাতে মুখোমুখি হয়েছে। সে সঙ্গে সঙ্গে খবর দিল অফিসার-ইন-চার্জ শিউনাথ সিংকে।

কন্ট্রোলরুমের অফিসার-ইন-চার্জ বার্তা দিল খিদিরপুরে আমাদের ডি সি (বন্দর) অফিসেও। ডি সি (বন্দর) বিনোদ কুমার মেহেতা গার্ডেনরিচের ওই অঞ্চলে দাঙ্গা রুখতে ওখানে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলেন। কিন্তু প্রস্তুতির প্রথমেই তিনি হোঁচট খেলেন। কারণ এ সি (প্রথম) কালীকা বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি নিজেকে কলকাতা পুলিশের একজন সবচেয়ে সাহসী, পেশাদার, কার্যকরী হিসাবে প্রচার করেন তিনিই দাঙ্গার খবর শুনে ভয়ে নিজেকে অসুস্থ বলে ঘোষণা করে দাঙ্গারত স্থানে যেতে অস্বীকার করলেন। অগত্যা মেহেতা সাহেবকে ওই অঞ্চলের এ সি (দ্বিতীয়) কে কে শর্মা ও অন্যান্য ফোর্স নিয়ে ফতেপুর ভিলেজ রোডের উদ্দেশে রওনা হতে হলো।

লালবাজারের স্পেশাল কন্ট্রোল রুম থেকে স্থানীয় থানার ফোর্সকে সাহায্য করার জন্য একজন সাব-ইন্সপেক্টরের নেতৃত্বে মোট কুড়ি জনের একটা কনস্টেবলের দলকে একটা লরিতে পাঠান হলো দাঙ্গাবিধ্বস্ত অঞ্চলে। এই ফোর্সের মাস্কেট পার্টিতে ছিল কনস্টেবল মোহিতমোহন সরকার, অজিত মাইতি, আমিরুল ইসলাম, ভোলানাথ মণ্ডল। কাঁদানে গ্যাসের দলে ছিল কনস্টেবল অসীম চক্রবর্তী ও উত্তম ঘোষ সমেত চারজন। এরা লরি নিয়ে দশটা কুড়ি নাগাদ লালবাজার থেকে বেরিয়ে পাহাড়পুর রোডের দিকে চলল।

ওদের পৌঁছানোর অনেক আগেই সাড়ে দশটা নাগাদ ফতেপুর ভিলেজ রোডের 'ধর্মযুদ্ধের' স্থানে পৌঁছে গেল গার্ডেনরিচ থানার অফিসার-ইন-চার্জ শিউনাথ সিং। সঙ্গে সাব-ইন্সপেক্টর ডি কে সিকদার, এইচ পি দত্ত ও থানার বেশ কিছু কনস্টেবল।

ডি সি (বন্দর) মেহেতা সাহেব, তাঁর গার্ড সার্জেন্ট রবীন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, ও ওয়াটগঞ্জ থানার কনস্টেবল কাসিম খান, কনস্টেবল উমাশংকর পাণ্ডে, একবাল থানার কনস্টেবল মোকতার আলি, গার্ডেনরিচ থানার কনস্টেবল মহেশ্বর সিং এবং এ সি (দ্বিতীয়) কে কে শর্মা, তাঁর সিকিউরিটি গার্ড একবালপুর থানার কনস্টেবল রামাশংকর সিং, দক্ষিণ বন্দর থানার অফিসার-ইন-চার্জ ফণী দে, সাব-ইন্সপেক্টর আশিস গোপ, সাব-ইন্সপেক্টর সাগর গুপ্ত, একবালপুর থানার অফিসার-ইন-চার্জ ও ফোর্স ফতেপুর ভিলেজ রোডে পৌঁছাল।

একমাত্র ডি সি (বন্দর) মেহেতা সাহেবের কাছে কোনও আগ্নেয়াস্ত্র ছিল না। তাঁর হাতে একটা পুলিশের সামান্য লাঠি এবং মাথায় একটা হেলমেট। বাকি ফোর্সের প্রায় প্রত্যেকের কাছে আগ্নেয়াস্ত্র ছিল।

গার্ডেনরিচ থানার অফিসার-ইন-চার্জ তাঁদের ফোর্স নিয়ে পৌঁছানোর আগেই লালবাজারের কন্ট্রোলরুমের নির্দেশে রিজার্ভ ফোর্সের একটা ভ্যান ফতেপুর

ভিলেজ রোডের দাঙ্গার স্থানে পৌঁছে গিয়েছিল। উত্তেজিত জনতা তাদের তাড়া করলে তৃতীয় ব্যাটেলিয়নের 'বি' কম্পানির কনস্টেবল এস খান সেই জনতার রোষ থেকে বাঁচতে রাইফেল থেকে এক রাউন্ড গুলি করে বসল। গুলি গিয়ে লাগল পঁচিশ ছাব্বিশ বছর বয়সের যুবক পাহাড়পুর রোডের বাসিন্দা সুব্রত ভট্টাচার্যের শরীরে। সে মারা গেল।

মেহেতা সাহেবের নেতৃত্বে ওই বিশাল রণমত্ত জনতাকে পুলিশ পার্টি ক্রোধ সংবরণ করতে অনুরোধ করতে লাগল।

কিন্তু কে কার কথা শোনে? তারা মেহেতা সাহেবের অনুরোধকে পাল্টা ইঁট ও পাথর ছুঁড়ে জবাব দিতে লাগল। সঙ্গে তুবড়ির মতো অকথ্য ভাষায় গালাগালি। ওই সব ভাষার জন্ম ওই অঞ্চলেই বেশি হয়। তার অর্থও একমাত্র ওরাও বিশেষ ভাবে জানে। এত তাদের গালাগালির পারদর্শিতা যে তা শিখতে শিশুদের এক মুহূর্তও লাগে না।

ইঁট বৃষ্টির মধ্যে ওই উন্মত্ত জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য পুলিশের দল এগিয়ে গেল। কাঁদানে গ্যাসের দল মেহেতা সাহেবের নির্দেশে গ্যাস ছুঁড়ল। কিন্তু তাতে প্রতিক্রিয়া সামান্যই।

কি যে তাদের ইচ্ছা, কি যে তাদের বক্তব্য, কি যে তাদের চাহিদা, কিছুই বোঝার উপায় নেই।

দুই সম্প্রদায়ের লোকই পুলিশের দলকে ইঁট ও বোমা ছুঁড়ে আক্রমণ করে ওই এলাকা থেকে হটিয়ে দিতে চাইল। এ ব্যাপারে তাদের মধ্যে আশ্চর্য রকম মিল। অর্থাৎ তারা যেন চাইছে, পুলিশ এলাকা ছেড়ে চলে যাক। একে অন্য সম্প্রদায়কে আক্রমণ করে যা ইচ্ছা তাই করবে, সেখানে পুলিশের হস্তক্ষেপ করার কিছু নেই।

দুষ্কৃতীকারীদের কাছে সবসময়ই বোমা মজুত থাকে, যে কোন প্রয়োজনে, যে কোন মুহূর্তে সেগুলো তারা গোপন গর্ত থেকে বার করে এনে তাদের কাজে লাগায়। দুই সম্প্রদায়ের দুষ্কৃতীরাই ওই অঞ্চলে এ ব্যাপারে সক্রিয়, তারা প্রস্তুত থাকে।

খিদিরপুর, একবালপুর, মেটিয়াবুরুজ, গার্ডেনরিচ অঞ্চলে সবসময়ই সাম্প্রদায়িক বিভেদের একটা চোরা স্রোত বয়ে যায়। এই উত্তেজনাটা ইচ্ছাকৃতভাবে কিছু মৌলবাদী মানুষ বাঁচিয়ে রেখে নিজের মুনাফা লোটে। এই মৌলবাদী নেতারা অলক্ষ্যে থাকে, তাদের হয়ে এই কাজটা করে যায় ওই অঞ্চলের দুষ্কৃতীরা। এর সঙ্গে আবার জড়িত আছে বন্দরের চোরাচালান ও তার ব্যবসা। কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের মধ্যে ওই এলাকাই সবচেয়ে অপরাধপ্রবণ। এবং তার কারণই হলো বন্দরের অন্ধকার ব্যবসা ও সাম্প্রদায়িক

বিভেদ। এই দুই ভিতের ওপর দাঁড়িয়েই ওই অঞ্চলের তাবড় তাবড় দুষ্কৃতীরা দুষ্কর্ম চালিয়ে যায়। আর তাদের দুষ্কর্মে হস্তক্ষেপ করলেই তারা পুলিশের ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে।

ওই অঞ্চলের রাজনীতিও দাঁড়িয়ে আছে মৌলবাদ ও চোরাচালানের ওপর। ধনী গরীবের বিভেদও ওই অঞ্চলে সবচেয়ে বেশি। সুতরাং দুষ্কৃতীরা তো সক্রিয় থাকবেই। তাদের কাছে এটা একটা স্বর্গরাজ্য। বোমার পাহাড় তাই সবসময়ই মজুত। সেই বোমাই নিরবিচ্ছিন্ন হয়ে এক নাগাড়ে ঝরছে।

মেহেতা সাহেব, শর্মা সাহেব, সাব-ইন্সপেক্টর আশিস গোপ, সাগর গুপ্ত, সার্জেন্ট এস বন্দ্যোপাধ্যায় ফোর্স নিয়ে দাঙ্গাকারী এক বিশাল জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে ফতেপুর ভিলেজ রোডের একটা গলিতে ঢুকে মেথরপাড়ার দিকে চলতে শুরু করল। ইঁট ও বোমাপাত তো হচ্ছেই। গলির ভেতর জনতাকে ভয় দেখাতে সাব-ইন্সপেক্টর আশিস গোপ তার রিভলবার থেকে তিন রাউন্ড গুলি ছুঁড়ল। প্রথম ব্যাটেলিয়নের এক কোম্পানির কনস্টেবল রতন তফাদারও তার রাইফেল থেকে এক রাউন্ড গুলি চালাল।

মেহেতা সাহেব তার দলকে নিয়ে মেথরপাড়ার দিকে একটু একটু করে এগিয়ে যেতে লাগল।

আগুন নেভাবার জন্য দমকল বাহিনীর তিনটে গাড়ি এসে গেছে। কিন্তু ওই জনতার একাংশ কিছুতেই তাদের এগিয়ে আসতে দিচ্ছে না। এদিকে আগুনের শিখা তার ধর্ম অনুযায়ী কাজ করে যাচ্ছে। থাবা বাড়িয়ে একের পর এক বাড়িকে নিজের গ্রাসে আনছে।

গার্ডেনরিচ থানার অফিসার-ইন-চার্জ শিউনাথ সিং তার বাহিনী নিয়ে দমকল বাহিনীকে সাহায্য করতে এগিয়ে গেল। তাদের সহযোগিতায় দমকল বাহিনী আগুনের কাছাকাছি আসতে পারল।

অন্যদিকে মেহেতা সাহেবরা লাঠিচার্জ করতে করতে মেথরপাড়ার ভেতরের দিকে এগিয়ে চলল। কিছুদূর যাওয়ার পর মেথরপাড়ার জে বিরানব্বই নম্বর ইদ্রিসের দোতলা বাড়ির সামনে রাস্তায় একটা মুসলমান লোকের মৃতদেহ তারা দেখতে পেল। মৃতদেহটা সাদা কাপড়ে ঢাকা। গলা অর্ধেক কাটা। রক্ত ছড়িয়ে আছে। কিন্তু আশেপাশে কেউ নেই।

মেহেতা সাহেব সাব-ইন্সপেক্টর আশিষ গোপ, সাগর গুপ্ত ও সার্জেন্ট শিবানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়কে নির্দেশ দিল মৃতদেহটা ওখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে। ওরা নির্দেশ শুনে ফিরে আসতে লাগল। মেহেতা সাহেব দু'জন কনস্টেবলকে ওই মৃতদেহ পাহারা দেওয়ার জন্য রেখে গলির আরও ভেতরে ঢুকতে লাগল। তিনি নিজে সামনে এগিয়ে যেতে লাগলেন,

তার বাঁ হাতে ইঁট থেকে বাঁচার জন্য একটা লোহার জালের ঢাল, ডান হাতে লাঠি।

তিনি নিজে একজন কনস্টেবলের হাত থেকে কাঁদানে গ্যাসের বন্দুক নিয়ে গ্যাস ছুঁড়লেন। গ্যাস আরও ছোঁড়া হলো।

ওখানে একটা হলুদ রঙের দোতলা বাড়ির ছাদ থেকে ক্রমাগত ভাবে পুলিশদলকে লক্ষ্য করে ইঁট, টালির টুকরো, বোমা ছুটে আসতে লাগল। ওদের লক্ষ্য করেও গ্যাস ছুঁড়তে হলো।

ঘিঞ্জি অঞ্চল, কাঁচা নর্দমা, সরু গলির আনাচে কানাচে থেকে দুষ্কৃতীদের আক্রমণ উড়ে উড়ে আসতে লাগল।

তবু মেহেতা সাহেবের নেতৃত্বে পুলিশের দল এগিয়ে যেতে লাগল। এইসব পরিস্থিতি সামলানো ভীষণ কঠিন। এর জন্য ফোর্সের সংখ্যা যত থাকা উচিত তার চেয়ে দলটা অনেক ছোট ছিল। তাও তারা আরও বেশি কার্যকরী হতে পারত যদি ওই ঘিঞ্জি অঞ্চলের আনাচে কানাচে সরু সরু গলি গুলির সঙ্গে তাদের পরিচিত থাকত। কিন্তু ওই দলের মধ্যে এমন কেউ ছিল না যে ওদের পথপ্রদর্শকের কাজ করবে। মেহেতা সাহেবরা উন্মত্ত জনতার পেছনে পেছনে স্রোতের টানে টানে চলতে লাগল। পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণ কিন্তু এলাকার দুষ্কৃতীদের হাতে। সেটা মেহেতা সাহেব করায়ত্ত করতে পারছিলেন না। তারা উচ্ছৃঙ্খল দাঙ্গাবাজ জনতাকে তাড়া করছেন, না, দাঙ্গাবাজেরাই তাদের তাড়া করে গলি থেকে গলিতে ছুটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তা বোঝা যাচ্ছে না।

মেহেতা সাহেব তার পুরো দল নিয়ে ছুটতে ছুটতে পৌঁছে গেল রামনগর লেনে।

এখানে পুরো পুলিশের দল কয়েকশ' মুসলিম দাঙ্গাবাজের ঘেরাওয়ের মধ্যে পড়ে গেল।

ওই রাস্তার ওপরে এসে মেহেতা সাহেবরা দেখলেন, ওখানেও একটা বাড়ি দাউ দাউ করে জ্বলছে। কিন্তু তা নিয়ন্ত্রণে আনার কোনও প্রচেষ্টাই কারও নেই। যেন এ বাড়িটা তৈরি হয়েছিল একদিন নির্লিপ্তভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়ার জন্য।

এগিয়ে যেতে যেতে দায়িত্ব ভাগ করতে করতে ক্রমান্বয়ে মেহেতা সাহেবের হাতে সঙ্গী কমে যাচ্ছে, তবু তিনি কনস্টেবল আমিরুল ইসলাম ও ভোলানাথ মণ্ডলকে ওখানে দাঁড় করিয়ে দিয়ে এগিয়ে চললেন।

সামনেই ধানক্ষেতি মসজিদ। মেহেতা সাহেব উপায়ান্তর না দেখে খুনী, দাঙ্গাবাজ দুষ্কৃতীদের হাত থেকে বাঁচতে লাল রঙের মসজিদের রাস্তার দিকের

কোলাপসিবল গেটটা খুলে ভেতরে ঢুকে গেলেন। সঙ্গে শর্মাসাহেব ও তাদের বডিগার্ড ও আরও দু'জন কনস্টেবল।

ওই দাঙ্গায় মত্ত জনতা তখন ধানক্ষেতি মসজিদ ঘিরে ধরে চিৎকার দিয়ে গালাগালি দিতে লাগল। গালাগালির বর্ষণ অবশ্য কখনও বন্ধ হয়নি। তার ঢেউ ক্রমশ বাড়তে লাগল।

জনতা মসজিদের ইমাম ফারহাদ জাভেরিকে হুমকি দিয়ে বলতে লাগল, "শালে লোক কো নিকাল দো, জুতা লেকে মসজিদ পর ঘুসা হ্যায়।"

জনতা একযোগে বলতে লাগল, "জুতা পিনকে ঘুসা হ্যায়, মার শালে কো, মার শালে কো। খতম কর শালে লোককো।"

শুধুমাত্র হুমকি দিয়েই ক্ষান্ত হলো না। ধানক্ষেতি মসজিদের পেছনের দিকের কলাপসিবল গেটটা ভেঙ্গে মসজিদের ভেতরে ঢুকতে চাইল। ওইদিকেই ইমামের ঘর।

ওদের প্রত্যেকেরই হাতেই কিছু না কিছু অস্ত্র আছে। কারও কাছে তরোয়াল, কারও হাতে বড় খোলা ছুরি, লোহার রড, চপার। সেই সব অস্ত্রগুলি আকাশের দিকে তুলে মাঝে মাঝে ওদের মর্জিমাফিক স্লোগান দিচ্ছে আর ইমামকে হুমকি দিচ্ছে।

তরোয়ালগুলি কোলাপসিবল গেটের ফাঁক দিয়ে ঢুকিয়ে খোঁচা দেওয়ার জন্য কনস্টেবলদের দেহের দিকে সজোরে এগিয়ে দিচ্ছে।

দু'জন কনস্টেবল তরোয়ালের ডগার খোঁচা খেয়ে চিৎকার করে বলে উঠল, "স্যার মেরে ফেলল!"

ইমাম মেহেতা সাহেব আর শর্মা সাহেবকে অনুরোধ করল, "আপলোক নিকাল যাইয়ে, নেহিতো হামকো এ লোক মার দেগা।"

মসজিদের সামনের গেটের কাছে তখন পরপর দুটো বোমা পড়ল। বোমার আওয়াজ ও প্রায় তিনশ উন্মত্ত মানুষের হুঙ্কার মিলে পরিস্থিতি ক্রমশ ভয়াল আকার ধারণ করেছে।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা তখন পাল্টে গিয়েছে পুলিশের ওপর হামলায়। মেহেতা সাহেব কি করবে ভেবে পাচ্ছে না। মসজিদের আশ্রয় ছেড়ে ওই খুনী দুষ্কৃতীদের মুখোমুখি দাঁড়াবে, না আরও কিছুক্ষণ মসজিদের ভেতর অপেক্ষা করে পরিস্থিতি শান্ত করার চেষ্টা করবে। কিন্তু মসজিদও যে তাদের জন্য নিরাপদ আশ্রয় নয় তাও ততক্ষণে তারা বুঝে গেছে। ধানক্ষেতির দিকের গেট ওরা যখন তখন ভেঙ্গে ফেলবে। আর তখন মসজিদের ভেতর একটা অবধারিত রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হবে, দাঙ্গাবাজদের সঙ্গে পুলিশদলের। সেটা কাম্য নয়।

মেহেতো সাহেব কোনও কিছু বলার আগেই শর্মা সাহেব ও চারজন কনস্টেবল মসজিদের সামনে রামনগর লেনের গেট দিয়ে বেরিয়ে ছুটে একটা পরিত্যক্ত দোকান ঘরে ঢুকে আশ্রয় নিল।

ওদের ওইভাবে মসজিদ থেকে বেরিয়ে যেতে দেখে জীবনের ভয়ে ভীত কনস্টেবল মোহিতমোহন সরকার ও আর একজন কনস্টেবলও বেরিয়ে রাস্তায় চলে এল। মোহিনমোহন রাস্তায় এসেই তার রাইফেল থেকে দু'রাউন্ড গুলি ছুঁড়ল হলুদ রঙের দোতলা বাড়িটার ছাদ লক্ষ্য করে, যেখান থেকে বোমাগুলি ছুটে আসছিল।

আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে নির্দিষ্ট লক্ষ্য ছাড়া মোহিতমোহন গুলি ছুঁড়েই যে পরিত্যক্ত দোকানে শর্মাসাহেবরা আশ্রয় নিয়েছিল তারাও সেখানে গিয়ে গা ঢাকা দিল।

রক্তপিপাসু এক দঙ্গল জনতার হিংস্র চিৎকার, হুমকি, বোমার আক্রমণের সামনে পুরো পুলিশ দলের কে কি করছে কেউ জানে না। মেহেতো সাহেবই ছিল পদাধিকার বলে ওই দলের অধিনায়ক, কিন্তু শর্মা সাহেব ছিল অনেক বেশি অভিজ্ঞ এবং পদাধিকার বলে সহ-অধিনায়ক। কিন্তু দু'জনের মধ্যে সিদ্ধান্তের কোনও লক্ষণই দেখা গেল না। শর্মা সাহেব পালিয়ে আশ্রয় খুঁজছে, সঙ্গে অন্য সশস্ত্র কনস্টেবলরাও। পরিস্থিতি সবটাই ওই দুষ্কৃতীদের নিয়ন্ত্রণে।

যেখানে অভিজ্ঞ অফিসাররা পালানোর চেষ্টা করে সেখানে তার অধীনস্থ সিপাইরা কী করবে? যাদের ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশের দলের ওই স্থানে যাওয়া তারাই ছত্রভঙ্গ হয়ে একে একে বিচ্ছিন্ন হতে লাগল।

ওই পরিত্যক্ত দোকানও নিরাপদ নয়। সেটা শর্মা সাহেব বুঝে গেলেন। কারণ ওদের পলায়নরত হতে দেখে দুষ্কৃতীরা আরও উৎসাহী হয়ে তাদের অস্ত্র নিয়ে উন্মত্ত নাচ নাচতে লাগল।

তাদের হল্লাধ্বনিতে পরিবেশ তখন চরম নারকীয়। মনুষ্যসমাজে বসবাসকারী কোনও অংশ যে এমন পরিবেশ তৈরি করতে পারে তা অধিকাংশ মানুষই বিশ্বাস করতে পারবে না।

মানুষই স্বর্গ তৈরি করতে পারে, সেই মানুষই আবার অবিশ্বাস্য নরক তৈরি করতে পারে। মানুষের স্বর্গ নিয়ে সারা পৃথিবীতে বহু কাব্য রচনা হয়েছে, কিন্তু নরক নিয়ে মানুষ এত নিশ্চুপ কেন? শুধু তা ঘৃণ্য বলে? এই নরক যারা সৃষ্টি করে অবশ্যই তারা ঘৃণ্য। পৃথিবীতে বেঁচে থাকার অনুপযুক্ত। কিন্তু কে তাদের বিদায়ের ঘণ্টা বাজাবে? সব ধর্মই স্বর্গ সৃষ্টি করতে বলে, কিন্তু সেই ধর্মের নামেই যখন কিছু মনুষ্যজাতীয় জীব নরক

সৃষ্টি করে তখন তাকে কী নামে, কী ভাষায় অভিহিত করা যায়? নীচ, অসভ্য, পাশবিক, বর্বর?

না, ভাষার অপ্রতুলতা এখানে সুস্থ লোকেদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। ভাষা সৃষ্টিকারীগণ এই কদর্য, বীভৎস পরিবেশ ও পরিস্থিতির কথা স্বপ্নেও ভাবেননি। তাই বর্বরের নিচে আর কোনও শব্দ অভিধানে যুক্ত করেননি।

এই পরিস্থিতিতে বাহিনীকে সুশৃঙ্খল রাখার জন্য প্রচণ্ড দক্ষতার দরকার। প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত ও নির্দেশ অতি দ্রুত নেওয়ার দরকার। এবং পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের বাইরে যাওয়ার আগেই সিদ্ধান্তগুলি নিতে হয়। কারণ একবার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে আর নিজের সিদ্ধান্ত মতো কাজ হয় না। তখন পরিস্থিতির শিকার হয়ে পরিণতির কথা না ভেবেই ভেসে যেতে হয়।

এখানেও সেটাই ঘটল। রামবাগান লেনে ধানক্ষেতি মসজিদে ঢোকার পর মেহেতা ও শর্মা সাহেবের হাতে আর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের সামান্যতম ক্ষমতাও রইল না। এমন কী তাঁরা তাঁদের অধীনস্থ কনস্টেবলদেরও আর এককাট্টা করে নিজেদের শক্তিকে একত্রিত রাখতে পারলেন না।

একবার যদি বাহিনীর সদস্যদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার হয় তখন বাহিনীকে আর নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় না। তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পিঠ বাঁচাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। যে যেদিকে পারে ছুটে পালাতে থাকে।

শর্মা সাহেব ও তাঁর সঙ্গী ছ'জন কনস্টেবল ওই পরিত্যক্ত দোকান থেকে যখন আরও নিরাপদ আশ্রয় খোঁজার আশায় বেরিয়ে এলেন তখন ঘড়িতে কাঁটায় কাঁটায় বারোটা।

ঝকমকে আকাশের মাথায় সূর্য। সেই সূর্যের কিরণে দাঙ্গাবাজদের খোলা তরোয়াল রক্ত খাওয়ার জন্য চিকচিক করছে। কোন ঈশ্বরকে রক্ত উৎসর্গ করার জন্য তারা এত উল্লসিত? কাদের রক্তে স্নান করার জন্য তারা এত উৎসাহিত?

ভয়ার্ত শর্মা সাহেব আশ্রয়ের জন্য এবার অন্য একটা বাড়িতে ঢুকে গেলেন। সঙ্গী কনস্টেবলেরাও। তাঁরা দিশাহারা।

ওই বাড়িতে আশ্রয় নেওয়ার পরই তাঁদের অভ্যর্থনা জানানোর জন্য পরপর দুটো বোমা ওই বাড়ির সদর দরজার সামনে আছড়ে পড়ল।

ওই বাড়ির সদস্যরাও বোমার আক্রমণে স্বাভাবিকভাবে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ল। তারা ঘর থেকে ঘরে ছোটাছুটি শুরু করল। গৃহকর্তা শর্মা সাহেবকে অনুরোধ করলেন, তাদের বাড়ি থেকে চলে যাওয়ার জন্য।

শর্মা সাহেব কি করবেন? তিনি বুঝলেন, এখানে কোনও বাড়িতেই এই অবস্থায় তাঁরা আশ্রয় পাবে না। নিজের বাঁচার উপায় নিজেকেই খুঁজে বার করতে হবে।

তাঁরা ওই বাড়ি থেকেও বেরিয়ে এলেন রামবাগান লেনে। শর্মা সাহেব ঠিক করে নিলেন, পালাতে হবে। তিনি একবার তাঁর সঙ্গী কনস্টেবলদের জিজ্ঞাসা করলেন, তাঁর বডিগার্ড কনস্টেবল রামশংকর সিং কোথায়। তারা জানাল, জানে না। শর্মা সাহেব আর প্রশ্ন না করে পাহাড়পুর রোডের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করলেন।

তিনি মসজিদকে পেছনে ফেলে পাহাড়পুর যাওয়ার গলি ধরলেন। মসজিদের দিকে কি হচ্ছে, মেহেতা সাহেব কোথায়, তার খোঁজই নিলেন না। গলিতে চলতে চলতেই কনস্টেবলদের হুকুম দিলেন, আকাশের দিকে লক্ষ্য করে রাইফেল থেকে গুলি ছুঁড়তে। মোহিতমোহনরা তিন রাউন্ড গুলি ছুঁড়ল। আশেপাশের আক্রমণকারীরা রাইফেলের গুলির আওয়াজে ভয়ে একটু পিছিয়ে গিয়ে ইঁট ছুঁড়তে লাগল। একটা ইঁটের টুকরো শর্মা সাহেবের মাথার পেছন দিকে লাগল।

আঘাত গুরুতর নয়। অল্প অল্প রক্ত ঝরতে লাগল। ইঁটের আঘাত খেয়ে তিনি আরও দিশাহারা হয়ে গেলেন। ছুটতে লাগলেন। বাধ্য হয়ে কনস্টেবলরা তাঁকে পাহারা দিতে দিতে ছুটতে লাগল।

তাঁরা মেথরপাড়ার যেখানে এক মুসলিম মৃতদেহ পড়েছিল সেখানে এসে পৌঁছালেন। সেখানে দু'জন স্থানীয় গার্ডেনরিচ থানার সিপাই ওই মৃতদেহটা পাহারা দিচ্ছিল। সাগর গুপ্ত, আশিস গোপ, সার্জেন্ট শিবানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোনও খবর নেই। তারা নাকি তিন অফিসার মিলে এতক্ষণ ধরে একটা মৃতদেহ সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার বন্দোবস্ত করতে পারেনি। তারা ভাল ভাবেই জানে মেথরপাড়ার যে গলিতে মৃতদেহটা পড়ে আছে সেই গলিতে কোনও ছোট গাড়িও ঢুকবে না। তবে কোন গাড়ির জন্য তারা তিনজন বেপাত্তা হয়ে গেল?

শর্মা সাহেব ওই স্থানীয় সিপাই দু'জনকে জিজ্ঞাসা করলেন, "পাহাড়পুর রোড কোন দিকে?"

সিপাই দু'জন বলল, "চলুন, আমরা নিয়ে যাচ্ছি।" ওরা মৃতদেহের পাহারা ছেড়ে ওদের পথপ্রদর্শক হয়ে শর্মা সাহেবের সঙ্গে চলল। তিন চার মিনিটের মধ্যে তারা পাহাড়পুর রোডে এসে পৌঁছে গেল।

সেখানে তখন বেশ বড় ফোর্স নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন ডিসি (সদর)

সুবিমল দাশগুপ্ত, এস বি ডিসি (প্রথম) দীনেশ বাজপায়ী, এস বি ডিসি (দ্বিতীয়) পার্থ ভট্টাচার্য।

শর্মা সাহেব সোজা ডি সি (সদর) সুবিমল দাশগুপ্তের কাছে গেলেন, বললেন, "স্যার, আমার মাথা ফেটে গেছেন, আমি হাসপাতালে চললাম।" দাশগুপ্ত সাহেব বললেন, "ঠিক আছে।"

শর্মা সাহেব ওখান থেকে একটা গাড়ি নিয়ে সোজা চলে গেলেন কলকাতা মেডিকেল এণ্ড রিসার্চ সেন্টার হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে।

শর্মা সাহেব কিন্তু ডি সি (সদর) বা অন্য কাউকে বলে গেলেন না, মেহতা সাহেব ও তাঁর বডিগার্ড রামনগর লেনে আটকে পড়ে গেছে। মেহতা সাহেবের কোনও উল্লেখই করলেন না। নিজে পালালেন।

বাকি অন্য কনস্টেবলরা তাদের জন্য অপেক্ষমান লরিতে গিয়ে উঠল। ডিসি (সদর) দাশগুপ্ত সাহেব ও অন্য ডিসিরা দাঁড়িয়ে রইলেন। এস বি ডিসি, (দ্বিতীয়) পার্থ ভট্টাচার্য পরিস্থিতি অনুকূল নয় বুঝে, "এখানে টেলিফোন কোথায়, একটা টেলিফোন করা জরুরি, টেলিফোন কোথায়?" বলতে বলতে পাহাড়পুর রোড ধরে সোজা চলে গেলেন গার্ডেনরিচ থানার নিরাপদ আশ্রয়ে।

তখন ঘড়িতে দুপুর বারোটা পনেরো মিনিট। ফতেপুর ভিলেজ রোডের জ্বলন্ত বাড়িগুলো দমকলের কর্মীরা নিভিয়ে দিয়েছে। পোড়া, আধপোড়া জিনিসপত্র থেকে অল্প অল্প ধোঁয়া বার হচ্ছে। সেই ধোঁয়া বসন্তের বাতাসে মিশে উড়ে প্রশ্বাসে প্রশ্বাসে মানুষের মস্তিষ্কে মস্তিষ্কে ঢুকে কী বলছে? পোড়া গন্ধ জানান দিচ্ছে ধ্বংসের খবর।

রামনগর লেনের যে বাড়িতে আগুন লেগেছিল তার অবস্থা কী হলো কেউ জানে না। ওখানে দমকলের গাড়ি যেতে পারবে না। খবরও কেউ জানে না। ছাই ছাড়া অবশিষ্ট কিছু থাকবে না তা নিশ্চিত। ফতেপুর ভিলেজ রোডের জ্বলন্ত বাড়িগুলো থেকেই বা অবশিষ্ট কী পাওয়া যাবে? কিছুই না। ছাই, ভাঙ্গা টালি, পোড়া ইঁট, আধপোড়া দরমার ভেতর থেকে কিছু কিছু জিনিস উঁকি দিচ্ছে। সবই কালো, পোড়া।

কালো কালো অ্যালুমিনিয়ম ও স্টিলের থালা, বাটি, ঘটির সংসার জানান দিচ্ছে মানুষের নিত্যদিনের জীবনের শ্বাসপ্রশ্বাস, প্রেম, প্রীতি, দুঃখ, আশা ভরসার ইতিবৃত্ত। আর সেই ইতিবৃত্ত ধ্বংসের পোড়া ছাইয়ের কাছে আত্মসমর্পণ। বাঁচার উল্লাসে মানুষ বাঁচে। আবার সেই মানুষই ধ্বংসের উল্লাসে বাঁচার রসদ পায়!

এই বৈপরীত্য একমাত্র মানুষের সমাজেই আছে। যারা ওখানে আগুন

ধরিয়েছিল তারা নিশ্চয়ই তাদের কীর্তি দেখে উল্লসিত! নিশ্চয়ই তারা নিজেদের কৃতিত্বের কথা সবিস্তারে নিজ সভায় জাহির করছে। ওই পোড়া ধ্বংসের স্তূপ থেকে যে আধপোড়া পুতুলটা উঁকি দিচ্ছে সেটা দেখে নিশ্চয়ই তার হত্যাকারীরা আনন্দিত। কারণ ওটা বিজাতীয় বাচ্চার পুতুল। অদ্ভুত চরিত্র, যে মানুষ রাস্তায় বিড়াল কুকুরকে ঘরে ডেকে আদর করে, সেই ব্যক্তিই আবার অন্য ধর্মের শিশুকে "দূর দূর" করে তাড়িয়ে দেয়, কারণ তাদের একমাত্র অপরাধ তাদের জন্ম সেই ব্যক্তির পছন্দের ধর্মের ঘরে জন্ম নেয়নি। তাই সে রাস্তার কুকুরের চেয়েও ঘৃণ্য। তাই সে বিন্দুমাত্র দয়া ও ভালবাসা পাওয়ার অযোগ্য।

শর্মা সাহেবের বডিগার্ড ধানক্ষেতি মসজিদ থেকে বেরিয়ে আসার সময় বোমার আঘাতে সামান্য আহত হয়েছিল। শর্মা ও ছ'জন কনস্টেবল আগেই পালিয়েছিল। শর্মা সাহেব যখন পালিয়েছেন, বডিগার্ড রামশংকর সিং দেখেনি। সে বেরিয়ে রামনগর লেনেই শাট্টাওয়ালা শাহজাদার বাড়িতে লুকিয়ে আশ্রয় নিল।

রামনগর লেনের মসজিদের ভেতর আশ্রয় নেওয়া ও তার থেকে বেরিয়ে অন্য দিকে যাওয়া, সমস্ত ঘটনা মিনিট দশেকের মধ্যে হয়ে গেল। এত হল্লা ও বোমার আক্রমণ, কনস্টেবলদের শূন্যে কয়েক রাউন্ড গুলি ছোঁড়ার আওয়াজের মাঝে সময়ের খবর কে রাখে? এই সময় ঘড়ি সবচেয়ে অপাংক্তেয় বস্তু, জীবন মরণের টানাপোড়েন, তার মাঝে পৃথিবী কখন সময় দেখেছিল? পৃথিবী তখন সচল না অচল তাও দেখার সময় হয় না। পৃথিবী ওই স্থানে বোবা, অন্ধ, স্তব্ধ হয়ে যায়। এক ভয়াল ঘূর্ণিপাকে ঘুরতে থাকে, যতক্ষণ না একপক্ষ অন্যপক্ষের রক্ত পান করে তৃপ্ত হয়।

মেহেতা সাহেব ও তাঁর বডিগার্ড মোকতার আলি ধানক্ষেতি মসজিদ থেকে সবচেয়ে পড়ে বার হলেন। ওঁরাও মসজিদের সামনের গেট দিয়ে বার হয়ে রামনগর লেনে আবার দাঁড়ালেন।

দূর থেকে মসজিদটা দেখলে মনে হবে, ওইখানে এসে রাস্তা শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু তা নয়। মসজিদের বাঁ দিক দিয়ে গেলে ধানক্ষেতি যাওয়া যায়। অন্য দিকে একটা গলি চলে গেছে বাতিকলের দিকে। আর আছে ফতেপুর ভিলেজ রোড থেকে মেথরপাড়া হয়ে যেমন মেহেতা সাহেবরা এসেছিলেন, সেই রাস্তা।

মেহেতা সাহেব ও মোকতার আলি কারও ওই অঞ্চলের রাস্তাঘাট সম্পর্কে বিন্দুমাত্র জ্ঞান নেই। কোন দিকে যাবেন? কে তাদের পথ চিনিয়ে পাহাড়পুরের দিকে নিয়ে যাবে?

ওই অঞ্চলে সাধারণভাবে পুলিশকে যারা সাহায্য করে তারাও এই পরিস্থিতিতে পথ দেখানোর সাহস দেখিয়ে নিজেদের বিপদ ডেকে আনবে না। ওখানকার পুলিশের সাহায্যকারী কাউকে মেহেতা সাহেব বা মোকতার চেনেন না। একমাত্র স্থানীয় থানার কর্মীরাই ওঁদের চেনে।

সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, তিনি একটা অপরিচিত অন্ধ সরু গলিতে যখন ঢুকেছিলেন তখন মেথরপাড়ায় মৃতদেহকে পাহারা দেওয়ার জন্য বহাল করলেন স্থানীয় দু'জন কনস্টেবলকে, যারা তাঁর সঙ্গী হলে ওই স্থানের গলিগুলোর হদিস দিয়ে পথপ্রদর্শকের কাজ করতে পারত। অন্যদিকে স্থানীয় থানার অফিসার আশিস গোপ, সাগর গুপ্তও ওই মৃতদেহটা সরানোর দায়িত্ব নিয়ে মেথরপাড়া থেকে বেরিয়ে এল। এক অনির্দিষ্ট অভিযানে অন্ধ গলির ভেতর অনিশ্চিত যাত্রায় একসঙ্গে তিনি কি করে স্থানীয় থানার কনস্টেবল ও অফিসারদের প্রথমেই ছেড়ে দিলেন তা একটা অবাক কাণ্ড। এর সঠিক এবং সত্য উত্তর কেউ দিতে পারবে না। ঘটনার সময় উপস্থিত কেউ জানলেও তা অন্য কাউকে বলবে না। এমন অভাবনীয় ঘটনা কলকাতা পুলিশে কেন কোনও পুলিশ বাহিনীতেই নেই।

মেহেতা সাহেব তাঁর বডিগার্ডকে সঙ্গে নিয়ে যখন ধানক্ষেতি মসজিদ থেকে বার হলেন তখন দেখলেন তাঁরা দু'জন ছাড়া তাঁর আর অন্য সঙ্গী নেই।

শর্মা সাহেব ও অন্য কনস্টেবলরা চলে গেছেন। তাঁদের শক্তি বলতে তাঁরা দু'জনে। কোনদিকে যাবেন। তাঁরা ঘেরাওয়ের মধ্যে পড়ে গেছেন। বডিগার্ড মোকতার আলির কাছে একটা পয়েন্ট থ্রি এইট বোরের রিভলবার ও মোট বারো রাউন্ড গুলি ছাড়া আর কোনও অস্ত্র নেই। মেহেতা সাহেবের হাতে একটা পুলিশের বেতের রুল আর উড়ন্ত ইট বাঁচানোর জন্য একটা লোহার তারের ঢাল।

কিন্তু কোন দিকে যাবে ওরা? কোন রাস্তায় গেলে পরিত্রাণ? বিরাট এক সাম্প্রদায়িক দুষ্কৃতীর দল তাঁদের তাড়া করছে। যেন ওরাই দুষ্কৃতী, ওদের ধরার জন্য সমাজের রক্ষকরা তাড়া করে ফিরছে।

আফ্রিকার জঙ্গলে জঙ্গলে যেমন পশুশিকারীর দল কোনও বন্যপশুকে ধরার জন্য চারদিক থেকে জাল পেতে আস্তে আস্তে গুটিয়ে এনে তাদের ফাঁদে ফেলে, ঠিক তেমনি মেহেতা সাহেব ও মোকতার আলিকে ওই দুষ্কৃতীরা সেইভাবে ফাঁদে ফেলে কোনও গহ্বরের দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। কি তাদের অভিলাষ? কি কারণে তারা দুই পুলিশকর্মীকে ফাঁদে ফেলে ছুটিয়ে বেড়াচ্ছে। তাঁরা যে পুলিশ তা তো তারা চোখের সামনেই ঘণ্টা

দেড়েক ধরে দেখে যাচ্ছে। মেহেতা সাহেবের পরনে খাকী পুলিশের উর্দি, বডিগার্ড কনস্টেবল মোকতার আলিও কলকাতা পুলিশের সাদা ইউনিফর্‌ম পরিহিত।

শর্মা সাহেবরা রামনগর লেনের মসজিদ অঞ্চল থেকে বেরিয়ে আসার পর দুষ্কৃতীরা বোমা মারা বন্ধ করে দিয়ে মেহেতা সাহেব ও মোকতার আলির দিকে ক্রমাগত ইট ছুঁড়ে আক্রমণ করে যাচ্ছে। মেহেতা সাহেব মাঝে মধ্যে ঢাল দিয়ে সেই ইট আটকে শরীর বাঁচানোর চেষ্টা করছেন।

মেহেতা সাহেব ও মোকতার আলি ছুটছে। ছুটতে ছুটতে ওঁরা বাতিকলের দিকে চলে এসেছেন। দুষ্কৃতীরা 'মার শালে লোককো, মার শালে লোককো' বলে চিৎকার করতে করতে ওদের পেছন পেছন ছুটছে। দুষ্কৃতীদের খোলা তরোয়াল, ছুরি, চপার, লোহার রড যে কোনও সময়ে মেহতা সাহেবদের শরীরের ওপর আঘাত হানতে পারে। দূরত্ব বেশি নয়।

পাহাড়পুর রোডে ডি সি (সদর) সুবিমল দাশগুপ্ত, ডি সি এস বি দীনেশ বাজপায়ী ও অন্যান্য অফিসার বিরাট পুলিশ বাহিনী নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁরা জানতেও পারছেন না মেহেতা সাহেবরা কি পরিস্থিতির মুখোমুখি। এমন কী তাঁরা একবার চেষ্টাও করছেন না কোথায় আছেন মেহতা সাহেব সেই খবর জানার। শুধু তাই নয়, শর্মা সাহেবকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়ার সময়ও তাঁরা কেউ প্রশ্নও করে জানতে চাইলেন না, 'কোথায় মেহেতা সাহেব?'

এমন নির্লিপ্ততার কোনও কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। কী কারণে যে ওঁরা প্রায় দর্শকের ভূমিকায় দাঁড়িয়ে আছেন তাও অজানা। যে রামনগর লেনে মেহেতা সাহেব জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে ঢুকেছিলেন সেখানে ফোর্স নিয়ে ঢুকে তারা মেহতা সাহেবকে সাহায্যের জন্যও এগিয়ে যাচ্ছেন না। অথচ তাঁরা জানেন যে বাহিনী নিয়ে মেহেতা সাহেব রামনগর লেনে ঢুকেছিলেন, সেই বাহিনীর প্রায় সব সদস্যই বেরিয়ে এসেছে। শুধু মেহেতা সাহেব ও তাঁর বডিগার্ড মোকতার আলি ছাড়া।

শর্মা সাহেব চলে যাওয়ার বেশ খানিকক্ষণ পর একবার দাশগুপ্ত সাহেব তবু ওখানে উপস্থিত অফিসারদের উদ্দেশে প্রশ্ন ছুঁড়ে জানতে চেয়েছেন, "মেহেতাকে সাহায্য করতে যাব না কি?"

দাশগুপ্ত সাহেব প্রশ্ন করার সঙ্গে সঙ্গে সেটা লুফে নিয়ে দক্ষিণ পোর্ট থানার তখনকার অফিসার-ইন-চার্জ ফণী দে ও একবালপুর থানার অফিসার-ইন-চার্জ অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায় প্রায় সমস্বরে বলে উঠল, "তার দরকার হবে

না, সাহেব পাঞ্জাবীর সন্তান, একাই দশ পনেরো জনের মহড়া নিতে পারে। দেখবেন ক'টা ক্রিমিনালকে মেরে ঠিক বেরিয়ে আসবে।"

ওদের প্রত্যয় দেখে দুই ডি সি সাহেব চুপ করে গেলেন। জানতেও চাইলেন না, মেহেতা সাহেবের কাছে কি আগ্নেয়াস্ত্র আছে? সঙ্গে কোনও পথ-জানা লোক আছে কিনা?

ওই অঞ্চলের অলিগলি না জানা লোকের যে, যে কোনও মুহূর্তে সাংঘাতিক বিপদ হতে পারে তা ওখানে উপস্থিত প্রায় সব অফিসারদেরই জানা।

ফণী দে ও অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্ভট যুক্তি মেনে নিয়ে চুপ করে থাকা কোনও বুদ্ধিমান লোকের কাছে আশা করা যায় না। ওখানে উপস্থিত অফিসাররা কি কারণে ওদের অবাস্তব যুক্তি মেনে নিলেন তাঁরাই জানেন। তাঁরা কি জানেন না! এক উচ্ছৃঙ্খল দাঙ্গাবাজ জনতার কাছে পৃথিবীর সবচেয়ে বলশালী ব্যক্তিও খড়কুটোর মতো মুহূর্তে উড়ে যেতে পারে। তার ওপর নিরস্ত্র মেহেতা সাহেব সশস্ত্র দুষ্কৃতীদের সঙ্গে কতক্ষণ পাল্লা দিয়ে লড়াই করতে পারবে? যদি জানতই, তবে কোন যুক্তিতে মেহেতা সাহেব পঞ্জাব প্রদেশের সন্তান বলে তারা সবাই দিব্যি নির্বিঘ্নে, নিশ্চিন্তে পাহাড়পুর রোডে অপেক্ষা করতে লাগল। কী কারণ ছিল এত ফোর্স নিয়ে ওখানে আসার? সে কি শুধু মাত্র শক্তি প্রদর্শনীর জন্য? না কি প্রয়োজনে তা ব্যবহার করার জন্য?

ফণী দে ও অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায় বন্দর এলাকার মেহেতা সাহেবের অধীন থানার অফিসার-ইন-চার্জ ছিল। তারা শুধু এখানেই এমন উদ্ভট যুক্তি দেখিয়ে অন্যান্য অফিসারদের উদ্যোগে ক্ষান্ত করল না। তারা মেহেতা সাহেবকেও প্রায়ই এই একই কথা বলত, "আপানাকে স্যার কে কি করবে, আপনি একাই দশ-পনেরো জনের মহড়া নিতে পারবেন।"

কেন এই কথাটা তারা মেহতা সাহেবকে বলত তা বুঝতে কারও অসুবিধা হওয়ার কারণ নয়। চাটুকারিতার একটা সীমা থাকা দরকার। সীমা ছাড়ালেই বিপদের সম্ভাবনা।

ওদের দু'জনের অযৌক্তিক উৎসাহেই হোক, কিংবা নিজের ওপর অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসেই হোক মেহেতা সাহেব প্রায়ই নিজের শারীরিক ক্ষমতা দেখাতেন। যেমন একবার রাত দেড়টা নাগাদ একাই জিপ চালিয়ে মাঝেরহাটে খালি হাতে ক্রিমিনাল ধরতে চলে গিয়েছিলেন। কেন গিয়েছিলেন, না, রাতে কোয়ার্টারে বিছানায় শুয়ে শুনতে পেয়েছিলেন ওই অঞ্চল থেকে আসা

চার-পাঁচটা বোমা ফাটার আওয়াজ। ব্যস, তিনি বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লেন, গেঞ্জি গায়ে জিপ ছুটিয়ে দিলেন। উদ্দেশ্য বোমাবাজদের গ্রেফতার করা।

এভাবে কী বোমাবাজদের গ্রেফতার করা সম্ভব? ওরা নিশ্চয়ই কেউ বাচ্চা দুধের শিশু নয় যে, মেহেতা সাহেবের জন্য অপেক্ষা করবে, তিনি জিপ নিয়ে আসবেন, তারপর বিনা বাক্যব্যয়ে সুরসুর করে তাঁর জিপে উঠে বসে সোজা কোনও থানার লকআপে চলে যাবে।

মাঝেরহাট ব্রিজ ও তার আশেপাশে দুষ্কৃতীদের ঘাঁটি আছে। বিশেষ করে উত্তর পশ্চিম কোণে। ওখানে ওয়াগন ব্রেকাররা ছাড়াও পোর্ট অঞ্চলের চোর, ছিনতাইবাজ, ছোটখাট ডাকাত, হাইওয়ে পরিবহনের সঙ্গে যুক্ত দুষ্কৃতীদের বেশ বড় আড্ডার স্থান। পুরনো মাঝেরহাট ব্রিজের নিচে ও উত্তর পশ্চিম দিকে ক'টি কারখানা, বড় বড় সংগঠিত লরি বাসের গ্যারেজ ছাড়া কোনও লোকালয় নেই। এর পাশেই একটা ছোটখাট জঙ্গল। জঙ্গলের সংলগ্ন খাল। খালের পাশে মালবাহী ট্রেন লাইন। সামান্য দূরে শিয়ালদহ বজবজের রেলওয়ে লাইন এবং মাঝেরহাট স্টেশন। সন্ধের পর থেকে অন্ধকারের হাতে ওই অঞ্চল চলে যায়।

এ সবই মেহেতা সাহেবের জানা থাকার কথা। তবু তিনি চলে গেলেন। তাঁর জানা থাকার কথা, ওই অঞ্চলের দুষ্কৃতীরা পেশাদার। তাদের চট করে, অল্প আয়াসে গ্রেফতার করা যায় না। তাছাড়া অত রাতে যারা বোমা ফাটাচ্ছে তার নিশ্চয়ই ধূর্ত, সশস্ত্র দুষ্কৃতী। তাদের গ্রেফতার করতে গেলে নিজেদেরও পাল্টা সশস্ত্র শক্তি নিয়ে গিয়ে তার মোকাবিলা করার দরকার। তবু তিনি চলে গেলেন।

না, কাউকে পেলেন না। পেলে নিশ্চয়ই বিপদ ছিল। কারণ তারা অবশ্যই বোমা ছুঁড়ে তার জিপকে অভ্যর্থনা জানাত।

কোনও পেশাদার অপরাধীই নিজে থেকে গ্রেফতার হতে চায় না। তাহলে কোন সাহসে তিনি রাত দেড়টায় এমন একটা অভিযানে গেলেন? তার জন্য ফণী দে ও অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের চাটুকারিতা কি আংশিকভাবেও দায়ী নয়?

এইরকম অতি দুঃসাহসিক অভিযান তিনি আরও করেছেন। তার কারণও কী তিনি নিজে মনে করতেন সত্যিই একটা সশস্ত্র দশ পনেরোজন দুষ্কৃতীদের মোকাবিলা একাই করতে পারবেন?

পুলিশের পেশায় সাহস থাকাটা অতি জরুরি। ভীতু ব্যক্তির এই পেশা গ্রহণ করাই উচিত নয়। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে তাকে যুক্তিহীনভাবে

অতি দুঃসাহসিক হয়ে উঠতে হবে। পুলিশকে প্রতিপদে বিপদের মোকাবিলা করতে হয়, কিন্তু বিপদ ডেকে আনার মধ্যে কোনও সাহসের পরিচয় নেই।

দুই ডি সি সাহেব যখন সিদ্ধান্তের রক্তাল্পতায় ভুগে নির্বাক হয়ে পাহাড়পুর রোডে ফোর্স নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, বাতিকলের ভেতর তখন মেহেতা সাহেব ও মোকতার আলি জীবন বাঁচানোর জন্য খাঁচাকলে আবদ্ধ হয়ে ঝট্‌পট্‌ করে ঘুরে মরছে।

বাতিকলের গলিতে ঢুকে মেহেতা সাহেব ও বডিগার্ড দুষ্কৃতীদের তাড়ায় পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

মোকতার আলিকে তাড়া করছে দিলওয়ার, নশরু ও তার ভাই কাল্লু, হাসমতের ভাই রহমত, নানকুর ছেলে সাগির, জাহির, লোকমানের ভাই ওসমান ও আরও দশ বারজন ওদের সঙ্গী। ওদের হাতের তরোয়াল, ছুরি, চপার মোকতার আলির রক্তে স্নান করার জন্য উন্মুখ।

মোকতার আলি ওদের হাত থেকে বাঁচার জন্য প্রাণভয়ে ছুটছে। ছুটতে ছুটতে উপায়ান্তর না দেখে বাতিকলে নউমুল্লার বাড়িতে আশ্রয়ের আশায় ঢুকে গেল।

মেহেতা সাহেবও ছুটছেন। কোন দিকে যাবেন ভেবে পাচ্ছেন না। কোথায় গেলে নিরাপদ, জানেন না। কোন ছাদ তাকে আশ্রয় দিয়ে এই রক্তপিপাসু দানবদের হাত থেকে বাঁচাবে, জানেন না। কে তাঁকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে তাও, জানেন না। কেন তিনি এই দুষ্কৃতীদের হঠাৎ শত্রু হয়ে গেলেন তাও, জানেন না। তিনি তো এসেছিলেন অনর্থক সংঘর্ষ থামিয়ে কিছু নিরপরাধ, নিরীহ মানুষকে বাঁচাতে। তিনি তো এসেছিলেন শান্তির দূত হিসাবে। রক্তের স্রোত বন্ধ করতে। অথচ তিনিই কিনা এখন মৃত্যুর মুখোমুখি। দুষ্কৃতীদের চোখ মুখ, খোলা অস্ত্র নিয়ে তাড়া করার মধ্যে মৃত্যু ছাড়া অন্য কোনও ভাষা নেই।

খুন। যে রক্তের বন্যা তিনি থামাতে এসেছিলেন এখন তাঁকেই কী না তাঁর নিজের রক্ত দিয়ে তা পরিশোধ করতে হবে।

নউমুল্লার বাড়িতে তাঁর বডিগার্ড মোকতার আলির আশ্রয় হয়েছে কিনা মেহেতা সাহেব জানেন না। জানার মতো পরিস্থিতিই নয়। এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি কলকাতা পুলিশের ক'জন হয়েছেন তাও তিনি জানেন না। তিনি রাস্তা খুঁজছে বাঁচার। ফণী দে ও অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায়রা কই, যারা তাকে বলেছিল, "আরে, আপনি একাই নিরস্ত্র অবস্থাতেই দশ পনেরোজন সশস্ত্র দুষ্কৃতীর মোকাবিলা করতে পারবেন?" কিন্তু ঠিক ওই রকম পরিস্থিতিতে

বাস্তব তো অন্য কথা বলছে। তিনি তো প্রাণপণে পরিত্রাণের রাস্তা খুঁজছেন। তিনি তো দাঁত বার করা রক্তলোলুপ আক্রমণকারীদের প্রতিরোধ করার সাহসই করছেন না।

অগত্যা পরিত্রাণের রাস্তা খুঁজতে তিনি ঢুকে পড়লেন দু'শ বাইশ নম্বর বাতিকল সেকেন্ড লেনের খোলা সদর দরজা দিয়ে ছুটে ওই বাড়ির খোলা উঠোনে।

ঘটনাচক্রে ওই বাড়িতে থাকে আবদুল লতিফ খান। সে কলকাতা পুলিশের রিজার্ভ ফোর্সের কনস্টেবল। বাড়িতে ছিল না, কর্মস্থলে। বাড়িতে ছিল তার বড় ছেলে হাদিশ খান ও তার কর্মচারী বাইশ তেইশ বছরের তরুণ মুসতাফা। স্ত্রী কাফিয়া বিবি। বাকি সন্তান ও পুত্রবধূ গিয়েছিল হাওড়ার কাজিপাড়ায় পুত্রবধূর পিত্রালয়ে।

উঠোনের এককোণে চারটে গাভী নিয়ে হাদিশ খানের একটা ছোট্ট খাটাল। সেই খাটালেই তার সাহায্যকারী হিসাবে কাজ করে বৌবাজারের মুসতাফা। সকাল থেকেই যে তাদের এলাকায় একটা বেশ বড় ধরনের গণ্ডগোল হচ্ছিল তারা বাড়ি থেকেই শুনতে পাচ্ছিল। না শোনার তো কোনও কারণ নেই, এক উন্মত্ত জনতার কোলাহল, একটানা বোমাবাজি তো আর নিঃশব্দে ঘটে যেতে পারে না। বোমারাও ফাটার পর তাদের ওজন জাহির করে আওয়াজ দিয়েই। আওয়াজেই মালুম হয় প্রত্যেক বোমার ক্ষমতা। সকাল থেকে ফতেপুর ভিলেজ রোড, রামনগর লেন, মুচিপাড়া, পাহাড়পুর রোডের আশেপাশের অন্য এলাকায়, ধানক্ষেতিতে কমপক্ষে একশ বোমা ফেটেছে। সেগুলো জানান দিয়েছে তাদের ইচ্ছা ও ক্ষমতার কথা। সুতরাং হাদিশদের কাছে গণ্ডগোলের কথা অজানা নয়। সেই গণ্ডগোলটা যে অবশেষে তাদের বাড়িতে প্রবেশ করবে তা তারা স্বপ্নেও ভাবেনি।

হাদিশ কলকাতা পুলিশ কনস্টেবলের ছেলে। তার অভিজ্ঞতা আছে কলকাতা পুলিশের ইউনিফরম সম্পর্কে। মেহেতা সাহেব তাদের উঠোনের ভেতর ঢুকতেই সে বুঝে গেল, যিনি তাদের বাড়িতে ঢুকে আশ্রয় খুঁজছেন তিনি কলকাতা পুলিশের কোনও এক উচ্চপদস্থ অফিসার।

মেহেতা সাহেব ওই বাড়িতে ঢুকেই উদ্বিগ্ন ও প্রচণ্ড উত্তেজিতভাবে জায়গা খুঁজছেন। লুকানোর। কোন্ গর্তে গেলে তাড়া করে ফেরা দাঙ্গাবাজরা তাঁকে খুঁজে পাবে না। কোন্ কোল তাঁকে আশ্রয় দিয়ে এ যাত্রায় তাঁর প্রাণ বাঁচাবে? ওই বাড়িতেই যে কলকাতা পুলিশেরই এক কনস্টেবল থাকে তাও তিনি জানেন না। তিনি উঠোনের একপ্রান্তে দুই যুবকের দিকে করুণভাবে

তাকালেন। হাদিশ ও মুসতাফা তাঁর দিকে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। হাদিশ বুঝতে পেরেছে, অসম্ভব বিপদে পড়ে তিনি তাদের বাড়িতে নিরাপত্তা খুঁজতে ঢুকে পড়েছে।

সে এই অবস্থায় কী করবে? চোখের ইশারায় সে মেহেতা সাহেবকে উঠোনের অন্য প্রান্ত দেখিয়ে দিল। সেখানে তাদের গোসলখানা, স্নানাগার। নামেই স্নানাগার। একটা টিউবওয়েল ঘিরে খানিকটা বাঁধানো চত্বর। অর্ধেক ঘেরা। মেহেতা সাহেব বাঁচার তাগিদে ওইখানেই গিয়ে শেষ পর্যন্ত আশ্রয় নিলেন।

ব্যাপারটা অনেকটা খরগোশ যেমন তার আক্রমণকারীর হাত থেকে বাঁচার জন্য তাড়াতাড়ি কোনও ঝোপঝাড়ে মুখটা ঢুকিয়ে দিয়ে ভাবে আক্রমণকারী তাকে দেখতে পাবে না এবং দেখতে না পেয়ে ফিরে যাবে, মেহেতা সাহেবের আড়ালটা অনেকটা তেমনই হলো। আবদুল লতিফ খানের বাড়ির গোসলখানাটা এমন নয় যে, মেহেতা সাহেবকে সামান্যতম নিরাপত্তা দিতে পারে।

আর নিরাপত্তাটাই বা দেবে কী করে? আক্রমণকারীরা তো তার পিঠে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নিতে নিতে ওই বাড়ির উঠোনে ঢুকে মেহেতা সাহেব কোথায় যাচ্ছেন তার দৃশ্যটা সম্পূর্ণ দেখতে পাচ্ছে।

ক্ষুধার্ত বাঘের দল দেখতে পাচ্ছে পলায়নরত খরগোশ কোন্ ঝোপের আড়ালে মুখ লোকাচ্ছে। ওরা দাঁত বার করে হাসছে।

গোসলখানায় ঢুকে মেহেতা সাহেবও বুঝে গেলেন, ওটা ওর নিরাপত্তার উপযুক্ত স্থান নয়। কিন্তু উপায় কী? কোথায় যাবেন। তিনি এবার কার্যত বন্দি হয়ে গেছেন। পালানোর সব রাস্তা বন্ধ।

গোসলখানা ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে, খুনের নেশায় মত্ত নাসো ওরফে নাসিম, নান্নে কসাই, পুটন, সন্ধা আকতার, হোসেন চৌধুরি, মেহফুজ আলম, লোকমান, মুকিম, সামসাদ, আব্বাস সহ প্রায় কুড়িজন দাঙ্গাকারী।

ওদের ঘেরাওতে বন্দি মেহেতা সাহেব আর পথ খুঁজে না পেয়ে দু'হাত জোর করে ওদের দিকে তাকিয়ে হিন্দিতে বললেন, "আমি ডিসি পোর্ট আমাকে তোমরা মেরো না।"

কিন্তু কাদের কাছে আবেদন করছেন? কাদের কাছে জীবন ভিক্ষা করছেন? ওরা কী কেউ মানুষ? ওদের মধ্যে মনুষ্যত্বের তখন কী কিছু অবশিষ্ট আছে?

ওরা মেহেতা সাহেবের আবেদন প্রত্যাখ্যান করে নরঘাতক হায়নার মতো

দাঁত বার করে হল্লা করে উল্লাস প্রকাশ করতে লাগল। তারপর, প্রথমে ওরা মেহেতা সাহেবকে লক্ষ্য করে একের পর এক ঢিল ছুঁড়তে লাগল। মেহেতা সাহেব তাঁর হাতের ঢাল দিয়ে কোনও মতে সেই ঢিল আটকে বাঁচতে লাগলেন। তখনও তিনি বলে চলেছেন, "আমাকে মেরো না, আমি তোমাদের কী করেছি? আমি ডিসি।" কিন্তু ওরা ঢিল ছোঁড়া বন্ধ করছেই না, বরং দ্বিগুণ উৎসাহে ছুঁড়ে যাচ্ছে।

দৃশ্যটা ঠিক যেমন দাসযুগে কোনও অপরাধীকে মাঝখানে রেখে শয়ে শয়ে লোক সেই অপরাধীর মৃত্যু পর্যন্ত পাথর ছুঁড়ে যেত, মেহেতা সাহেবকে ওইভাবেই নাসো, সন্ধা, লোকনাথরা ঢিল ছুঁড়ে যেতে লাগল। ওই দৃশ্যের সঙ্গে এখানে একটাই তফাৎ যে অপরাধীর হাত পা বাঁধা থাকে, এখানে মেহেতা সাহেবের হাতে একটা পুলিশের ঢাল আছে, আর মাথায় হেলমেট। এখানে মেহেতা সাহেব ঢালটা ব্যবহার করে ঢিল কিছুটা প্রতিরোধ করছেন। তাছাড়া সবচেয়ে বড় তফাৎ অপরাধীরা ঢিল ছুঁড়ছে একজন নিরপরাধ উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসারকে লক্ষ্য করে, যিনি তাদেরই প্রাণ বাঁচাতে এসেছিলেন।

আক্রমণকারীদের তা পছন্দ হচ্ছে না, পছন্দ হবে কেন? তারা তো চাইছে, তাদের ছোঁড়া প্রতিটা ইঁট-পাথরের টুকরো অব্যর্থ লক্ষ্যে মেহেতা সাহেবের শরীরের বিভিন্ন অংশে লেগে 'কাজে' আসুক। তিনি ক্ষতবিক্ষত হয়ে যন্ত্রণায় ছটফট করুক।

অনেক সময় চলে গেছে। এবার ওরা ঢিল ছোঁড়ায় ইতি টানতে উৎসাহী হয়ে উঠল। হোসেন চৌধুরি সহসা বলে উঠল, "ডিসি উসি নেহি জানতা, মারো শালে কো।"

ব্যস, হোসেন চৌধুরির হুকুমের সঙ্গে সঙ্গে নাসো, পুটন, সামসাদ, আব্বাস, লোকমান, সন্ধা আকতার, মুকিম ও হোসেন চৌধুরি ঢিল ছোঁড়া বন্ধ করে খোলা ছুরি, তরোয়াল, চপার, লোহার রড নিয়ে মেহেতা সাহেবের দিকে গোসলখানার সামনে ছুটে এগিয়ে গেল। বাচ্চা ছেলেদের মতো ঢিল ছোঁড়া বন্ধ করে এবার সত্যিকারের 'বড়দের' মতো কাজে নেমে গেল।

গোসলখানার কোনও দরজা নেই, ছাদ নেই। সামান্য একটু ঘেরা, মেহেতা সাহেবের মুখোমুখি হতে ওদের সামান্যতম সমস্যাও হলো না।

মেহেতা সাহেব তখনও বলে চলেছেন, "আমাকে মেরো না, আমি ডিসি, পোর্ট। তোমরা আমাকে চিনতে পারছো না?"

এইসব তুচ্ছ কথা বলে কী রক্তলোভী খুনীদের রক্তপান থেকে নিবৃত্ত করা যায়? মেহেতা সাহেবের কথা শুনে ওরা হো হো করে হেসে উঠল। সেই হাসির হুল্লোড়ের ধাক্কায় মেহেতা সাহেবের আকুতি পাগলের প্রলাপ

হিসাবে উড়িয়ে দিল। সকাল থেকে শিকারের আশায় তাড়া করে ফিরেছে কী বন্দি প্রাণীকে শেষ পর্যন্ত বধ না করে ছেড়ে দেওয়ার জন্য? তা কখনও হয়, না আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে হয়েছে? বধ করার জন্যই তো এত পরিশ্রম।

হাসির হুল্লোড় থামিয়ে দ্রুতগতিতে লোকমান শা, মুকিম ও হোসেন চৌধুরি মেহেতা সাহেবকে জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে বলে উঠল, "মারো শালে কো, মারো শালে কো।"

সঙ্গে সঙ্গে নাসিমের হাতের লোহার রড একবার আকাশের দিকে উঠে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে মেহেতা সাহেবের মাথায় নেমে এল। ঝন করে একটা আওয়াজ হলো। মেহেতা সাহেবের মাথায় হেলমেটের ওপর লোহার রডের বাড়িতে ওই ঝন আওয়াজ।

মেহেতা সাহেব টলে গেলেন। তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করছেন লোকমানদের হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে। লোহার রডের বাড়ি ও ধস্তাধস্তিতে মেহেতা সাহেবের মাথা থেকে হেলমেটটা গোসলখানার মেঝেতে ঝনাৎ করে শব্দ করে পড়ে গেল।

নাসিম আর এক মুহূর্তও দেরি করল না। হেলমেটবিহীন মেহেতা সাহেবের খোলা মাথা পেয়ে নাসিম উল্লাসে তার হাতে ধরা লোহার রডটা আবার আকাশের দিকে তুলে মেহেতা সাহেবের খোলা মাথার মাঠে সজোরে নামিয়ে আনল। খটাস করে একটা আওয়াজ। মেহেতা সাহেব চোখে রঙিন তারা দেখতে লাগলেন। মাথা থেকে গরম রক্ত গলগল করে পড়ে তার খাকি ইউনিফরম ভিজিয়ে দিতে লাগল।

মেহেতা সাহেব আর সামলাতে পারলেন না। শরীরের শক্তি নিঃশেষিত। তিনি দেহের ভার ছেড়ে দিতেই লোকমানেরা তাদের হাত আলগা করে দিল। মেহেতা সাহেব ধপাস করে পড়ে গেলেন।

নাসোর আঘাতে মেহেতা সাহেব শুয়ে পড়তে উল্লসিত সামসাদ, আব্বাস, পুটন, সন্ধা আকতার এবার শুরু করল তাদের কাজ। ওদের হাতের খোলা তরোয়াল, চপার, ছুরিগুলো এতক্ষণ যে কাজের জন্য ছটফট করছিল তা এখন 'জায়গা' পেয়ে শুরু করল 'কাজ'।

তরোয়াল, ছুরি, চপারগুলো একটার পর একটা ঢুকতে লাগল মেহেতা সাহেবের পেটে, বুকে, মুখে, গলায়। এক একটা আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে মেহেতা সাহেব চিৎকার করতে লাগলেন।

সেই চিৎকার কী পাহাড়পুর রোডে নিশ্চিন্তে দাঁড়িয়ে থেকে ফণী দে ও অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায়রা শুনতে পেল? বা তাদের নিশ্চিত ঘোষণা শুনে অপেক্ষমান দুই ডিসি সাহেবের কানে পৌঁছাল?

কতবার যে তরোয়াল আর ছুরি মেহেতো সাহেবের পেটে ঢুকল তা সামসাদ, আব্বাস, আকতাররা জানে না।

রক্তে ভাসতে লাগল মেহেতো সাহেবের শরীর। আবদুল লতিফ খানের গোসলখানার বাঁধানো মেঝে ভেসে গেল মেহেতো সাহেবের রক্তে। সেই রক্ত গোসলখানার নর্দমা দিয়ে স্রোত হয়ে বইতে লাগল।

একসময় মেহেতো সাহেবের আর আঘাতের প্রতিক্রিয়া জানানোর ক্ষমতা রইল না। শরীর স্থির হয়ে গেছে।

এতক্ষণ হাদিশ ও তার কর্মচারী মুসতাফা পুরো ঘটনাটাই গোয়ালঘরের সামনে দাঁড়িয়ে দেখছিল। আর পারল না। প্রথমে মুসতাফা ছুটে রাস্তায় চলে এল। হাদিশও বেরিয়ে এল।

রাস্তায় তখন পাহারা দিচ্ছে ঝোনে, মুর্সাদ, মিরাজু, ইউনুস, খুরাম, সরফরাজ ওরফে সানু এবং আরও অন্তত দশ বারোজন দুষ্কৃতী। হাদিশকে দেখতে পেয়েই সরফরাজ ওকে ধমক লাগল, "শালা কিসিকো কুছ্ বোলাতো জানসে মার দেগা।" হাদিশ ভয় পেয়ে ছুটতে লাগল তার কাকা খলিল খানের বাড়ির দিকে।

হাদিশের মা কাফিয়া বিবি ঘরের জানলার ফাঁক দিয়ে মেহেতো সাহেবকে ওইভাবে খুন হতে দেখে, ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে ঘরের মেঝেতেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে রইল।

মুসতাফা ছুটতে ছুটতে চলে গেছে পাহাড়পুর রোডে, বাসে উঠে সে তার বৌবাজারের বাড়িতে চলে যাবে। সে দেখল, সেখানে বহু পুলিশ, কিন্তু কাউকে কিছু বলার মতো অবস্থায় সে নেই। এখন এই অঞ্চল ছেড়ে পালাতে পারলে বাঁচে।

ওরা চলে যেতে এবার নান্নে কসাই, লোকমান, সামসাদ, মেহফুজ আলম, নাসোরা অন্য কাজে লাগল। তারা এবার ডিসি সাহেবের মৃতদেহটা লোপাট করার কাজে নামল। হোসেন চৌধুরির আদেশে প্রথমেই তারা মেহেতো সাহেবের রক্তাক্ত খাকী ইউনিফরম তার দেহ থেকে একে একে খুলতে শুরু করল।

কোমরের বেল্টটা খুলল। তারপর ট্রাউজার, শার্ট, গেঞ্জি, জুতো। শুধু অন্তর্বাসটা দয়া করে মেহেতো সাহেবের মৃতদেহে রেখে দিল। সেগুলো এক জায়গায় জড়ো করে রাখল।

এবার সামসাদ টিউবওয়েলটা টিপে জল তুলতে শুরু করল। সেই জল দিয়ে মেহেতো সাহেবের রক্তে ভেসে যাওয়া গোসলখানার মেঝে ধুয়ে ফেলে খুনের চিহ্ন মুছতে লাগল। তারা এমনভাবে কাজটা ঠাণ্ডা মাথায় নিখুঁতভাবে করতে লাগল যেন কিছুই হয়নি। চোখেমুখে এখন উত্তেজনা অনেকটা কম।

শিকারকে বধ করে ওরা অনেকটা তৃপ্ত। যে রক্তপান করার লোভে ওরা সকাল থেকে ছুটছে, অবশেষে তা পান করা হয়েছে।

সাড়ে বারোটার মধ্যে রক্ত পরিষ্কার করে ফেলল। এবার মেহেতা সাহেবের ইউনিফরম, ঢাল, বেতের রুল, হেলমেট, বেল্ট, আই পি এস ব্যাচ, ইত্যাদি লুকিয়ে ফেলতে পারলেই ওদের বিশ্রাম। তারপর খুব সম্ভবত তারা পিকনিক করবে। এত বড় 'কাজ' তারা সমাধা করে নিশ্চয়ই একটু ফুর্তি করার অধিকার অর্জন করেছে।

হোসেন চৌধুরি মেহেতা সাহেবের রক্তেভেজা ইউনিফরমটা আব্বাসকে তুলে নিতে বলল। আব্বাস ছুটে চলে গেল গোয়ালঘরের দিকে। ওখানে একটা বাঁশের খুটিতে পেরেকের আংটায় ঝুলছিল হাদিশের খাটালের একটা চটের থলি।

থলিতে কাঁচা রক্তে মাখা মেহেতা সাহেবের ট্রাউজার, শার্ট, গেঞ্জি ইত্যাদি দ্রুত ভাঁজ করে ঢুকিয়ে নিল। যেন মুরগি কাটার পর তার দেহের থেকে ছাড়ানো পালকগুলি ডাস্টবিনে ফেলে দেওয়ার জন্য তুলে নিচ্ছে।

থলিটা সাজিয়ে নিয়ে আব্বাস তার হাতে লাগা মেহেতা সাহেবের রক্ত টিউবওয়েলের জলে ধুয়ে হোসেন চৌধুরির পরবর্তী নির্দেশের অপেক্ষায় উঠে দাঁড়াল।

নায়ে তুলে নিল হেলমেট, ঢাল, বেল্ট, রুল।

হোসেন এবার বলল, "ওঠা লে, শালে কো।" সামসাদ, লোকমান, নাসো, সন্ধ্বা আকতার মেহেতা সাহেবের মৃতদেহের হাত পা চারদিক থেকে ধরে চ্যাংদোলা করে তুলে বাতিকলের আবদুল লতিফ খানের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল। ওদের হাতে হাতে তখন ঝুলছে রক্তে ভেজা তরোয়াল, ছুরি, চপার।

শুধু জাঙ্গিয়া পরিহিত মেহেতা সাহেবের মৃতদেহটা ওইভাবে ঝুলিয়ে ওরা বাতিকল সেকেন্ড লেনের সব বাসিন্দাদের চোখের সামনে দিয়ে বীরদর্পে নিয়ে চলেছে। যেন কোনও যুদ্ধজয়ের শেষে জয়ের স্মারক হিসাবে ওই বিধ্বস্ত মৃতদেহটা। বাসিন্দারা কেউ কেউ ওই দৃশ্য চোখের সামনে দেখে সহ্য করল। কেউ সহ্য করতে না পেরে সরে গেল।

ওদের চেলা চামুণ্ডারা চিৎকার করে রাস্তা পরিষ্কার করে হোসেন চৌধুরিকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করল।

বুক ফুলিয়ে হোসেন, মেহফুজ আলম, আব্বাস সামনে এগিয়ে চলেছে

আর তাদের পেছন পেছন 'স্মারক' বহনকারী সামসাদ, লোকমান, নাসো, আকতার। তাদের মুখে ঝুলছে হাসি। তাদের পাহারা দিয়ে চলেছে পটন, ঝোনে, সরফরাজ, ইউনুস, খুরাম, নাহো কসাইরা।

কতদূর হোসেন চৌধুরি ওদের নিয়ে যাবে তা ওরা জানে না। কখন যে পুরো অভিযানের নেতৃত্ব হোসেন আর মেথরপাড়ার ইদ্রিস তুলে নিয়েছে ওরা বোঝেনি।

দাঙ্গার সময় এমনই হয়, হঠাৎ হঠাৎ কেউ না কেউ স্বতঃস্ফূর্তভাবে নেতৃত্বে চলে আসে আর তাদের নেতৃত্বেই পুরো দাঙ্গাবাজের দল দাঙ্গা করে। এদের একটা অদ্ভুত ক্ষমতা থাকে, দাঙ্গার সময় পুরো দলটাকে চিৎকার চেঁচামেচি করে চাঙ্গা রাখতে পারে এবং নিজের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পুরো দলকে পরিচালনা করতে পারে।

হোসেন চৌধুরি ঘুরতে ঘুরতে ওদের নিয়ে এল গঙ্গার কাছাকাছি আটাবাগে। তারপর আটাবাগের একের বাই উনষাট ও দুশো আট নম্বর বাড়ির পেছনে কাঁচা নর্দমায় উপুড় করে মেহেতা সাহেবের মৃতদেহটা ছুঁড়ে ফেলে দিতে বলল।

নর্দমার পাশে সামসাদ, লোকমান, নাসো ও সন্ধা আকতার দেহটা রাখল। নর্দমার ডাসা ডাসা মাছিরা খাবারের গন্ধ পেয়ে ভোঁ ভোঁ করে বাঁশি বাজিয়ে উল্লসিত চিত্তে মেহেতা সাহেবের পেটে, মুখে লাগা রক্তের ওপর এসে বসল।

জাঙ্গিয়া পরা মেহেতা সাহেব নিষ্প্রাণ দেহে আটাবাগের কাঁচা নর্দমার পাশে শুয়ে আছেন তাঁর অন্তিমযাত্রার জন্য।

আকাশের দিকে মুখ। সূর্য ঠিক মাথার উপর থেকে সামান্য পশ্চিমে হেলে গেছে। বসন্তের পরিষ্কার খোলা আকাশ। গতকালই ভারতবাসী সৌভ্রাত্র, সম্প্রীতি, ভালবাসা ও প্রেমের প্রতীক ফাগ উড়িয়ে পরস্পরের শুভ কামনা করে আলিঙ্গন করেছে। রঙে রঙ মিলিয়ে দোলপূর্ণিমার আকাশে উড়িয়েছে। আর আজই সেই সৌভ্রাত্র, সম্প্রীতি, ভালবাসা, প্রেমকে পায়ে দলে দলে নৃশংসভাবে রক্ত ঝরিয়ে তাকেই ব্যঙ্গ করে আটাবাগের কাঁচা নর্দমার পাশে মেহেতা সাহেবের মৃতদেহটা শুইয়ে রেখেছে।

কয়েক মিনিট পর নাসো, সামসেদরা পা দিয়ে ঠেলে মেহেতা সাহেবের দেহটা উপুড় করে নিয়ে আবার একইভাবে তুলে নিল। তারপর সামান্য দুলিয়ে কাঁচা নর্দমার মাঝখানে ছুঁড়ে দিল।

ঝপাস করে একটা শব্দ। কাঁচা নর্দমার কাদা ছিটকে পড়ল নর্দমার ওপর। কিছুটা বুদবুদ, আস্তে আস্তে মেহেতা সাহেবের দেহটা নর্দমার কাদার মধ্যে ঢুকে গেল।

বিজয়ীর হাসি খেলে গেল হোসেন, নাসো সমেত উপস্থিত দুষ্কৃতীদের চোখে মুখে।

হোসেন আব্বাসকে বলল, "ও থলিয়াকে লেকে আও।"

আব্বাস কথা মতো নর্দমার পাশে হোসেনের পায়ের সামনে মেহেতা সাহেবের ইউনিফরম সমেত থলিটা নামিয়ে রাখল।

"অভি থোরা কেরোসিন লেকে আও।" হোসেনের নির্দেশ। খোলা তরোয়াল হাতে আব্বাস সামনেই একটা বাড়িতে ঢুকে গেল।

মিনিট দুয়েকের মধ্যে একটা লিটার দুই প্লাস্টিকের জার ঝুলিয়ে ফিরে এল। ওর ভেতর কেরোসিন।

হোসেন আব্বাসকে বলল, "ঢাল দে।"

আব্বাস জারের মুখটা খুলে চটের থলির ওপর পুরো কেরোসিন ঢেলে দিয়ে জারটা ছুঁড়ে ফেলে দিল।

হোসেন পকেট থেকে একটা বিড়ি বার করল। সঙ্গে দেশলাই। একটা কাঠি বার করে জ্বালাল। প্রথমে বিড়িটা ধরিয়ে জ্বলন্ত কাঠি ছুঁড়ে ফেলল কেরোসিন তেলে ভেজা চটের থলিটার ওপর। ঝপ করে একটা শব্দ করে থলিটা দাউ দাউ করে ঊর্ধ্বমুখী উঠল।

মেহেতা সাহেবের কোনও চিহ্নই তারা রাখবে না। তাই ইউনিফরম পুড়িয়ে নিশ্চিহ্ন করে দিচ্ছে। আটাবাগে মৃতদেহটা ফেলারও একটা কারণ আছে। হোসেনরা জানে গঙ্গায় জোয়ার এলে সেই জোয়ারের জল আটাবাগের ওই কাঁচা নর্দমায় এসে খুব সহজেই দেহটা গঙ্গার মাঝখানে নিয়ে যাবে। তারপর মেহেতা সাহেবের দেহটা গঙ্গায় ভাসতে ভাসতে কোথায় যে চলে যাবে কে জানে। কোনওদিন কোনও তীরে ভেসে থেমে গেলেও সেই দেহটা যে মেহেতা সাহেবের তার বোঝার কোনও উপায় থাকবে না। একটা গলিত, পচা, উলঙ্গ শরীর দেখে থাকে চিহ্নিত করা খুবই মুশকিল। শরীর থেকে ইউনিফরম খুলে সেগুলো পুড়িয়ে ফেলার এটাই কারণ। পচা গলা শরীরে যদি ইউনিফরমটা পরা থাকে তবে ইউনিফরম দেখেই মৃতদেহটা চিহ্নিত হয়ে যাবে।

মেহেতা সাহেবের ইউনিফরমটা পুড়তে লাগল। পোড়া ধোঁয়া থেকে কাঁচা রক্তের গন্ধ বাতাসে ভরে গেছে। একটা লাঠি নিয়ে নাসো থলিটা উল্টেপাল্টে আগুনের সমতা রেখে ইউনিফরমটা সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হওয়ার জন্য সাহায্য করতে লাগল। হাওয়ায় হাওয়ায় দ্রুত আগুন খেলে ওদের কাজটা ত্বরান্বিত করতে লাগল।

ওরা ফিরে চলল বাতিকলের দিকে। নান্নে কসাইয়ের হাতের দিকে দেখে হোসেনের মনে পড়ে গেল আরও একটা কাজ বাকি। ওরা তখন বাতিকলে ইস্রাইলের বাড়ির সামনে। হোসেন নান্নেকে বলল, "ও শালা হেলমেট, উমলেট ইঁয়া ফেক দে।" নান্নে তার হাতে রাখা মেহেতা সাহেবের হেলমেট, ঢাল, বেল্ট ইত্যাদি একে একে ইস্রাইলের বাড়ির সামনে কাঁচা নর্দমায় ছুঁড়ে দিতে লাগল। জিনিসগুলো ঝপ করে নর্দমায় পড়ে ধীরে ধীরে তলিয়ে যেতে লাগল।

আব্বাসের হাতে তখনও ধরা একটা তরোয়াল। হোসেন ওকে বলল, "উসকো ভী চালান কর দে।" আব্বাস ওই একই জায়গায় তরোয়ালটা ছুঁড়ে দিতে সেটাও নর্দমায় তলিয়ে গেল।

ওরা ইস্রাইলের বাড়ির সামনে থেকে সরে অন্যদিকে চলতে শুরু করল। মোকতার আলির কী ব্যবস্থা হয়েছে সেটা সরেজমিনে দেখার জন্য।

আবদুল লতিফ খানের গোসলখানায় যখন মেহেতা সাহেব হোসেন চৌধুরি, আকতার আলম, নাসো, সামসাদ, মেহফুজ আলম, লোকমানদের চক্রব্যূহের মধ্যে আটকে গেছে তখন তার বডিগার্ড মোকতার আলি জি দুশো আটাশের তিন বাতিকল সেকেন্ড লেনে মহঃ নউমুল্লার বাড়িতে ঢুকেছে একইভাবে আশ্রয়ের আশায়।

সত্তর বছরের মহঃ নউমুল্লা তার ছোট দোতলা বাড়িতে স্ত্রী আয়েষা বিবি ও চার মেয়ে আলমারা, আঞ্জুমান, হাসানারা ও জাহানারাকে নিয়ে বাস করে।

বাড়ির বাইরে যখন প্রচণ্ড হইহল্লা হচ্ছে, তখন মহঃ নউমুল্লা দুপুরের খাওয়ার খেতে বসে ছিল। তাকে ঘিরে বসে ছিল তার চার মেয়ে ও স্ত্রী।

সকাল থেকেই তারা হল্লা ও বোমার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে। এবং একটা যে দাঙ্গা ও সংঘর্ষ তাদের এলাকায় চলছে সেই খবরও তাদের কাছে ছিল। মুহুর্মুহু বোমার আওয়াজে দাঙ্গার রঙ্গমঞ্চে কী দৃশ্য চলছে তা তারা দেখতে না পেলেও সেটা যে একেবারে নিরামিষ রান্নার মতো বিশুদ্ধ অবস্থায় পরিবেশন করা হচ্ছে না তা হল্লার উত্তাল ধ্বনির সঙ্গে বোমার

আওয়াজের মিশেলে সহজেই অনুমান করতে পেরেছে বৃদ্ধ নউমুল্লা ও তার পরিবারের সদস্যরা।

দুপুর বারোটা দশ পনেরো মিনিট নাগাদ হঠাৎ হল্লার ধ্বনি এত এগিয়ে এল যে ওদের মনে হলো দাঙ্গার উৎপাত ওদের বাড়ির ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলছে।

বাড়ির সদর দরজা হাট করে খোলা। চারটে জোয়ান মেয়ে নিয়ে মঙ্গঃ নউমুল্লার বাস। হল্লার প্রচণ্ড উত্তাপ তার বাড়ির ওপর আছড়ে পড়ার আওয়াজে সন্ত্রস্ত নউমুল্লা খাওয়ার ছেড়ে উঠে ছুটে গেল সদর দরজাটা বন্ধ করে আসতে।

ঠিক ওই মুহূর্তেই প্রাণভয়ে ভীত মোকতার আলি প্রাণ বাঁচাতে নউমুল্লার বাড়ির সদর দরজা দিয়ে বাড়িতে ঢুকে গেল।

একই সময়ে হাত দশেক দূরে একটা ছোট বোমা উড়ে এসে পড়ল। ওরা স্বাভাবিকভাবেই আরও ভয় পেল। কলকাতা পুলিশের সাদা পোশাক-পরিহিত মোকতার আলিকে দেখেই নউমুল্লা বুঝে গেছে যে তার বাড়িতে আশ্রয়প্রার্থী কলকাতা পুলিশের একজন কনস্টেবল।

সময় নেই। সামান্যতম নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নেওয়ারও সময় নেই। পলক পরার আগেই যে কোনও মুহূর্তে আক্রমণকারীরা মোকতারের শরীরের ওপর আক্রমণ করতে পারে। সকাল থেকে তার সারা শরীর অজস্র ঢিলের ঘা খেয়েছে। শরীরের যেখানে যেখানে সেইসব ঢিলের আঘাত লেগেছে সেখানে তার ব্যথা অনুভব হচ্ছে। কিন্তু ওইসব ব্যথা নিয়ে ভাবার অবকাশ নেই। আগে প্রাণ। প্রাণই যদি না বাঁচল ব্যথা নিয়ে কী করবে? ব্যথা-ফ্যথা এই মুহূর্তে একেবারেই তুচ্ছ। যে ডিসি সাহেবের বডিগার্ডের ডিউটিতে সে এসেছে, দাঙ্গাবাজদের আক্রমণের তরঙ্গের চোটে তিনি যে কোনখানে, কোন দিকে ছিটকে গেছেন তা দেখার সময়ও নেই মোকতারের কাছে। দাঙ্গাবাজদের ক্রমাগত আক্রমণে দু'জনে দু'জনের থেকে কখন যে ছিটকে গেছে নিজেরাও খেয়াল করেনি। ধানক্ষেতি মসজিদ পর্যন্ত সে মেহেতো সাহেবের সঙ্গে সঙ্গে ছিল, অন্য গার্ডেদের মতো সে মেহেতা সাহেবকে ছেড়ে পালানোর চিন্তাই করেনি। মসজিদ থেকে বেরিয়েই আক্রমণের ঠেলায় তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে দু'জনে একলা হয়ে যায়। অবশ্য দু'জনে একসঙ্গে থাকলেও এই এক দঙ্গল দাঙ্গাবাজকে ঠেকিয়ে রাখতে পারত না। ঠেকিয়ে রাখার মতো একটাই অস্ত্র তার কাছে আছে। একটা পয়েন্ট থ্রি এইট বোরের রিভলবার এবং মাত্র বার রাউন্ড গুলি। কী হবে?

এতক্ষণ ধরে ও ছুটে চলেছে, তবু সে রিভলবারটা ব্যবহার করেনি।

কারণ জানে, একবার ওটা ব্যবহার করলে দাঙ্গাবাজরা আরও উত্তেজিত হয়ে যাবে। তাদের প্ররোচনা না দিয়ে যদি তারা শান্ত হয়ে যায় সেটাও তার কাম্য। কিন্তু যে কারণে সে তার রিভলবারটা ব্যবহার করেনি তার মূল্য দাঙ্গাবাজদের কাছে কতটুকু?

মানুষ যখন কোনও একটা বিষয়ে পাগলের মতো হিংস্র হয়ে যায় তখন তাকে কোনও কৌশল করে থামানো যায় না। হিংস্রতার শেষ পরিণতি না দেখে সে থামে না। সুতরাং মোকতারের সহনশীলতা তারা কী করে অনুভব করবে?

উত্তেজিত মোকতার হতভম্ব নউমুল্লাকে বলল, "হাম কো জান সে বাঁচাইয়ে, হাম ভী মুসলিম হ্যায়।"

মোকতার নউমুল্লার উত্তরের অপেক্ষা না করে বাড়ির ভেতর ঢুকে গেল। গৃহকর্তার উত্তর ইতিবাচক না নেতিবাচক ভদ্রতা করে তা শোনার সময় নেই। তার জীবন যে, যে কোনও মুহূর্তে ওই আক্রমণকারীর কাছে উৎসর্গ করতে হতে পারে। এই সব মুহূর্তে কে কবে ভদ্রতা করে এক ঢোক সময়ও নষ্ট করতে পেরেছে?

মোকতার বাড়ির ভেতর ঢুকে যেতেই নউমুল্লা আক্রমণকারীদের ঠেকাতে তার কাঠের সদর দরজা খিল দিয়ে বন্ধ করে দিল।

মোকতার সোজা বাড়ির ভেতর একটা টিনে ঘেরা পায়খানায় ঢুকে ভেতর থেকে ছিটকানি তুলে দিয়ে হাঁপাতে লাগল।

নউমুল্লা সদর দরজায় খিল দিয়ে বাড়ির ভেতরের দিকে ঢোকার জন্য পা বাড়িয়েছে কী বাড়ায়নি, দরজা খোলার জন্য আক্রমণকারীরা নউমুল্লাকে হুমকি দিতে লাগল। হুমকির সঙ্গে দরজায় লাথিও মারতে লাগল।

নউমুল্লা কোনদিকে যাবে। সে বেশ ভালই বুঝতে পারছে, দাঙ্গাবাজরা তার সদর দরজা ভেঙ্গে ফেলবে।

কিন্তু সে কোনদিকে যাবে। একটা অল্পবয়সী পুলিশ কনস্টেবল তার বাড়িতে প্রাণের দায়ে আশ্রয় নিয়েছে, তার ওপর সে আবার তার স্বধর্মীয়, কি করে সে নিজ হাতে বাড়ির সদর দরজা খুলে খুনীদের আহ্বান করে ওই কনস্টেবলকে তাদের হাতে তুলে দেবে? সে বাড়ির ছোট উঠোনের মাঝখানে দ্বিধা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একদিকে সদর দরজার ওপাশে আক্রমণকারীরা, অন্যদিকে তারই বাড়ির পায়খানায় লুকিয়ে আছে আক্রমণকারীদের লক্ষ্যবস্তু।

এবার আক্রমণকারীরা নউমুল্লার নাম ধরে গালাগালি দিয়ে হুমকি দিয়ে বলল, "শালা, দরওয়াজা খোল, নেই তো তোর দেঙ্গে।"

অপেক্ষা করা ধাতে নেই দাঙ্গাবাজদের। তারা দরজার ওপর চার পাঁচ জন মিলে শক্তি প্রয়োগ করতে শুরু করল।

দু'তিন মিনিটের প্রতিরোধ। দরজার পাল্লা ভেঙ্গে গেল। কুরবান, দিলওয়ার খান, হালিম, নাসির খান ওরফে কাল্লু, সাগির, রহমৎ, ইলিয়াস, ওসমান, নশরু খান সহ প্রায় কুড়ি পঁচিশ জন আক্রমণকারী তরোয়াল, ছুরি, চপার, রড, বল্লম নিয়ে চিৎকার করতে করতে নউমুল্লার বাড়িতে বন্যার জলের মতো ঢুকে পড়ল।

দরজা ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধ নউমুল্লাকে টেনে তার স্ত্রী আয়েষা বিবি নিচের একটা ঘরে আশ্রয় নিয়েছে। আতঙ্কে দিশাহারা নউমুল্লার মেয়েরা বাড়ির দোতলার একটা ঘরে ঢুকে খিল লাগিয়ে কাঁপতে কাঁপতে জানালার একটা ছোট্ট ফুটো দিয়ে নিচে দাঙ্গাবাজেরা কী করছে তা দেখার চেষ্টা করছে।

আনওয়ার, হালিম, দিলওয়ার, নাসির, রহমৎ, ইলিয়াসদের গালাগালি ও হল্লার চোটে নউমুল্লার ছোট বাড়ি ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম, কে কত জোরে, কে কত প্রতিহিংসার জ্বলনে স্লোগান, চিৎকার, গালাগালি দিতে পারে তার যেন ওদের মধ্যে প্রতিযোগিতা হচ্ছে।

দিলওয়ারা কাউকে কিছু জিজ্ঞাসাও করছে না। নিজেরাই ঘরে ঘরে মোকতারের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে। ওরা প্রত্যেকে যেন বহুদিনের অভুক্ত বাঘ, একটা ছোট জন্তু দেখে খাওয়ার লোভে পৃথিবী তোলপাড়, তছনছ করে জন্তুটাকে খেয়ে ওদের ক্ষুধার দহন মেটাবে।

রান্নাঘরের যে দাওয়ায় বসে নউমুল্লা খেতে বসেছিল, তার অভুক্ত থালা নাসিরের এক লাথিতে ছিটকে গিয়ে পড়ল বাইরে, পেতলের জল খাওয়ার লোটা উড়ে গেল পায়খানার সামনে।

ছোট্ট অন্ধকার বন্ধ খোপের ভেতর মোকতারের তখন কী অবস্থা। সে বুঝে গেছে, এদের হাত থেকে ওর মুক্তি নেই। যে কোনও মুহূর্তে ওরা খোপের ভেতর থেকে ওকে টেনে বার করে নিয়ে যাবে বা এই খোপের মধ্যেই ওকে ওরা কোতল করতে পারে। মোকতার মৃত্যুভয়ে থরথর করে কাঁপছে। ওর শরীর থেকে কে যেন প্রতিরোধ করার শক্তি আস্তে আস্তে নিঃশোষিত করে নিচ্ছে। ওর হাত পা দুর্বল হয়ে যাচ্ছে।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ওদের পুরো বাড়ির তল্লাশি শেষ। শুধু একটা জায়গা বাকি আছে। নউমুল্লার বাড়ির পায়খানা।

ঘরগুলোতে মোকতার আলিকে না পেয়ে দিলওয়ার খান এত ক্ষিপ্ত

হয়ে উঠেছে যে যেখানে সেখানে জিনিসপত্রে লাথি মেরে তার রাগ জাহির করছে। তারই একটা লাথি গিয়ে আছাড় খেল পায়খানার টিনের দরজায়।

ঝনঝন করে উঠল। খুলল না।

দিলওয়ার চিৎকার করে নউমুল্লাকে জিজ্ঞেস করল, "এই মোল্লা, ইঁয়া কোন হ্যায়? তেরা বিবি?" একটা হাসির ছররা।

নউমুল্লা নিশ্চুপ। তার পাশে দাঁড়িয়ে আয়েষা বিবিও নিশ্চুপ।

ওদের যা বোঝার বোঝা হয়ে গেছে। দিলওয়ারের সঙ্গে নাসির, সাগিরও পায়খানার টিনের দরজা ভাঙ্গার কাজে নেমে গেল।

ঝনঝন, তারপর মুক্ত। ভেতরে মোকতারকে দেখে পৃথিবী কাঁপিয়ে উল্লাস। খোলা তরোয়াল, চপার ও ছুরিগুলো ওদের হাতে এমনভাবে নাচতে লাগল যেন মোকতারের রক্তপানের জন্যই ওগুলির জন্ম।

মোকতার কোনোমতে দিলওয়ারদের বলল, "হামকো ছোড়ো, হাম ভী মুসলিম হ্যায়।"

"চোপ শালা, তু কাফেরকা দালাল।" দিলওয়ারের হুমকি।

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, শালে কো লে চল, শালে কাফেরকা চামচা।" একটা চিৎকার। মোকতারকে চার পাঁচজন মিলে পায়খানা থেকে টানতে টানতে নউমুল্লার বাড়ি থেকে বার করে রাস্তায় নিয়ে গেল। পেছন পেছন যুদ্ধজয়ের ধ্বনি দিতে দিতে বাকি কুড়ি পঁচিশজন দাঙ্গাবাজ।

একদল দুষ্কৃতীর উন্মত্ত হাতির মতো নউমুল্লার বাড়ির সদর দরজা ভেঙ্গে, সম্পূর্ণ বাড়ি, ঘর, জিনিসপত্র বিধ্বস্ত করে মোকতারকে নিয়ে যেতে মোট সময় লাগল মিনিট পাঁচ সাত।

বৃদ্ধ নউমুল্লা ও তার স্ত্রী আয়েষা বিবি বিহ্বল। ওরা তো জানে না, দিলওয়াররা ওদের কত দয়া দেখিয়েছে। হোসেন চৌধুরি ও নাসোরা মেহেতা সাহেবকে আবদুল লতিফ খানের গোসলখানায় পেয়ে ওইখানেই খুন করেছে। দিলওয়ারা অন্তত নউমুল্লাকে ওইটুকু দয়া দেখিয়ে ওর বাড়ির পায়খানায় মোকতারকে কোতল করেনি। তাকে মারতে মারতে বাড়ি থেকে নিয়ে গেছে।

কুরবান আর আনোয়ার নউমুল্লার বাড়ির ভেতরেই মোকতারের রিভলবার ও বারো রাউন্ড গুলি ছিনতাই করে নিয়ে নিল।

যে রিভলবার দিয়ে মোকতার মেহেতা সাহেব ও নিজের জীবনরক্ষার কথা ছিল সেটা ব্যবহৃত না হয়ে দাঙ্গাবাজদের হাতে চলে গেল। সেটা মেহেতা সাহেবের জীবন বাঁচানোর কাজে লাগল না, ওর নিরাপত্তার কাজেও লাগল না।

দিলওয়ার ও নসরু খানের ভাই নাসির খান মোকতারের দুটো হাত দু'দিক থেকে শক্ত করে চেপে ধরে আছে। মিছিল করে ওরা ধানক্ষেতি ময়দানের দিকে চলেছে।

মিছিলের নেতৃত্ব দিচ্ছে নসরু খান, তার পাশে ইদ্রিস। তার পেছনে গোরাচাঁদ, মাফিজ, সালিম, ইলিয়াস, কাইজার, ওয়াহেব। আর মোকতারের পেছনে কুরবান, আনোয়ার, সাগির, জাহির, হাটিন, হালিম, রহমৎ ও মেহের মঞ্জিলের আয়ুব।

নউমুল্লার বাড়ি থেকে বাতিকল লেনে আসার সঙ্গে সঙ্গে আয়ুব তার জ্বালা প্রকাশ করতে হাতের লোহার রড দিয়ে মোকতারের কোমরের ওপর সজোরে মেরেছে। ফল, মোকতারের হাঁটার শক্তি নিমেষে উধাও।

মোকতার তবু দিলওয়ার আর নাসিরের টানে হোঁচট খেতে খেতে "আল্লা আল্লা" স্মরণ করতে করতে চলেছে কোথায়, সে জানে না। দোজখে না স্বর্গে? দিলওয়াররা তাকে কোথায় পাঠাবে? কোন ঠিকানায়? দিলওয়াররা নিশ্চয়ই স্বর্গে যাওয়ার জন্য তাকে দোজখে পাঠাচ্ছে। কারণ ওদের মত অনুযায়ী সে কাফেরদের দালাল, কে কাফের কে ফকির তার পরীক্ষা করল কে? দিলওয়াররা?

আদিম মানুষেরা যেমন অপদেবতার কাছে নরবলি দিতে আপন আপন উৎসবের নাচ গান করতে করতে উৎসর্গের বস্তুকে টানতে টানতে বলির স্থানে নিয়ে যায়। দিলওয়াররা অনেকটা তেমনভাবেই মোকতারকে নিয়ে বাতিকল লেন থেকে রামনগরের দিকে চলল।

রামনগর লেন ও বাতিকলের সংযোগস্থলে এসে দিলওয়াররা ধানক্ষেতি ময়দানের উত্তর-পূর্ব কোণের দিকে নিয়ে চলল মোকতারকে।

ধানক্ষেতি ময়দানে এসে রহমতের আর ধৈর্য ধরল না। সে নিজে তার স্বর্গে যাওয়ার রাস্তা বাধাহীন করতে হাতের খোলা বারো ইঞ্চি ছুরিটা ঢুকিয়ে দিলে সোজা মোকতারের তলপেটে।

সঙ্গে সঙ্গে মোকতারের একটা মরণ চিৎকার ধানক্ষেতি ময়দানের আশেপাশের বাসিন্দাদের কানে তীব্র ভাবে আছাড় খেয়ে পড়ল। মোকতার তার হাত ছাড়িয়ে একবার তলপেটের ওপর রাখতে চাইল। পারল না। ওর দু'হাত যে দু'দিক থেকে প্রাণপণে চেপে ধরে আছে দিলওয়ার হোসেন ও নাসির খান।

মোকতারের রক্ত ছিটকে পড়ল ধানক্ষেতির ময়দানে। মোকতার আর চোখ খুলে রাখতে পারছে না। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তীরবেগে ঘুরছে। সে ধানক্ষেতি

ময়দানে শুয়ে পড়তে চাইছে। কিন্তু পারছে না। ঘাড় বুকের ওপর নেমে এসেছে। কিছুই দেখতে পারছে না। সে শুধু তার তলপেট চেপে বিছানা চাইছে। পারছে না। কারণ তাকে যে দিলওয়ার আর নাসিম টেনে ধরে দাঁড় করিয়ে রেখেছে।

রহমৎ তার ছুরিটা মোকতারের পেট থেকে বার করার সঙ্গে সঙ্গে হাটিনও তার হাতের ছুরি ঢুকিয়ে দিল মোকতারের পেটে।

মোকতার চিৎকার করে কাউকে জানানোর যে আর জোর নেই। তার জীবনের বাঁচার মুহূর্ত শেষ হয়ে এসেছে। হাটিনের ছুরিটা পরপর দু'বার দ্রুতগতিতে ওর পেটে ঢুকল এবং বার হলো।

একটা অতি ক্ষীণ আওয়াজ। সেই আওয়াজ ময়দানের সামনে ধানক্ষেতি মসজিদ পর্যন্ত পৌঁছাল না। সেখানে তখন আজানের ব্যবস্থা করছে ইমাম ফারহাদ জুভেরি।

রক্ত তলপেট থেকে নিচের দিকে নেমে মোকতারকে ভাসিয়ে দিচ্ছে। দিলওয়ার ও নাসিম ওর দু'হাত ছেড়ে দিল। মোকতার ধুপ করে মাটিতে পড়ে গেল।

"গিয়া।" দু'তিনজন একই সঙ্গে বলে উঠল।

হ্যাঁ। মোকতারের প্রাণের স্পন্দন ধানক্ষেতি ময়দানে রহমতদের হাতে থেমে গেছে। ওর কাছে পৃথিবীর সব ময়দানই এখন সমান। সকাল থেকে ইদ্রিস, নসরু, হোসেন চৌধুরি, নাসো, দিলওয়ার, লোকমানদের তাড়া খেয়ে খেয়ে কোনও মতে তবু প্রাণ নিয়ে বেঁচে ছিল। সেই প্রাণটা উড়ে যেতে ওর কাছে এখন আর প্রাণ বাঁচানোর কোনও তাগিদ নেই। মৃত্যুই যখন বরণ করে নিয়েছে তখন আর ভয় কী?

মোকতারের মৃতদেহ ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে 'বীর' রহমৎ, হালিম, দিলওয়ার, ওয়বউদ্দিন, নাসিম, কুরবান, আনোয়ার, গোরাচাঁদ, মনসুর হোসেন, আয়ুব ও নসরুরা।

নসরু বলে উঠল, "ইসকো হাপিজ কর দো।"

উপস্থিত সহযোদ্ধারা ওর মুখের দিকে তাকাতেই নসরু আবার বলল, "জ্বালা দো। না মিলে।"

"কেইসে?" দিলওয়ার জানতে চাইল।

"শালা কাফের লোক যেইসে জ্বালাতে হ্যায়।" নসরুর উত্তর।

নসরুর হুকুম শুনেই প্রত্যেকেই কাজে নেমে পড়ল।

নির্দেশ পেয়েই সামিম, সাগির, জাহির ও ওসমান চলল কাঠ যোগাড়

করতে। কাছেই জে পাঁচের বাই তিনের এ-তে আবদুল্লা খানের ঘুড়ি বানানোর গোডাউন ও কারখানা। সেদিন সকালেই অসম থেকে সাতশো আশি বাণ্ডিল ঘুড়ি বানানোর কাঠি লরিতে এসেছে। আবদুল্লা, তার বাবা মহঃ আব্বাসউদ্দিন, লরির ড্রাইভার ও খালাসীরা মিলে সেই কাঠি লরি থেকে নামিয়ে ওই গোডাউনে রেখেছে। ওরা আবদুল্লার সেই কারখানায় অনায়াসে ঢুকে গেল। ওখানে কারখানার মালিক ঘুড়ি বানানোর কাঠি স্তূপ স্তূপ করে একপাশে সাজিয়ে রেখেছে।

সামিমরা কারখানায় ঢুকেই ওই ঘুড়ি বানানোর কাঠির স্তূপ থেকে বাণ্ডিল পাঁজা করে করে তুলে নিল। আজ ওদের কে বাধা দেবে? কার এত সাহস? আজ ওরা যে 'মুক্তিযুদ্ধে' অবতীর্ণ। আজ কেউ বাধা দিলেই তাকেও তারা মোকতারের সঙ্গে দোজখে পাঠিয়ে দেবে। কারখানার মালিক আবদুল্লা ও কর্মচারীরা এমনিতেই কাজ বন্ধ করে দাঙ্গা দেখছিল। তারা ওদের কাণ্ড দেখে নির্বাক দৃষ্টিতে তাকিয়েই রইল। বাধা দেওয়ার সামান্যতম প্রয়াসও দেখাল না।

ঘুড়ি বানানোর কাঠি নিয়ে সামিম, সাগিররা ফিরে এল। নসরু তাদের জায়গা দেখিয়ে দিল, ঠিক কোন জায়গায় তারা মোকতারের জন্য ঘুড়ি বানানোর কাঠি দিয়ে চিতাটা সাজাবে। মির্জা গালিব স্কুলের সামনে ধানক্ষেতি ময়দানের কোণে তারা চিতা বানানোর জন্য কাঠির বাণ্ডিলগুলো একে একে খুলে সাজাতে লাগল।

নসরু ও দিলওয়ার পরস্পরের দিকে একবার তাকালো।

নসরু দিলওয়ারকে বলল, "এইসা নেই হোগা, লাশ ছোটা কর দো।"

ওরা মোকতারের মৃতদেহের কাছে ফিরে এল। দিলওয়ার বলল, "লাশ ছোটা করনে হোগা।"

নাসিম জানতে চাইল, "কেইসে?"

"হাত পা আলাগ কর দো।" নসরু বলল।

দিলওয়ার মোকতারের নিশ্চল উপুড় হয়ে পড়ে থাকা দেহটা একটানে উল্টে দিয়ে রক্তে ভেজা কোমরের বেল্টটা খুলে নিল। তারপর মোকতারের পরনে কলকাতা পুলিশের ইউনিফরমের সাদা ট্রাউজারটা টেনে টেনে খুলতে লাগল।

রক্তে ও ধানক্ষেতি ময়দানের মাটিতে মাখামাখিতে ট্রাউজারের সামনের দিকটায় আর সাদা অংশ নেই।

দিলওয়ার ট্রাউজারটা খুলে উঠে দাঁড়াল। কেন সে ট্রাউজারটা খুলল,

এবার অন্যরা বুঝল। সে কুরবানের হাত থেকে ঝট করে তার চপারটা নিয়ে মোকতারের ডান পায়ের উরুর ওপর দিকে সজোরে বসিয়ে দিল। মোকতারের ডানপায়ের ওপর চপারটা বসে গিয়ে একটা থপ করে আওয়াজ হলো।

উল্টো দিকে দাঁড়িয়ে ছিল রহমৎ। সেও একটা চপার নিয়ে মোকতারের বাঁ পায়ের উরুর ওপর চপার বসিয়ে বাঁ পা-টা মোকতারের মূল দেহের থেকে আলাদা করার কাজে নেমে গেল।

থপ থপ করে ক'মিনিট ধরে মাংস কাটার আওয়াজ হলো। দিলওয়ার, রহমৎ, নাসিম ও মহঃ হালিম মিলে মোকতারের দেহ থেকে তার দুটো পা দুটো হাত আলাদা করে নিল। রক্ত আর বেশি পড়ল না। মোকতারও আর বুঝতে পারল না তার দেহের থেকে রহমতরা তাদের প্রয়োজনে তার হাত ও পা দুটো ছিন্ন করে নিয়েছে। সে তো তার অনেক আগেই সব ব্যথা বেদনার ঊর্ধ্বে উঠে গেছে। দেহের অনুভবের সমস্ত তন্ত্রিগুলো নিস্তেজ।

এখন মোকতারের দেহটাকে অদ্ভুত লাগছে। হাত ও পা হীন শুধু ছোট মূল দেহটা উপুড় হয়ে মাটিতে মুখ বুজে শুয়ে আছে। তলপেটের নাড়িভুঁড়ি উঁকি দিচ্ছে বাইরে।

সে কী লজ্জায় মুখ ঢেকেছে? না কি এই যন্ত্রণার থেকে মাটির কাছে মুক্তি চাইছে। কে জানে?

এমন নারকীয় নৃশংসতা কী পৃথিবীর কোনখানে কোনওদিন কেউ দেখেছে, মোকতারের মতো একটা নিরীহ কনস্টেবল সেই ইতিহাস জানে না।

ঘুড়ির কাঠি দিয়ে বানানো চিতা তৈরি। সেখানে এখন মোকতারের দেহ চাপিয়ে তা পুড়িয়ে নিশ্চিহ্ন করে দেবে নসরুরা।

রহমৎ, নাসিম, সাগির, ইলিয়াস, হাটিন, সেলিম ও দিলওয়ার মোকতারের দেহটা তুলে নিয়ে চলল চিতায় তুলে দেওয়ার জন্য। নসরু তাদের পেছন পেছন। কাটা হাত, পা ও দেহের থেকে ফোটা ফোটা রক্ত ধানক্ষেতি ময়দানের মাটিতে পরে বিদায় চিহ্ন রেখে যাচ্ছে।

অদ্ভুতভাবে চিতা সাজানো হলো। প্রথমে কাটা পা দুটো কাঠির ওপর রহমৎ ও নাসিম রাখল। তার ওপর ইলিয়াস ও সাগিররা রাখল কাটা দেহটা। সেলিম ও দিলওয়ার কাটা হাত দুটো মোকতারের বুকের ওপর চাপিয়ে দিল। তার ওপর আবার চাপানো হলো এক বাণ্ডিল কাঠি।

দিলওয়ার এবার চিৎকার করে কেরোসিন আনতে বলল। সেলিমরা আবার

ছুটল কেরোসিন আনতে। আবার তারা হানা দিল ঘুড়ির কারখানায়। সেখানে ওরা দেখে এসেছে কারখানার এক কোণে কর্মচারীদের চা-বানানোর পর্ব। সেখান থেকে তারা নিয়ে আসবে কেরোসিন।

সেলিমরা গেল এবং ঘুড়ির কারখানা থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এল দুই বোতল কেরোসিন। নসরু ও দিলওয়ার বোতল দুটো হাতে নিয়ে চিতার চারদিকে সমান ভাবে ছড়িয়ে দিল। বাকিরা উজ্জ্বল চোখ নিয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে।

রহমৎ দেশলাই জ্বালিয়ে ফেলে দিল চিতার ওপর। শুকনো সরু সরু ঘুড়ির কাঠির চিতা। ঘুড়ির কাঠি দিয়ে আর কখনও কোনওকালে চিতা তৈরি কেউ করেছে কি না কোনও ইতিহাসবিদও বলতে পারবে না। সেই চিতাতে দু'বোতল কেরোসিন দিলওয়াররা ঢেলেছে। তার ওপর জ্বলন্ত দেশলাই কাঠি পড়তেই ঝপ করে আগুন দাউ দাউ করে মোকতারের দেহ গিলে ফেলল।

উপস্থিত 'ধর্মযোদ্ধাদের' মুখে সেই আগুনের তাপ লাগতেই তারা উৎসাহিত হয়ে স্লোগান দিতে দিতেই ধানক্ষেতি ময়দান ছেড়ে বাত্তিকলের দিকে চলল। সামান্য এগিয়েই ওদের সঙ্গে দেখা হলো নাস্রে কসাই, হোসেন চৌধুরি, নাসো, লোকমানদের সঙ্গে। নসরু এগিয়ে গিয়ে হোসেন চৌধুরি, ইদ্রিসের সঙ্গে কোলাকুলি করল।

কোলাকুলির সঙ্গে স্লোগান আরও তুঙ্গে উঠল। মেহেতা সাহেব যখন আটাবাগের কাঁচা নর্দমার কাদায় শুয়ে আছে, তখন তার বডিগার্ড মোকতার ধানক্ষেতি ময়দানে দিলওয়ারদের তৈরি এক অদ্ভুত চিতায় দাউ দাউ করে জ্বলছে।

ওরা সকালে আগুন নেভাতেই এসেছিল। সেই আগুন হয়তো নিভেছে, কিন্তু নিজেরাই সেই আগুনে জ্বলতে লাগল।

গা-জুড়ানো বসন্তের ঝিরঝিরে হওয়া ধানক্ষেতি ময়দানের ওপর এসে মোকতারের কাঁচা মাংস পোড়া গন্ধ গায়ে মেখে নিয়ে আশেপাশের বাড়ির ভেতর ঢুকে বাসিন্দাদের জানান দিল রহমৎ, দিলওয়ারের ঐতিহাসিক যুদ্ধজয়ের বার্তা।

'ধর্মযুদ্ধের সৈনিকরা' পরস্পরকে মুবারক জানিয়ে 'যুদ্ধ' শেষের ঘোষণা শুনিয়ে যে যার মতো চলে গেল। দুপুর একটার মধ্যেই যে যার আস্তানায় গিয়ে বিশ্রাম নিয়ে দুপুরের খাওয়া খেতে লাগল।

তাদের প্রত্যেকের মনেই আজ ফুর্তি একটা খুব বড় 'কাজ' সমাধা

করার জন্য। বিরিয়ানী, মাংসের চাপ সহযোগে তাদের পাকস্থলী যখন পূর্ণ করছে তখন কারও কারও মনে আত্মগোপন করার আবশ্যিক চিন্তাটা নিশ্চিত ভাবে এল।

তারা অসংগঠিত ভাবে যে যার মতো ছড়িয়ে পড়ল। ধানক্ষেতি ও আটাবাগের কাঁচা নর্দমায় মোকতার আলি ও মেহেতা সাহেবের মৃতদেহের কী হাল হলো তা নিয়ে তাদের আর চিন্তা করার অবকাশ রইল না।

একটা পূর্ণবয়স্কের দেহ দাহ করতে কীভাবে চিতা সাজাতে হবে, কতটা কাঠ এবং কী ধরনের কাঠ লাগবে, তা যারা ধানক্ষেতি ময়দানে মোকতারের জন্য আবদুল্লার ঘুড়ির গোডাউন থেকে ঘুড়ির কাঠি দিয়ে নতুন ধরনের চিতাটা সাজিয়েছিল তাদের কারোর জানা ছিল না। ফলে কেরোসিন তেলে ভেজা খটখটে সরু ঘুড়ির কাঠিগুলি মোকতারের দেহকে আর্ধেক পুড়িয়ে নিজেরাই ছাই হয়ে শেষ হয়ে গেল।

মোকতারের আধপোড়া দেহটা দুমড়ে মুচড়ে ধানক্ষেতি ময়দানে পড়ে রইল। ওটার পরিণতি দেখতে যাওয়ার কেউ দুঃসাহস দেখাল না।

সময় একটু একটু করে চলে যাচ্ছে। বসন্তের হাওয়া থেকে আস্তে আস্তে প্রেম চলে যাওয়ার মতো। পৃথিবীর কাছ থেকে মেহেতা সাহেব ও মোকতার আলির আর কিছু চাওয়ার ও পাওয়ার নেই।

কিন্তু পৃথিবীর লোকেরা এবার তাদের জন্য কী করবে?

পৃথিবীর মনুষ্য সমাজের হয়ে যারা পাহাড়পুর রোডে অপেক্ষা করছে তারা তখন কী করছে?

ফণী দে ও অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘোষণা অনুযায়ী মেহেতা সাহেব বহু আগেই দাঙ্গাবাজদের হটিয়ে, তাদের আক্রমণ নিষ্ক্রিয় করে পাহাড়পুর রোডে পৌঁছে যাওয়ার কথা। কিন্তু তেমন তো হচ্ছে না। এমন কী রামনগর লেন, বাতিকল ও ধানক্ষেতির দিক থেকেও কোনও হল্লা বা বোমার আওয়াজও পাহাড়পুরে অপেক্ষারত ডিসি (সদর) সুবিমল দাশগুপ্ত, ডিসি (স্পেশাল ব্রাঞ্চ) দীনেশ বাজপায়ী, কিংবা অন্য অফিসার ও কনস্টেবলদের কানে এসে পৌঁছাচ্ছে না।

বহু প্রতীক্ষার পর দেড়টা নাগাদ দুই ডিসি সাহেব, গার্ডেনরিচ থানার অফিসার-ইন-চার্জ শিউনাথ সিং ও অন্যান্য অফিসাররা ফোর্স নিয়ে পাহাড়পুর রোড থেকে রামনগর লেনের দিকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল।

আস্তে আস্তে ফোর্স ফতেপুর ভিলেজ রোড দিয়ে রামনগর লেনের দিকে চলতে শুরু করল। শিউনাথ সিং ওই অঞ্চলের বাসিন্দাদের প্রশ্ন করে

জানতে চাইল, তারা ডিসি (বন্দর) বিনোদ কুমার মেহেতা ও তার বডিগার্ডকে দেখেছে কি না।

প্রায় প্রত্যেকেই এক সুরে জানাল, "সকালে দেখেছি স্যার চলে যেতে, কিন্তু কোথায় গেছে তা জানি না।"

নেতিবাচক উত্তরের মধ্যেই উপস্থিত অফিসারদের বুঝতে অসুবিধা হলো না যে, কেউ মুখ খুলতে চাইছে না। ভয়ে। এর অর্থ কী? কোনও দুঃসংবাদ কি ওদের জন্য অপেক্ষা করছে? কি সেই দুঃসংবাদ?

আর একটা জিনিসও ওরা বুঝতে পারছে না, মেহেতা সাহেব যদি আত্মরক্ষা করতে সমর্থই হয় তবে তিনিও বা বের হয়ে আসছেন না কেন?

অন্যথায় তিনি যদি আক্রমণের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে ব্যর্থই হন, তবে তার পরিণতিই বা কী হয়েছে। তিনি কী বন্দী হয়ে আছেন? না কি তাকে একেবারে খুনই হতে হয়েছে দাঙ্গাবাজদের হাতে।

তেমনই যদি হয়, দাঙ্গাবাজরা এত সাহস কি করে পেল, তাদের মধ্যে নিশ্চয়ই কেউ কেউ উপস্থিত ছিল যে ডিসি (বন্দর)কে চেনে। এবং তাকে চেনার পরও একেবারে খুন করার সাহস তারা সঞ্চয় করে ফেলল, সেটাও আশ্চর্যজনক। তার পরিণতির কথা কী একবারও তাদের মাথায় আসবে না?

তার ওপর সকাল থেকে এমন কোনও ঘটনা ঘটেনি যে, দাঙ্গাবাজরা মত্ত হয়ে একেবারে পুলিশ অফিসারদের খুন করে ফেলবে। যা ঘটেছে, তা এমন কোনও উচ্চ মাত্রার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা নয় যে তাতে তারা সমস্ত বোধ হারিয়ে একেবারে পুলিশ অফিসারকে হত্যা করবে।

এই রকম ছোটখাট দাঙ্গা এবং দাঙ্গা লাগার পরিস্থিতি কয়েক হাজারবার বাংলাদেশে এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে হয়েছে। তাহলে সেই সব দাঙ্গা ও পরিস্থিতিতে বহু পুলিশকে প্রাণ দিতে হতো। তাই উপস্থিত অফিসাররাও সামান্য হতবাক হয়েছিল।

কিন্তু হতবাক হয়ে তো পুলিশের বসে থাকলে চলবে না। কোনও পরিস্থিতিতেই পুলিশের হতবাক হওয়া চলে না। কারণ অপরাধীরা কোন দিক থেকে কোন ঘটনার সূত্র ধরে কী ধরনের অপরাধ করবে তা পূর্বে জানান দেবে না। তাই পুলিশকেই আগাম সতর্কতা নিতে হয়। যা কিনা উনিশশো চুরাশি সালের আঠারোই মার্চে নেওয়া হয়নি। এবং সেই ভুলের মাশুল কলকাতা পুলিশকে দিতে হয়েছে।

সেই মাশুল কতটা, তার ফল কী, সেটা দেখতেই দুই ডিসি সাহেবের নেতৃত্বে বাতিকল, রামনগর লেনে, মুচিপাড়ায় তল্লাশি করতে বিরাট ফোর্স মাথা কুটে মরছে।

এমন একজনও তারা ওই অঞ্চলের বাসিন্দাকে পাচ্ছে না, যে তাদের সত্যি কথা বলে তাদের পথপ্রদর্শক হবে। জানাবে ইদ্রিস, হোসেন চৌধুরি, নাসো, লোকমান, নসরু, ইলিয়াস, রহমৎ, দিলওয়ার, সেলিম, জাহির, কুরবানরা সকাল থেকে দুপুর সাড়ে বারোটা পর্যন্ত এলাকা কাঁপিয়ে কতটা কী করেছে।

জানে। ওই অঞ্চলের বাসিন্দারা প্রত্যেকেই দেখেছে অথবা শুনেছে শেষ পরিণতি কী হয়েছে। কিন্তু আতঙ্কে তারা মুখ খুলছে না।

খুলবেই বা কী করে? তারা তো দেখেইছে যারা তাদের রক্ষাকারী, সেই রক্ষাকারী পুলিশই অসহায়ের মতো দাঙ্গাবাজদের হতে খুন হয়েছে। তবে কাদের ভরসায় তারা দাঙ্গাবাজদের কর্মকাণ্ডের বিবরণ জানাবে? কে দেবে নিরাপত্তা?

সুতরাং বিরাট পুলিশ বাহিনীকে ওই অঞ্চলের বোবা নাগরিকদের সাহায্য ছাড়াই গলি আর তস্য গলিতে খুঁজে বেড়াতে হচ্ছে মেহেতা সাহেব ও তাঁর বডিগার্ডকে।

তখনকার পুলিশ কমিশনার নিরুপম সোম বাড়িতে বসে সব খবরই রাখছিলেন। গার্ডেনরিচ এলাকায় যে একটা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে তা তিনি শুনেছিলেন। এবং সেখানে পরিস্থিতি সামাল দিতে ডিসি (বন্দর) বিনোদ কুমার মেহেতার নেতৃত্বে যে একটা ফোর্স গিয়েছে তাও জানতেন। তাদের সাহায্যের জন্য ডিসি (সদর), ডিসি (স্পেশাল ব্রাঞ্চ)ও পৌঁছেছেন তাও তাঁর দর্পণে ছিল। তিনি লালবাজারে এসে শুনলেন মেহেতা সাহেব ও তাঁর বডিগার্ডকে পাওয়া যাচ্ছে না। তিনি উদ্বিগ্ন হলেন। তিনি একটু রোমান্টিক ধরনের ছিলেন। এবং নিজের ওপর অতিরিক্ত আস্থাবান ছিলেন। তাই তিনি ঠিক করলেন নিজেই গার্ডেনরিচে গিয়ে ওখানকার পরিস্থিতি দেখবেন।

একটা নাগাদ তিনি লালবাজার ছাড়লেন। কুড়ি মিনিটের মধ্যে গার্ডেনরিচ থানায় পৌঁছে গেলেন। থানায় তখন সাব-ইন্সপেক্টর এস কে মৈত্র ছাড়া অন্য কোনও অফিসার ছিলেন না। বাকিরা সব ফতেপুর ভিলেজ রোড, রামনগর লেনের গলিতে মেহেতা সাহেবকে খুঁজতে ব্যস্ত। কেউ কেউ সেই ব্যস্ততার সুযোগে কোথায় যে চলে গেছে কেউ জানে না।

সোমসাহেব সাব-ইন্সপেক্টর মৈত্রকে নিয়েই ফতেপুর ভিলেজ রোডের দিকে চললেন। মৈত্র সোমসাহেবকে নিয়ে পাহাড়পুর রোড ও ফতেপুর ভিলেজ রোডের সংযোগস্থলে এসে পৌঁছালেন। ওখানে তখন সাব-ইন্সপেক্টর এইচ পি দত্ত কয়েকজন কনস্টেবলকে নিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

এইচ পি দত্তের কাছেই সোমসাহেব শুনলেন বাকি বাহিনী মেহেতা সাহেব ও তাঁর বডিগার্ডকে খুঁজতে রামনগর লেন ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে গিয়েছে।

সোমসাহেব তখন মৈত্র, দত্ত এবং উপস্থিত কনস্টেবল ও তাঁর বডিগার্ডদের নিয়ে নিজেও চললেন রামনগর লেনের দিকে।

সোমসাহেবরা যখন ফতেপুর ভিলেজ রোডের গলির ভেতর দিয়ে ঢুকছেন, তখন সব ফাঁকা। দুই একটা শিশু উঁকি দিয়ে তাদের কৌতূহল দমন করার চেষ্টা করলেও, বয়স্ক মানুষজনকে দেখাই যাচ্ছে না। তারা তো বুঝে গেছে, সকাল থেকে বোমাবাজি ও দুষ্কৃতীদের দাপটে তাদের অঞ্চলে যে ঘটনা শেষ পর্যন্ত নাটকীয়ভাবে ঘটেছে তার পরিণতি মোটেই ভাল নয়। সেই পরিণতির ফলে যে পুলিশের আগমন ও দাপাদাপি চলবে তা তারা অভিজ্ঞতা দিয়ে ভালভাবেই জানে। তাই তারা নিরাপদ দূরত্বে নিজেদের রাখার জন্য দরজা জানালা বন্ধ করে ঘরে ঘরে আশ্রয় নিয়েছে।

সোমসাহেবরা ঘুরতে ঘুরতে রামনগর লেনের ধানক্ষেতি মসজিদের সামনে এসে পৌঁছালেন। ওইখানেই তাঁর সঙ্গে ডিসি (সদর), ডিসি (স্পেশাল ব্রাঞ্চ), গার্ডেনরিচ থানার অফিসার ইনচার্জ ও অন্যান্য অফিসারদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো।

তখনও মেহেতা সাহেব ও তাঁর বডিগার্ডের কোনও খোঁজ নেই কারও কাছে। এমন কী তাঁদের শেষ কোথায় দেখা গিয়েছিল তাও তারা বলতে পারছে না। থমথমে মুখে সোমসাহেব দিশাহারা দুই ডিসি সাহেবকে বললেন, "খুঁজুন কোথায় গেলেন।"

এতবড় বাহিনীর সদস্যের এত জোড়া চোখ তন্নতন্ন করে খুঁজে যাচ্ছে, কিন্তু কোনও সূত্রই তারা পাচ্ছে না, যা দেখে বোঝা যাবে, মেহেতা সাহেব বা তাঁর বডিগার্ড মোকতার আলির কোনও চিহ্ন পাওয়া যায়। দু'দুটো পুলিশ কী তবে কর্পূরের মতো এই অঞ্চল থেকে উবে গেল? কি ভাবে বেপাত্তা হয়ে গেল?

অবশেষে ধানক্ষেতি ময়দানে মির্জা গালিব স্কুলের সামনে একটা হাত পা কাটা পোড়া পুরুষদেহ দেখতে পাওয়া গেল।

সোমসাহেব ও অন্যান্য অফিসাররা সেই পোড়া দেহের সামনে এলেন। পোড়া দেহটা কার তারা প্রথমে আন্দাজ করার চেষ্টা করলেন।

ঘুড়ির কাঠি দিয়ে চিতা সাজিয়ে যে ওই পুরুষদেহটা পুড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল তা বুঝতে কারও অসুবিধাই হয়নি। পোড়ানোর আগে যে সেই দেহ থেকে দুটো হাত ও দুটো পা বাকি শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছিল তাও পরিষ্কার।

পোড়া দেহের পাশেই পড়েছিল আধপোড়া খাকি মোটা কাপড়, একটা পেতলের বোতাম। তাই দিয়ে প্রাথমিকভাবে পোড়া দেহটা যে মেহেতা সাহেবের বডিগার্ড মহঃ মোকতার আলির তা চিহ্নিত করা হলো। কারণ অন্য কোনও ভাবে তখন মোকতার আলিকে চেনার আর উপায়ই ছিল না। তার মুখের সামনের দিকটা সম্পূর্ণ পুড়ে গেছে।

কোন পাশবিক মত্তে হত্যাকারীরা যে মোকতার আলির ওপর এইভাবে তাদের প্রতিহিংসার জ্বালা মিটিয়েছে তা কারও বোধগম্য হলো না। ওই অর্ধদগ্ধ দেহটা দেখে সবাই মূক হয়ে গেল।

গার্ডেনরিচ থানার অফিসার-ইন-চার্জ শিউনাথ সিং-ই স্তব্ধতা ভাঙল। তারই নির্দেশে সাব-ইন্সপেক্টর মৈত্র ও সাব-ইন্সপেক্টর ডি কে সিকদার জি একশ পঁয়ত্রিশ নম্বর ধানক্ষেতির বাসিন্দা আহাদ আলি, এইচ একশ চুয়ান্ন নম্বর, রামনগর লেনের মহঃ জামাল ও ডি দুশ সাতচল্লিশ রামনগর লেনের মনসুর আলিকে সাক্ষী রেখে মোকতার আলির পোড়া দেহ ও চিতার থেকে পাওয়া অবশিষ্টাংশ পোড়া কাঠি কুড়িয়ে তালিকা বানাতে লাগল।

তালিকায় জায়গা পেল কটা ঘুড়ির কাঠি, আধপোড়া খাকি কাপড়ের টুকরো, একটা পোড়া হাড়। একটা পুলিশের ওয়েব বেল্ট ইত্যাদি। কিন্তু তার হেফাজতে থাকা রিভলবার ও গুলির কোনও হদিস পাওয়া গেল না।

মোকতার আলির পোড়া দেহ খুঁজে পাওয়া গেলেও মেহেতা সাহেবের কোনও হদিস নেই। আবার নতুন করে শুরু হলো মেহেতা সাহেবকে খোঁজা।

এতক্ষণ যেটা শুধু সন্দেহের বারান্দায় আটকে ছিল, সেটা এখন বাস্তবের ঘরে ঢুকে পড়ল। সেই সন্দেহটা হচ্ছে, মেহেতা সাহেবকেও সম্ভবত মোকতার আলির মতো দাঙ্গাবাজ দুষ্কৃতীরা খুন করেছে।

সন্দেহটা বাস্তবের ঘরে ঢুকল মোকতারের অবস্থা দেখে। বডিগার্ডকে যখন তারা ওই রকম নৃশংসভাবে খুন করার পর নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার

জন্য জ্বালিয়ে ছাই করে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল তখন নিশ্চয়ই যার বডিগার্ড মোকতার সেই মেহেতা সাহেবকে তারা বাঁচিয়ে রাখবে না।

কিন্তু কী ভাবে কোনখানে তারা মেহেতা সাহেবকে খুন করেছে? খুন করার পর কোথায় তার মৃতদেহ লুকিয়ে ফেলেছে? না কি তাকেও অন্যত্র একই কায়দায় কোনও চিতা সাজিয়ে তার দেহ নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

এমন কী, হতে পারে, দুষ্কৃতীরা মেহেতা সাহেবকে খুন করে এই অঞ্চল থেকেই তার মৃতদেহ অন্যত্র সরিয়ে দিয়েছে। কি যে হয়েছে তার কোনও সামান্যতম সূত্রও দেখা পাওয়া যাচ্ছে না।

অথচ মোকতারের পোড়া দেহ পাওয়ার পর এক ঘণ্টা চলে গেছে, পুরো রামনগর লেন, ধানক্ষেতি, বাতিকল, পাহাড়পুর, মেথরপাড়া ও তার আশপাশ অঞ্চল কয়েক দফা ঘোরা হয়ে গেছে।

ইতিমধ্যে সোমসাহেব শর্মা সাহেবের সঙ্গে যোগাযোগ করে জেনেও নিয়েছেন যে শর্মা সাহেব ধানক্ষেতি মসজিদের কাছে মেহেতা সাহেবকে ছেড়ে এসেছে। তারপর তিনি কোথায় গিয়েছেন তা তিনি জানেন না।

ধানক্ষেতি মসজিদের কাছেই পাওয়া গেছে মোকতারের দেহ। সেখানে মেহেতা সাহেবের কোনও চিহ্ন নেই।

এইভাবে কত ঘণ্টা, কত দিন পুলিশ বাহিনী মেহেতা সাহেবের তল্লাশ করে যাবে। একই এলাকা, একই স্থানে ঘুরে ঘুরে আসছে। আশায়। যদি কিছু দেখা মেলে।

সমগ্র এলাকা আশ্চর্য নীরব। বসন্তের সন্ধ্যা এগিয়ে আসছে। ঘরে ঘরে হাঁস মোরগের ডাক, গরুর চিৎকার ছাড়া আর কোনও প্রাণের স্পন্দন বিশেষ শোনা যাচ্ছে না। এলাকার লোকজন যেন একযোগে প্রতিজ্ঞা করেছে, পুলিশের মুখ তারা আজ কোনও অবস্থাতেই দেখবে না। সন্ধ্যা একবার ঘন হয়ে নেমে গেলে, ওই ঘিঞ্জি, নোংরা অঞ্চল থেকে কিছু খুঁজে বার করা আরও শতগুণ কঠিন হয়ে যাবে।

দিনের আলোতেই যাকে পাওয়া যাচ্ছে না, রাতের অন্ধকারে তাকে কি ভাবে পাওয়া যাবে। একটাই ভরসা, গতদিনের দোল পূর্ণিমার চাঁদ আজও তার পুরো মুখ নিয়ে আকাশ জুড়ে হাসবে। তাকে কোনও দুষ্কৃতী বন্ধ করতে পারবে না। সেই হাসির আলোতে যতটুকু দেখার ততটুকু দেখা যাবে।

যতক্ষণ না নিখোঁজ মেহেতা সাহেবের হদিস পাওয়া যাচ্ছে ততক্ষণ

ওই বাহিনীও ফিরে আসতে পারছে না। একটা জলজ্যান্ত ডিসি পদমর্যাদার অফিসার দিনের আলোয় হঠাৎ বহু লোকের সামনে থেকে নিখোঁজ হয়ে যাবে এবং নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার তিন চার পাঁচ ছয় ঘন্টার মধ্যে তার কোনও খোঁজ কলকাতা পুলিশের কাছে নেই, এই খবর নিশ্চয়ই কলকাতা পুলিশের জন্য গৌরবের নয়। সুতরাং তল্লাশি অব্যাহত রইল।

গার্ডেনরিচ থানা এলাকার পাশে ওয়াটগঞ্জ থানা। ওয়াটগঞ্জ থানা খিদিরপুরের আদিগঙ্গা পর্যন্ত। আদিগঙ্গা পার হয়ে উত্তর দিক থেকে হেস্টিংস থানার এলাকা।

হেস্টিংস থানায় তখন অফিসার-ইন-চার্জ ছিল আয়ুব খান। মেহেতা সাহেব তাঁর বডিগার্ড সমেত যে দুপুর বারোটার পর নিখোঁজ সেই খবর আয়ুবের কাছেও পৌঁছে ছিল। সেখানে যে কমিশনার সাহেব নিজে, দুই ডিসি ও ওই অঞ্চলের আশেপাশের থানার প্রায় সব পুলিশ অফিসার বিরাট বাহিনী নিয়ে মেহেতা সাহেবের খোঁজ করছে সেই খবরও আয়ুবের কাছে পৌঁছেছিল। তার বিশ্বাস ছিল যে, গার্ডেনরিচ থানার অফিসার ও কনস্টেবলদের যে সোর্স এলাকায় আছে, তারা নিশ্চয়ই যথাসময়ে খবর দেবে মেহেতা সাহেবের নিখোঁজ সম্পর্কে। কিন্তু স্থানীয় থানার সোর্সের সম্পূর্ণ জাল যে পুরোপুরি নেতিবাচক হয়ে নীরবতা পালন করবে তা সে অনুমানই করতে পারেনি। কারণ এইরকম হঠাৎ করে সোর্সের জাল ভেঙ্গে পড়তে পারে, এমন ঘটনা অন্তত কলকাতা পুলিশ এলাকায় হয় না।

আয়ুবের কোয়ার্টারে বিকেল সাড়ে তিনটে নাগাদ একটা ফোন এল। ফোন করেছে, গার্ডেনরিচ অঞ্চলের তার একটা পুরনো সোর্স।

গার্ডেনরিচ থেকে পুরনো সোর্সের হঠাৎ ফোন পেয়ে আয়ুব প্রথমে বেশ আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল। প্রথমত, ওর সঙ্গে আয়ুবের বহুদিন যোগাযোগ ছিল না। দ্বিতীয়ত, সেদিন গার্ডেনরিচ অঞ্চল সকাল থেকেই অগ্নিগর্ভ। সেই অগ্নিগর্ভের পরিণতি হিসাবে দুপুর বারোটা থেকে মেহেতা সাহেব ও তাঁর বডিগার্ড নিখোঁজ। তাঁদের খোঁজে ওখানে হাজির পুলিশ কমিশনার সমেত বহু অফিসার। এমন মুহূর্তে ওই সোর্সের কী এমন দরকার পড়ল যে তাকেই ফোন করার। এইসব ভাবনা মুহূর্তের।

আয়ুব তাকে হিন্দিতে প্রশ্ন করল, "কি ব্যাপার?"

সোর্স উত্তরে জানাল, "আমি এলাকার বাইরে থেকে আপনাকে ফোন করছি। শুনুন আটাবাগে কাঁচা নর্দমায় একটা লাশ পড়ে আছে। ওটাই খুব সম্ভবত আপনাদের ডিসি সাহেবের।"

আয়ুব ওর খবর শুনে আরও আশ্চর্য হয়ে জানতে চাইল, "ঠিক কোন জায়গায় বল।"

সোর্স জায়গাটা নির্দিষ্টভাবে জানিয়ে ফোন রেখে দিল। আয়ুব তখনও জানে না মেহেতা সাহেবের কোনও খোঁজ তল্লাশিতে রত বাহিনী পেয়েছে কি পায়নি।

সে সঙ্গে সঙ্গে তার খবর ওয়ারলেসের মাধ্যমে কমিশনার সোম সাহেবকে জানিয়ে দিল। পুরো বাহিনী নিয়ে ওই অঞ্চলে ব্যস্ত অফিসাররা আটাবাগের দিকে ছুটল। তারা জি দুশো একুশ নম্বর বাতিকলের সামনে ও এক উনষাট নম্বর আটাবাগ বাড়ির পেছনের দিকে কাঁচা নর্দমার সামনে ভিড় করে এসে দাঁড়াল।

আয়ুবের সোর্সের খবর একেবারে ঠিক। ওই নর্দমায় একটা মৃতদেহের খোলা পিঠ অল্প দেখা যাচ্ছে, ওটা যে মেহেতা সাহেবের পিঠ তা বোঝার কোনও উপায় নেই।

স্থানীয় থানার দু'জন কনস্টেবল ওই কাঁচা নর্দমায় নেমে সেই মৃতদেহটা নর্দমার ওপরে তুলে নিয়ে এল।

উপস্থিত দর্শকদের মধ্যে মেহেতা সাহেবকে যারা চিনত, তাদের আর বলে দিতে হলো না যে, ওই মৃতদেহটা মেহেতা সাহেবের।

যদিও সর্বাঙ্গে নর্দমার কাঁচা কাদা। সারা শরীরে পরনে শুধু একটা জাঙ্গিয়া। খুনীরা দয়া করে তাকে উলঙ্গ করে রাখেনি। আর দু'পায়ে মোজা। হাত ও পা নারকেল দড়ি দিয়ে বাঁধা। শরীরটাও নর্দমার একটা খুঁটির সঙ্গে বাঁধা ছিল। সম্ভবত গঙ্গার জোয়ারের তোড় ওই নর্দমায় আছড়ে পড়লে খুনীরা ওই খুঁটির সঙ্গে বাঁধা দড়িটা খুলে দিত। এবং জোয়ারের জলে তাঁর দেহটা গঙ্গায় গিয়ে ভেসে ভেসে হারিয়ে যেত।

এই অভিপ্রায়েই তারা দেহটা বেঁধে রেখেছিল। বাঁধা না থাকলে ঠিক সময়ে ঠিক জায়গায় হয়তো তারা দেহটা পাবে না। তাই নির্দিষ্ট করে তারা সময়ের অপেক্ষা করছিল।

উপস্থিত প্রত্যেকেই দেখল, মেহেতা সাহেবের মাথা চৌচির, একটা চোখ খুব সম্ভবত কোনও ভাঙ্গা বোতল দিয়ে উপরে নেওয়া হয়েছে। বুক ও পেটে অসংখ্য ছুরির আঘাত।

ফণী দে ও অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায় কী দেখেছে? ফালতু চাটুকারিতার কী পরিণতি? তারা হয়তো বলবে, "আমরা বললেই কী মানতে হবে, সেটাই বিশ্বাস করে মরণের মাঝে ঝাঁপ দিতে হবে?"

ঠিকই। এমন কোনও মাপকাঠি নেই। কিন্তু মেহেতা সাহেবের সামনে যে কথা বলে চাটুকারিতা করা হতো, সেই একই কথা তারা দুই ডিসি সাহেবদের বলতে গেল কেন? যখন তাঁরা পাহাড়পুর রোডে এসেই রামনগরে ঢুকতে চেয়েছিলেন, যখন মেহেতা সাহেব ও মোকতার আলি প্রাণ বাঁচানোর জন্য প্রাণপণে আশ্রয়ের আশায় রামনগর লেন, বাতিকল লেনে পাগলের মতো ছুটে বেড়িয়েছেন। ওই মুহূর্তে যদি নতুন বাহিনী নিয়ে তারা রামনগর অঞ্চলে প্রবেশ করত তবে সম্ভবত মেহেতা সাহেবরা বেঁচে যেতেন। কারণ দাঙ্গাবাজদের যদি পেছন থেকে বিরাট বাহিনী নিয়ে আক্রমণ করা হতো ছত্রভঙ্গ হয়ে নিজেরাই প্রাণ বাঁচাতে এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়তে বাধ্য হতো। মেহেতা সাহেবরা বেঁচে যেতেন।

এমন কী তখন হানা দিলে দাঙ্গাবাজদের অনেককে হাতেনাতে গ্রেফতারও করা যেত। এই সমস্ত সম্ভাবনাই অঙ্কুরে বিনষ্ট করে দিল ফণী দে ও অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওই "মেহেতা সাহেব পঞ্জাবী, তিনি একাই দশ পনেরো জনের মোকাবিলা করে ঠিক বেরিয়ে আসবেন" মন্তব্যে। আর এই অবাস্তব মন্তব্য দাশগুপ্ত সাহেব এবং বাজপায়ী সাহেব ও উপস্থিত অন্য অফিসাররাও বা কী করে বিশ্বাস করে স্থবির হয়ে রইলেন, সেটাও আশ্চর্যের। তারা কী এক লাঠির চেয়ে দশ লাঠির জোর অনেক বেশি এই সাধারণ জ্ঞানটুকুও সেই মুহূর্তে ভুলে গিয়েছিলেন?

লড়াইয়ের ময়দানে সিদ্ধান্তের ভুলে যে কত বড় মারাত্মক ক্ষতি হয় তা তাঁরা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করছেন। মেহেতা সাহেব প্রায় উলঙ্গ অবস্থায় আটাবাগের কাঁচা নর্দমার ধারে খুন হয়ে শুয়ে আছেন। কারও লাগামহীন কথা বা দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা কিংবা মূর্খের মতো প্ররোচনায় প্রভাবিত হয়ে যে কোনও সিদ্ধান্ত অন্তত যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে নেওয়া উচিত নয় তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে মেহেতা সাহেব শুয়ে আছেন।

মেহেতা সাহেবের মৃতদেহ উদ্ধার করতে পেরে ওখানে উপস্থিত অফিসাররা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। এবার তাঁরা ব্যস্ততা দেখাতে শুরু করলেন।

কলকাতা পুলিশের লাশবহনকারী গাড়ি ডেকে পাঠানো হলো। সঙ্গে ফটোগ্রাফাররা এলেন। মেহেতা সাহেবের ও মোকতারের হাত পা কাটা পোড়া দেহের ফটো তোলা হলো। এইচ একশ এগারো নম্বরের বাসিন্দা শেখ সিকান্দার ও নবাব হোসেনকে সাক্ষী রেখে মেহেতা সাহেবের দেহ লাশবহনকারী গাড়িতে তোলা হলো।

ধানক্ষেতি ময়দান থেকে মোকতারের লাশের অংশগুলো নিয়ে এসে সেগুলোও ওই গাড়িতে তোলা হলো।

মেথরপাড়ায় যে মুসলিম মৃতদেহটা পাহারা দেওয়ার জন্য সকাল এগারোটা নাগাদ স্থানীয় থানার দুই কনস্টেবলকে মেহেতা সাহেব দায়িত্ব দিয়ে গিয়েছিলেন, তারা শর্মা সাহেবের সঙ্গে পথপ্রদর্শকের ভূমিকা নিয়ে অনেক আগেই স্থান ত্যাগ করে চলে গিয়েছে। যে সাব-ইন্সপেক্টর আশিস গোপ, সাব-ইন্সপেক্টর সাগর গুপ্ত ও সার্জেন্ট শিবানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়কে ওই মৃতদেহ ওখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বলেছিলেন তারাও বা কোথায় চলে গেল? তিন তিনজন অফিসার এতক্ষণ ধরে একটা মৃতদেহ সরিয়ে নিয়ে যেতে পারল না? অথচ সেই মৃতদেহটাই পাওয়া গেল ফতেপুর ভিলেজ রোডে। কে বা কারা মেথরপাড়া থেকে নিয়ে এসে ফতেপুর ভিলেজ রোডে ফেলে দিয়ে চলে গেছে কেউ জানে না।

সেই মৃতদেহটাও কলকাতা পুলিশের মর্গে পোস্ট মর্টমের জন্য মেহেতা সাহেবদের সঙ্গে লাশবহনকারী গাড়িতে তুলে দেওয়া হলো। গার্ডেনরিচ থানার কনস্টেবল হলধর মিশিরকে দায়িত্ব দিয়ে লাশবহনকারী গাড়িটা অফিসাররা ছেড়ে দিল।

মেহেতা সাহেব চললেন মর্গের ডাক্তারের হাতে পরীক্ষিত হতে কিভাবে তিনি খুন হয়েছেন, তা বাকি পৃথিবীকে জানাতে।

তখন বিকেল পাঁচটা। বসন্তের সন্ধ্যা নেমে আসছে। শান্ত হচ্ছে পৃথিবীর এই অংশ। শান্ত হচ্ছে গার্ডেনরিচ। ঘরে ঘরে চুপচাপ, টুক করে জ্বলে উঠছে আলো। প্রাণের। এবার ওই অঞ্চলের বাসিন্দারা মশগুল হবে সারাদিনের ঘটনা নিয়ে গল্পগুজবে। রান্নাঘরে জ্বলে উঠবে উনুন। তাতে হাঁড়ি বসবে। রান্না হবে। সেই দরদী হাতের রান্না খাওবার খেয়ে বেঁচে থাকবে মানুষ। কত আয়োজন।

মেহেতা সাহেব ও মোকতারের মৃত্যুতে তাদের কি যায় আসে? যারা বেঁচে আছে, তারা তো দীর্ঘ জীবন বেঁচে থাকার আয়োজন করবেই। মৃত্যু নিয়ে আলোচনা করা যায়। ব্যস। তার বেশি কিছু নয়। মৃত্যু তো একদিন তাদেরও গ্রাস করবে, তখন বাকি মানুষ কী বাঁচার আয়োজন থেকে বিরত থাকবে? ঠিক। এইভাবেই মনুষ্যসমাজ বেঁচে আছে। বেঁচে থাকবে এভাবেই।

মেহেতা সাহেব তো মর্গে চলে গেলেন, কিন্তু তাঁর এভাবে মৃত্যু নিয়ে কলকাতা পুলিশে শুরু হলো তোলপাড়। খুব স্বাভাবিক। একজন ডিসি দুষ্কৃতীদের হাতে খুন হয়ে গেলে তো তোলপাড় হবেই। এমন ঘটনা তো কলকাতা পুলিশের ইতিহাসে নেই।

পরদিন যে কলকাতা শহরের সমস্ত পত্রপত্রিকা এই অকল্পনীয় খুন নিয়ে কলকাতা পুলিশকে ছিঁড়ে খাবে, তাতে কারও সন্দেহ নেই। সেই সব

লেখায় যে কত কল্পনার ডানা মেলে, কত ভাবে শাখা-প্রশাখা পল্লবিত করে গল্প বানিয়ে পাঠকদের কাছে পৌঁছাবে তাও অকল্পনীয়।

সেইসব গল্পকে ধামাচাপা দিয়ে সত্য প্রকাশ করার একমাত্র উপায় হলো হত্যাকারীদের যত দ্রুত সম্ভব গ্রেফতার করে আদালতে পেশ করা। সেখানে গাফিলতি হলেই পত্রপত্রিকাকে আরও চেপে ধরার সুযোগ করে দেওয়া। কিন্তু হত্যাকারীরাও তো আর চুপ করে বসে নেই। তারাও গ্রেফতার এড়াতে ডানা মেলে দেবে। সেই ডানা মেলে দেওয়ার আগেই তাদের খাঁচায় বন্ধ করার দরকার।

সেদিন রাতেই লালবাজারে উচ্চপদস্থ অফিসাররা ঠিক করে ফেললেন, এই খুনের মামলার তদন্ত স্থানীয় থানার হাত থেকে নিয়ে লালবাজারের গোয়েন্দা দফতরের হোমিসাইড শাখার হাতে দায়িত্ব দেওয়া হবে।

গার্ডেনরিচ থানার অফিসারদের ওপর পুলিশ কমিশনার সোম সাহেব বা অন্য কোনও উচ্চপদস্থ অফিসারের আর আস্থা নেই। কারণ তারা 'একটা সম্ভাব্য দাঙ্গা হতে পারে' এই আগাম খবরও রাখতে পারেনি। দ্বিতীয়ত, দাঙা লাগার পর সেটা প্রাথমিক অবস্থাতেই দমন করতে পারেনি। তৃতীয়ত, 'পুলিশের গাড়ি থেকে তেল নিয়ে বাড়ি জ্বালানো হয়েছে' এই গুজব থামাতে ব্যর্থ হয়েছে। চতুর্থত, মেহেতা সাহেব ও তাঁর বডিগার্ডকে ছেড়ে দিয়ে থানার অফিসাররা নিরাপদ জায়গায় চলে এসেছে। অথচ তারা ভালভাবেই জানে, মেহেতা সাহেব ও মোকতার ওই এলাকার অলিগলি চেনেন না। তাঁরা খাঁচায় আটকে যেতে পারেন। পঞ্চমত, এমন যখন অবস্থা, তখন তারা অতিরিক্ত সময় দুষ্কৃতীদের দিয়ে, অনেক পরে রামনগর লেনের দিকে হানা দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে। ষষ্ঠত, নিজেদের সোর্সের পরিকাঠামো সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ, সোর্সদের থেকে মেহেতা সাহেব ও তার বডিগার্ডের মৃতদেহ কোথায় পড়ে আছে, তাও জানাতে পারেনি, অথচ বহুদূরে থেকে হেস্টিংস থানার অফিসার-ইন-চার্জ আয়ুব খান ওই খবরটা পেয়ে গেল।

স্বাভাবিক ভাবেই এইসব কারণগুলি গার্ডেনরিচ থানার অফিসারদের বিরুদ্ধে গেল। তদন্ত ও মামলা ডিডি ডিসি সফি সাহেবের মাধ্যমে গোয়েন্দা দফতরে চলে এল।

যে কোনও থানা এলাকায় এই রকম খুন হলে সেই থানার অফিসারদের চুল ছিঁড়ে ফেলার উপক্রম হবে। কারণ তার প্রধান দায়ের ভাগ তাদেরই নিতে হবে। তাদের দিকেই সবাই আঙুল তুলে বলবে, "ওরাই প্রধানত দায়ী। ওদের ব্যর্থতার জন্য এমন একটা ঘটনা ঘটল।"

গার্ডেনরিচ থানার অফিসারদেরও সেই রকম অবস্থা হলো। তার ফলে

তারাও তাদের ব্যর্থতা ঢাকতে প্রায় পাগলের মতো যাকে পারল তাকেই গ্রেফতার করে থানার হাজতে নিয়ে এসে ঢুকিয়ে দিল। প্রায় সত্তর পঁচাত্তর জন মানুষকে গ্রেফতার করার ফলে হাজতে আর জায়গা হলো না। অনেককে থানার ভেতরের সরু করিডোরে বসিয়ে রেখে দিল।

এভাবে তো আর সমস্যার সমাধান হয় না, উল্টে এলাকার নিরীহ লোকেরা পুলিশের বিরুদ্ধে চলে যায়। তাতে খবরের যোগান কমে যাওয়ার একশ ভাগ সম্ভাবনা থাকে।

শুধু তাই নয়, পুলিশ যে ব্যাপকভাবে গ্রেফতার করছে সেই খবর আসল অপরাধীদের কানে পৌঁছে গেলে তারা আর এলাকার ধারে কাছে আসবে না। প্রয়োজনে যোগাযোগও ছিন্ন করে দেবে। ফলে আসল অপরাধীদের গ্রেফতার করতে বিলম্বিত হয়ে যাবে।

সত্তর পঁচাত্তর জনকে গ্রেফতারের ফলে রামনগর, ধানক্ষেতি এলাকায় আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে ঠিকই কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। কারণ এত লোককে ঠিকমতো জিজ্ঞাসাবাদ করে আসল অপরাধীদের নাম ও আস্তানা জানা যাবে না। ধৃত এত লোককে কখন এবং কতক্ষণ ধরে জেরা করা যাবে ?

তার থেকে এই অঞ্চলের পুরনো গুণ্ডা ও অপরাধ জগতের লোকদের খবর ও গ্রেফতার করলেই দাঙ্গায় অংশগ্রাহীদের নাম অনায়াসে পাওয়া সম্ভব। গুণ্ডাদের যদি বাড়িতে না পাওয়া যায় তবে তাদের সন্দেহের তালিকায় অবশ্যই রাখা উচিত। কারণ সাধারণভাবে কোনও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হলেই গুণ্ডারা তার সুযোগ নিয়ে লুঠতরাজে নেমে যায়। এটা তাদের রোজগারের একটা রাস্তা। আর সেই গুণ্ডাদের গ্রেফতার করতে পারলেই অন্য দাঙ্গাকারীর নাম পেতে অসুবিধা হওয়ার কারণ নেই।

গার্ডেনরিচ থানার অফিসারদের কাছেও যে দাঙ্গায় অংশকারী ও খুনীদের কারও নাম এল না, তেমন নয়, তারাও শুনল দাঙ্গায় নেতৃত্বকারীদের নাম। কিন্তু তারা প্রত্যেকেই এলাকা ছেড়ে দুপুরের মধ্যে পালিয়েছে।

ফলে সেই রাতে তারা একজন প্রকৃত খুনীকেও গ্রেফতার করতে পারল না। সোর্সরাও ভয়ে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে অফিসারদের এড়িয়ে চলতে লাগল। স্থানীয় থানার পুলিশের সঙ্গে কাউকে দেখলে সেও দাঙ্গাকারীদের শত্রুতে সঙ্গে সঙ্গে পরিণত হয়ে যাবে সেটা তারা নিশ্চিতভাবে জানত। এবং তারা যে প্রচণ্ড প্রতিহিংসাপরায়ণ তাও তারা জানে। ব্যর্থতার উপর আরও ব্যর্থতা চেপে বসল গার্ডেনরিচ থানার কাঁধে। তবে ওরা চেষ্টার কোনও ত্রুটি রাখল না।

পরদিন উনিশে মার্চ সকালবেলা ডিসি ডিডি সফি সাহেব তখনকার হোমিসাইড বা মার্ডার ডিপার্টমেন্টের অফিসার-ইন-চার্জ দীপক রায়কে ডেকে মেহেতা সাহেব ও মোকতার আলির খুনের তদন্তের ভার সরকারী ভাবে তুলে দিলেন। আলোচনার পর ঠিক হলো ওই শাখার সাব-ইন্সপেক্টর সরোজ কুমার ভট্টাচার্য এই মামলার মূল তদন্তকারী অফিসার হিসাবে থাকবে। এবং তাকে সাহায্য করবে পুরো গোয়েন্দা দফতর।

সরোজকে এই জন্যই এই মামলায় দায়িত্ব দেওয়া হলো যে, সে প্রচণ্ড সাহসী, একগুঁয়ে, বুদ্ধিমান। যে গুণগুলির একান্ত দরকার এই মামলা পরিচালনা করার জন্য। কারণ মামলার অপরাধীরা কেউ নিরামিষী নন।

আমি তখন ডাকাতি দমন শাখার দায়িত্বে। আমাদের কাছেই প্রথম খবর এল দাঙ্গাবাজদের একটা ছোট দল কোনস্থানে আস্তানা গেড়ে আড্ডায় মত্ত। আমার ডাকাতি দমন শাখারই দুই অফিসার উমাশংকর লাহিড়ী ও সুধীশ নাগ আরও ফোর্স নিয়ে চলে গেল ওই অঞ্চলে। লাহিড়ী ও নাগ আগে ওই থানায় ছিল বলে ওরা ওই অঞ্চল খুব ভালভাবে চেনে। তাই ওদের নেতৃত্বেই ফোর্স পাঠানো হলো।

আমরা যখন গোপন খবর পেয়েছি তখন দুপুর দুটো। খবর পাওয়ার পর প্রস্তুত হতে যতটুকু সময় লেগেছে। তারপরই লাহিড়ী ও নাগ রওনা দিয়েছে। তাদের হানা দেওয়ার জন্য যাত্রার খবর এমন কী গার্ডেনরিচ থানাকেও আগাম জানান দেওয়া হলো না।

লাহিড়ী ও নাগ গোপন সূত্রের খবর অনুযায়ী সুরিনাম জেটির নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে প্রথমেই ঘিরে ফেলল। ঘড়িতে তখন তিনটে। জেটি সংলগ্ন একটা ছোট ঘরে তখন আসামিরা মত্ত অবস্থায় তাস খেলাতে ব্যস্ত। তারা যে ঘেরাওয়ের মধ্যে পড়ে গেছে প্রথমে বুঝতেই পারেনি। যখন বুঝল তখন তাদের আর পালানোর উপায় নেই। অফিসার ও কনস্টেবলেরা রিভলবার উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

প্রথম যে আসামি গ্রেফতার হলো, তার নাম শেখ নান্নে ওরফে নান্নে কসাই। বাড়ি, পাহাড়পুর রোডে। তারপর গ্রেফতার হলো রামনগর লেনের গোরাচাঁদ ওরফে জামিন আহমেদ। তৃতীয়জন ২৭রা তালাওয়ের শেখ নুরু। তারপর রামনগর লেনের মহঃ হালিম। সবশেষে চিড়িমার মহল্লার ওয়েবুদ্দিন ওরফে ওয়েব।

লাহিড়ী ও নাগ ধৃত ওই পাঁচজন আসামিকে গাড়িতে তুলে যখন গার্ডেনরিচ থানায় এসে পৌঁছাল তার অনেক আগেই থানায় পৌঁছে গেছে ডিসি ডিডি

সফি সাহেব, দীপক রায়, সরোজ কুমার ভট্টাচার্য সহ আরও অফিসার ও কনস্টেবল।

তাঁরা গিয়েছেন মেহেতা সাহেব খুনের মামলা গোয়েন্দা দফতরের হাতে তুলে দিতে। সেই সময় চারটে নাগাদ লাহিড়ী ও নাগ ওই থানায় নিয়ে এল ওই ধৃত পাঁচজন আসামিকে।

সন্ধেবেলা গোয়েন্দা দফতরের অফিসাররা আসামি ও অন্যান্য কাগজপত্র নিয়ে গার্ডেনরিচ থানা থেকে বেরিয়ে রওনা দিল লালবাজারের উদ্দেশে।

সাতটা সাড়ে সাতটা নাগাদ সফি সাহেব আসামি ও অফিসারদের নিয়ে লালবাজারে এসে পৌঁছালেন। এরপর শুরু হলো জিজ্ঞাসাবাদ।

আচ্ছা একজন ডিসি ও তাঁর বডিগার্ড খুনের মামলার প্রথম প্রকৃত আসামিকে গ্রেফতার করে আনলে জিজ্ঞাসাবাদটা কেমন হবে, কোথা থেকে শুরু হবে? তার জন্য কী ফুলের দোকান থেকে তোড়া কিনে নিয়ে আসবে পুলিশ অফিসাররা নাকি বাকি অন্য আসামিদের খবর ও ঘটনার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ পাওয়ার জন্য চাপ দেবে? চাপ না দিলে কী তারা ভদ্রলোকের মতো সব কথা বলে দেবে?

জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হলো। প্রথম রাতেই নান্নে কসাই স্বীকার করল। সে যে ওই দাঙ্গায় অংশ নিয়েছে শুধু সেটুকু স্বীকার করল। অংশগ্রহণকারী ক'জনের নামও জানাল।

অন্য আর আসামিরা কেউ কিছু স্বীকার করল না। অবশ্য চাপও তাদের ওপর তেমনভাবে সরোজরা দেয়নি।

পরদিন আরও ভালভাবে শুরু করার জন্য আসামিদের সেন্ট্রাল লকআপে পাঠিয়ে দেওয়া হলো।

একটা কথা নান্নের কাছ থেকে জানা গেল যে অন্য আসামিরা গার্ডেনরিচ এলাকা ছেড়ে যে যার মতো পালিয়েছে। অর্থাৎ সব আসামিদের ধরতে আমাদের প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে হবে এবং শেষমেষ প্রত্যেককেই যে গ্রেফতার করতে সক্ষম হব। তারও নিশ্চয়তা নেই।

গুরুত্বের জন্য কুড়ি তারিখ সকালেই শুধুমাত্র এই মামলার তদন্তের ব্যাপারে ততকালীন ডিসি ডিডি সফি সাহেব একটা আলাদা টিম তৈরি করলেন। এসি (ডিডি) সনৎ কুমার গুপ্তকে পরিচালনার দায়িত্ব দিয়ে সেই টিমের অন্য সদস্যরা হলো মার্ডার সেকশনের অফিসার-ইন-চার্জ দীপক রায়, তদন্তকারী অফিসার সরোজ কুমার ভট্টাচার্য, সাব-ইন্সপেক্টর সমীর গঙ্গোপাধ্যায়, স্বদেশ রায়চৌধুরি, ডাকাতি দমন শাখার সব-ইন্সপেক্টর উমাশংকর লাহিড়ী,

সুধীশ নাগ ও অন্য শাখার ইন্সপেক্টর পার্বতী চট্টোপাধ্যায়, সাব ইন্সপেক্টর টি পি দত্ত, অমূল্য দাশ, এম এ সালে ও এই মামলার তদন্তের জন্য গোয়েন্দা দফতরে সাহায্যকারী হিসাবে নিয়োজিত স্পেশাল ব্রাঞ্চের সাব-ইন্সপেক্টর দিলীপ দাশগুপ্ত।

টিম গঠন করার পর ঠিক হলো সেদিনই গার্ডেনরিচে গিয়ে দাঙ্গার ও হত্যার মূল স্থানগুলোতে তদন্তের জন্য যাওয়া হবে।

দুপুর আড়াইটার সময় সফি সাহেব পুরো টিম ও ফোর্স নিয়ে লালবাজার থেকে গার্ডেনরিচের উদ্দেশে বার হলেন। আমিও সফি সাহেবের ইচ্ছায় ওই টিমের সঙ্গে সামিল হয়ে গাড়িতে উঠে বসলাম।

আমরা যে গার্ডেনরিচ অঞ্চলে হত্যার স্থান পরিদর্শন করতে যাচ্ছি সেটা গার্ডেনরিচ থানায় ওসি শিউনাথ সিংকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। সে পাহাড়পুর রোডে আমাদের দলের জন্য অপেক্ষা করছে।

তিনটে বাজার সামান্য পরে আমরা যথানির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে দেখলাম, শিউনাথ তার থানার দু'জন সাব-ইন্সপেক্টর ও চারজন কনস্টেবল নিয়ে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে।

পাহাড়পুর রোডে যেখানে দাঙ্গার দিন ডিসি (সদর) সুবিমল দাশগুপ্ত ও ডিডি (স্পেশাল ব্রাঞ্চ) দীনেশ বাজপায়ী বিরাট পুলিশ বাহিনী নিয়ে অযথা অপেক্ষা করে দাঙ্গাবাজদের খুন করার জন্য সময় দান করেছিল ঠিক সেইখানে আমরা আমাদের গাড়িগুলো রেখে রামনগর লেনের ভেতরে হাঁটতে হাঁটতে এসে ঢুকলাম।

মাত্র দু'দিন আগে ওই ফতেপুর ভিলেজ রোড ও তার সংলগ্ন অঞ্চলে যে কি ভয়ানক ধরনের নারকীয় কাণ্ড ও নৃশংসভাবে খুন সংগঠিত হয়েছে তা দেখে বোঝার উপায় নেই।

নিস্তরঙ্গ, নির্বিকার। অবশ্যই সেটা উপরে উপরে। একটা চাপা উত্তেজনা এবং ভয় যে বিরাজ করছে তা শিশুদের মুখগুলি দেখলেই বোঝা যাচ্ছে। তারা আমাদের বেশ বড় বাহিনীকে ওদের সরু সরু গলিতে হেঁটে হেঁটে পর্যবেক্ষণ করতে করতে যেতে দেখে খেলা ফেলে বড় বড় চোখে ভয়ার্ত দৃষ্টিতে দেখেই টুক করে অন্তরালে চলে যাচ্ছে।

বাড়ির বড়রা কাজ ফেলে একবার আমাদের দেখেই দরজা জানালা বন্ধ করে সীমানা টেনে দিচ্ছে।

আমাদের পথপ্রদর্শকের কাজটা করছে গার্ডেনরিচ থানার কর্মচারীরা। তারা এই অঞ্চল চেনে। তারাই আমাদের মিছিলের সামনে। হায়রে, এই কাজটা

যদি তারা দু'দিন আগে রবিবার আঠেরোই মার্চ করত তবে মেহেতা সাহেব ও তার বডিগার্ড মোকতার আলির জীবন এভাবে অকালে এবং অহেতুক যেত না। কিন্তু ঘটনাচক্রে সেদিন তারা অসতর্ক হয়ে মারাত্মক ভুল করার ফলেই দুর্ঘটনা যা ঘটার ঘটে গেছে। যা আর কোনওভাবে শুধরে নেওয়া সম্ভব নয়।

আমরা হাঁটতে হাঁটতে রামনগর লেনের ধানক্ষেতি মসজিদটার সামনে এসে দাঁড়ালাম। রামনগর লেনটা পশ্চিম থেকে এসে পুবের দিকে চলে গেছে। ছোট্ট লাল রঙের মসজিদটা রাস্তার উত্তর দিকে। মসজিদের দক্ষিণ দিকে রাস্তার ধারে একটা কোলাপসিবল গেট। পেছনের অর্থাৎ উত্তর দিকেও একটা কোলাপসিবল গেট। সেদিকেই খানিকটা খোলা জায়গা, তারই এককোণে দুটো ঘর। যে ঘরে মসজিদের ইমাম ফারহাদ জুভেরি বাস করে।

এই সেই মসজিদ যেখানে সেদিন মেহেতা সাহেব তার বাহিনী নিয়ে দাঙ্গাবাজদের আক্রমণের হাত থেকে বাঁচার আশায় আশ্রয় নিয়েছিলেন।

কিন্তু ইদ্রিস, নসরু, দিলওয়ার, রহমৎ, হোসেন চৌধুরিদের হল্লা ও বোমাবাজির সঙ্গে মসজিদ থেকে বেরিয়ে আসার দাবির কাছে ইমাম আত্মসমর্পণ করে তাঁদের বার করে দেয়। এবং তখনই কে কে শর্মা সমেত বাহিনীর ছ'জন কনস্টেবল থেকে মেহেতা সাহেব ও মোকতার আলি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

ভাবলাম, এ কোন ধর্মের স্থান, যেখানে শিকারীর হাত থেকে শিকারকে আশ্রয় দেয় না, যেখানে নিরাশ্রয়কে আশ্রয় এবং নিরাপত্তা দেয় না। ধর্মস্থানগুলি কি শুধু উপাসনা ও আরতির জন্য? সে কি মানুষের হিতের জন্য নয়? তা যদি না হয়, তবে ধর্মস্থান প্রতিষ্ঠা করার কিসের প্রয়োজন? মানুষেরই জন্য ধর্ম। ধর্মের জন্য মানুষ নয়। এই সত্যটা কেন বিলুপ্তির পথে? এই উপলব্ধিটা কবে প্রত্যেকের মনে স্থান পাবে?

আসলে ধর্মস্থানগুলি তো বানায় মানুষ, পরিচালনাও করে মানুষ। সেই মানুষেরই ইচ্ছা অনুযায়ী চলে ধর্মের আচার-বিচার। সেখানে ঈশ্বরের স্থান কোথায়? ঈশ্বর সেখানে নিমিত্ত মাত্র।

মেহেতা সাহেবরা মসজিদে আশ্রয় পেলেও হয়তো দাঙ্গাবাজরা তাঁদের মসজিদ থেকে টেনে নিয়ে গিয়ে খুন করত, তেমন হলে, ধানক্ষেতি মসজিদটা অন্তত ধর্মস্থান হিসাবে সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখতে পারত। নিজের প্রতিষ্ঠার মর্যাদা রাখতে পারত। কিন্তু মর্যাদা রক্ষা করা যার দায়িত্ব সেই তো মর্যাদা রক্ষার চেয়ে নিজের জীবন রক্ষার তাগিদ অতিরিক্ত ভাবে অনুভব করল।

ইমাম জুভেরিকে খুঁজে পাওয়া গেল না। তখন তার সাক্ষ্য-বিবরণও লিপিবদ্ধ করা গেল না। অর্থাৎ আবার এসে ওর থেকে বিবরণ নিতে হবে।

এবার আমরা এগিয়ে গেলাম সেই ধানক্ষেতি ময়দান বা মুন্নু ময়দানের দিকে, যেখানে মোকতার আলিকে খুন করে দিলওয়ার, রহমত, নাসিমরা ওর মৃতদেহ জ্বালিয়ে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চেয়েছিল।

সেই কুখ্যাত ময়দানের উত্তরপূর্ব কোণে একশ বাই এক ধানক্ষেতি বাড়ির সামনে শিউনাথ সিং আমাদের নিয়ে গিয়ে দাঁড় করাল, ঠিক যেখান থেকে মোকতার আলির হাত পা কাটা আধপোড়া দেহটা উদ্ধার করা হয়েছিল। আমরা দেখলাম, মাঠের ওই জায়গার মাটি কালো হয়ে পুড়ে গেছে। তার চারপাশে তখনও ছড়ানো বেশ কিছু ঘুড়ি বানানোর আধপোড়া কাঠি। নিজেদের অজান্তে তারা ওই কুখ্যাত চিতার সাক্ষ্য বহন করছে।

মাঠে আমরা বেশ খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। যেন অজান্তে একটা প্রার্থনা সভা। সফি সাহেব ক'টা আধপোড়া ঘুড়ির কাঠি কুড়িয়ে দেখলেন। প্রায় পনেরো মিনিট ধানক্ষেতি ময়দান ও তার চারপাশটা দেখে আমরা চললাম, বাতিকল সেকেন্ড লেনের দিকে।

মেহেতা সাহেব যে গলি দিয়ে ছুটে ছুটে পালাতে চেয়েছিলেন আমাদেরও সেই গলি দিয়ে শিউনাথ সিং নিয়ে চলল।

অবশেষে সাড়ে চারটে নাগাদ আমরা বাতিকল সেকেন্ড লেনে এসে পৌঁছালাম। রাস্তাটা উত্তর দিক থেকে দক্ষিণ দিকে চলে গেছে। আমাদের গন্তব্যস্থান জি দুশো বাইশ নম্বর বাড়িটা। যে বাড়ির ভেতর মেহেতা সাহেব হোসেন চৌধুরি, নাসো, লোকমানদের হাতে খুন হয়েছেন। আমরা নির্দিষ্ট বাড়ির সামনে দাঁড়ালাম। রাস্তাটার উত্তর দিকে দক্ষিণমুখী একটা টালির ছাউনি দেওয়া ইংরাজী অক্ষরের এল ধরনের বাড়ি। বাড়িতে অনেকগুলো ঘর। এই বাড়িরই একটা ঘরে আমাদের রিজার্ভ ফোর্সের কনস্টেবল আবদুল লতিফ খান থাকে। বাড়ির একটাই সদর দরজা। ওটা দিয়ে ভেতরে ঢুকলেই একটা ছোট উঠোন। পশ্চিমদিকে ক'টা পুবমুখী ঘর। উত্তরদিকে ক'টা দক্ষিণমুখী ঘর। পুবদিকেই একটা ছোট খাটাল। ওখানে চারটে গরু। উত্তর-পুব কোণে একটা ছোট ঘেরা জায়গা। ওটাই গোসলখানা। এই বাড়ির মহিলারা ওই ঘেরা জায়গাটাই স্নানাগার হিসাবে ব্যবহার করে। ওখানেই মেহেতা সাহেব খুন হয়েছেন।

গোসলখানার মেঝেতে রক্তের আর কোনও চিহ্ন নেই। দেওয়ালে আছে। ওইগুলো ছাড়িয়ে নিয়ে ফরেনসিকে পাঠাতে হবে।

খুনের সময় বাড়িতে ছিল লতিফ খানের ছেলে হাদিশ, তার এক কর্মচারী ও লতিফের স্ত্রী কাফিয়া বিবি। সরোজ, স্বদেশ, সমীর ওদের বিবরণ লিখছে। আমরা দাঁড়িয়ে শুনছি। ওই গোসলখানায় শেষ আশ্রয় হিসাবে মেহেতো সাহেব ঢুকেছিলেন এবং তারপর অত্যাচারীদের নির্মম আঘাতে আঘাতে তিনি ওই গোসলখানাতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

ওদের বিবরণ লেখা শেষ হলে, আমরা বাতিকলেই মহঃ নউমুল্লার বাড়ি গেলাম। যেখানে মোকতার আলি আশ্রয়ের আশায় গিয়ে তাদের পায়খানায় টয়লেটে ঢুকে বসেছিল।

মহঃ নউমুল্লা, তার স্ত্রী আয়েষা বিবি, মেয়ে আলমারা বেগম, অঞ্জুমান বেগম, হাসানারা বেগম বাড়িতেই ছিল। তাদের কাছ থেকেও সেদিনের ঘটনার একটা দৃশ্যের বর্ণনা আমরা পেলাম। কিভাবে মোকতার এসেছিল, সদর দরজা দিলওয়ার, নাসিম, রহমতরা কিভাবে ভেঙ্গে বাড়ি তছনছ করে মোকতারকে পায়খানা থেকে টানতে টানতে নিয়ে গিয়েছিল সবই আমরা নউমুল্লার কাছ থেকে জানতে পারলাম।

সরোজ যখন বৃদ্ধ নউমুল্লার কথা লিখছে, আমরা তখন আশেপাশের দু'একটা বাচ্চা ছেলেকে সেদিনের ঘটনার বিবরণ জানতে চাইলাম। ঘটনার কিছু কিছু অংশ তারা বলল ঠিকই। কিন্তু ভয়ে তারা দু'চারজন আততায়ীর নাম ছাড়া বেশি নাম জানাল না।

মহঃ নউমুল্লার বাড়ি থেকে সামান্য দূরত্বেই ওই বাতিকলেই দিলওয়ার হোসেনের বাড়ি। ওই বাড়িতে তল্লাশির জন্য আমাদের একটা দল গেল। ফিরে এল। খুব স্বাভাবিক কারণেই দিলওয়ার উধাও।

বাড়িতে এমন কী কোনও অস্ত্রশস্ত্রও পাওয়া গেল না। সেসব কী আর সাজিয়ে রেখে দেবে?

সন্ধে নেমে এসেছে। আলো জ্বলে গেছে। সফি সাহেব ও এসি ডিডি (আই) সনৎ গুপ্ত লালবাজারে ফিরে গেছেন। আমরা তখনও একে ওকে ধরে রবিবারের ঘটনার চিত্রটা নিজেদের কাছে পরিষ্কার করতে চাইছি। চাইছি সাক্ষী যোগাড় করতে।

দীপকরা একটা ওষুধের দোকানে ঢুকে দোকানের পুষ্প পাল নামে এক মহিলার সাক্ষ্য নিচ্ছে। শ্রীমতী পালেরই ওই ওষুধের দোকানটা। তিনি দোকান থেকেই দাঙ্গার আংশিক চিত্র দেখেছেন।

রাত প্রায় সাড়ে আটটা। খুনের স্থান পরিদর্শন ও সামান্য কিছু টুকরো টুকরো দৃশ্যের বিবরণ ছাড়া আমরা বিশেষ কিছু সংগ্রহ করতে পারলাম না।

শিউনাথ সিং জি দুশো সাতচল্লিশ রামনগর লেনে পুটুন ওরফে গোলামের বাড়িটা দেখাল। পুটুন রবিবারের ঘটনার অন্যতম আসামি। হাদিশ ও আরও ক'জনের মুখে ওর নামটা বারবার এসেছে।

পুটুনকে যে ওই বাড়িতে পাওয়া যাবে না, আমরা প্রত্যেকেই তা জানি, তবু সরোজ, সমীররা একবার ওই বাড়িতে গোঁতা দিল। বাড়ির মালিক মনসুর আলির সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হলো। তিনিই জানালেন, ঘটনার পর পরই পুটুন তার পরিবার নিয়ে ঘরে ছেড়ে পালিয়েছে। ঘটনার বিবরণ তার কাছে যা পাওয়া গেল সেটাও লিপিবদ্ধ করা হলো।

রাত সাড়ে ন'টার সময় জি একশ ছেচল্লিশ নম্বর ধানক্ষেতিতে নসরু খান ও তার ভাই নাসিম খান ওরফে কাল্লুর বাড়িতে হানা দিলাম। ফাঁকা। পালিয়েছে। অর্থাৎ ওদের নাম যে অপরাধীদের তালিকার শীর্ষে আছে, সেটা সত্যি।

কাছেই জি একশ চুয়ান্ন নম্বর ধানক্ষেতিতে ভাড়া থাকে রহমৎ। সেখানেও আমরা গেলাম। রহমতের বাবা আদিক পানওয়ালা পরিষ্কার জানিয়ে দিল, রবিবার দুপুর থেকেই তার ছেলে বেপাত্তা। কোথায় গেছে জানে না। জানলেও সে আমাদের বলবে না তা আমরা খুব ভাল ভাবেই জানি। তবু আমাদের একবার নিয়মমাফিক প্রশ্ন করতে হয়। করলাম, চলে এলাম।

ওখান থেকে আমরা মেথরপাড়ায় এলাম। মেথরপাড়ার জে বিরানব্বই-এর এ নম্বর বাড়িটা রবিবারের দাঙ্গার অন্যতম নেতা ইদ্রিসের বাড়ি। ইদ্রিস একসময় ডকের চোর ছিল। জাহাজের খোলের ভেতর যেসব জিনিস আমদানি হতো, সেইসব জিনিস সে চুরি করে নিয়ে আসত। সেই ইদ্রিসই পরে এলাকার নেতা হয়ে গিয়েছিল এবং দাঙ্গার নেতৃত্বের প্রধানদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে ও এগিয়ে এসেছিল।

ইদ্রিসের বাড়িতে শুধু ইদ্রিস নয়, কেউ নেই। দরজা, জানালা সব বন্ধ করে উড়ে চলে গেছে।

রবিবার ফণী দে ও অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবান্তর কথা না শুনে দুই ডিসি সাহেব যদি অন্তত রামনগর, মেথরপাড়া, বাতিকল অঞ্চল থেকে বার হওয়ার রাস্তার মুখগুলি বন্ধ করে ব্যাপকভাবে তল্লাশি চালাতেন তবে এইভাবে ইদ্রিসরা পরিবার নিয়ে পালাতে পারত না। সবাই ধরা না পড়লেও আসল অপরাধীদের অন্তত ক'জন হলেও জালে আটকে যেত। কিন্তু তাঁরা যখন আর উপায় না পেয়ে মেহেতা সাহেবদের খোঁজে ওই অঞ্চলে গেলেন, তার মধ্যে অপরাধীরা পালিয়ে যাওয়ার অনেকটাই সময় পেয়ে গেছে। শুধু

তাই নয়, বেশ সাজগোজ করে পরিবার পরিজন নিয়ে প্রতিবেশিদের সঙ্গে শুভেচ্ছা আদানপ্রদান করে তারা পালিয়েছে।

আমরা রাত দশটা নাগাদ গার্ডেনরিচ ছেড়ে লালবাজারের উদ্দেশে রওনা দিলাম। একটা ব্যাপার পরিষ্কার, গার্ডেনরিচের এই অঞ্চলে আমাদের আরও অনেকবার আসতে হবে। প্রকাশ্যে অথবা গোপনে।

পরদিন কমিশনার নিরুপম সোম এসি ডিডি (আই) সনৎ গুপ্ত ও দীপক, সরোজ, সমীরদের নিয়ে হত্যার স্থান দুটো নিজে পরিদর্শন করে এলেন। দীপক ও সরোজ তার মধ্যেই আরও ক'জন সাক্ষীকে যোগাড় করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। মেহেতা সাহেব যে বাড়িতে খুন হয়েছেন, সেই বাড়ির পশ্চিমদিকে যে অংশে মেহেতা সাহেবের রক্ত ছিটকে লেগেছিল, সেইসব স্থানগুলো রক্ত সমেত তুলে নিয়ে এল, ফরেনসিক দফতরে পরীক্ষা করার জন্য।

নাসো জি পঁচাশি বাতিকল ফার্স্ট লেনের খ্রিস্টান পরিবার নরমান মারাসের মেয়ে কারলিনকে বিয়ে করেছিল। ঘটনার দিন সকালে যখন নরমান ও তার ছেলে বাইরন একবালপুরে গীর্জায় প্রার্থনা করতে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল, তখনই মেহেতা সাহেব ছুটতে ছুটতে বাতিকলের দিকে আসেন, তাঁর পেছন পেছন দাঙ্গাবাজরা। তারা দেখতে পায় সেই দাঙ্গাবাজদের একেবারে নেতৃত্বে আছে তাদের বাড়ির জামাই নাসো। তার হাতে একটা প্রমাণ মাপের লোহার রড।

নাসোর মুখ চোখ ঠিক উন্মাদের মতো। সে এমন পাগলের মতো মেহেতা সাহেবকে তাড়া করেছে যে, সে দেখতেই পাচ্ছে না তার শ্বশুরবাড়ি থেকে নরমান ও বাইরন তা প্রত্যক্ষ করছে।

গঙ্গার পুব পারে 'ম্যাচি কল' পাড়ায় সামসাদ বাড়িওয়ালার বাড়িতে দোতলার একটা ঘরে সে কারলিনকে নিয়ে থাকে। বাইশ তারিখ দুপুরে বাইরনকে সঙ্গে নিয়ে সরোজ, উমাশংকর ও সুধীশ ওর বাড়িতে তল্লাশি করতে গেল। নাসো যথারীতি ঘটনার দিনই পালিয়েছে। কারলিন বাড়িতে একা। একাই ওকে থাকতে হবে। কতদিন তা কে জানে।

সেদিনই বিচালিঘাটের একটা বাড়িতে উমাশংকর ও সুধীশ হানা দিল রহমতের জন্য। না ভুল খবর। ওরা ব্যর্থ হয়ে ফিরে এল।

আঠারোই মার্চ মেহেতা সাহেব নৃশংসভাবে খুন হওয়ার পর রামনগর লেন, ধানক্ষেতি, ফতেপুর ভিলেজ রোড, বাতিকলে কলকাতা পুলিশ বাহিনীর একাংশ অপরাধীদের তল্লাশিতে যে ঝড় বইয়ে ছিল, তার উত্তাপ নায়ে

কসাই, ওয়েবরা অবশ্যই লালবাজারে পেয়েছিল। তার ফলশ্রুতিতে একমাত্র নূরু ছাড়া প্রত্যেকেই তার অপরাধ স্বীকার করে নিয়েছিল।

তাছাড়া নান্নে তার অপরাধ স্বীকার করে রাজি হলো, কোথায় মেহেতো সাহেবের জিনিস তারা ফেলেছে তা সে দেখিয়ে দেবে।

লালবাজারেই সে বলেছে, বাতিকলে ইস্রাইলের বাড়ির সামনে কাঁচা নর্দমায় সে হোসেন চৌধুরির নির্দেশে একটা একটা করে মেহেতো সাহেবের জিনিসগুলো ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলেছে।

কাঁচা নর্দমার থেকে জিনিসপত্র উদ্ধার করার জন্য চাই সুইপার। আমাদের বাহিনীতেই প্রয়োজনের জন্য সুইপার আছে। আমাদের দুই সুইপার বিন্ধ্যেশ্বরী ও নারায়ণ তোমকে নিয়ে দীপক; সরোজ ও সমীর ক'জন কনস্টেবলকে সঙ্গে নিয়ে গার্ডেনরিচের দিকে ছুটল। সঙ্গে অবশ্যই নান্নে কসাই। সেই তো দেখিয়ে দেবে নর্দমার ঠিক কোন জায়গায় ওরা ওগুলো ফেলেছে।

দুপুর ঠিক তিনটে নাগাদ নান্নে দীপকদের নিয়ে জি দুশো একুশ নম্বর বাতিকলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। কাঁচা নর্দমাটা বাতিকল থেকে আটাবাগের মধ্যে দিয়ে গিয়েছে।

পাঁচদিন পর নান্নে আবার ঘটনাস্থলে হাজির। এবার অবশ্য আর পুলিশ খুন করতে নয়, পুলিশ পাহারায়, হাতে হাতকড়ি লাগানো অবস্থায়। নান্নেকে আশেপাশের লোকেরা দূর থেকে দেখছে, নান্নেও দেখছে। ও কী ভাবছে কে জানে। নান্নেরা কিছু ভাবে কী? হয়তো ভাবছে এত তাড়াতাড়ি ধরা পড়াটা ওর উচিত হয়নি।

নর্দমার একটা জায়গা দেখিয়ে নান্নে দীপককে হিন্দিতে বলল, "স্যার ঠিক ওই জায়গায় ওগুলি আছে।"

দীপক এক কনস্টেবলকে বলল নান্নের হাতকড়িটা খুলে দিতে। হাত মুক্ত হলে দীপক নান্নেকেই বলল, "তুই নাব।"

নির্দেশ শুনে নান্নের কিছু বলার নেই। নান্নে নর্দমায় নামলো। ওর পেছন পেছন বিন্ধ্যেশ্বরী ও নারায়ণ। আস্তে আস্তে ওরা প্রায় কোমর পর্যন্ত নর্দমার কাদা ও জলের নিচে ঢুকে গেল।

নান্নে জানে ঠিক কোন জায়গায় মেহেতো সাহেবের ব্যবহৃত জিনিসগুলি আছে। নান্নে আস্তে আস্তে কাঁচা নর্দমার কাদায় পা দিয়ে দিয়ে খুঁজতে লাগল। কাঁচা নর্দমার থেকে বিড়বিড় করে ছোট ছোট বুদবুদ খেয়াল খুশি মতো উঠতে লাগল।

দীপকরা নান্নের দিকে অধীর আগ্রহে তাকিয়ে আছে। কোন জিনিসটা প্রথমে উদ্ধার হয় সেটা দেখার জন্য।

নায়ো কিছু একটা পেয়েছে। প্রতিক্রিয়াতে বোঝা যাচ্ছে। সেটা সে পা দিয়ে ওপরে তোলার চেষ্টা করছে। কাদার মধ্যে আটকে থাকা জিনিসটাকে নাড়াচাড়া হতে বুদবুদ বেশ তোড়ে নর্দমার ওপরের জলে ফুটে মিলিয়ে যেতে লাগল। নায়ো তার ডান হাতটা নর্দমার ভেতর ঢুকিয়ে দিয়ে একটানে দিয়ে জিনিসটা ওপরে তুলে আনল।

লোহার তারের তৈরি একটা ঢাল। কাদা আর জল টুপটুপ করে নিচে পড়ছে। ওই ঢালটা দিয়েই মেহেতা সাহেব যতক্ষণ পেরেছেন দাঙ্গাবাজদের ছোঁড়া ঢিল আটকেছিলেন। নায়ো ঢালটা নর্দমার পাশে রেখে আবার অন্য জিনিসের খোঁজে কাঁচা কাদার মধ্যে পা চালাতে শুরু করল।

এবার নায়ো তুলে আনল মেহেতা সাহেবের হেলমেটটা। কাদায় কাদায় মাখামাখি। হেলমেটটার সামনের দিকের একটা অংশ ভাঙা। নাসিমের রডের বাড়ি খেয়ে ওই অংশটা উড়ে গেছে। তারপর লোহার রডের দ্বিতীয় আঘাতের সময় ওই হেলমেটটা মেহেতা সাহেবকে আর রক্ষা করতে পারেনি। কারণ লোকমান ও হোসেনদের সঙ্গে ধস্তাধস্তিতে ওটা মাথার থেকে নিচে পড়ে যায়। এবং নাসিমের হাতের লোহার রড তারপর অব্যর্থ লক্ষ্যে মেহেতা সাহেবের মাথার ওপর নেমে আসে।

হেলমেটটা নায়ো নর্দমার জলেই কিছুটা পরিষ্কার করে ঢালের পাশে রাখল। সামান্য পরিষ্কার হতে ওটার জলপাই রঙটা উঁকি দিতে লাগল। ওটা আর কারও মাথা বাঁচানোর জন্য ব্যবহৃত হবে না। চিরদিনের জন্য নির্বাসিত হয়ে যাবে।

বিন্ধ্যেশ্বরী তুলে আনল একটা চামড়ার বেল্ট। নিকেলের বেল্ট। বেল্টটার মাঝখানটা প্রায় দু'ভাগে বিভক্ত। সম্ভবতঃ খুন করার সময় আকতার, সামসাদদের ভোজালির কোপে ওটার ওই দশা হয়েছে। বেল্টের চামড়া কেটে ভোজালিটা পেটে ঢুকেছে।

নারায়ণ তুলল একটা তরোয়াল। সামসাদরা হোসেন চৌধুরির নির্দেশে ওটা ফেলে দিয়েছিল, খুনের অস্ত্রকে বেপাত্তা করার তাগিদে।

কাছেই একটা ডোবা। নায়ো, নারায়ণ ও বিন্ধ্যেশ্বরী উদ্ধারপ্রাপ্ত জিনিসগুলো নিয়ে সেখানে গেল। সেগুলো পরিষ্কার করল। নিজেরাও শরীর থেকে নর্দমার কাদা ছাড়িয়ে প্রস্তুত হয়ে নিল।

নায়োর হাতে আবার হাতকড়ি লাগল। তাকে নিয়েই দীপকরা গেল নাসিম বা নাসো পরিচালিত ক্লাবে। ক্লাবটা জি সাতাত্তর বাতিকলে। ওই ক্লাবে নাসিমই সর্বেসর্বা। তারই জোরে সে খ্রিস্টান পরিবারের কারলিনকে বিয়ে করেছিল।

ক্লাব ঘরের দরজায় তালা ঝুলছে। চাবির খোঁজ আশেপাশের কেউ দিতে পারল না। এসব ক্ষেত্রে আমাদের যা করতে হয়, দীপকরা তাই করল। স্থানীয় লোকজনকে সাক্ষী রেখে তালা ভেঙ্গে নাসিমের ক্লাব ঘরে তল্লাশির জন্য ঢুকল। অন্ধকার ঘরের জানালা খুলে দিতেই আলো এসে ঝপ করে ঘরটার মধ্যে দাঁড়াল।

মেহেতা সাহেবকে খুন করার পর নাসিমরা ক্লাব ঘরে এসেছিল কী? প্রথমে সেটাই বিচার করতে দীপকদের চোখ ক্লাব ঘরের ছোট পরিসরটার চারদিকে বোলাল। এসেছিল। এবং খুব দ্রুত প্রস্থানও করেছে। একটা লোহার রড, একটা ভোজালি, অন্যান্য জিনিস যেভাবে পড়ে আছে, সেগুলো সেই সাক্ষ্যই বহন করছে।

দীপকরা তল্লাশি করে নাসিমের ক্লাবের স্ট্যাম্প, লেটার হেড সমেত ভোজালি, রড সব বাজেয়াপ্ত করে নিল। মামলায় নাসিম একটা প্রধান আসামি। ওকে গ্রেফতার এড়িয়ে থাকতে হবে, আর গ্রেফতার হলে ঠিকমতো মামলা চালাতে পারলে ওর বেশ বড় ধরনের সাজা হতে পারে। সুতরাং দুটো ক্ষেত্রেই ওর আবার ওই ক্লাবে আশু ফিরে আসার সম্ভাবনা ক্ষীণ। ক্লাব ঘরটা অন্য ছেলেদের দখলে চলে যাবে।

সবই হচ্ছে, কিন্তু প্রধান আসামিদের কোনও খোঁজ নেই। ওদের গ্রেফতার করতে না পেরে আমরাও নিশ্চিত হতে পারছি না।

একটা জিনিস পরিষ্কার, লালবাজারের গোয়েন্দা দফতরের প্রায় পুরো অফিসাররা অন্য তদন্ত সরিয়ে রেখে মেহেতা সাহেব ও মোকতার আলির খুনের আসামি ধরার জন্য নিজেদের নিয়োজিত করেছে।

পঁচিশ তারিখ সকালে খবর এল এই দাঙ্গা ও খুনের অন্যতম প্রধান আসামী মহঃ ইদ্রিস বিহারের গয়া জেলায় লুকিয়ে আছে।

কোথায়, কার বাড়িতে ইদ্রিস আছে তাও সোর্স জানাল। জানাল, ইদ্রিসের আত্মীয় জলিল খানের বাড়ি গয়া জেলার বাঁকেবাজার আউট পোস্টের কাছে ধুমরাওগাঁও গ্রামে। সেখানেই ইদ্রিস আত্মগোপন করে আছে।

সেই সোর্স আরও জানাল রামদাস হাটির কাজিপাড়ায় কোনও এক তহসুদ্দুরের খাওয়ার হোটেলে দুপুরবেলা রহমৎ আসে। সম্ভবত মধ্যাহ্নভোজ সারতে।

ডাকাতি দমন শাখারই দুই অফিসার সুধীশ নাগ ও প্রতাপ মিত্র ইদ্রিসকে গ্রেফতারের জন্য গয়ার উদ্দেশে তিনজন কনস্টেবলকে নিয়ে যাত্রা করল।

সরোজ ও উমাশংকর আমাদের সোর্সের নির্দেশ অনুযায়ী রহমতকে ধরতে গার্ডেনরিচের বাঁধাবটতলার বাজারের সামনে সাদা পোশাকের দশজন কনস্টেবলকে

নিয়ে দুপুর দুটোর মধ্যেই হাজির। সোর্স তাদের সঙ্গে রহমতকে চিহ্নিত করার জন্য একটা লোককে দিয়ে নিজে আড়ালে চলে গেল।

বাঁধাবটতলা বাজারের থেকে দক্ষিণ দিকে একটা রাস্তা চলে গেছে কাজিপাড়ার দিকে। সরোজরা বাঁধাবটতলা মোড়ের কাছে পাহাড়পুর রোডেই গাড়ি রেখে সোর্সের দেওয়া লোকের সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে কাজিপাড়ার দিকে চলল।

মিনিট পাঁচ সাত হাঁটার পর সঙ্গী লোকটা সরোজদের ইঙ্গিতে অপেক্ষা করতে বলে সে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে একটা ছোট পাইস হোটেলে ঢুকল। খবর অনুযায়ী, ওই হোটেলেই রহমৎ দুপুরের খাওয়ার সারতে আসে। আজও যদি সে আসে এবং ওই লোকটি দেখে, সরোজদের খবর দেবে। তারপর সরোজরা ওই পাইস হোটেলে গিয়ে রহমতকে গ্রেফতার করবে।

সরোজরা বিচ্ছিন্ন বিচ্ছিন্ন ভাবে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ওই লোকটার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। কিন্তু লোকটা হোটেল থেকে ফিরছে না।

দু'মিনিট। তিন মিনিট। না ওই মুখের দেখা নেই। কোথায় হারিয়ে গেল? ওইটুকু পাইস হোটেলে একটা লোক আছে কী না আছে তা দেখতে দুই একটা মুহূর্তই যথেষ্ট, তা ওই লোকটা এতক্ষণ করছেটা কী, ভেবে পাচ্ছে না সরোজরা।

সরোজদেরও সন্দেহজনকভাবেই পথচারীরা দেখতে দেখতে যাওয়া আসা করছে। কিন্তু ওরা তো আর স্থান ত্যাগ করেও অন্যদিকে যেতে পারছে না। একটু নড়াচড়া করছে। সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়ছে। অন্যমনস্কতার অভিনয় করছে। কিন্তু আস্তে আস্তে ধৈর্যের বাঁধ ভাঙছে।

ধৈর্য্যের শেষ সীমায় যখন সরোজরা পৌঁছে গেছে, প্রায় দশ মিনিট পর ওই লোকটা নির্বিকারচিত্তে ওই হোটেল থেকে বেরিয়ে এসে জানাল, রহমত আসেনি।

খবর শুনে সরোজদের রাগ হলো। কিন্তু কিছুই বলল না। রহমত যদি ওই হোটেলটায় নাই থাকে তবে এতক্ষণ ওই লোকটা ওইখানে কী করছিল? সরোজরা ওকে কিছু বলল না। ওই স্থানে আর অযথা না গিয়ে ফিরে এল।

পরদিন কমিশনার নিরুপম সোম নির্দেশ দিল রাতে হানা দিতে। রাতে হানা দিয়ে কী লাভ হবে তা বোঝা গেল না। অপরাধীরা যে বাড়িতে আমাদের জন্য বসে নেই তা আমরা জানি। তবু কমিশনার সাহেবের নির্দেশ, যেতেই হবে।

সরোজ, সাব-ইন্সপেক্টর দিলীপ দাশগুপ্ত, তারাপদ দত্ত বেশ বড় একটা

বাহিনী নিয়ে রাত আটটার সময় গার্ডেনরিচের উদ্দেশে লালবাজার থেকে রওনা দিল।

বাতিকল সেকেন্ড লেনে দিলওয়ার হোসেনের বাড়িতে সাড়ে ন'টার সময় ঢুকল। বাড়িতে দিলওয়ারের এক ভাই ছাড়া অন্য কোনও পুরুষ নেই। দিলওয়ার কোথায় গেছে তার কোনও হদিস তারা জানে না।

দিলওয়ারের বাড়ি থেকে বার হয়ে সরোজরা ওই একই রাস্তায় লোকমান ও তার ভাই ওসমানের বাড়িতে হানা দিল।

দিলওয়ারের বাড়িতে তবু ওর ভাই সমেত ক'জন ছিল, লোকমানদের বাড়িতে কেউ নেই। ঘরের সামনে তালা ঝুলছে। সবাই পালিয়েছে।

সরোজরা তবু আশা না ছেড়ে এক প্রতিবেশীকে লোকমানদের সম্পর্কে প্রশ্ন করতে সে জানাল, বাবুবাজারের কাছে ডক ইস্ট বাউন্ডারি রোডে কোনও এক গাড়িতে লোকমানরা ঠাঁই নিয়েছে। এর বেশি সে আর কিছু জানে না।

এরপর একে একে বাতিকলে সন্ধা আকতার, ধানক্ষেতিতে রহমৎ ও গঙ্গার ধারে নাসিমের বাড়িতে গিয়ে সরোজদের প্রায় একই ধরনের বার্তা শুনতে হলো।

এমন যে হবে তা আমরা গোয়েন্দা দফতরের সব অফিসারই জানি। তবু সোমসাহেবের জন্য, তার খেয়াল পূর্ণ করতে রাত প্রায় একটা পর্যন্ত গার্ডেনরিচের ওই অঞ্চলে ঘুরতে হলো। ওই অঞ্চল সম্পর্কে যাদের সামান্যও অভিজ্ঞতা আছে, তারা জানে ওই সব সরু সরু নোংরা, দুর্গন্ধময়, অন্ধকার গলিতে রাতে ব্যাপকভাবে হানা দিতে কত ঝুঁকি, কষ্ট ও পরিশ্রম করতে হয়।

কষ্ট ও পরিশ্রম করাটা তখনই সার্থক হয়, যখন কাজে সফলতা পাওয়া যায়। কিন্তু অহেতুক, অযৌক্তিকভাবে পরিশ্রম করে খোঁচাখুঁচি করে অপরাধীদের আরও সজাগ করার সুযোগ কেন করে দেব?

সোমসাহেব এমনই ছিলেন। একদিকে অসম্ভব ভদ্রলোক, অন্যদিকে সন্দেহবাতিক ও নিজের বিশ্বাসের প্রতি প্রচণ্ড আস্থাবান।

আঠারোই মার্চ দুপুরে যখন দুই ডিডি সাহেব সমেত বিরাট পুলিশ বাহিনী রামনগর লেন, বাতিকল ও ধানক্ষেতির কোণায় কোণায় মেহেতা সাহেবকে খোঁজার জন্য মাথা খুঁটে মরছে, মেহেতা সাহেব জীবিত না মৃত সেই খবরের জন্য হন্যে হয়ে ঘুরছে তখন অনেক দূরে বসে হেস্টিংস থানার অফিসার-ইন-চার্জ আয়ুব খান কী করে খবর পেল আটাবাগের কাঁচা নর্দমায়

একটা মৃতদেহ পড়ে আছে, যা সম্ভবত মেহেতা সাহেবেরই। তা তদন্ত করে দেখতে বললেন।

কি জন্য সোমসাহেব তদন্ত করতে বললেন, তিনিই একমাত্র ভাল জানেন। কোন যুক্তিতে কার বিরুদ্ধে, কিসের জন্য সন্দেহের বশে তিনি তদন্ত করতে বললেন?

তিনি কি জানতেন না, পুলিশ অফিসাররা খবর পেলে, ঠিক স্থানে সেই খবর পৌঁছে দেওয়াই তাদের কর্তব্য, যা অতি আবশ্যিক কাজের মধ্যে পড়ে। সেই খবর না দেওয়াটাই তাদের কাজের অবহেলা হিসাবে দেখা হয়। সে ক্ষেত্রেই তদন্ত হতে পারে। উল্টে কর্তব্য সঠিকভাবে যে অফিসার সম্পন্ন করল তার বিরুদ্ধেই কি না তদন্ত করতে তিনি নির্দেশ দিলেন।

কাজ করে যদি তদন্তেরই সম্মুখীন হতে হয় তবে কোন কর্মচারী দায়িত্ব পালন করবে? কে খবর সংগ্রহ করবে, সংগ্রহ করলে তা কেন জানাবে? এমন সব তদন্তের নির্দেশ কী বাহিনীর মনোবল ভেঙ্গে দেবে না?

খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আয়ুব যদি না যথাযথ স্থানে সেই খবরটা জানিয়ে দিত তবে কী আটাবাগে কাঁচা নর্দমার পাঁকের ভেতর থেকে মেহেতা সাহেবের মৃতদেহটা ওরা উদ্ধার করতে পারত?

তখন উদ্ধার করতে না পারলে আর কিছুক্ষণ পর অন্ধকারের হাত ধরে সন্ধ্যা নেমে আসত, কিছুই দেখা যেত না, উদ্ধার করা আরও কয়েকগুণ কঠিন হয়ে যেত। অথবা ওই দেহটা গঙ্গার জোয়ার এসে গঙ্গায় টেনে নিয়ে যেত, তখন তো অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে যেত। গঙ্গার টানে টানে সেই মৃতদেহ কোথায় চলে যেত, সেই দেহের কী হাল হতো, কিংবা আদৌ পাওয়া যেত কি না যথেষ্ট সন্দেহ।

কে আয়ুবকে খবরটা দিয়েছে তা আয়ুব জানাবে কেন? কোনও অফিসার কী তার সোর্সকে অন্যের কাছে প্রকাশ করে? প্রকাশ না করাটাই রীতি। এক্ষেত্রে তো আরও কঠিন। কারণ ওই সোর্স ওই বাতিকল-আটাবাগ অঞ্চলেই থাকে।

খুনীরা যদি জানতে পারে কে আয়ুবকে খবরটা দিয়েছে, তবে কি তারা ওই সোর্সকে ওই অঞ্চলে নির্বিঘ্নে বাঁচতে দেবে? কখনই নয়। আয়ুব নিশ্চয়ই তার নাম প্রকাশ করে তাকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেবে না?

সোমসাহেব এমনই ছিলেন। যুক্তিহীন কিছু নির্দেশ দিতেন। সেই সব নির্দেশের জন্য অন্য অফিসারদের অপ্রয়োজনীয় কিছুটা সময় চলে যেত।

এসব তদন্তের ক্ষেত্রে যা হয়, তাই হলো। ওই নির্দেশ ওখানেই চাপা পড়ে গেল।

ছাব্বিশ তারিখ সকাল ন'টা নাগাদ সুধীশ ও প্রতাপ বিহারের গয়া জেলার এস পি সাহেবের অফিসে হাজির হলো। শুনল তিনি তাঁর অধীনে বিভিন্ন থানা পরিদর্শনে বেরিয়েছেন, কখন ফিরবেন কেউ বলতে পারল না। সেই অফিস থেকে তাদের বলা হলো, তারা যেন ডি এস পি, শেরঘাটির সঙ্গে দেখা করে তাদের প্রয়োজনের কথা বলে। ওদের কথা অনুযায়ী ওরা শেরঘাটিতে ডি এস পি সাহেবের সঙ্গে দেখা করে সফি সাহেবের চিঠি দিল। তিনি চিঠি পড়ে ওদের নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে আমস থানার অন্তর্গত বাঁকেবাজার চৌকির দিকে রওনা দিলেন।

ডি এস পি সাহেব বাঁকেবাজার চৌকির অফিসারকে ধূমরাওগাঁও গ্রামে নতুন আগন্তুকের খোঁজ নিতে বললেন। বাঁকেবাজার ছেড়ে আবার সুধীশ ও প্রতাপ গয়া জেলার এস পি সাহেবের অফিসের দিকে ছুটল। পঁচাত্তর কিলোমিটার পার হয়ে ওরা বিকেল সাড়ে চারটে নাগাদ ফিরে শুনল এস পি সাহেবকে রাতে তার বাড়ির অফিসে পাওয়া যাবে। অবশেষে সন্ধে ছ'টার সময় সুধীশরা এস পি সাহেবকে তার বাড়ির অফিসে পেয়ে গেল। সেখানে তখন তারা অতিরিক্ত এস পি সাহেবেরও সাক্ষাৎ পেল। এস পি সাহেব অতিরিক্ত এস পি মিঃ সি পি কিরণকে নির্দেশ দিলেন সুধীশদের সব রকমের সাহায্য করতে। মিঃ কিরণ রাত এগারোটার সময় গয়া পুলিশ লাইনে ওর সঙ্গে ওদের দেখা করতে বললেন। সুধীশরা যথারীতি পুলিশ লাইনে ঠিক সময় মিঃ কিরণের সঙ্গে দেখা করল। তিনি বেশ বড় বাহিনী নিয়ে প্রস্তুত ছিলেন। আমাদের অফিসাররা ওখানে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাদের নিয়ে বাঁকেবাজার চৌকির দিকে ছুটলেন। বাঁকেবাজার চৌকিতে খবর দেওয়াই ছিল। সেখানে অফিসারও উপস্থিত। মিঃ কিরণ ওই অফিসারদের নিয়ে ধূমরাওগাঁও গ্রামের দিকে রওনা দিলেন, সঙ্গে জলিল খানের বাড়ি চিনিয়ে দেওয়ার সোর্স।

সাতাশ তারিখ ভোর চারটে দশ মিনিট নাগাদ ওরা জলিল খানের গ্রামে পৌঁছে জলিল খানের বাড়ি মিঃ কিরণের নির্দেশে ঘিরে ফেলল।

হ্যাঁ, এইক্ষেত্রে সোর্সের খবর ঠিক। ইদ্রিসকে জলিল খানের বাড়িতে সপরিবারে পাওয়া গেল। ইদ্রিসকে চিহ্নিতকরণটা বেশ সোজা। চেহারার বিবরণ ছাড়াও ওর উপরের পাটির সামনের দুটো দাঁত নকল। সুধীশ ওটা পরীক্ষা করে ওকে গ্রেফতার করল। সুধীশরা ওকে গ্রেফতার করে সেদিন

স্থানীয় থানার লকআপে রেখে দুপুরে গয়া জেলার ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি নিয়ে ইদ্রিসকে নিয়ে কলকাতার উদ্দেশে ট্রেনে চড়ে বসল।

আটাশ তারিখ সকালে ওরা হাওড়া স্টেশনে নেমে সোজা লালবাজারে এনে সেন্ট্রাল লকআপে পাঠিয়ে দিল। ইদ্রিসের গ্রেফতারের খবর সারা লালবাজারে ছড়িয়ে পড়তে সাধারণ কনস্টেবলদের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দিল। ইদ্রিস যে মেহেতা সাহেব ও মোকতার আলি খুনের অন্যতম প্রধান আসামি তা পত্রপত্রিকার প্রচারের জোরে প্রত্যেকেই জানত।

সোমসাহেব তাঁর অফিসে এসেই ইদ্রিসকে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য সেন্ট্রাল লকআপ থেকে তাঁর অফিসে নিয়ে আসতে বললেন।

লালবাজারের পুব দিকে সেন্ট্রাল লকআপ থেকে দক্ষিণ দিকে কমিশনার সাহেবের অফিসের দূরত্ব সামান্যই। ওইটুকু আনতেই লালবাজারের মাঝখানের চত্বর জুড়ে বেশ বড় ভিড় জমে গেল। প্রত্যেকেই আমাদের বাহিনীর।

দীপক ও সরোজ ইদ্রিসকে নিয়ে সোমসাহেবের চেম্বারে গেলেন। সফি সাহেবও এলেন। সোমসাহেব ও সফিসাহেব ইদ্রিসকে প্রায় মিনিট কুড়ি ধরে এটা ওটা জিজ্ঞেস করলেন। ইদ্রিস ডকের পুরনো পাকা দুষ্কৃতী। সে প্রতিটা উত্তরেই, "হ্যাঁ, সাহেব", "নেহি সাহেব" করে উত্তর দিয়ে গেল। সোমসাহেব ইদ্রিসকে ছেড়ে দিলেন।

দীপকরা ইদ্রিসকে নিয়ে লালবাজারে পশ্চিম প্রান্তে গোয়েন্দা দফতরে মার্ডার সেকশনে আনার সময় উত্তাপটা টের পেল।

প্রায় শ'খানেক কনস্টেবল ও লালবাজারে কর্মরত স্বরাষ্ট্র দফতরের কর্মচারীরা ইদ্রিসের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখাতে লাগল অশ্রাব্য ভাষায়। দীপক ও সরোজ ইদ্রিসকে নিয়ে ওই বিক্ষোভের মাঝখান দিয়ে পথ করে গোয়েন্দা দফতরে নিয়ে এল। ওকে এবার আলিপুর আদালতে পাঠিয়ে পুলিশের হেফাজতে রাখার জন্য অনুমতি নিয়ে আসার জন্য পাঠানো হবে।

দুপুর দেড়টা নাগাদ আলিপুর আদালতে যখন ইদ্রিসকে নামান হলো, সেখানেও আমাদের গাড়ি ঘিরে সাধারণ মানুষ ইদ্রিসের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে ফেটে পড়ল। সরোজরা কোনওমতে ইদ্রিসকে আদালতে উপস্থিত করিয়ে এপ্রিলের দশ তারিখ পর্যন্ত ওকে পুলিশের হেফাজতে রাখার অনুমতি নিয়ে লালবাজারে ফিরে এল।

গোয়েন্দা দফতরের বাড়ির মাঝখানের সিঁড়িটা দিয়ে ইদ্রিসকে নিয়ে ওঠার মুখেই প্রায় সত্তর আশি জন কনস্টেবল হঠাৎ সরোজদের হাত থেকে ইদ্রিসকে ছিনিয়ে নিয়ে লাঠি দিয়ে পেটাতে শুরু করল। দু'তিন মিনিট।

সরোজ ও অন্য অফিসাররা ওদের সরিয়ে ইদ্রিসকে নিয়ে মার্ডার সেকশনে পৌঁছে গেল।

আঘাত তেমন গুরুতর নয়, ইদ্রিসের চেহারা দেখে আপাতদৃষ্টিতে উপস্থিত অফিসারদের তাই মনে হলো। সেও আঘাত নিয়ে কোনও অভিযোগ কাউকে জানাল না। হয়তো ভয়ে কিংবা লজ্জায় বা এটাই স্বাভাবিক, এই যুক্তিতে, যে কোনও কারণেই হোক।

মার্ডার সেকশনে দীপকের নেতৃত্বে সরোজরা ওকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করল। ওর স্বীকারোক্তিও লিপিবদ্ধ হতে লাগল। ঘুরে ঘুরে অফিসাররা ওকে প্রশ্ন করতে লাগল। অবশ্যই সবসময় যে খুব নিরীহভাবে, তা নয়। তবে ইদ্রিস মোটামুটি সহযোগী মনোভাব নিয়েই উত্তর দিচ্ছিল। এবং প্রায় টানা দু'তিন ঘণ্টা জেরাতে সে অনেক কিছুই জানাল।

রাত আটটা নাগাদ হঠাৎ সরোজ দেখতে পেল, ইদ্রিস কথা বলতে বলতে ডান হাত দিয়ে তার বুকের বাঁদিকটা চেপে ধরছে, এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তার শরীরটা বাঁদিকে চেয়ারের হাতলের ওপর ঝুলে পড়ছে।

সাহসী সরোজও ইদ্রিসের অবস্থা দেখে হকচকিয়ে গেল। ও ইদ্রিসের বাঁ হাতটা তুলে নাড়ি দেখতে লাগল। খুব আস্তে ওটার ওঠানামা। সরোজ সঙ্গে সঙ্গে পাশের ঘরে আড্ডারত দীপক ও অন্য অফিসারদের ডাকতে গেল।

দীপক ইদ্রিসকে দেখেই আমাদের সেন্ট্রাল লকআপের ডাক্তার পাইনকে ডেকে আনতে বলল। কনস্টেবল ভোলারাম ও রাজা সিং ছুটল ডাক্তারবাবুকে ডেকে নিয়ে আসার জন্য।

মিনিট সাত-আট মিনিটের মধ্যেই ডাক্তার পাইন এলেন এবং ইদ্রিসকে পরীক্ষা করে হাসপাতালে নিয়ে যেতে বললেন।

আমাদের ডাকাতি দমন শাখার অফিসার রাজকুমার চট্টোপাধ্যায় একটা ছোট দল নিয়ে একটা গাড়িতে ইদ্রিসকে নিয়ে কলকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের উদ্দেশে সঙ্গে সঙ্গে রওনা দিল।

রাজকুমার যখন ইদ্রিসকে নিয়ে রওনা দিয়েছে তখনও আমি কিছুই জানি না। আমি অন্য কাজে লালবাজারের বাইরে ছিলাম।

রাজকুমার চলে যাওয়ার পাঁচ সাত মিনিট পর আমি লালবাজারে যখন পৌঁছালাম তখন দেখি সরোজ হন্তদন্ত হয়ে দফতর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। আমার সঙ্গে ওর মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল।

আমাকে দেখেই সরোজ বলল, "একটা ফালতু ঝামেলা হয়ে গেছে স্যার।"

"কি হয়েছে?" জানতে চাইলাম।

"ইদ্রিস খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছে, রাজকুমার ওকে নিয়ে মেডিকেল কলেজে গেছে। আমিও যাচ্ছি। আপনি যাবেন?"

সরোজের উদ্বিগ্নতা দেখে বললাম, "চল।"

সরোজের সঙ্গী হয়ে আমিও মেডিকেল কলেজের ইমার্জেন্সি বিভাগে পৌঁছালাম। আমাদের আগেই রাজকুমার পৌঁছে গেছে। ইমার্জেন্সি বিভাগের ডাক্তারবাবুদের ইদ্রিসকে পরীক্ষাও হয়ে গেছে।

রাজকুমার বলল, "ইদ্রিস মৃত।"

আমার পাশে দাঁড়ানো সরোজ রাজকুমারের কথা শুনে পাশে রাখা একটা বেঞ্চিতে ধপ করে বসে পড়ল।

বলল, "সর্বনাশ হয়ে গেল স্যার, ইদ্রিস সবই স্বীকার করছিল, ওর কাছ থেকে আমরা অনেক কিছুই জানতে পারতাম। এবার কী হবে। তাছাড়া—।"

আমি ওর দুশ্চিন্তার কারণ মুহূর্তেই ধরতে পারলাম। পুলিশ হেফাজতে কোনও আসামির মৃত্যু হলে তার ঢেউ সামলাতে যে কী নিদারুণ পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয় তা আমি খুব ভালভাবেই জানি।

আমি সরোজের দুশ্চিন্তা কাটানোর জন্য ওর কাঁধে আমার ডান হাতের তালুটা রেখে একটু চাপ দিয়ে বললাম, "চিন্তার কিছু নেই, আমি তো আছি।"

সরোজ অস্ফুটস্বরে শুধু বলল, "স্যার।"

ইদ্রিসের মৃতদেহ মর্গে পাঠানোর ব্যবস্থা করে আমরা লালবাজারের দিকে গাড়ি নিয়ে যাত্রা করলাম। সবাই প্রায় চুপ করেই আছি।

জানি, শুধুমাত্র উচ্চপদস্থ অফিসারদেরই ভর্ৎসনা শুনতে হবে না, পত্রপত্রিকা কিছু না জেনেই পুরো গোয়েন্দা দফতর এমন কী কলকাতা পুলিশের বিরুদ্ধে তীর নিক্ষেপ করে ক্রমাগত তুলোধোনা করবে।

ওরা তো জানে না, ইদ্রিসের এভাবে মৃত্যুটা লালবাজারের কোনও অফিসারই চায়নি। যে আসামি ভালভাবে স্বীকারোক্তি দেয় তাকে দিয়ে আমাদের অনেক কাজ হয়। তাকে ব্যবহার করে অনেক সূত্র পাওয়া যায়। সুতরাং তার মৃত্যুটা কেউ কোনও অবস্থাতেই চায় না।

ইদ্রিসের মৃত্যুই যদি আমাদের কাম্য হতো তবে তাকে তো গোপনে গয়া জেলাতেই রাতের অন্ধকারে খুন করা যেত। তার মৃত্যুই যদি কেউ চাইত তবে তাকে গয়ায় এবং আলিপুর আদালতে নিশ্চয়ই হাজির করা হতো না। তার গ্রেফতারের খবরটাই গোপন রাখা হতো। এসব কেউ

ভাববে না। যুক্তি এবং ঘটনার কথা সবাই ভুলে গিয়ে কিছু আবেগমিশ্রিত কাহিনী বানিয়ে তা প্রচারের শিখরে নিয়ে আসবে।

একথা ঠিক ইদ্রিসের নিরাপত্তা ও শারীরিক দিকটা আরও ভালভাবে নজরে রাখা উচিত ছিল। কনস্টেবলদের হাতে নিগৃহীত হওয়ার পর তাকে একবার ডাক্তারকে দিয়ে পরীক্ষা করালে ভাল হতো। ইদ্রিস যখন তার অস্বস্তির কোনও অনুযোগ করেনি তখন তাকে বিশ্বাস না করলেই ভাল হতো।

আসলে বাহিনীর এক উচ্চপদস্থ অফিসার ও কনস্টেবলকে নৃশংসভাবে খুনের দায়ে ধৃত আসামির প্রতি মায়া দয়া দেখানোর ক্ষেত্রে যে একটা মানসিক প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়েছিল তারই ফলশ্রুতি হিসাবে ইদ্রিসের হঠাৎ মৃত্যু।

পরদিন যখন ইদ্রিসের মৃত্যুর কারণ সম্বলিত পোস্ট মর্টমের রিপোর্ট হাতে এল, তখন দেখা গেল, স্থূল চেহারার ইদ্রিস হৃদরোগী ছিল। এবং প্রবল উত্তেজনার কারণেই তার হঠাৎ কার্ডিয়াক ফেলিওর অর্থাৎ হৃদযন্ত্র বন্ধ হয়ে যায়।

ইদ্রিস যে হৃদরোগী ছিল, সে কিন্তু একবারের জন্যও কোনও অফিসারকে আগাম জানায়নি। ফলে তার প্রয়োজনীয় চিকিৎসাও হয়নি। এবং যখন তার চিকিৎসা শুরু হলো, তখন আর সুযোগ পাওয়া গেল না।

লেনিন সরণির চাঁদনি চক বাজার ও তার সংলগ্ন এলাকায় নসরু খানের একটা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। পোর্ট অঞ্চলের ছোট ধরনের চোরাচালানেই নসরু রপ্ত ছিল। সেই 'ব্যবসার' জন্যই ওর ধর্মতলা এলাকায় যাতায়াত ও অন্ধকার জগতের দুষ্কৃতীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ও বন্ধুত্ব।

খুনের ঘটনার দিন নসরু বিকেলবেলাতেই ওই এলাকায় এসেছিল। রবিবার ওই অঞ্চলের অধিকাংশ দোকানই বন্ধ থাকে। নসরু তাই ওর দু'চারজন বন্ধু ছাড়া বেশি আর ওর লোকজনের সাক্ষাৎ পেল না। যাদের সঙ্গে ওর দেখা হলো, তারা তখনও গার্ডেনরিচ এলাকায় মেহেতা সাহেবের খুনের খবর জানে না।

নসরু ওদের কাছ থেকে যতটা পারল টাকা নিয়ে চলে গেল। নসরুকে টাকা দিতে ওদের কোনও আপত্তি নেই। কারণ ওরা জানে নসরু ব্যবসার জিনিস ঠিক পাঠিয়ে দেবে।

টাকা নিয়ে নসরু চম্পট দিল। মধ্য কলকাতা ও হাওড়ার হোটেলে দিন চারেক কাটিয়ে সে চলে গেল বর্ধমান। কিন্তু ওর পকেটের ওজন দিন দিন কমে আসছিল।

চাঁদনি চক ও তার সংলগ্ন এলাকায় আমার অনেকগুলো সোর্স ছিল। ওইসব অঞ্চলে এমন কোনও রাস্তা ও বাজার ছিল না যেখানে আমার একটা না একটা সোর্স ছিল না।

মেহেতা সাহেবের খুনের ঘটনার কথা পরদিন সকালের মধ্যেই সবাই জেনে গিয়েছিল। ঘটনার দিন বিকেলে নসরু যে এসেছিল সেটা আমার দু'জন সোর্স দেখেছিল। তাদের সামান্য অস্বাভাবিক লেগেছিল। কারণ সাধারণভাবে রবিবার বিকেলে বাজার বন্ধের দিন নসরুর ওখানে আগমনের কথা নয়। তবু ওরা অস্বাভাবিক হলেও সেটা বিশেষ গুরুত্ব দেয়নি।

পরদিন সকালে মেহেতা সাহেবের খুনের ঘটনা শোনার পর ওরা গুরুত্ব বুঝল এবং সেই খবরটা জানাল। কিন্তু ততক্ষণে নসরু উড়ে গেছে। যদিও ওরা জানে না, নসরু ওই ঘটনার অন্যতম আসামি।

আত্মগোপন করে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াতে গেলে যে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন তা কে না জানে। তবে নসরুদের মতো লোকেদের অর্থের প্রয়োজন আরও বেশি। লম্বা স্বাস্থ্যবান নসরু সবসময়ই ফিটফাট থাকত। দামি সিগারেট, সন্ধের পর বিলাতি মদ এবং বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে আসরে সে অভ্যস্ত ছিল। অভ্যাস একবার হয়ে গেলে, তার থেকে মুক্ত হয়ে চলতে যে মনের জোরের দরকার তা নসরুদের মতো লোকেদের থাকার কথা নয়। সেটা চিন্তা করেই আমি চাঁদনি চক, গ্রান্ট স্ট্রিট ও খিদিরপুর অঞ্চলের সোর্সদের জানিয়ে দিলাম, নসরু টাকার প্রয়োজনে ফিরে ঠিক আসবেই আসবে। সে ব্যাপারে খেয়াল রাখতে।

দশই এপ্রিল রাতে খবর পেলাম, নসরু পরদিন আসছে। টাকা নিতে। স্থান গঙ্গার পুবপাড়ে আউটরাম ঘাটে। সময় দুপুর একটার থেকে দুটোর মধ্যে। ওর জন্য ওখানে টাকা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে ওর গ্রান্ট স্ট্রিটের এক বন্ধু। নসরু আসবে বজবজ থেকে।

আমার আন্দাজই ঠিক। নসরুর টাকা শেষ হয়ে গেলে সে তার পাওনা টাকা তুলতে চেষ্টা করবে। এবং সে ন'তারিখেই তার নতুন এক অনুচরকে দিয়ে গ্রান্ট স্ট্রিটে খবর পাঠিয়ে সেই নির্দেশ দিয়েছে। তার সেই বন্ধু গোপনে নসরুর নির্দেশ পালন করার সময়ই আমার সোর্সের কাছে খবরটা ফাঁস হয়ে যায়। নসরু চাঁদনি চকের ঘিঞ্জি অঞ্চলে যেতে চায় না বলেই তাকে টাকা নিয়ে আউটরাম ঘাটে দুপুর একটার মধ্যে টাকা নিয়ে চলে আসতে বলেছে।

অর্থাৎ একটার আগেই আমাদের আউটরাম ঘাট এলাকাটা সাদা পোশাকের অফিসার ও কনস্টেবল দিয়ে ঘিরে ফেলতে হবে।

সুধীশ নসরুকে চেনে। ওকে থাকতেই হবে। সরোজ ও সুধীশ আমাদের কনস্টেবলদের দিয়ে ওই এলাকাটা ঘিরে ফেলার পরিকল্পনা করে নিল।

পরিকল্পনা অনুযায়ী দুপুর বারোটার পর থেকে একজন দু'জন করে আউটরাম ঘাটের চারপাশে গিয়ে পৌঁছাতে লাগল। কেউ গেল বাসে, কেউ গেল বাস থেকে নেমে হেঁটে। সরোজ আর সুধীশও অনেক দূরে গাড়ি রেখে গল্প করতে করতে আউটরাম ঘাটের কাছে পৌঁছে গেল।

কনস্টেবলেরা কেউ গঙ্গার হাওয়া খাচ্ছে। কেউ সিমেন্টের বেঞ্চিতে বসে খৈনি টিপছে। কেউ গঙ্গার পারের ছোট ছোট চায়ের দোকানের সামনে ইঁটের উপর বসে চা খাচ্ছে। কেউ উদাস হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

দুপুর একটার মধ্যেই মঞ্চ তৈরি। এবার আসামি হাজির হলেই হলো। খবর অনুযায়ী আসামি আসবে বজবজ থেকে। অর্থাৎ গঙ্গারই আরও দক্ষিণ দিক থেকে।

সরোজ ও সুধীশ আউটরাম ঘাটে অবস্থিত লোকজনকে পর্যবেক্ষণ করে অনুমান করার চেষ্টা করছে কোন লোকটি নসরুর বন্ধু। ঘড়ির কাঁটা ঘুরতে ঘুরতে একটা যখন পার হয়ে গেছে, খবর যদি ঠিক হয়, তবে সে নিশ্চয়ই আশেপাশে আছে।

লোকটিকে চিনতে পারলে একটাই সুবিধা তাকে ঘিরেই আমাদের বাহিনী একটা গোলাকার বেষ্টনী রচনা করে রাখবে। নসরু সেই লোকটির কাছে এলে সে অনায়াসেই আমাদের বেষ্টনীর মধ্যে ঢুকে যাবে। বেষ্টনী আস্তে আস্তে সঙ্কুচিত হবে, তারপর আসামি খাঁচায় বন্দি।

একটার ঘণ্টা যখন বেজে গেছে, তখন, যখন তখন অভিনেতারা পর্দা তুলে হাজির হতে পারে। সে জন্য প্রত্যেকের চোখ সক্রিয়।

এপ্রিলের কড়া রোদ। সরোজদের শরীর কাঠ করে দিচ্ছে। যদিও শেষ বসন্তের দক্ষিণের বাতাস তাতে প্রলেপ দেওয়ার জন্য চেষ্টার কসুর করছে না, তবু তা যে বিফলেই যাচ্ছে তা তাদের শরীর দেখলেই এবং ছায়া খোঁজার তাগিদাতে বোঝা যাচ্ছে।

গঙ্গায় তখন ভাটা। মাঝখানে দু'একটা লঞ্চের আনাগোনা ছাড়া সবাই প্রায় দাঁড়িয়ে আছে। জল অনেকটা নিচে। কাদার মধ্যে বড় বড় ঘাসের গুল্ম জলের তলা থেকে মুক্ত হয়ে হাওয়ায় হাওয়ায় দুলছে। অদ্ভুত ওদের জীবন, দিনের খানিক সময় আকাশের দিকে মুখ, বাকিটা জলের ভেতর লুকিয়ে। প্রকৃতি কাকে নিয়ে যে কী খেলে, কখন খেলে তা একমাত্র প্রকৃতিই জানে।

দেড়টা। নসরুর দেখা নেই। সময় অবশ্য এখনও পার হয়নি। কথা

আছে দুপুর একটার থেকে দুটোর মধ্যে সে মুখ দেখাবে। খুব অল্প সময়ের জন্য।

যত তাড়াতাড়ি সে মুখ দেখায় ততই সরোজদের জন্য ভাল। রোদের প্রহার থেকে মুক্তি। না এলে আর কী করা যাবে, রোদকে গায়ে মেখেই ঠাঁয় অপেক্ষা করতে হবে।

গঙ্গার পাশ দিয়ে হু হু করে কত গাড়ি চলে যাচ্ছে। সামান্য দূরে দক্ষিণে বিদ্যাসাগর সেতু তৈরির কর্মব্যস্ততা। সেই কর্মের ভারী ভারী আওয়াজ এসে আউটরাম ঘাটে বিচরণরত মানুষের কানের পর্দায় আঘাত করে মিলিয়ে যাওয়ার আগেই আমার আওয়াজ।

ঘড়িতে দুটো। অর্থাৎ নির্ঘন্ট অনুযায়ী সাক্ষাতের লগ্ন শেষ। কী করবে সরোজরা ? চলে আসবে ? না-না, ওখানে আরও অনেকক্ষণ তাদের অপেক্ষা করতে হবে। আত্মগোপনকারী অপরাধীরা ঘড়ির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারে না। তাদের নিজেদের প্রয়োজনেই চলার পথটা গোলকধাঁধা বানিয়ে চলতে হয়। তাই সময়কে নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে না। তাছাড়া, আত্মগোপনকারীরা অনেকক্ষেত্রে ইচ্ছে করেই ঠিক সময়ে যথাস্থানে হাজির হয় না। সময়কে গুলিয়ে দিয়ে ধন্ধে ফেলে দেয়। তারা তখন কাউকেই নিজের বিশ্বাসের তালিকায় রাখে না। আর সেই অবিশ্বাস থেকেই সময়ের হিসাবকে উল্টে পাল্টে দেওয়ার চেষ্টা।

সুতরাং সরোজদের ধৈর্য ধরে ওখানে অপেক্ষা করতেই হবে। যতই রোদ ওদের পুড়িয়ে ঝলসে দিক না।

দুপুর দুটো পনেরো। ধর্মতলামুখী একটা বারোর বি বাস থেকে আফগান কুর্তা পায়জামা পরিহিত একটা লম্বা চওড়া লোক আউটরাম ঘাট বাস স্টপেজে নামল। লোকটা বাস থেকে নেমেই এদিক ওদিক সন্দেহব্যাতিক চোখ নিয়ে ধীর পায়ে আউটরাম ঘাটের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। ধূর্ত চাহনি, অস্থির চোখের তারা।

লোকটিকে দেখেই সুধীশ ইঙ্গিতে সরোজকে জানিয়ে দিল, এই সেই লোক যার জন্য ওরা প্রায় আড়াই ঘণ্টা সূর্যকে গায়ে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অর্থাৎ এই লোকটাকে গ্রেফতার করে লালবাজারে নিয়ে যেতে পারলেই ওদের এই অভিযোগের সাফল্যতম অবসান।

সরোজ তার চশমাটা একবার খুলল। সেটা রুমাল দিয়ে মুছে চোখে লাগাতেই আউটরাম ঘাট ঘিরে থাকা আমাদের কনস্টেবলেরাও বুঝে গেল লক্ষ্যবস্তু হাজির। এবার ওকে বেষ্টনীর মধ্যে আটকে দাও।

ছড়ানো ছিটানো কনস্টেবলেরা সরোজের সংকেতে জাল গোটাতে লাগল।

দুই একটা মুহূর্ত। লোকটি গঙ্গার পাড়ের দিকে এগিয়ে আসছে। সরোজ তার দিকে এগিয়ে গিয়ে একেবারে মুখোমুখি দাঁড়াল।

"নসরু দাঁড়া।" সরোজের জোরাল নির্দেশ।

নসরু থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে গিয়ে কিছু একটা বলতে গিয়ে দেখল ওর চারপাশে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে অনেক লোক। তার মধ্যে একজন সুধীশ। ওকে চেনে। ওর মিথ্যার অজুহাতের বেলুন যে ফেঁসে গেছে বুঝে গেল। নসরু দাঁড়া ডাকের সঙ্গে ওর শরীরের চমকের সঙ্গে সে বুঝিয়ে দিয়েছে সুধীশ সঠিক লোককেই নির্ণয় করেছে। খেলা শেষ।

সরোজ কনস্টেবল পাণ্ডেকে বলল, "হাতকড়ি লাগাও।" পাণ্ডে তার কোমরে গোঁজা হাতকড়িটা বার করে নসরুর বাঁ হাতে একটা দিক লাগিয়ে অন্য প্রান্তটা নিজের ডানহাত দিয়ে শক্ত করে ধরে রাখল।

দূরে অপেক্ষারত গাড়ি এসে গেছে। নসরুকে নিয়ে সরোজরা লালবাজারের দিকে রওনা দিল। গঙ্গার বুক তখন জোয়ারের প্রস্তুতি নিচ্ছে। ঘাসের গুল্মগুলো জলের তলায় লুকিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

নসরু জোয়ারের জল খেয়ে শুধু বলল, সে নিজের হাতে খুন করেনি কাউকে তবে ধানক্ষেতি মসজিদ ও ধানক্ষেতির মাঠে সে উপস্থিত ছিল। মোকতার আলির মৃতদেহ পুড়িয়ে ফেলার বুদ্ধিটা যে তারই সে স্বীকার করল। আর বলল, তার ভাই কাল্লুর কোনও খবর তার কাছে নেই। ঘটনার দিন থেকে দু'জনে ছাড়াছাড়ি। বর্ধমান থেকে দু'দিন আগে ফিরে বজবজের এক পরিচিত দর্জির বাড়িতে সে আশ্রয় নিয়েছিল। ভেবেছিল, টাকা নিয়ে সে মুম্বাই পাড়ি দেবে। সেখানে সে অনায়াসে আত্মগোপন করে থাকতে পারবে। তার বহু দোস্ত মুম্বাইয়ের দাদার ও বান্দ্রা অঞ্চলে আছে। আউটরাম ঘাটে আটকে পড়াতে তার আর স্বপ্ন পূরণ হলো না। তাকে এখন চার দেওয়ালের মাঝেই থাকতে হবে।

তেরো তারিখ সকালে অফিসে এসেছি, আমাকে সেই একই সোর্স খবর দিল, মেহেতা সাহেবের খুনের আর এক আত্মগোপনকারী আসামির খোঁজ সে পেয়েছে। আসামির নাম দিলওয়ার হোসেন।

এই সেই দিলওয়ার বাতিকলে সেকেন্ড লেনে আবদুল লতিফ খানের গোসলখানায় মেহেতা সাহেবকে খুন করার সময় অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিল। ওর বাতিকলের বাড়িতে সরোজরা দু'দুবার হানা দিয়েও ওর টিকির সন্ধান পাওয়া যায়নি। টেলিফোনে সোর্সকে আমি বললাম, "তুই এক্ষুণি মোহনবাগান মাঠের কাছে চলে আয়, আমি যাচ্ছি।"

ফোনটা নামিয়েছি কী নামাইনি, আর একটা খবর, এটা অবশ্য মেহেতা

সাহেবের খুনের মামলা সংক্রান্ত নয়। এক ব্যাঙ্ক ডাকাতির আসামি সংক্রান্ত। সেটাও জরুরি। সেখানেও যেতে হবে। কোন দিকে যাব?

ব্যাঙ্ক ডাকাতের যে খবর দিল তাকে জিজ্ঞেস করলাম, "তুই কতক্ষণ থাকবি?"

সোর্স বলল, "আমি তো স্যার আছি, কিন্তু ও যে বাড়িতে এসেছে সে কতক্ষণ থাকবে তাতো বলতে পারছি না।"

ঠিকই। ডাকাত কতক্ষণ আমাদের জন্য অপেক্ষা করবে সোর্স ছেলেটা কী করে বলতে পারবে? কী করি, কোন দিকে যাই। এই ডাকাতটাকেও আমরা বহুদিন ধরে খুঁজছি। এমন পরিস্থিতি, দু'দিকের দুটো সোর্সকেই অন্য কোনও অফিসার চেনে না যে, তাদের কাউকে একদিকে পাঠিয়ে দিয়ে আমি অন্যদিকে চলে যাব। এমন পরিস্থিতিতে নিজের দায়িত্বপ্রাপ্ত দফতরের স্বার্থটাই আগে দেখলে ভাল হয়। না আমি তেমন সিদ্ধান্তে এলাম না।

ডাকাত ধরতে যেতে হবে বাগুইহাটি। লালবাজার থেকে অনেকটা দূর। তার আগে আমি মেহেতা সাহেবের খুনের আসামিকে গ্রেফতারের ব্যবস্থা করব। তারপর বাগুইহাটি যাব। ততক্ষণে যদি ডাকাতটা চলে যায় যাবে। তাকে পরে ধরার চেষ্টা করব। কী করা যাবে? কিন্তু মেহেতা সাহেবের খুনের আসামিকে গ্রেফতারের চেষ্টাই প্রথম স্থান দেব।

সরোজকে খবর দিলাম। সরোজ এল। সুধীশ ওকে প্রতিক্ষেত্রে সঙ্গ দিচ্ছে বলে ওকেও ডেকে দ্রুত আমি ওদের নিয়ে দফতর থেকে নিচে নেমে এসে গাড়িতে বসে গাড়ি ছোটালাম মোহনবাগান মাঠের দিকে। ওইখানেই সোর্স আসবে, যে দিলওয়ারের খবর শুধু দেবে না, আড়ালে দাঁড়িয়ে তাকে চিনিয়েও দেবে।

গাড়িতে যেতে যেতেই আমি এই ছোটার কারণটা সরোজদের জানিয়ে দিলাম। আমার সোর্স আমাদের পৌঁছানোর আগেই মোহনবাগান মাঠের গেটের উল্টো দিকে ইডেন গার্ডেন্সের প্রাচীরের পাশে রাস্তায় পায়চারি করছে।

আমরা এগারোটার মধ্যে পৌঁছে গেছি। আমি গাড়ি থেকে উঁকি দিতেই ও এগিয়ে এল। আমি ওকে গাড়িতে তুলে নিয়ে আকাশবাণী ভবনের দিকে চললাম। সে জানাল দিলওয়ার বারোটার পর নিউমার্কেটে এক সাট্টাবাজের কাছে টাকা নিতে আসবে। ঠিক হলো, সরোজ ও সুধীশ যাবে। সোর্স দিলওয়ারকে চিনিয়ে দেবে। হগ স্ট্রিটের কোন জায়গায় সোর্স ছেলেটি সরোজদের জন্য অপেক্ষা করবে তাও সে সরোজ ও সুধীশকে জানিয়ে দিল।

সোয়া এগারোটা নাগাদ আমি ওকে রাজভবনের পশ্চিম গেটের সামনে

গাড়ি থেকে নামিয়ে তাড়াতাড়ি লালবাজারে ফিরে এলাম। আমি যে বাগুইহাটির দিকে ডাকাত ধরতে ছুটব তাও সরোজদের জানিয়ে দিয়েছি।

লালবাজারে এসে আমাদের দারুণ তৎপরতা বেড়ে গেল। দুটো দল দু'দিকে ছুটবে। একদল যাবে খুনী ধরতে। অন্যদল ডাকাত।

আমি, উমাশংকর, শচী দুটো গাড়িতে আরও ছ'জন কনস্টেবলকে নিয়ে ছুটলাম বাগুইহাটির দিকে। জানি না, ওখানে আমাদের জন্য কী অপেক্ষা করছে। ডাকাতটা এখনও আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে কী করছে না।

আমাদের প্রায় পেছন পেছন সরোজরাও বেরিয়ে পড়ল। হগ স্ট্রিটে ওদের জন্য আমার সোর্সটা অপেক্ষা করবে। জানি না, ওদের অভিযানের ফল কী হবে, একটাই আস্থা, এই সেই সোর্স যে নসরুর খবর ঠিক ঠিক দিয়েছিল। শুধু তাই নয়, এই ছেলেটি আমাকে আরও অনেক সঠিক খবর দিয়েছে। চাঁদনি চক, সাকলাত প্লেস থেকে গ্রান্ট স্ট্রিট, নিউ মার্কেটের বেশ বিস্তৃত অঞ্চলের মুসলমান সমাজে ওর গতিবিধি একেবারে মসৃণ। এক নম্বর, দু'নম্বর ব্যবসা করে। সেই সূত্রেই তার কাছে খবরের যোগান হয়। যেগুলো আমাদের কাজে লাগে।

আমি, উমাশংকর, শচী আর কনস্টেবল শচীন একটা গাড়িতে, অন্য গাড়িতে বাকি কনস্টেবলেরা আমাদের পেছন পেছন আসছে।

মধ্য কলকাতার গাড়ির দঙ্গল কাটাতে কাটাতে আমরা সাড়ে বারোটা নাগাদ ফুলবাগানের মোড়ে এসে পৌঁছালাম। এবার গাড়ি একটু দ্রুত ছুটবে। আমাদের মনও দ্রুত ছুটছে। দু'দিকে। দিলওয়ার বারোটার পর নিউ মার্কেটে এক সাট্টাবাজের কাছে আসার কথা। এল কিনা, জানি না। ওকে সরোজরা ধরতে পারল কি না সেই খবর জানার জন্য মনের একটা দিক উদগ্রীব হয়ে আছে।

মনের অন্য অংশটা চাইছে দ্রুত বাগুইহাটির মোড়ে পৌঁছাতে, যেখানে আমার জন্য চুয়াল্লিশ নম্বর বাস স্ট্যান্ডের উল্টোদিকে দাঁড়িয়ে থাকবে আমার আর একটা সোর্স। সেও খুব বিশ্বস্ত। নিজে একসময় এক ডাকাত দলে ছিল, আমাদের হাতে গ্রেফতার হয়ে বছর চারেক জেলখানাতেও ছিল। জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর ওকে আবার আমি ধরে আনি, এবং সে আমাকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলে ওকে আমি ছেড়ে দিই। সেই থেকে ও আমার বিশ্বস্ত সোর্স। ছোট একটা পাইস হোটেল ও পান বিড়ি সিগারেটের দোকান চালায় আর আমাকে খবর দেয়। উত্তর চব্বিশ পরগনার ওই অঞ্চলের দুষ্কৃতীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে, আমারই নির্দেশে।

গাড়ি ভি আই পি রোড দিয়ে দ্রুত উত্তরমুখী ছুটছে। ডাকাতটি যে খুবই বুদ্ধিমান সে খবরও আমাদের কাছে আছে। আমাদের প্রসারিত হাত এড়িয়ে প্রায় বছরখানেক ধরে ছুটে বেড়াচ্ছে। ওর দলের অন্য ডাকাতরা আমাদের হেফাজতে থাকার ফলে ওর বর্তমান চরিত্রটা চড়াই পাখির মতো। কোনও জায়গায় বেশি সময় তিষ্ঠনো ওর ধাতে নেই। আর একটা বিষয়ও সে নিয়ম মেনে চলে। কলকাতা শহরে সে আসেই না। এড়িয়ে চলে। লালবাজারের দৃষ্টির বাইরেই থাকতে চায়।

বাগুইহাটির মোড়ে যখন আমরা এলাম তখন ঘড়িতে দুপুর একটা। এই সময়টায় ওই প্রাক্তন ডাকাত, বর্তমানে আমার সোর্স ছেলেটি ওর পাইস হোটেলে প্রচণ্ড ব্যস্ত থাকে। বাগুইহাটি বাজারের সবজি-বিক্রেতা, মিস্ত্রি, রিকশাচালকরা ওর খদ্দের। ওর সঙ্গে সবার ভাব। ব্যবসা চালাতে ও সোর্সের কাজ করতে প্রত্যেকের সঙ্গে ভাব রাখাটাই মূলধন। পাইস হোটেলের সুবাদে বহু লোকের সঙ্গে দৈনন্দিন যোগাযোগ ওর অনায়াসেই ঘটে।

বাগুইহাটি মোড় থেকে সামান্য এগিয়ে ঠিক চুয়াল্লিশ নম্বর বাস স্ট্যান্ডের উল্টোদিকে আমার জন্য ওর অপেক্ষা করার কথা।

গাড়ির গতি কমিয়ে মোড়টা পার হতেই দেখলাম, ছেলেটি একটা প্রাচীর ঘেঁষে একটা বড় গাছের তলায় দাঁড়িয়ে আছে। ওকে ছাড়িয়ে আমি চলে গেলাম। গাড়ি দাঁড় করিয়ে শচীনকে সঙ্গে নিয়ে আমি ওই ছেলেটার দিকে এগিয়ে গেলাম। শচীন ওর সঙ্গে গিয়ে যে বাড়িতে ডাকাতটা এসেছে সেই বাড়িটা দেখে আসবে। তারপর আমরা গিয়ে হানা দেব।

সোর্স ছেলেটিও আমাদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। ওর মধ্যে কোনও উত্তেজনা নেই। এটা ভাল সোর্সের লক্ষণ। নির্বিকার থাকাটা ওদের বিশেষ কাজের মধ্যে পড়ে। হাসিখুশি, দরাজ, বন্ধুপ্রীতি, সামাজিক, উদাসীন ও নির্বিকার থাকার অভিনয়টা যে যত ভাল করতে পারে সে তত খবর সংগ্রহ করতে পারে। সোর্সের কাজে দক্ষ হবে। এই ছেলেটি খুব অল্প সময়েই নিজগুণে এই সব দক্ষতা অর্জন করে নিয়েছে। কৃতিত্বটা ওর একার।

ওর সঙ্গে মুখোমুখি হতেই আমার জিজ্ঞাসু দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে নিচু স্বরে বলল, "পালিয়েছে।"

"কতক্ষণ আগে?"

"মিনিট পনের হলো।"

অর্থাৎ খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা রওনা দিলে ওই ডাকাতটাকে আমরা পেয়ে যেতাম। মেহেতা সাহেবের খুনী দিলওয়ার হোসেনের খবরটা যথারীতি কার্যকর করতে গিয়েই এখানে পৌঁছাতে দেরি করে ফেলেছি। এখন সান্ত্বনা পাওয়া যাবে যদি সরোজরা নিউ মার্কেট থেকে দিলওয়ারকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়।

সোর্স ছেলেটা মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে। ওর কোনও দোষ নেই। দোষ আমার। তাই ওকে উৎসাহ দিতে বললাম, "আজ ফসকেছে, যাক, খোঁজ রাখ। কোনদিকে গেল?"

"দমদমের দিকে। পঁয়তাল্লিশ নম্বর বাসে উঠে। তবে ও যে রকম, হয়তো দু'তিন স্টপেজের পরই ও বাস থেকে নেমে, রাজারহাটের দিকে চলে যাবে।" সোর্স ছেলেটির উত্তরে আমি হতাশ গলায় শুধু বলতে পারলাম, "হুঁ।"

এখানে আর অপেক্ষা করার দরকার নেই। বললাম, "তুই যা, খবর দিবি।"

আমি আর শচীন উল্টো রাস্তা ধরে আমাদের গাড়ির দিকে এগিয়ে গেলাম। আমাদের মুখ দেখে উমাশংকররাও হতাশ। শচীনকে নিয়ে আমি ফিরে আসতেই ওরা বুঝে গেছে এবার আমাদের খালি হাতে লালবাজারের দিকে ফিরতে হবে।

গাড়ি ঘুরিয়ে আমরা সেদিকেই ছুটলাম। ব্যর্থতায় সবারই মন খারাপ হয়, আমাদেরও হলো। সরোজরা সফল হলে আমাদের বাগুইহাটি অভিযানের ব্যর্থতায় খানিকটা প্রলেপ পড়বে। সেই আশাতেই আমরা ফিরছি।

সরোজরা ও আমরা দু'দলই সফল হলে তবে লালবাজারে একটা দমকা খুশির হাওয়া বহে যেত। সেটা আর সম্ভব নয়। এখন আমার চাঁদনি চকের সোর্সটা যদি মুখরক্ষা করে তবে অর্ধেক সফল হব।

আড়াইটা নাগাদ আমাদের গাড়ি লালবাজারে প্রবেশ করতেই দ্রুত আমরা নেমে গিয়ে ছুটতে ছুটতে আমাদের গোয়েন্দা দফতরে পৌঁছে গেলাম। সরোজদের অভিযানের ফলটা জানার জন্য।

সামনেই দীপকের সঙ্গে দেখা। তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করলাম, "কি রে?"

দীপক একটু হাসল। বলল, "পেয়েছে।"

দীপকের কথায় আমার বুক থেকে একটা হালকা হাওয়া বেরিয়ে গেল। যাক, একটা জায়গায় তো সফল হওয়া গেছে।

দীপকই জানাল, "আমাদের ঘরে বসে আছে।"

আমি দীপককে নিয়ে দিলওয়ারকে দেখতে গেলাম। সরোজরা ঘিরে ওকে

জেরা করছে। আজ সারাদিন ধরে দফায় দফায় জেরা চলবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না বিস্তারিতভাবে ঘটনার বিবরণ জানাবে।

পরীক্ষায় পঞ্চাশ নম্বর পেয়ে আমি আমার ঘরের দিকে ফিরে চললাম। উমাশংকর ও শচী মার্ডার সেকশনে আটকে গেল।

সুধীশের কাছে ওদের অভিযানের বিবরণ শুনলাম। ওরা ঠিক বারোটা নাগাদ হগ স্ট্রিটে পৌঁছেছিল। আমার সোর্স নির্দিষ্ট জায়গায় ওদের জন্য অপেক্ষা করছিল। ঠিক কোন জায়গায় দিলওয়ারের আসার কথা সেটা সে জানিয়ে দিতেই আমাদের বাহিনী আনাচে কানাচে দাঁড়িয়ে দিলওয়ারের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে।

দিলওয়ার ঠিক একটা দশ মিনিট নাগাদ সাট্টাবাজের কাছে আসে। সোর্স ইশারায় দেখিয়ে দিতেই সরোজ ও সুধীশের কোনও অসুবিধাই হয়নি দিলওয়ার হোসেনকে গ্রেফতার করে লালবাজারে নিয়ে আসার।

নান্নে কসাই-এর আগেই আলিপুরের বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে তার জবানবন্দী লিপিবদ্ধ করিয়ে দিয়ে এসেছে। সেখানে সে দিলওয়াররা বাতিকলে কিভাবে মেহেতা সাহেবকে খুন করেছে তার বর্ণনাও দিয়েছে, এবং ওখানে কে কে উপস্থিত ছিল তাও সে জানিয়েছে।

দিলওয়ার যে ওই খুনের একটা প্রধান আসামি সে ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই। স্বীকারোক্তির আগে সে সরোজদের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবে না। যতই যে শক্তপোক্ত ক্রিমিনাল হোক না, একবার যদি আমরা জেনে যাই ধৃত আসামিই অপরাধী তখন স্বীকারোক্তি ছাড়া তার আর উপায় নেই। যে কোনও পদ্ধতি ও উপায়ে গোল করে ওকে হারিয়ে তাকে ধরাশায়ী করবই করব। দিলওয়ার সরোজদের হাত থেকে পালাবে কী করে? আমার ঘর থেকে আমি শুনতে পেলাম দিলওয়ারের গলার স্বর। স্বীকার করার পূর্ব মুহূর্ত ঘনিয়ে এসেছে, আমি বুঝতে পারলাম।

দিলওয়ারকে পরদিন আদালতে হাজির করিয়ে আমাদের লকআপে রাখার অনুমতি নিয়ে আসা হলো। দিলওয়ার আস্তে আস্তে সবই স্বীকার করতে লাগল। কিন্তু অন্য অপরাধীর খোঁজ দিতে ব্যর্থ হলো।

কিন্তু দিলওয়ারকে গ্রেফতার করার পর অগ্রগতি হঠাৎ সঙ্কুচিত হয়ে গেল। এমনই হয়। সুতো ধরে এগিয়ে যেতে না পারলে হঠাৎ প্রবাহ থেকে হারিয়ে যেতে হয়। তখন ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোনও উপায় থাকে না।

সরোজরা এই সময়টা ঘটনার সাক্ষী যোগাড় করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। ওই অঞ্চল থেকে সাক্ষী যোগাড় করাটা একটা কঠিনতম কাজ। কারণটা

খুবই সহজবোধ্য। ভয়ে এবং খুব সম্ভবত প্রচ্ছন্নভাবে ধর্মের অনুশাসনের হুকুমের কবলে পড়ে।

কিন্তু হাল ছেড়ে তো বসে থাকলে চলবে না। কারণ অপরাধীদের শুধু গ্রেফতার করলেই চলবে না। আদালতে মামলা পরিচালনা করে অপরাধ প্রমাণ করে ওদের শাস্তি দিতে হলে সাক্ষী চাই। তাই সাক্ষীর জন্য সরোজদের এত ছোটাছুটি।

সরোজদের এই ছোটাছুটির মধ্যেও আত্মগোপনকারী অপরাধীদের খবর পাওয়ার জন্য প্রত্যেকেই চেষ্টা করতে লাগলাম। সেখানে কোনও ঘাটতি নেই।

আঠাশ তারিখ দক্ষিণ বন্দর থানার সাব-ইন্সপেক্টর এস পি ঘোষ বিচালিঘাট থেকে আসামি শেখ ঝুমন ওরফে ডনকে গ্রেফতার করে লালবাজারে পাঠিয়ে দিল।

ডন বেশি সময় নেয়নি। সরোজদের অল্প আয়াসেই সে তার দোষ স্বীকার করে নিয়েছে। সে ঘটনার পরই গঙ্গার উল্টো পারে হাওড়া জেলার নাজিরগঞ্জে ওর এক পুরনো বন্ধুর বাড়িতে আশ্রয় নেয়। সেখানেই সে এতদিন ছিল। কিন্তু ওর এভাবে বিনা নোটিশে আসা এবং থাকার জন্য ওর বন্ধুর মনে সন্দেহ হতে থাকে যে হয়তো ডনও মেহেতা সাহেব খুনের সঙ্গে জড়িত।

বন্ধু যে তার গতিবিধি সন্দেহের চোখে দেখছে তা ডনের কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়। সে তাই আর নাজিরগঞ্জে থাকাটা নিরাপদ নয় বুঝতে পেরে বাঁচার জন্য বিচালিঘাটে পালিয়ে আসে এবং তখনই গ্রেফতার হয়ে সোজা লালবাজার।

মে মাসের ষোল তারিখ সকালে সুধীশ বন্দর থানার অফিসারদের সাহায্য নিয়ে বিচালিঘাট সংলগ্ন একটা ছোট দোকানের পেছনে একটা ঘর থেকে সাকিল আহমেদকে গ্রেফতার করে লালবাজারে নিয়ে এল।

পরদিন দুপুর দুটো নাগাদ খবর পেলাম, মহঃ হোসেন চৌধুরি, যে বাতিকলে মেহেতা সাহেবকে খুন করার নেতৃত্ব দিয়েছে, সে তার জামাইয়ের বাড়ি কামারহাটিতে আত্মগোপন করে আছে।

আমার খবরদাতা আমার অফিসে এসেই খবর দিয়েছে। সরোজকে ডাকিয়ে এনে ওই খবরদাতার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলাম। ঠিক হলো কামারহাটির মুক্তি সিনেমা হলে আমার খবরদাতা হোসেন চৌধুরিকে সান্ধ্য শো'য়ে নিয়ে আসবে। তখনই সরোজ ওকে গ্রেফতার করবে।

সরোজ ওর সঙ্গে কনস্টেবল অর্জুন বেরা ও এন মণ্ডলকে নিয়ে আমার

খবরদাতাকে সঙ্গে করে আড়াইটা নাগাদ একটা গাড়িতে বেরিয়ে গেল। আমরা ওদের ফেরার অপেক্ষায় রইলাম।

ওরা পৌনে চারটে নাগাদ কামারহাটিতে বি টি রোডের ওপর মুক্তি সিনেমার সামনে এল। খবরদাতা সিনেমা হলের কাছে একটা দোকানের সামনে সরোজদের গাড়িতে অপেক্ষা করতে বলে চলে গেল।

মিনিট দশেকের মধ্যে খবরদাতা অন্য একটা মুসলিম লোককে সরোজের কাছে নিয়ে এল। সেও সরোজকে বলল, তারা দুজনে মিলে হোসেন চৌধুরিকে সান্ধ্য শো'য়ে মুক্তি সিনেমায় সিনেমা দেখার অছিলায় নিয়ে আসবে। যদি ওরা অকৃতকার্য হয়, তবে সেটাও তারা সরোজকে জানিয়ে দেবে। তখন সরোজ স্থানীয় বেলঘরিয়া থানার সাহায্য নিয়ে যে বাড়িতে হোসেন আশ্রয় নিয়েছে সেখানে হানা দিয়ে হোসেনকে গ্রেফতার করবে।

সরোজরা ওদের কথামতো মুক্তি সিনেমা হলের সামনে অপেক্ষা করতে লাগল। সাড়ে চারটে নাগাদ খবরদাতা ও তার সঙ্গী একজন কালো, বয়স্ক মুসলিম লোককে নিয়ে সিনেমা হলের সামনে এল।

সরোজ বুঝে গেল, ওদের পরিকল্পনা সার্থক হয়েছে। এবার ওর কাজ। সরোজ ওর সঙ্গী দুই কনস্টেবলকে নিয়ে এগিয়ে গেল সিনেমা হলের সামনে। সান্ধ্য শো'য়ের জন্য তখন দর্শকের আনাগোনা অব্যাহত। ওরা যে ওর দিকে এগিয়ে আসছে তা হোসেন টেরই পেল না।

সরোজ ঝট করে হোসেন চৌধুরির সামনে দাঁড়িয়ে ওর ডান হাতটা ধরল। হোসেন ভ্যাবাচেকা খেয়ে তাকিয়ে দেখল ওর দুই সঙ্গী ছুটে পালিয়ে যাচ্ছে।

সরোজ হোসেনকে বলল, "লালবাজার চল। ওদের আমার দরকার নেই। শুধু তোকে দরকার।" হোসেনকে টানতে টানতে সরোজরা গাড়িতে এনে তুলল। সিনেমা হলের দর্শকরা দর্শক হয়েই ওদের দিকে তাকিয়ে রইল। হয়তো ভাবছে, সিনেমা কী এখানেই শুরু হয়ে গেল?

সরোজকে কামারহাটিতে পাঠিয়ে আমি লালবাজারে ওদের ফেরার অপেক্ষায় অস্থির হয়েছিলাম। কারণ, হোসেন মেহেতা সাহেবের খুনের মামলায় অন্যতম প্রধান আসামি। তাছাড়া খবরের সূত্র আমার দেওয়া। সোর্স যদি ভুল খবর দেয় তার কিছুটা দায়িত্ব আমার উপরও বর্তাবে। তবে তাতে পরিস্থিতির কিছু পরিবর্তন হবে না। হোসেনকে সরোজরা গ্রেফতার করতে পারলে আমাদের সাফল্য নয়ত যেমন ছিল তেমনই থাকবে।

আমার অস্থিরতার কারণ এটাই। সফল হতে কে না ভালবাসে। কাজের লক্ষ্যই তো সফল হওয়া। তাই আমিও দুপুর থেকে সরোজদের ফেরার

অপেক্ষায় পথ চেয়ে বসে আছি। শুধু আমি নয়, দীপক সমেত মার্ডার সেকশনের অন্য অফিসাররাও।

সরোজরা সন্ধে সাতটার পর হোসেনকে নিয়ে এল। আমাদের মুখে হাসিও ফুটল। না, হোসেন সরোজদের বেশি বিরক্ত করেনি। সে লালবাজারের গোয়েন্দা দফতরে এসেই স্বীকার করল যে, মেহেতা সাহেবকে খুনের সে অন্যতম কাণ্ডারী। নাসো, ফুটন, সামসাদ, আব্বাস, মুকিম, আকতার, লোকমানের সঙ্গে সেও বাতিকলে লতিফ খানের গোসলখানায় ছিল। এবং মেহেতা সাহেবের মৃতদেহ সে আটাকলে ওর বাড়ির পেছনের কাঁচা নর্দমায় ফেলে এসেছিল তাও যে তার মস্তিষ্কপ্রসূত সেটাও সে স্বীকার করে নিল। কিন্তু আত্মগোপনকারী অন্য কোনও আসামি সম্পর্কে হোসেন কোনও খবর দিতে পারল না।

মে মাসেরই তেইশ তারিখ বিকেল সাড়ে চারটে নাগাদ আমাদের অফিসার সুধীশ নাগ খবর পেল আত্মগোপনকারী মেহফুজ আলমকে রেস কোর্সের কাছে পাওয়া যাবে। খবরটা ওকে দিল ওরই এক পুরনো সূত্র। গার্ডেনরিচ অঞ্চলের সেই সোর্স জানাল বিকেল পাঁচটার পর সুধীশরা খিদিরপুর ব্রিজের উত্তরদিকে রেস কোর্সের প্রান্তে এলে সে নিজেই মেহফুজ আলমকে নিয়ে ওখানে যাবে। মেহফুজ রেসকোর্সে ওর সঙ্গেই থাকবে।

অফিসার নাগ গার্ডেনরিচ থানায় থাকার সময়ই মেহফুজ আলমকে চিনত। এরা বেশিরভাগই পুরনো দুষ্কৃতী। আশেপাশের প্রায় সব থানাতেই এদের দু'একবার করে ভ্রমণ করা আছে। অবশ্যই আসামি হিসাবে।

খবর পাওয়ার পর নাগ সরোজকে জানাল। সরোজ আর সুধীশ নাগ আরও চারজন কনস্টেবলকে নিয়ে রেস কোর্সের দিকে রওনা দিল। ঠিক পাঁচটার সময় সরোজরা খিদিরপুর ব্রিজের উত্তর পূর্ব প্রান্তে সোর্সের পরামর্শ অনুযায়ী দাঁড়াল। এবার ওদের ছ'জোড়া চোখ অধীর আগ্রহে পথের দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। যদিও নাগ ছাড়া উপস্থিত অন্যারা মেহফুজ আলমকে চেনে না।

মিনিট কুড়ি অপেক্ষা করার পর নাগের ঠোঁটে হাসি ফুটে উঠল। সরোজকে সে জানাল, "আসছে।" কনস্টেবলেরাও তৈরি হয়ে নিল। কী পরিস্থিতি যে হবে তা তো আগে থেকে অনুমান করা যায় না। বিনা বাধায় গ্রেফতার করতে পারলে তো কোনও সমস্যা নয়, কিন্তু আসামি যদি ছুটতে শুরু করে, বা গায়ের জোর দেখায় তখন আমাদেরও পরিস্থিতি অনুযায়ী কাজ সমাধা করতে হয়। আর এইসব ব্যস্ত, একনাগাড়ে দ্রুত ধাবমান গাড়ির রাস্তায় আমাদের পুলিশ বাহিনীকে খুব সতর্ক হয়ে পরিস্থিতির মোকাবিলা

করতে হয়। তাই সরোজরা অতিরিক্ত সতর্ক হয়ে মেহফুজ আলমের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

রেস কোর্সের দিক থেকে দুটো ছেলে কথা বলতে বলতে এগিয়ে আসছে। অন্য পথচারীরাও যাচ্ছে আসছে। ফাঁকা ফাঁকা। হাঁটার মধ্যে কোনও ব্যস্ততার ছাপ নেই। মে মাসের গরমে ঘামে ভেজা পড়ন্ত বিকেলে সবাই যেন হাঁপিয়ে উঠেছে। দম যেন শেষ। কোনওমতে টেনে টেনে চলার ধরন দেখে তাই মনে হয়।

কিন্তু সরোজদের হৃৎপিণ্ড ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। চাইছে, মেহফুজরা তাড়াতাড়ি হেঁটে এসে তাদের খাঁচায় ঢুকে যাক। তারা তাকে নিয়ে লালবাজারে ফিরে যাবে।

ঠিক সাড়ে পাঁচটার সময় মেহফুজ ও সুধীশের সোর্স খিদিরপুর ব্রিজের উত্তরপূর্ব প্রান্তে সরোজদের সামনে এল। সুধীশ মুখটা এতক্ষণ ঘুরিয়ে রেখেছিল যাতে মেহফুজ তাকে দূর থেকে দেখতে না পায়।

মেহফুজ সামনে আসতেই সুধীশ ঝট করে তার শরীর ও মুখ ঘুরিয়ে মেহফুজের মুখোমুখি। একটা হাত ওর জামার কলারটা চেপে ধরেছে। সুধীশের সোর্স আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু রোড ধরে উল্টো দিকে দৌড়।

মেহফুজ আলমকে ওরা গ্রেফতার করল। মিনিট পনেরোর মধ্যেই ওকে নিয়ে সরোজরা লালবাজারে। না, মেহফুজ, হোসেনের মতো আয়াসে সব কথা স্বীকার করবে না। ওর জন্য সরোজদের পরিশ্রম করতে হবে। কতটা, তা দুই এক ঘণ্টার মধ্যে বোঝা যাবে।

উনত্রিশে মে রাত সাড়ে এগারোটার সময় গুণ্ডা দমন শাখার ইন্সপেক্টর পি. চট্টোপাধ্যায়ের কাছে খবর এল জি তিনশ তেইশ নম্বর আলিফ নগরে ইশাক কাওয়ালের বাড়িতে একটা ঘরে আসামি মহঃ ইউনুস ও খুরাম রাত যাপন করতে আসে।

খবর পাওয়ার পরই ইন্সপেক্টর চট্টোপাধ্যায় সঙ্গে সঙ্গে সরোজকে খবর দিল। সরোজ খবর দিল সুধীশ নাগকে।

ওরা যখন ফোর্স নিয়ে লালবাজার থেকে বের হলো তখন ইংরেজি ক্যালেন্ডারের দিন পাল্টে গেছে। রাত সোয়া বারোটা নাগাদ দুটো অ্যাম্বাসেডর গাড়ি নিয়ে গার্ডেনরিচের দিকে রওনা দিল।

রাস্তা ফাঁকা। গার্ডেনরিচ পৌঁছাতে ওদের বেশি সময় লাগার কথা নয়। লাগলও না। রাত একটা নাগাদই ওরা গার্ডেনরিচের আলিফ নগরে পৌঁছে গেল। রাতে গার্ডেনরিচ অঞ্চলে গলির অর্থ যখন তখন দুষ্কৃতীদের মোকাবিলা

করার জন্য প্রস্তুত থাকা। দুষ্কৃতী, মাতাল ও রাস্তার কুকুর ছাড়া কাউকে পাওয়া দুষ্কর।

খবরদাতা আর একটা উপকার করল। সে আলিফনগরের রাস্তার সামনে অপেক্ষা করছিল। সঠিক বাড়িটা চিহ্নিতকরণের জন্য। গরমকালে ওই অঞ্চলে সাধারণ মানুষ অনেকেই ঘরের বাইরে খাটিয়া নিয়ে এসে ঘুমায়। কিন্তু এবছরই ব্যতিক্রম। দু'একজন ছাড়া কেউ আর ঘর থেকে এমনকী নিজ বাড়ির উঠোনেও শয্যা প্রস্তুত করেনি। ভয়ে, পুলিশের না দুষ্কৃতীদের সেটা বোঝা মুশকিল। মেহেতা সাহেব ও মোকতার আলি খুন হয়ে যাওয়ার পর আমাদের বাহিনীর ঢেউয়ের মতো হানা ওই অঞ্চলে হয়েছে। তার মধ্যে তো অস্বাভাবিকতার কিছু নেই। এরকমই হবে। তাতে অঞ্চলের সাধারণ মানুষও ভীত হতে পারে।

খবরদাতা শুধু চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে অন্ধকার রাস্তা ধরে এগিয়ে গিয়ে ইশাক কাওয়ালের বাড়িটা দূর থেকে দেখিয়ে অন্ধকারে হারিয়ে গেল।

ওই অঞ্চলের বেশিসংখ্যক বাড়ির মতো এটা একটা। অন্ধকারে গা এলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একটা একতলা ছোট বাড়ি। সেই বাড়ি ঘিরে অনেকগুলি টালির ছাউনি দেওয়া ঘর। ইশাক কাওয়াল মৃত, সেটা খবরদাতা জানিয়ে গেছে। তার ছেলের নাম আনোয়ার, সেই এখন কর্তা। চট্টোপাধ্যায় দূরে অপেক্ষারত সরোজদের ডেকে নিয়ে এল।

ফোর্স পুরো বাড়িটা ঘিরে ফেলল। আশেপাশের সব বাড়িই এই বাড়িটার মতো ঘুমন্ত। ছোট ছোট জানালাগুলি কারও খোলা, কারও বন্ধ। এই গুমোট গরমেও কীভাবে জানালা দরজা বন্ধ করে দিব্যি নিদ্রায় মগ্ন। একমাত্র ওইসব বাড়ির নিদ্রারত মানুষেরাই বলতে পারবে। তার ওপর এইসব মানুষেরা পেঁয়াজ রসুনের ভক্ত। রান্নায় তার অতিরিক্ত মাত্রায় যোগ প্রায় প্রতি খাদ্যেই থাকে। থাক। সরোজদের এখন একমাত্র প্রার্থনা পরিশ্রমের ফল হিসাবে মহঃ ইউনুস ও খুরামকে যেন গ্রেফতার করে লালবাজারে নিয়ে যেতে পারে। ঘুম বাদ দেওয়া পরিশ্রম যেন সার্থক হয়।

নিচু ছোট প্রাচীর ঘেরা বাড়ি। সামনে একটা কাঠের দরজা। কাঠের দরজায় কড়া নাড়িয়ে সরোজ আনোয়ারের নাম ধরে ডাকতে লাগল। মিনিট তিনেক পর দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রশ্নও ছুটে এল, "কৌন?"

"ম্যায় হুঁ।" সরোজের উত্তর।

দরজা খুলেই সামনে অন্ধকারে দাঁড়ান পাঁচ ছ'জন লোককে দেখে আনোয়ার ভয় পেয়ে গেল। কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, "কৌন হ্যায় আপ লোক।"

চট্টোপাধ্যায় বলল, "লালবাজার সে আয়া হ্যায়, ইউনুস কা ঘর বাতলাও।"

আনোয়ার কোনও প্রতিবাদ করল না। দরজা থেকে সরে দাঁড়িয়ে চট্টোপাধ্যায়দের জায়গা দিল ভেতরে যাওয়ার। সবাই ঢুকে গেল। অন্ধকারেই দেখা গেল ভেতরে একটা অবিন্যস্ত ছোট্ট উঠোন। সেই উঠোনকে ঘিরে টালির ছাউনি দেওয়া ঘরগুলি। আনোয়ার উঠোন পেরিয়ে একটা ওই রকম ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে বলল, "এ হি হ্যায়।"

সরোজই এগিয়ে গেল। ঘরটার সামনে নিচু কাঁচা বারান্দা। টালির চালও খুবই নিচু। সরোজ মাথা নিচু করে ঘরের সামনের দরজায় গিয়ে খটমট করে ধাক্কা দিতে লাগল। অন্যরা উঠোনে দাঁড়িয়ে ওই ঘরের দিকে দৃষ্টি দিয়ে অপেক্ষা করছে, ভেতর থেকে উত্তরের।

পুরনো কাঠের দরজার ওপর লোহার শিকলের জোরে জোরে আছাড় মারার খটখট খটখট আওয়াজ পুরো বাড়ির বাসিন্দাদেরই শোনার কথা, কিন্তু ওই ঘরের বাসিন্দারা কী শুনতে পাচ্ছে না? নিশ্চয়ই শুনছে, এই গরমে ঘুম কারও অতিরিক্ত গভীর হওয়ার কথা নয় যে, ঘরের দরজা ধাক্কার আওয়াজ ঘুমকে অতিক্রম না করে মস্তিষ্কে প্রবেশ করবে না। করবেই। নেশা করে শুলেও নেশা ভেঙ্গে যাবে।

তবে খুলছে না কেন? ঘরের বাইরে যে ক'জন লোক দাঁড়িয়ে আছে তাও ঘরের বাসিন্দারা আন্দাজ করতে পারছে। কারণ তারা তো একেবারে মুখ বুজে দাঁড়িয়ে নেই। কথাবার্তা বলছে। এবং স্বাভাবিক স্বরেই। অন্ধকার, নিশুত রাতে ওই স্বাভাবিক স্বরটাই কানের গভীরে বেশ উচ্চশব্দ হয়ে মস্তিষ্কের কোষে নাড়া দিয়ে জানান দেবে।

ইউনুস ও খুরাম কী বুঝতে পেরেছে, তারা ধরা পড়ে গেছে। সম্ভবত তাই। সেজন্যই ভয়ে তারা দরজা খুলছে না। তাই যতক্ষণ পারছে স্বাধীন থাকার ব্যর্থ চেষ্টা করছে। কিন্তু ওদের এটাও তো বোঝা উচিত যে, দরজা স্বইচ্ছায় ওরা খুলে না দিলে বাইরে অপেক্ষমান পুলিশের দল ওদের ইচ্ছার ওপর দাঁড়িয়ে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করবে না, বলপ্রয়োগ করবে। দরজা ভেঙ্গে ওদের গ্রেফতার করবে।

প্রায় মিনিট পাঁচ ছয়েক পর ভেতর থেকে একটা খট করে আওয়াজ। তারপর আবার একটা। দরজার পাল্লা দুটো আস্তে আস্তে খুলে গেল। অপেক্ষমান পুলিশ অফিসাররা ওদিকে দুচোখ খুলে তাকিয়ে আছে।

সামনে দাঁড়িয়ে ঘোমটায় মুখটা প্রায় ঢাকা। একজন মহিলা। বলল, "কিসকো মাঙ্গতা হায়।"

সরোজ বলল, "ইউনুস আউর খুরাম কো।"

মহিলা শান্ত নিচু স্বরে কোনওমতে বলল, "ম্যায় ইউনুস কো বিবি। ও লোক নেহি হ্যায়।"

চট্টোপাধ্যায় বলল, "নেহি হ্যায় ?"

মহিলা মাথা নেড়ে বলল, "নেহি।" সরোজ জিজ্ঞেস করল, "আপকো নাম ক্যেয়া হ্যায়।"

"ফতিমা বিবি। ও লোক বহুত রোজ সে ঘর মে নেহি আতা হ্যায়। আনোয়ার ভাই সব কুছ্ জানতা।"

ফতিমার কথা শেষ হতেই আনোয়ার বলল, "সাচ বাত, ইউনুস ও খুরাম কো বারি মে হামলোক কুছ্ নেহি বলনে সেকেগা। ভাগ গিয়া।"

হতাশ গলায় চট্টোপাধ্যায় একজন কনস্টেবলকে বলল, "সাচ বাত ? ইউনুসের ঘরের ভেতরটা দেখতো।" সেই কনস্টেবল টর্চের আলো ঘরের ভেতর ফেলল। একটা বাচ্চা ছাড়া ঘরে আর কোনও প্রাণী নেই। চারদিকে চরম দারিদ্র্যতার ছাপ। নোংরা, ছেঁড়া জামাকাপড়, ক'টা থালা বাসন, একটা ছোট ভাঙ্গা খাট, ক'টা ইঁটের ওপর দাঁড়িয়ে আছে।

চট্টোপাধ্যায় ও সরোজরা আনোয়ারের বাড়ি থেকে ফিরে এল আলিফ নগরের রাস্তায়। তখন রাত পৌনে দুটো।

রাতের অভিযানে ব্যর্থ হলে খুব খারাপ লাগে। সরোজদেরও লাগছিল। কিন্তু কী করবে। খবর একটা পেলে তা যাচাই করতে তো যেতেই হবে। কষ্ট যতই হোক। অভিযানে যাওয়ার আগে মানসিকভাবে আমাদের প্রস্তুত থাকতেই হয় যে, আমরা ব্যর্থও হতে পারি। আমরা একটা সুযোগ নিতে যাচ্ছি। খবরের সত্যতা ও সময় যদি ঠিক হয় আমরা ব্যর্থ হই না। ব্যর্থতা ও সাফল্যের মাপকাঠি এখানেই লুকিয়ে আছে।

সরোজই চট্টোপাধ্যায়কে বলল, "স্যার একটা চান্স নেব নাকি ?"

চট্টোপাধ্যায় জিজ্ঞেস করল, "কি রকম ?"

সরোজ বলল, "ক'দিন আগে খবর পেয়েছি লোকমান আর ওর ভাই ওসমান শা মাঝেমধ্যে ওদের বাড়িতে চুপচাপ রাত কাটিয়ে যায়। দেখি না আজ ওরা বাড়িতে এসেছে কি না।"

চট্টোপাধ্যায় বলল, "সে তো দেখা যেতেই পারে। এসেছি যখন, তখন ঘুরে দেখা যাক।"

ঘটনার পরদিন থেকে সরোজ আর সুধীশ এতবার এই অঞ্চলে এসেছে যে তারা এখন এখানকার অলিগলিগুলি নিজেদের হাতের চেটোর মতো চেনে। পথপ্রদর্শকের আর কোনও প্রয়োজনই হয় না।

লোকমানদের বাড়ি বাতিকলে। আলিফ নগর থেকে ওরা বাতিকলের দিকে চলল। অন্ধকার রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে ওরা যখন জি চুরানব্বই নম্বর বাতিকলে লোকমানদের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল তখন রাত দুটো। লোকমানদের বাড়িতে এর আগেও সরোজ দু'বার হানা দিয়েছিল। সুতরাং সেটা চিনতে তার কোনও অসুবিধাই হলো না।

যথারীতি অন্ধকারকে গায়ে মেখে কনস্টেবলেরা লোকমানদের বাড়ি ঘিরে ফেলল। এবার ঘুম থেকে তুলতে হবে বাড়ির ভেতরে নিদ্রারত মানুষদের। শুরু হলো দরজা ধাক্কা। প্রথম থেকে বেশ জোরে জোরে।

লোকমান আর ওর ভাই ওসমান বাড়ি আছে কী? খুনি দুই ভাই কী মেহেতা সাহেব ও মোকতার আলিকে খুন করে নিশ্চিন্ত মনে বাড়ির বিছানায় শুয়ে ঘুমাচ্ছে?

একটা জানালার পাল্লা খুলে গেল। একটা পুরুষের মুখ। লোকমান। তাকে চিনে ফেলেছে সুধীশ নাগ। "ক্যায় বাত?" লোকমানের প্রশ্ন।

"দরওয়াজা খোল, উসকু বাত দেখেগা, ক্যায়া বাত।" সুধীশের উত্তর।

দরজা খুলে গেল। ঘরে লোকমান ও ওসমান দু'জনেই উপস্থিত। ওদের যে এভাবে পাওয়া যাবে তা কেউ ভাবতেই পারেনি। এসেছিল আলিফ নগর থেকে ইউনুস ও খুরামকে গ্রেফতারের উদ্দেশে, সেটা ব্যর্থ হওয়াতে, ফিরে যাওয়ার আগে ওরা একটা চান্স নিয়েছিল। স্রেফ একটা চান্স। ওরা যখন বাতিকলের দিকে রওনা দিয়েছিল, মোটামুটি ধারণাই করে নিয়েছিল লোকমানদের পাওয়া যাবে না। তবু এসেছিল। পেয়ে গেল।

লোকমান ও ওসমানকে গ্রেফতার করে ওরা পৌনে তিনটে নাগাদ গার্ডেনরিচ ছেড়ে লালবাজারের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করল। ইউনুস ও খুরামের থেকেও এই মামলায় লোকমান ও ওসমান অনেক গুরুত্বপূর্ণ আসামি। লোকমান মেহেতা সাহেবকে ও ওর ভাই ওসমান মোকতার আলিকে খুনের সময় সরাসরি প্রধান ভূমিকায় অংশগ্রহণ করেছে। সেক্ষেত্রে সরোজদের এই রাতের অভিযানের সাফল্যে তারা খুবই খুশি।

ভোর তিনটের সময় ওরা লালবাজারে পৌঁছে লোকমানদের সেন্ট্রাল লকআপে পাঠিয়ে দিয়ে বিশ্রাম নিতে যে যার বাড়ি ফিরে গেল। সকালবেলা অফিসে এসে লোকমানদের ব্যবস্থা করা যাবে। মেহফুজ এখনও দোষ স্বীকার করেনি। হজম করে যাচ্ছে। সেই দিকটাও সরোজদের দেখতে হবে।

হোসেন চৌধুরি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধ করতে রাজি হয়েছে। এটা মামলার ক্ষেত্রে বিরাট লাভ। লোকমানরা কেমন ব্যবহার করবে কে জানে।

হোসেনকে জেলখানায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। আদালতে স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধ করার আগে জেলখানার সেলে একা চিন্তা করার জন্য তিনদিন সময় দেওয়া হয়। এটাই নিয়ম। আসামি একাগ্র মনে চিন্তা করে জানাবে যে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে জবানবন্দি দেবে কী দেবে না। কারণ ওই জবানবন্দি তার বিরুদ্ধেও মামলার একটা গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসাবে বিচার্য হবে।

একত্রিশ তারিখে হঠাৎ হোসেন চৌধুরি আদালতে স্বীকারোক্তি দিতে এসে জানাল, না, সে নিজে থেকে জবানবন্দি বলবে না। এটা মামলার ক্ষেত্রে একটা ধাক্কা। কিন্তু লোকমান ও ওসমান তাদের দোষ স্বীকার করে নিয়েছে। অবশ্য সেটা লালবাজারে দীপক, সরোজ, সমীরদের কাছে। কিন্তু এখনও তারা অন্য আত্মগোপনকারী খুনীদের সম্পর্কে কোনও আলোকপাত করতে পারল না।

একটা ব্যাপার পরিষ্কার, খুন করার পর খুনীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যে যার মতো পালিয়ে আত্মগোপন করেছে। কারও সঙ্গে অন্য কারও সম্পর্ক ছিল না। আসলে ওরা তো কোনও সংগঠিত সংগঠনের সদস্য নয়। একই এলাকার বসবাসকারী। এখানেই শুধু ওরা পরস্পরের পরিচিত। দাঙ্গার সময় সাম্প্রদায়িক কারণে একত্রিত হয়েছিল। তারপর আবার যে যার মতো পথ খুঁজে নিয়েছে। তার উপর দুই চারজন ছাড়া অধিকাংশই গরীব। আত্মগোপনের অর্থসংস্থান করতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে। সেই কারণেই এক এক করে খুনীরা ধরা পড়লেও একজনের কাছ থেকে অন্যজনের খবর যোগাড় করা যাচ্ছে না। তাই যত দ্রুত অপরাধীদের আমরা গ্রেফতার করতে পারতাম তত দ্রুত ওদের গ্রেফতার করতে পারছি না।

জুন মাসের তিন তারিখ ভোরবেলায় আমাদের ডাকাতি দমন শাখার খবর অনুযায়ী আমাদের অফিসার উমাশংকর ও সুধীশ নাগ রাজাবাগান ডক ইয়র্ডের কাছে একটা বস্তি থেকে মহঃ মার্টিনকে গ্রেফতার করে লালবাজারে নিয়ে এল। ওকে নিয়ে এই মামলায় ধৃত মোট আসামির সংখ্যা দাঁড়াল উনত্রিশ।

লালবাজারে এসে মার্টিন প্রথমে অস্বীকার করল। তারপর ঝাড় খেয়ে স্বীকার করল। এটাও সে স্বীকার করল যে মোকতার আলির হাত পা তার শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করার সময় সে একটা তরোয়াল ব্যবহার করেছিল। তরোয়ালটা সে গঙ্গার মাঝখানে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে।

লোকমান আলিপুর আদালতের তৃতীয় জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে দোষ স্বীকার করে জবানবন্দি দিল কিন্তু ওর ভাই ওসমান জবানবন্দি দিল না।

জুন মাসের ষোল তারিখে মোট তেতাল্লিশ জন আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে আলিপুর আদালতে চার্জশিট দাখিল করল এই মামলার তদন্তকারী অফিসার সরোজ ভট্টাচার্য।

অভিযুক্তরা হলো, শেখ নান্নে, গোরাচাঁদ ওরফে জামিল আহমেদ, শেখ নুরু, ওয়েবউদ্দিন, মহঃ হালিম, আনোয়ার হোসেন, মহঃ কুরবান, কাইজার খান, মানওয়ার হোসেন, মহঃ আমিন, মহঃ আয়ুব, সরফারজ, আলম, মহঃ ইস্রাইল, মহঃ মাফিজ, মহঃ সামিন, মহঃ জাহির, নসরু খান, দিলওয়ার হোসেন, শেখ ঝুমন, হোসেন চৌধুরি, মেহফুজ আলম, লোকমান শা, ওসমান শা, মহঃ মার্টিন। এরা সবাই জেলখানায় বন্দি বিচারাধীন হিসাবে রয়েছে।

আর যারা এই মামলায় তখন পর্যন্ত আত্মগোপন করে আছে কিন্তু অভিযুক্ত, তারা হলো, নাসিম খান ওরফে নাসো, পুটন, সামসাদ, আব্বাস, আকতার ওরফে সন্ধ্যা আকতার, মুকিম, নাসির খান, রহমত, ইউনুস, সাগির, মুক্তার, ইলিয়াস, সালিম, খুরাম, মিরাজু, মুর্শিদ, ঝোনে, বিলায়াৎ, খুয়াম।

চার্জশিট দাখিল করলেই তদন্তকারী অফিসারদের কাজ শেষ হয়ে যায় না। তখন অন্য আর একটা দায়িত্ব আরও চেপে বসে। সেটা হলো প্রমাণ করার জন্য সেগুলি সঠিকভাবে সঠিক সময়ে আদালতে পেশ করা। অন্যদিকে এই মামলায় চার্জশিট প্রাপ্ত আরও আসামি আত্মগোপন করে আছে। তাদের যত তাড়াতাড়ি গ্রেফতার করে এই মামলার সঙ্গে যুক্ত করা যায় ততই মামলার ক্ষেত্রে জোর হবে।

নয়ত একবার মামলা তার নিজস্ব গতিতে অনেকদূর এগিয়ে গেলে তখন নতুন করে সেই আসামিকে যুক্ত করলে আসামির ক্ষেত্রে সুবিধা হয়ে যায়। অনেক ক্ষেত্রে প্রথম থেকে আবার আলাদা করে মামলা শুরু করতে হয়। এইসব ছোট ছোট ব্যাপারগুলি এড়িয়ে চলতে পারলেই ভাল। সুতরাং যত দ্রুত সম্ভব মূল মামলা শুরু হওয়ার আগে আত্মগোপনকারী আসামিদের গ্রেফতার করতে সবাই নতুন উদ্যোগে ঝাঁপিয়ে পড়ল। মেহেতো সাহেব ও তার বডিগার্ড মোকতার আলির খুনিরা বিনা সাজায় সমাজে ঘুরে ফুর্তি করে বেড়াবে এটা আমরা সহ্য করতে পারব না।

দু'দিকে ফ্রন্ট খুলে আরও জোর কদমে আমরা এগিয়ে চললাম। জানি না, আমাদের, বিশেষ করে দীপক, সরোজ, সুধীশ, সমীর, স্বদেশদের পরিশ্রমের কী ফল হবে। শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত আমাদের ছুটতে হবে। হাল ছেড়ে দিলে চলবে না। নাসো ওরফে নাসিম খানেরা যেন কিছুতেই মেহেতো সাহেবকে খুন করে মুক্ত পৃথিবীর হাওয়া না খেতে পারে। যারা বিনা

কারণে ওইভাবে নৃশংসভাবে মানুষকে খুন করতে পারে, তারা পৃথিবীর খোলামেলা চত্বরে ঘুরে বেড়ানোর অধিকার হারিয়েছে। সুতরাং ছোটো।

ছোটার ফল কি পাওয়া যাবে? জুন মাসের উনত্রিশ তারিখ সকালে সরোজই খবর পেল নসরু খানের ভাই নাসির খান ওরফে কাল্লু উত্তরপ্রদেশের ফৌজাবাদের পুরানে সবজি বাজারে ওর আত্মীয়া অনিমা বিবির বাড়িতে আশ্রয় নিয়ে আছে।

তদন্তের অন্য কাজে সরোজ ব্যস্ত থাকায় ঠিক হলো ফৌজাবাদে যাবে মার্ডার সেকশনের দুই অফিসার প্রদ্যুৎ শঙ্কর চক্রবর্তী ও স্বদেশ রায়চৌধুরি। ওরা প্রয়োজনীয় ফোর্স সঙ্গে নিয়ে সেদিনই সন্ধেবেলা ফৌজাবাদের উদ্দেশে যাত্রা করল।

ফৌজাবাদে পৌঁছে ওরা ফৌজাবাদের কোতোয়ালি থানার অফিসার-ইন-চার্জকে সঙ্গে নিয়ে পুরানে সবজি বাজারে অনিমা বিবির বাড়িতে হানা দিল, কিন্তু কাল্লুকে পেল না। হতাশ প্রদ্যুৎ ও স্বদেশ তখন কোতোয়ালি থানার অফিসার-ইন-চার্জকে কাল্লু সম্পর্কে খোঁজ করে তাকে গ্রেফতার করে লালবাজারে খবর জানাতে অনুরোধ করে কলকাতায় ফেরার ট্রেন ধরল।

আত্মগোপনের জায়গায় হানা দিয়ে যদি আসামিকে গ্রেফতার না করা যায় তবে স্বাভাবিক কারণেই সেই আত্মগোপনকারী আর দ্বিতীয়বার সেই স্থানে আশ্রয় নেয় না। অন্যত্র নিজেকে সরিয়ে নেয়। কাল্লুও হয়তো আর অনিমা বিবির বাড়িতে আশ্রয় নেবে না। তাহলে কোতোয়ালি থানার পুলিশ ওকে কীভাবে গ্রেফতার করতে সক্ষম হবে? প্রদ্যুৎ ও স্বদেশের হতাশাটা এখানেই। কাল্লু ওখান থেকে পালাবে।

জুলাই মাসের আট তারিখে আমাদের অবাক করার জন্য ফৌজাবাদ থেকে রেডিওগ্রামে একটা বার্তা এল। বার্তাটা পুলিশের। জানিয়েছে সাত তারিখ রাতে নাসির খানকে ওরা গ্রেফতার করেছে। কলকাতায় ওকে নিয়ে আসার জন্য আমাদের খবর পাঠিয়েছে। উল্লসিত হওয়ারই মতো বার্তা। কারণ আমরা ধরেই নিয়েছিলাম কাল্লুকে আর ফৌজাবাদে পাওয়া যাবে না। অনিমা বিবির বাড়িতে কলকাতার পুলিশ ওর খোঁজে হানা দিয়েছে শুনে ও ফৌজাবাদ থেকে পাততাড়ি গুটিয়ে অন্য জায়গায় লুকিয়ে যাবে। নব্বই কোটি মানুষের ভিড় থেকে কাল্লুকে খুঁজে বের করে তাকে গ্রেফতার করা আরও কঠিন হয়ে যাবে, যদি না আবার কোনও সঠিক খবরদাতা তার ঠিকানাটা আমাদের সময়মত জানায়।

ন'তারিখ সকালে প্রদ্যুৎ আলিপুর আদালত থেকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ নিয়ে সঙ্গে স্বদেশ ও অন্যান্য কনস্টেবলের একটা দল নিয়ে পরদিন সকালে

ফৌজাবাদের উদ্দেশে শিয়ালদহ স্টেশনে জম্মু তাওয়াই এক্সপ্রেসে চড়ে বসল। এবার আর নিশ্চিতের উদ্দেশে নয়, নিশ্চিত হয়েই।

এগারো তারিখ সকালবেলায় ফৌজাবাদ স্টেশনে নেমে ওরা সোজা চলে গেল কোতোয়ালি থানায়। প্রথমে ধন্যবাদের পালা। তারপর ফৌজাবাদের আদালতে আলিপুর আদালতের নির্দেশ দাখিল। এবং অনুমতিপত্র পাওয়ার পর ওরা সোজা চলে গেল ফৌজাবাদ সেন্ট্রাল জেলে, যেখানে কাল্লুকে ওরা গ্রেফতার করে পাঠিয়ে দিয়েছিল।

বিকেল চারটের মধ্যেই সব কাজ সেরে ওরা সেদিনই সন্ধেবেলা নাসির খানকে নিয়ে কলকাতায় ফেরার ট্রেন ধরল।

বারো তারিখ সন্ধে আটটায় কাল্লুর ঠিকানা লালবাজারের সেন্ট্রাল লকআপ। তারপর ঠিকানা হবে ওর দাদা নসরুর সঙ্গে আলিপুর জেল।

কুড়ি তারিখ বিকেল পাঁচটা নাগাদ দক্ষিণ বন্দর থানার সাব ইন্সপেক্টর শিবপ্রসন্ন দত্ত একটা খবর পেল। খবরটা হচ্ছে, মেহেতা সাহেবের খুনের অন্যতম প্রধান আসামি সন্ধ্যা আকতার ওরফে আকতার আলম সেদিনই শিয়ালদহ স্টেশন থেকে আপার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেস ধরে কলকাতা ছেড়ে পালাবে।

আকতারকে আবার দত্ত চেনে না। তাহলে শিয়ালদহ স্টেশনের ভিড়ে সে কী করে ওকে চিহ্নিত করে গ্রেফতার করবে? হঠাৎ ওর মনে পড়ল যেখানে আকতারের বাড়ি সেই বাতিকল সেকেন্ড লেনেই থাকে ওই থানারই কনস্টেবল হাকিম খান। একই পাড়ার বাসিন্দা হিসাবে হাকিম নিশ্চয়ই আকতারকে চিনবে।

দত্ত তাড়াতাড়ি হাকিমকে ডেকে পাঠিয়ে জিজ্ঞেস করল, "তুম আকতার আলমকে পয়চানতা হায়?"

কনস্টেবল হাকিম খান জানাল, "জরুর, উসকো হাম আচ্ছা সে জানতা হায়।"

দত্ত বলল, "ঠিক হায়, তুম আভি থানা সে ইধার উধার মৎ যাও। হামারা কাম হায়।" দত্ত হাকিম খানকে নির্দেশ দিয়ে ওর উচ্চপদস্থ অফিসারদের জানিয়ে সঙ্গে ওই থানার সাব-ইন্সপেক্টর জি এল মুখোপাধ্যায় ও কনস্টেবল ভোলা কুঁয়ারকে ওর দলে নিয়ে তাড়াতাড়ি শিয়ালদহ স্টেশনের উদ্দেশে যাত্রা করল।

সন্ধে ছ'টার মধ্যে দত্ত, মুখোপাধ্যায়, হাকিম ও ভোলা শিয়ালদহ স্টেশনে পৌঁছে গিয়ে শিয়ালদহ মেইন রেলওয়ে স্টেশনে ঢোকার মুখে নজর রেখে যাত্রীদের ভিড়ের আড়ালে নিজেদের লুকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

সময় একটু একটু নদীর স্রোতের মতো চলে যাচ্ছে। শিয়ালদহ স্টেশনের নিত্যদিনের ও অন্যান্য যাত্রীরাও নিজেদের খেয়ালে কেউ উদভ্রান্ত, কেউ সঠিক দিশায়, কেউ বা সময়কে ধরার জন্য ছুটছে। কারও তখন অন্যদিকে নজর দেওয়ার সময় নেই। পৃথিবী ওলটপালট হয়ে গেলেও ওই মুহূর্তে বাড়ি ফেরার তাগাদায় নির্দিষ্ট ট্রেন ধরার জন্য নিজেদের জ্ঞান শূন্যে নামিয়ে ছুটছে। এটা প্রতিদিনের দৃশ্য। মানুষ তার নিজের রুটিনের মধ্যেই ঘুরপাক খেয়ে মরছে।

দত্তরা দাঁড়িয়ে আছে। এক খুনী আসামি আসবে। তাকে তারা গ্রেফতার করবে। সে কলকাতা পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পলাতক।

হাকিমই আকতারকে গ্রেফতার করার এখানে চাবিকাঠি। ওই একমাত্র ওকে চেনে। ওর ভরসাতেই দত্তদের আগমন। ও যদি আকতারকে দেখেও পাড়ার লোক হিসাবে বা ভয়ে নিশ্চুপ থাকে তবে দত্তদের কিছুই করার নেই। খালি হাতে শিয়ালদহ স্টেশন পরিক্রমা করে আবার দক্ষিণ বন্দর থানায় ফিরে যেতে হবে। সেইভাবে ফিরে যেতে কোনও পুলিশ অফিসার চায় না।

দত্তরা শিয়ালদহ স্টেশনে পৌঁছানোর পর স্টেশনের ঘড়ি টিকটিক করে মিনিটের ঘর ষাট বার পাল্টেছে। ছোট কাঁটাটা সাতটার ঘরে। বড়টা বারোতে সাময়িকভাবে দাঁড়াল। ওকে থামিয়ে রাখা যায় না। আবার ডান দিকে ঘুরে টিকটিক করে আওয়াজ করে ছুটবে। দত্তরা ওর সঙ্গে ছুটতে পারছে না। তারা অধীর আগ্রহে আকতারের জন্য অপেক্ষা করে আছে। লুকিয়ে। জনগণের আড়ালে।

নির্দিষ্ট প্ল্যাটফর্মে আপার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেস এসে দাঁড়িয়েছে। যাত্রীদের নিয়ে সে আর আধ ঘণ্টা পর ছুটবে। যাত্রীদের কেউ যাবে বেড়াতে, কেউ কাজে, কেউ বা বাড়িতে। স্টেশনে স্টেশনে নিঃশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে ও দাঁড়াবে। জল খাবে। তারপর আবার ছুটবে। কাউকে ছেড়ে, কাউকে আবার কোলে তুলে। একই চিত্র।

আকতার যদি এই ট্রেনেই কলকাতা ছেড়ে চলে যেতে চায় তবে সে আর আধ ঘণ্টার মধ্যে স্টেশনে চলে আসবে। নয়ত তাকে ছেড়েই আপার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেস হুইসেল বাজিয়ে প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে চলে যাবে তার নিশানায়। তার দৈনন্দিন চক্রের পথ ধরে।

এই আধ ঘণ্টা তাই খুব সতর্ক হয়ে থাকতে হবে দত্তদের। বিশেষ করে কনস্টেবল হাকিম খানকে---কারণ ওর চোখ এড়িয়ে গেলেই আকতার আবার ধুলো দিয়ে পালাতে পারবে। হাকিমের দুই চোখ আরও তীক্ষ্ণভাবে

যাত্রীদের শরীরের ওপর হেনে যাচ্ছে। একজনও সেই দৃষ্টি থেকে পালিয়ে না যায়, দৃষ্টির বিভ্রান্তিতে সেই পালিয়ে যাওয়া একজনই হয়তো হতে পারে ফেরার আসামি আকতার আলম ওরফে সন্ধ্যা আকতার। হাকিমের প্রতিবেশী।

সাতটা কুড়ি নাগাদ হাকিম খানের কপালটা কুঁচকে গেল। কয়েক সেকেন্ড। তারপর তার কপালের ভাঁজ সোজা হয়ে গেল। দত্ত আর মুখোপাধ্যায়কে একটা তিরিশ বছর বয়স্ক শক্তপোক্ত ছেলেকে দেখিয়ে বলল, "ও হি স্যার, ও হি হায় আকতার।"

ছেলেটার হাতে একটা ছোট মতো সুটকেস। এদিক ওদিক পর্যবেক্ষণ করতে করতে শিয়ালদহ মেইন রেলওয়ে স্টেশনের দিকে এগিয়ে আসছে। তার পা দুটো ত্রস্ত।

আসুক। এগিয়ে আসুক। দত্তরা সেটাই চায়। ওরা মেইন স্টেশনের মুখে দাঁড়িয়ে আছে। আকতার যত ওদের কাছে আসবে, ওকে গ্রেফতার করতে দত্তদের তত সুবিধা হবে। দত্তরা তাই অপেক্ষা করতে লাগল।

হাত পনেরো যখন আকতার দূরে তখনই ওর চোখের পর্যবেক্ষণকারি তারায় হাকিম খানের চেহারাটা ফুটে উঠল। ওর প্রতিবেশি হাকিম খান যে দক্ষিণ বন্দর থানার কনস্টেবল সেটা ও খুব ভালভাবেই জানে। এসব খবর ওদের জানতে হয়।

এক কী দুই সেকেন্ড, আকতার পেছন ফিরে উর্ধ্বশ্বাসে শিয়ালদহ ফ্লাইওভারের দিকে দৌড়াতে লাগল।

ব্যস। আকতারই যখন খেলা শুরুর বাঁশি বাজিয়ে দিয়েছে তখন আর দেরি কেন? দত্ত, মুখোপাধ্যায়, হাকিম ও ভোলাও ওকে ধরবার জন্য ছুটতে শুরু করল। শিয়ালদহ স্টেশন চত্বরে কী অনায়াসে দৌঁড়ানো যায়? অগুনতি মানুষের মাঝখান দিয়ে গলে গলে আকতার আলম দৌড়চ্ছে। দত্তরাও দৌড়াচ্ছে। যাত্রীরা কেউ সেই দৃশ্য বিনা কৌতূহল নিয়ে দেখছে, কেউ বা কৌতূহল নিয়ে। এমন দৃশ্য ওরা বহুবার দেখছে। তাদের অভ্যাস আছে। যার পেছনে ওই চারজন তাড়া করে ফিরছে, সে যে ডিসি (বন্দর) মেহেতা সাহেবের খুনী, তা সাধারণ লোক বুঝবে কী করে। তাই ওরা অনেকটা নির্বিকার। চলতে চলতে যতটুকু উত্তেজনা উপভোগ করা যায়, তেমনভাবে ওরা দৃষ্টি হেনে যে যার নিজের পথে চলেছে।

আকতার তার ডান হাতে ধরা সুটকেসটা ফেলে দিয়ে নিজেকে আরও হাল্কা করে ছুটছে। তার উদ্দেশ্য ফ্লাইওভারের নিচে বাজারের ভিড়ে মিশে গিয়ে লুকিয়ে যাওয়া।

আকতার ছুটতে ছুটতে একবার তার সঙ্গে দত্তদের দূরত্ব কতটা বোঝার জন্য পেছন ফিরে তাকাল। সামনেই যে একটা ইঁটের ছোট পিলার সেটা সে খেয়াল করেনি। পালানোর তাগিদে সে পেছন থেকে সামনে দৃষ্টি ঘোরাতেই সেই পিলারে খেল হোঁচট। আছাড় খেয়ে সোজা ফুটপাতে। অজান্তে অপ্রস্তুত অবস্থায় সটান।

আকতারের বাঁ পায়ের হাঁটুতে আঘাত লেগেছে। তবু সে একবার উঠে দাঁড়িয়ে আবার পালানোর চেষ্টা করতে গেল। কিন্তু তার আগেই দত্ত, মুখোপাধ্যায়, হাকিম ও ভোলা তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। ওরা ওর হাত দুটো চেপে ধরেছে। আর ওর পালানোর উপায় নেই।

দত্তরা আকতারকে টানতে টানতে নিয়ে গেল শিয়ালদহ স্টেশনের দক্ষিণপ্রান্তে, যেখানে ওরা ওদের গাড়ি রেখে এসেছিল সেখানে। আকতারকে গাড়িতে তুলে সোজা দক্ষিণ বন্দর থানায়।

দত্তদের সাফল্যে দক্ষিণ বন্দর থানার সবাই খুশি। ওরা বন্দর এলাকার উচ্চপদস্থ অফিসারদের ওদের সাফল্যের খবর জানাল।

রাত সাড়ে দশটার সময় অফিসার মুখোপাধ্যায়, কনস্টেবল হাকিম খান ও কনস্টেবল ভোলা ভুঁয়ার সন্ধ্যা আকতার ওরফে আকতার আলমকে নিয়ে লালবাজারে গোয়েন্দা দফতরে হাজির। ওকে লালবাজারে হস্তান্তরিত করে ওরা ফিরে গেল ওদের কর্মস্থলে।

চুরাশি সাল চলে গেল, আর কোনও ফেরার আসামি ধরা পড়ল না। যদিও আমাদের চেষ্টা অব্যাহত রইল। বাইরে তখনও অনেক আত্মগোপনকারী আসামি আছে, যাদের আমরা ধরতে পারিনি।

পঁচাশি সালের ফেব্রুয়ারি মাসের আঠাশ তারিখ দুপুরবেলা খবর পেলাম। নাসিম খান ওরফে নাসো, যে প্রথম মেহেতা সাহেবের মাথায় লোহার রডের বাড়ি মেরে মেরে আবদুল লতিফ খানের গোসলখানায় শুইয়ে দিয়েছিল সে দুপুরবেলা কালীঘাট স্টেশনের কাছে স্টোনচিপের এক ব্যবসায়ীর কাছ থেকে তোলা তুলতে আসবে। তোলা সে আগেও কয়েকবার নিয়ে গেছে। খবরদাতা খুবই দক্ষ।

খবর পাওয়ার পর দীপক ও সরোজকে আমি বিস্তারিত জানিয়ে দিলাম। এখন প্রশ্ন কে নাসোকে চিনিয়ে দেবে?

দেবে। যার থেকে নাসো টাকা আদায় করতে আসবে সেই লোকটাই। তার একটাই শর্ত, তার গদি থেকে নাসোকে গ্রেফতার করা যাবে না। শর্তটা যে ভয়ে সেটা আর আমাদের বলে দিতে হবে না। ওর সেই শর্ত আমি মেনে নিয়েছি।

স্টোনচিপের ব্যবসায়ীর নাম শুনে সরোজ, নাগ, সমীর ফোর্স নিয়ে দুপুর দেড়টা নাগাদ কালীঘাট সাইডিংয়ের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেল। দুটোর সময়ই সরোজরা নিউ আলিপুর থানার উত্তর দিকে দুর্গাপুর ব্রিজের পুব প্রান্তে স্টোনচিপের সাইডিংয়ে পৌঁছে গেল।

ওই সাইডিংয়ে সবসময় স্টোনচিপ ব্যবসায়ীদের আনাগোনা। অঞ্চলটা যদিও লোকালয়ের মাঝখানে, তবু কেমন যেন ছাড়াছাড়া। কাঁচা রাস্তা, ভারী ভারী লরির সারাদিনরাতের দাপটে রাস্তার হাল বছরের প্রতি সময় অত্যন্ত কদর্য। ব্যবসায়ী ও দালালদের চোখে মুখে শুধু লোভের ছায়া। কে কাকে কৌশলে হারিয়ে অতিরিক্ত লাভ করবে তারই দাবা খেলার গুটির চাল চলছে রাতদিন।

খবর নিয়ে সরোজ একা গেল সেই ব্যবসায়ীর গদিতে। খবরের সত্যতা স্বীকার করল ব্যবসায়ী ভদ্রলোক। চুপিসাড়ে ওদের মধ্যে আলোচনার ফল দাঁড়াল, নাসো এলে তাকে ব্যবসায়ী টাকা দেবে, এবং নাসোকে এগিয়ে দেওয়ার জন্য ওই ব্যবসায়ী এক কর্মচারীকে সঙ্গে দেবে। তখনই সরোজরা বুঝে যাবে ওই কর্মচারীর সঙ্গীটাই হচ্ছে নাসো।

কোন কর্মচারীকে নাসোর সঙ্গে পাঠাবে তাকেও সে চিনিয়ে দিল। কথা হলো, নাসোকে যে টাকাটা ওই ব্যবসায়ী দেবে, নাসোকে গ্রেফতারের পর সেটা সরোজ ফিরিয়ে দেবে। টাকাটা তল্লাশির তালিকায় তুলে আদালতে জমা দেওয়ার জন্য পাঠিয়ে দেবে না। যে আমাদের এত বড় একটা খবর ও সাহায্য করছে তার এই সামান্য অনুরোধ মানবে না সরোজ, তা কি হয়? সরোজ সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গদি থেকে বেরিয়ে এল। ওর খবরের জন্য কালীঘাট স্টেশনের কাছে অন্য অফিসার ও কনস্টেবলেরা অপেক্ষা করছে। নাসো যে তিনটে নাগাদ আসবে সেটা ওই ব্যবসায়ী সরোজকে জানিয়েছে।

আড়াইটার মধ্যেই ওই গদিকে লক্ষ্য রেখে বেশ খানিকটা দূরে সরোজ, নাগ ও সমীর জায়গায় জায়গায় দাঁড়িয়ে গেল। নাসো গদিতে আসবে, টাকা নেবে, বেরিয়ে যাবে। বেশিক্ষণ সে গদিতে অপেক্ষা করে না। খুনের আসামি তোলাবাজরা এমনই করে। তারা সম্রাটের মতো আসে, টাকা নেয়, চলে যায়। যেন তারা নিজের কোনও জমা তহবিল থেকে টাকা তুলে চলে যায়। অপেক্ষা ওদের ধাতে নেই। দেরি হলেই ওদের রক্ত ঊর্ধ্বমুখী চড়ে যায়। তার ফল খারাপ হতে পারে। আসলে ওরা এভাবেই একটা ভয়ঙ্কর চাপা আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করে, সেই চাপেই টাকা আদায় করে। তাছাড়া, তাদের একটা নিজস্ব ভয় থাকে, যদি পুলিশকে কেউ

খবর দিয়ে রাখে, এবং সেই অনুযায়ী ফাঁদে ধরা পড়ে যায়, তাই তারা দ্রুত প্রস্থান করতে যায়।

ব্যক্তিগতভাবে নাসোর আগমনের মধ্যে একটা জিনিস প্রমাণিত, তার সঙ্গী কেউ আপাতত ওর সঙ্গে নেই। যদি তার সঙ্গীসাথী থাকত তবে সে নিজে না এসে সঙ্গীদেরই কাউকে তোলা আদায় করতে পাঠাত। সে নিউ আলিপুর থানা সংলগ্ন কালীঘাটের সাইডিংয়ে আসার ঝুঁকি নিত না। বোঝা যাচ্ছে, সে এখন যে কোনও কারণেই হোক, নিঃসঙ্গ।

তিনটে বাজতে দশ মিনিট নাগাদ কালীঘাট স্টেশনের দিক থেকে এসে একটা ছেলেকে ওই ব্যবসায়ীর গদিতে ঢুকতে দেখল সরোজরা। ছেলেটার গায়ে একটা ডোরাকাটা জামা, পরনে ট্রাউজার। চলনে খুব স্বাভাবিকভাব নেই। সুধীশের ওকে চেনা চেনা লাগল, ওই কী খুনী নাসিম খান? হতে পারে, নাও পারে। তবে ওকে যে সুধীশ গার্ডেনরিচ অঞ্চলে দেখেছে তা নিশ্চিত। এখন তাড়াহুড়া না করে অপেক্ষা করতে হবে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ছক অনুযায়ী ব্যবসায়ী তার কর্মচারীকে দিয়ে ওদের কাছে বার্তা পৌঁছে দেবে। তখনই যা করার তাই করবে। এমনও তো হতে পারে আজ নাসো নিজে না এসে তার কোনও সঙ্গীকে টাকাটা নিয়ে যাওয়ার জন্য এই ব্যবসায়ীর কাছে পাঠিয়েছে, এবং তার সেই সঙ্গীও গার্ডেনরিচ অঞ্চলের এবং সেই জন্য তার চেনা চেনা লাগছে।

ওই ছেলেটাকে সরোজ ও সমীরও লক্ষ্য করেছে। পুলিশের চোখে কাউকে সামান্য অস্বাভাবিক লাগলেই সেটা ধরা পড়ে যায়। তখন মস্তিষ্কের একটা অংশ সেই দিকে দৃষ্টি দিয়ে খেয়াল রাখে। যতক্ষণ না পর্যন্ত ভাল ও খারাপের মাপকাঠি কোনও একটা দিক নির্দিষ্ট হয়।

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ওই ডোরাকাটা জামা পরিহিত ছেলেটা গদি থেকে বেরিয়ে এল। তার পেছন পেছন কথা বলতে বলতে ব্যবসায়ীর ওই কর্মচারী অল্পবয়সী ছেলেটাও। সরোজ যা বোঝার বুঝে গেছে। সুধীশ ও সমীরও। ওটা যে নাসোই তা বুঝতে কোনও অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

এবার জালটা গুটিয়ে নেওয়ার পালা। তবে কথা অনুযায়ী ওই গদির থেকে যতটা সম্ভব দূরত্বে ওকে গ্রেফতার করতে অনুরোধ করেছে সেই অবাঙালী ব্যবসায়ী ভদ্রলোক। তাই করবে সরোজরা।

পঁচিশ তিরিশ পা একসঙ্গে এসে ওই ব্যবসায়ীর কর্মচারীটা ফিরে গেল গদির দিকে। ওর কাজ ও করে গেছে। এবার সরোজদের কাজ। সেটা ঠিকঠাক করতে পারলেই নাসো লালবাজারের সেন্ট্রাল লকআপে।

নাসো এবার দ্রুত পা চালাতে লাগল। সুধীশ যেখানটায় দাঁড়িয়ে ওকে

লক্ষ্য করছিল, সেখানটা পার হয়ে গেল। পার হতে গিয়েই ওর চোখে সুধীশ ধরা পড়ে গেল। সুধীশের ওকে চেনা চেনা লাগছিল, ছেলেটা নাসো কি না সেটা নিশ্চিত হতে পারছিল না, নাসো কিন্তু সুধীশকে চিনে ফেলল। সুধীশ যে পুলিশ তা নাসো জানে। গার্ডেনরিচ থানায় দেখেছে।

নাসোর দ্রুত পা এবার স্টেশন রোড ধরে দক্ষিণ দিকে দৌড়াতে শুরু করল। আর অপেক্ষা অর্থহীন। সরোজ, সমীর, সুধীশ ও কনস্টেবলেরাও এবার নাসোর পেছন পেছন ছুটতে শুরু করল।

নাসোর প্রাণ বাঁচানোর তাগিদ। আর সরোজদের খুনী ধরার তাগিদ। তাই ছোটার গতিও তুমুল। সরোজরা ছুটতে ছুটতে "ডাকু, ডাকাত, পাকড়াও" বলে চিৎকার করে যাচ্ছে। কিন্তু নিউ আলিপুরের ওই অঞ্চলে দুপুরবেলাটা প্রায় ফাঁকাই থাকে, কে ওদের চিৎকারে সায় দিয়ে নাসোকে ধরতে আসবে ? তার ওপর ডাকাতকে সাধারণ মানুষ এমনিতেই ভয় পায়, ঝুঁকি নেওয়ার সাহস সঞ্চয় করে তবেই কোনও কোনও লোক কোনও ক্ষেত্রে এগিয়ে যায়। কিন্তু তেমন মানুষ কই ? বিশেষ করে নিউ আলিপুরের মতো উচ্চমধ্যবিত্ত অঞ্চলে।

তিনটে অল্পবয়সী ছেলে উল্টো দিক থেকে আসছিল। তারা মজা দেখার জন্যই বোধহয় দাঁড়িয়ে গেল। নাসো ছুটছে। ছুটছে আমাদের অফিসার ও কনস্টেবলেরা।

নিউ আলিপুর পাম্পিং স্টেশনের সামনে একটা ধাবমান গাড়ির সামনে পড়ে নাসো আটকে গেল। তার ছোটা বন্ধ। গাড়ি ওর পথ থেকে সরে যেতেই ও আবার গতি আনতে গিয়েই সরোজ আর সমীরের বেষ্টনীর মধ্যে আটকে গেল। পুবদিকের জীবনবীমা করপোরেশনের কোয়ার্টার থেকে কতজন মহিলা ও শিশু দেখল, একটা ডাকাতকে কতজন মানুষ তাড়া করে ধরেছে।

আসলে ধৃত ব্যক্তি যে ডাকাত নয়, মেহেতা সাহেবের খুনী তা তারা অনুমানই করতে পারল না। ওই ব্যক্তি যে, যে কোনও ডাকাত থেকে আরও কুখ্যাত তাও তারা আন্দাজ করতে পারছে না।

সরোজ দর্শকের ভূমিকায় রাস্তায় দাঁড়ান তিনটে ছেলেকে সাক্ষী হওয়ার জন্য ডেকে নিয়ে ওইখানেই নাসোকে তল্লাশি করল। প্রথম কারণ, ওর পকেটে ওই ব্যবসায়ীর তিন হাজার টাকা আছে, যা ওকে ফেরৎ দেওয়ার কথা। দ্বিতীয়ত, আর কি পাওয়া যায় তা সাক্ষী রেখে দিলে আদালতে মামলা মজবুত হয়।

সরোজদের অবাক করে দিয়ে নাসোর কোমর থেকে বার হলো একটা

রিভলবার। গুলি ভর্তি। সেটা ওরা নিয়ে নিল। তারপর ওই তিন হাজার টাকা, যেটা ওই ব্যবসায়ী নাসোকে দিয়েছে।

তল্লাশির পর নাসোকে নিয়ে এসে সরোজরা কাছেই নিউ আলিপুর থানায় গেল। সেখানকার লকআপে নাসোকে কিছুক্ষণ রাখতে হবে। কারণ সরোজ ফিরে যাবে ওই স্টোনচিপের অবাঙ্গালীর ব্যবসায়ীর গদিতে, টাকা ফেরৎ দেওয়ার জন্য। সেটা যাতে নাসো না জানতে পারে, সেজন্যই তাকে সামান্য সময়ের জন্য লকআপে নিক্ষেপ।

সরোজ সমীরকে নিয়ে ফিরে এল এই গদিতে। ফেরৎ দিল টাকা। অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে তারা বেরিয়ে এল।

বিকেল সাড়ে চারটের মধ্যেই সরোজরা নাসিম খান ওরফে নাসোকে নিয়ে লালবাজারের গোয়েন্দা দফতরে পা রাখল।

আমাদের প্রত্যেকের মুখে হাসি, কারণ নাসোই প্রথম মেহেতা সাহেবকে বড় আঘাতটা হানে, যে আঘাতের পরিণতিতে মেহেতা সাহেব মাটিতে শুয়ে পড়তে বাধ্য হন। যে শোয়া থেকে তিনি আর কোনও দিনও উঠে দাঁড়াতে পারেননি। সুতরাং নাসোর প্রতি আমাদের একটা অতিরিক্ত রাগ ছিলই, যেটা এবার মামলার ভূমিকায় পেশ করে তাকে উচিত সাজার মাধ্যমে শাস্তি দিতে হবে।

আলিপুরের তৃতীয় অতিরিক্ত দায়রা আদালতে মামলা শুরু হলো। যে তেতাল্লিশ জন আসামির বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করা হয়েছিল বিচারপতি এম কে সেনগুপ্ত দেখলেন তার মধ্যে চোদ্দ জন প্রাপ্তবয়স্ক নন। তাই তিনি আইন অনুযায়ী তাদের বিচারের জন্য জুভেনিয়াল আদালতে পাঠিয়ে দিলেন।

মোট আশি জন সাক্ষী নিয়ে মামলা শুরু হলো। কিন্তু শুরুতেই একের পর এক ধাক্কা। দেখা গেল যে সাক্ষীরা আমাদের অফিসারদের যে বিবরণ দিয়েছিল তাদের সেই লিপিবদ্ধ বয়ান থেকে সরে গিয়ে আদালতে সাক্ষী দেওয়ার সময় ঠিক উল্টো বয়ান দিতে লাগল।

যেমন ধানক্ষেতি মসজিদের ইমাম ফারহাদ জুভেরি, যিনি মেহেতা সাহেব ও শর্মা সাহেবকে মসজিদ থেকে চলে যেতে বলেছিল, সে বলতে লাগল, এমন কোনও উত্তেজিত দাঙ্গাবাজদের সে দেখেনি যে তাদের মসজিদে আশ্রয় দিতে হবে।

এইভাবেই নাসোর শ্বশুর নরমান ও তার ছেলে বাইরন নাসোকে শাস্তির হাত থেকে বাঁচাতে মিথ্যা বয়ান আদালতে পেশ করতে লাগল।

একে একে সাক্ষী মকবল আহমেদ, আকিল আহমেদ, সাকিল আহমেদ,

এস কে কামাল, পুষ্প পাল, রাহাৎ আলি, আবদুল সাত্তার, মহঃ আকবর, আসগর আলি, হাইদার আলি, শেখ কুতুবুদ্দিন আহমেদ আদালতে মিথ্যা সাক্ষী দিয়ে মামলা দুর্বল করার চেষ্টা করতে লাগল। স্বাভাবিকভাবেই মোট চোদ্দজন সাক্ষীকে শত্রুপক্ষীয় হিসাবে ঘোষণা করতে হলো। এই সব সাক্ষী যে ভয়ে এবং আসামিদের বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনের চাপে আদালতে এসে এইরকম ব্যবহার করল সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। নয়ত পুলিশের কাছে দেওয়া বয়ান থেকে তাদের পিছিয়ে এসে অন্য কথা বলার কোনও কারণ নেই।

মামলা শেষ না হওয়া পর্যন্ত সাক্ষীদের মানসিকভাবে ঠিকমতো রাখা একটা দুরূহ কাজ। সরোজ সেই কাজটা যতটা যত্ন সহকারে করার কথা তার চেয়েও বেশি মনোযোগ দিয়ে ওটা করছিল, তবু ওই চোদ্দজন সাক্ষী আসামিদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ চাপে বিরোধী হয়ে গেল।

চুরাশি সালের জুন মাসের ষোল তারিখে আদালতে চার্জশিট পেশ করার পর দীর্ঘ তিন বছর তিন মাস ধরে মামলা চলল।

অবশেষে উননব্বই সালের সেপ্টেম্বর মাসের তেইশ তারিখ বিচারপতি সেনগুপ্ত তার রায় জানালেন।

যে সতেরজন আসামি বিচারধীন ছিল সাক্ষ্য প্রমাণের অভাবে তার মধ্যে সরফরাজ আলম, মহঃ ইস্রাইল, মহঃ মাফিজ, মহঃ সামিম, দিলওয়ার হোসেন, মেহেফুজ আলম, ওসমান শা ও কাইজার খানকে তিনি মুক্তি দিয়ে দিলেন।

বাকি রইল ন'জন আসামি। কিন্তু আদালতে মেহেতা সাহেবের বডিগার্ড মোকতার আলির খুনের প্রমাণ করা গেল না। শুধু খুন হওয়ার পর সাক্ষ্যপ্রমাণ লোপের জন্য মহঃ হালিমের বিরুদ্ধে প্রমাণ পাওয়া গেল। এটা আমাদের একটা ব্যর্থতা।

আসলে রামনগর লেন, বাতিকল সেকেন্ড লেন, ফতেপুর ভিলেজ রোড, মেথরপাড়া অঞ্চলের এক সম্প্রদায়ের বাসিন্দারা, বিশেষ করে ধানক্ষেতি এলাকা, যেখানে মোকতার, রহমৎ ও হাটিন সমেত অন্যরা বডিগার্ড মোকতার আলির হাত পা কেটে কেটে খুন করেছিল, সেই এলাকার বাসিন্দারা এককাট্টা হয়ে আমাদের প্রয়াসকে প্রতিরোধ করেছিল। সেইজন্যই সেখান থেকে সাক্ষীও অধিক সংখ্যায় যোগাড় করা যায়নি। এবং ওই অঞ্চলের রেশন দোকানের মালিক মনসুর আলির ভাই মকবল আহমেদ, যে মোকতার খুনের প্রত্যক্ষদর্শী ছিল, সে ও তার মতো আরও ক'জন সাক্ষী শত্রুপক্ষীয় হয়ে যেতে আদালতে

মোকতার আলির খুনের জন্য প্রমাণ সঠিকভাবে পেশ করতে সরোজরা ব্যর্থ হয়।

বিচারপতি সেনগুপ্ত তাঁর রায়ে মেহেতা সাহেবকে খুন করার অভিযোগ নাসো ওরফে নাসিম, আকতার আলম ওরফে সন্ধ্যা আকতার, লোকমান শা এবং মহঃ হোসেন চৌধুরিকে ফাঁসির হুকুম দিলেন। তিনি তাঁর রায়ে পরিষ্কারভাবে বললেন, এরা সমাজে বেঁচে থাকার অধিকার হারিয়েছে।

তাছারা নান্নে কসাইকে মেহেতা সাহেবকে খুনের প্রমাণ লোপ করার দায়ে ছ'বছর, মহঃ হালিমকে ছ'বছর, নসরু খান ও তার ভাই নাসির খান ওরফে কাল্লুকে দেড় বছর করে সশ্রম কারাদণ্ড দিলেন।

যেদিন বিচারপতি সেনগুপ্ত মেহেতা সাহেবের খুনের মামলার রায় দিলেন সেই রায়ের বয়ানের কপি নিয়ে সরোজ যখন লালবাজারে ফিরল তখন সে উচ্চপদস্থ অফিসারদের দ্বারা পুরস্কৃত হলো। কি সেই পুরস্কার? সরোজকে কাজে গাফিলতির জন্য সাময়িকভাবে চাকরির থেকে বরখাস্ত করা হলো।

অবিশ্বাস্য ব্যাপার। যে সরোজ দিনরাত পরিশ্রম করে এত বড়, এত বন্ধুর, এত কঠিন একটা মামলা পরিচালনা করল, তাকে কিনা কাজে গাফিলতির জন্য সাময়িকভাবে বরখাস্ত হতে হলো।

এই রকম কাণ্ডজ্ঞানহীন কাজ করলে কী আর বাহিনীর অফিসার আর নিচুতলার কর্মচারীদের কাজ করার মানসিকতা অবশিষ্ট থাকে? তাদের মনোবল কোন স্তরে নেমে যেতে পারে? কাজ করার উদ্যম, ঝুঁকি নেওয়ার প্রবণতা, প্রতিবন্ধকতা ঠেলে এগিয়ে যাওয়ার অদম্য ইচ্ছা কী থাকে?

যে সত্যি সত্যিই সাফল্যের জন্য পুরস্কৃত হওয়ার যোগ্য তাকে কিনা বরখাস্তের নোটিশ হজম করতে হয়! এর প্রতিফলন যে কতটা হতে পারে তা কি একবারও বড়সাহেবরা ভেবে দেখলেন না।

সত্যি সেলুকাস! কি বিচিত্র এই পুলিশের চাকরি। যে ঘরে বসে "জো হুজুর, জো সাহেব" করে যায় তার জন্য সরকারের কাছে যায় প্রশংসাপত্র, তাকে দেখানো হয় পুলিশ মেডেল পাওয়ার উপযুক্ত হিসাবে। আর যারা সত্যিই যোগ্য তার হাতে ধরিয়ে দেওয়া হয় বরখাস্তের নোটিশ। রাজনীতি ও তোষামোদের এ খেলা বন্ধ না হলে, সত্যিকারের কাজের অফিসার ও কর্মচারীদের পুরস্কৃত না করলে যে, কলকাতা পুলিশের নিম্নগামী কর্মদক্ষতা এখন দেখা যাচ্ছে তা আর রোখা যাবে না। মুখ শুঁখে আর প্রযুক্তিগত কিছু উন্নতি করলেই যদি অপরাধ কমানো যেত তবে মানুষের আর দরকার হতো না, কিছু রোবট দিয়েই কাজ চালানো যেত।

অথচ ওই মেহেতা সাহেবের খুনের দিন, বন্দরের এসি (প্রথম) কালীকা

বন্দ্যোপাধ্যায় যখন অসুস্থতার ভান করে ফতেপুর ভিলেজ রোডে না গিয়ে বাড়িতে বসে রইলেন, তাঁর কিছু হলো না। এমনকী কমিশনার সোমসাহেব যখন তাঁর বাড়িতে ফোন করে তাঁর খবর জানতে চাইলেন, তখনও তিনি ফোন ধরলেন না। তাঁর স্ত্রী কমিশনার সাহেবকে বললেন, "তিনি অসুস্থ তাই ফোন ধরতে পারবেন না।" কমিশনার সাহেব যখন বললেন, "কী এমন অসুস্থ যে ফোনও ধরতে পারবেন না?" উত্তর এল, "হ্যাঁ তিনি খুবই অসুস্থ, বিছানা ছেড়ে উঠতেই পারছেন না।" কমিশনার সাহেব চুপ করে গেলেন। এ নিয়ে আর কিন্তু কোনও হইচই হলো না। কমিশনার সাহেব কিন্তু ব্যাপারটা তদন্ত করতেই পারতেন। যিনি আয়ুব খানের সঠিক কাজের জন্য বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দিতে পারেন, তিনি কী কালীকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অসুস্থতার গভীরতা কতটা তা যাচাই করার জন্য বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দিতে পারতেন না? দিলেন না বলে, কালীকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো কতগুলি তোষামোদকারী, চাটুকার, কর্মবিমুখ লোক পার পেয়ে যায়। আর সরোজের মতো সত্যিকারের কাজের, তোষামোদ-বিরোধী, দক্ষ অফিসাররা প্রচণ্ড সাহসের পরিচয় দেওয়ার পরও বরখাস্তের নোটিশ পায়!

এমন দৃষ্টান্ত কিন্তু এই একটা ক্ষেত্রেই নয়, আরও আছে, আশঙ্কা, আরও এমন হবে। উচ্চপদস্থ অফিসারদের তোষামোদ করাটাই যদি চাকরির একমাত্র শর্ত হয়, তবে আর খাটনি কী। অফিসাররা অফিসে এসে, "স্যার, স্যার" করে যাবে। অন্যদিকে খুনীরা খুন করে যাবে, ডাকাতরা ডাকাতি, ধর্ষণকারীরা ধর্ষণ। তাদের গ্রেফতার করার, সাজা দেওয়ার কেউ থাকবে না। কারণ অফিসাররা তো "স্যার, স্যার" করার জন্য ব্যস্ত। তাহলেই তাদের চাকরিও থাকবে, পদোন্নতিও হবে, পুলিশ মেডেলও হবে। শুধু জনসাধারণ নিরাপত্তার অভাবে দিশাহারা হয়ে ঘুরবে।

ফাঁসির আসামি নাসো, লোকমানরা তাদের সাজা মুকুব করার জন্য কলকাতা হাইকোর্টে যথারীতি আবেদন করল।

দীর্ঘ দিনের শুনানির পর, হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের বিচারপতি গীতেশ রঞ্জন ভট্টাচার্য ও বিচারপতি অমিত তালুকদার নিরানব্বই সালের পয়লা ডিসেম্বর তাদের রায়ে নাসিম ও সন্ধ্যা আকতারের ফাঁসির হুকুম বহাল রাখেন, কিন্তু লোকমান শা ও মহঃ হোসেন চৌধুরির ফাঁসির হুকুম নাকচ করে দিয়ে তার বদলে তাদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দেন।

এই রায় বর্তমানে কর্মরত কলকাতা পুলিশের কর্মচারীদের খুশি করতে পারেনি, তাই তারা লোকমান শা ও মহঃ হোসেন চৌধুরিরও ফাঁসির হুকুম বহাল রাখার জন্য সুপ্রীম কোর্টে আবেদন করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। জানি

না, তাদের সেই আবেদনের ফল কী হবে। ফল যাই হোক, আমরা আর কোনও দিনও মেহেতা সাহেব ও মোক্তার আলিকে ফিরে পাব না। যাদের অপরিণামদর্শিতার জন্য এই ঘটনা ঘটেছিল তারা কী একটুও অনুতপ্ত, দুঃখিত, লজ্জিত? যারা দাঙ্গাবাজদের মত্ততা ও খুনের কারণ হিসাবে পুলিশের গাড়ি থেকে তেল নিয়ে বাড়ি জ্বালানোর গুজবটাকে তত্ত্বের আকারে প্রচার করেছিল, তারা কী একবারও ভেবেছে, মেহেতা সাহেবকে দলছুট হতে দেওয়াটাই একটা অপরাধের সমান। সেইজন্য সে নিজেও আংশিকভাবে দায়ী। তারও দায়িত্ব ছিল নিজেদের প্রতিরোধ গড়ার। মনে হয় তেমন ভাবনা কেউ ভাবেনি। ভাবলে, আরও সংগঠিত ভাবে তারা মামলার কাজে সহায়তা করত, তাতে যারা অপরাধ করেও সাক্ষ্যপ্রমাণের অভাবে আদালত থেকে বেকসুর খালাস পেয়ে গেছে তারা ওইভাবে লেজ উঁচিয়ে আর চট করে সমাজে ফিরতে পারত না।

সমাজের কোষে কোষে কত যে নোংরা জীব দিনরাত তাঁত বোনার মতো ষড়যন্ত্রের কদর্য জাল বুনে চলেছে তা কি আমরা যথাসময়ে জানতে পারি? যথাসময়ে কেন সেই সব ষড়যন্ত্রের একশ ভাগের দশ শতাংশও প্রকাশ্যে আসে না।

কোটি কোটি মানুষের সংসারে কোটি কোটি মানুষের মস্তিষ্কের ভেতর কত কি যে কিলবিল করছে তা আন্দাজ করাও প্রায় দুঃসাধ্য। সবাই যে ষড়যন্ত্রের অংশীদার তা অবশ্যই নয়। সুস্থ ও ভাল চিন্তার মানুষই অধিকাংশ, কিন্তু অসুস্থ ও মন্দ লোকেরও অভাব নেই। আর তাদের শিকার হয় সুস্থ ও ভাল লোকেরা। এই নিয়মেই পৃথিবীর মনুষ্যসমাজ যেন বাঁধা। সমাজের অগ্রগতির সঙ্গে যদি আদর্শের প্রচার ব্যাপকভাবে না করা যায় সমাজে ঘুণ ধরতে বাধ্য। সেই ঘুণেরাই কুরে কুরে সমাজের ভেতর দগদগে ঘা করে দেয়, আর সেই ঘা থেকে মুক্তির জন্য আমরা ছটফট করি।

সাদার্ন অ্যাভিনিয়ুর যেখানে এখন নজরুল মঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেখানে একসময় এক মুসলিম উচ্চবিত্ত পরিবারের কবরস্থান ছিল। কবর দেওয়া বহু বছর আগেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। পরবর্তীকালে সেটা কলকাতা ইনপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট সেই কবরস্থানটা উন্নয়নের জন্য নিজেদের আওতায় হস্তান্তর করে নেয়। হস্তান্তর হওয়ার পরও বহু বছর সেখানে কোনও পরিকল্পনা মাফিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেনি।

সেই কবরস্থানে অনেকগুলি বড় বড় তালগাছ ছিল, ছিল ক'টা খেজুর গাছও। একসময় ওই জায়গাটা নিচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা ছিল, সেই প্রাচীরের ভাঙ্গা ভাঙ্গা অংশ তার পুরনো ইতিহাসই বহন করে চলেছে।

ষাটের দশকেও রবীন্দ্র সরোবর অঞ্চল এখনকার মতো এত দূষিত ছিল না। খোলামেলা উদার বুক পেতে সে বাতাস বইতে দিত। কবরস্থানের তালগাছগুলি সারা দিনরাত্রই সরসর আওয়াজে বাতাসের সঙ্গে খেলত। কোনও কোনও তালগাছে বাবুই পাখিরা তাদের বাসাও বেঁধেছিল। তাদের সেই নিপুণ কারিগরি দক্ষতার বাসা তালগাছের পাতায় পাতায় লম্বা হয়ে ঝুলত আর হাওয়ায় হাওয়ায় দোল খেত। ওরা তাদের সেই ঝুলন্ত ঘরেই নিজেদের সংসারে দোল খেতে খেতে ঘুমাত। অন্য পাখিরা কী হিংসা করত? না। তাদের মস্তিষ্কের কোষে পরশ্রীকাতরতার কোনও স্থান নেই। যে যার আপন ভোরেই খুশি। সেই নিজ নিজ ভূমিতেই সে উড়ে বেড়ায়, নাচে। আকাশের নিচে উড়ে বেড়ানোই একমাত্র তাদের আকাঙ্ক্ষা। হিংসা, লোভের কাছে তারা পরাধীন হবে কেন?

কলকাতা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট ওই তাল খেজুর গাছের রসের জন্য প্রতি বছর নিলামের মাধ্যমে এক বছরের জন্য লিজ দিত।

উনিশশো সাতষট্টি সালে ওই তাল ও খেজুর গাছের জন্য নিলামে ডেকে লিজ নিয়েছিল ঢাকুরিয়া অঞ্চলের অধিবাসী রামচন্দ্র চৌধুরি।

রামচন্দ্র কাজ করত পোর্ট ট্রাস্টে। সে প্রতি সকালে ঢাকুরিয়ার বাড়ি থেকে বেরিয়ে রেল লাইন পার হয়ে ওই কবরস্থানে তাল খেজুরের গাছগুলি দেখে তারপর সাদার্ন অ্যাভিনিয়ু থেকে বাস ধরে বন্দরের দিকে চলে যেত।

একদিন সকালে যথারীতি সে ওই তালগাছ দেখতে এল। বেশ খানিকটা দূর থেকেই রামচন্দ্রের চোখ আকাশের দিকে দৃষ্টি রেখে কবরস্থানে ঢোকে। মাথা তার উপরের দিকেই থাকে। গাছে গাছে তালের ছড়ায় ঠিকমতো হাঁড়ি বাঁধা আছে কিনা সেটাই তার একমাত্র লক্ষ্য। শীতকালে খেজুর গাছেও নজর দিতে হয়। খেজুরের সুমিষ্ট রসের জন্য সেখানেও ঝোলে মাটির কলসি।

রামচন্দ্রের পর্যবেক্ষণ শেষ। সবই ঠিকঠাক আছে। গ্রীষ্মের সকালে সূর্যের তেজ প্রখর হওয়ার আগেই সে পৌঁছে যাবে তার কর্মস্থলে। সে জানে, তালগাছের রস দিয়ে তৈরি হবে তালপাটালি কিংবা তাড়ি। রামচন্দ্র ওই সব করে না, তার জন্য আলাদা লোক আছে। তারা বাঁশের দাঁড়িতে দু'দিকে বড় বড় কলসি ঝুলিয়ে আসে। রামচন্দ্রের থেকে তারা তালরস নিয়ে বারুইপুরের দিকে চলে যায়।

চোখ তার আকাশমুখী থেকে নিম্নমুখী হলো। কবরস্থান থেকে সে এবার বেরিয়ে যাবে। হঠাৎ তার নজরে এল, একটা খেজুর গাছের নিচে একটা মাঝারি মাপের নতুন চটের থলি।

সামান্য দূর থেকে ওই চটের থলিটা দেখে রামচন্দ্র আশ্চর্য হলো। কারণ ওই খেজুর তলায় নির্জন স্থানে এমন একটা নতুন চটের থলি থাকার কোনও সম্ভাবনাই সাধারণ চিন্তায় আসে না।

কৌতূহল দমন করতে রামচন্দ্র পায়ে পায়ে ওই খেজুর গাছের দিকে এগিয়ে গেল। ভাবল গত রাতে কোনও চোর কোনও বাড়িতে চুরি করে ওই থলিতে চুরির সামগ্রী নিয়ে এসে ওইখানে থলিটা ফেলে চুরির মালপত্র নিয়ে চলে গেছে। নয়ত আর কি হতে পারে?

রামচন্দ্র থলিটা হাতে তুলে নিল। বেশ ভারী। চোর কি কিছু ফেলে গেছে। কি সেটা, কার?

থলির মুখটা দু'হাতে ফাঁক করে রামচন্দ্র থলির ভেতরটা দেখার জন্য উঁকি দিল। ঠিক বুঝতে পারল না। সোফার কুশান দিয়ে ঢাকা গোলাকার কিছু একটা জিনিস।

উনসত্তর সালের ওই সময়ে, তখনও পশ্চিমবঙ্গে কুটীরশিল্পের মতো বোমাশিল্প পাড়ায় পাড়ায় প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তাই যেখানে সেখানে বোমা থাকার ভয়টা মানুষের মনে সংক্রামিত হয়নি।

রামচন্দ্র অই কুশানে জড়ানো গোল মতো জিনিসটা প্রত্যক্ষ করার জন্য থলিটা উল্টে দিল।

ঝপাস করে জিনিসটা মাটিতে পড়েই কুশান থেকে ছাড়িয়ে নিজেকে জানান দিল।

একটা ভয়ার্ত চিৎকার রামচন্দ্রের গলা থেকে অজান্তেই বেরিয়ে গেল। হাত থেকে থলিটা খসে গেল। রামচন্দ্র ভয়ে কাঁপতে লাগল। জিনিসটা কিন্তু নিশ্চিন্তে, রামচন্দ্রের প্রতিক্রিয়াকে ভ্রূক্ষেপ না করে কবরস্থানের মাটিতে শুয়ে আছে।

কবরস্থানের পাশ দিয়ে অন্য এক ভদ্রলোক যাচ্ছিল। সে রামচন্দ্রের ভয়ার্ত চিৎকার শুনে, চিৎকারের কারণটা জানার জন্য রামচন্দ্রের কাছে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, "কি হয়েছে ভাই?"

রামচন্দ্র মাটির দিকে আঙুল দিয়ে নির্দেশ দিয়ে বলল, "নিচে দেখুন না, কি।"

একটা কাটা মাথা। শরীরের আর কোনও অঙ্গ নেই। মাথাটা একটা

অল্পবয়সী ছেলের। নাকের নিচে সদ্য গজানো সবুজ গোঁফের রেখা। কালো মুখে আর কোনও বৈচিত্র্য নেই।

রামচন্দ্র আর তার কাছে সাহায্যকারী হিসাবে এগিয়ে আসা ভদ্রলোক দু'জনেই ওই অল্পবয়সী ছেলেটার কাটা মাথাটা দেখে এত বিহ্বল হয়ে গেছে যে, তারা তখন কি করবে তা ভেবে পাচ্ছে না।

দু'জনে পরস্পরের মুখের দিকে একবার তাকাচ্ছে, আবার দৃষ্টি ফিরিয়ে মাটিতে পড়ে থাকা কাটা মাথাটার দিকে দেখছে। কাটা গলার থেকে কিন্তু এক ফোঁটা রক্তও মাটিতে পড়েনি, কিংবা কুশানে বা থলিতে লাগেনি।

এসব ওদের দেখার কথা নয়, তবু আশ্চর্য হয়ে সেটাও তাদের নজরে এল। রামচন্দ্র ওই ভদ্রলোককে বলল, "এখন কি করি?"

"থানায় খবর দেওয়ার দরকার।"

"কিন্তু দু'জনে একসঙ্গে গেলে যদি কুকুর-টুকুর মাথাটা টেনে নিয়ে যায়? তাই যে কোনও একজনের এখানে থাকার দরকার।" রামচন্দ্রের জবাব।

"ঠিক, আমি যাচ্ছি। আপনি পাহারা দিন।" ভদ্রলোকের কথায় রামচন্দ্রের মুখ শুকিয়ে গেল। সে যত তাড়াতাড়ি পারে ওই কাটা মাথাটা থেকে পরিত্রাণ পেতে চায়। রামচন্দ্রের শুকনো মুখের দিকে তাকিয়ে ভদ্রলোক বলল, "আপনি ঘাবড়াবেন না, আমি খবর দিয়েই ফিরে আসছি।"

রামচন্দ্রের উত্তর না শুনে সে সাদার্ন অ্যাভিনিয়ুর দিকে হাঁটতে শুরু করল। ওখান থেকে বাসে চড়ে সে টালিগঞ্জ থানায় যাবে।

তখনও লেক থানা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ওই অঞ্চলটা টালিগঞ্জ থানার এক্তিয়ারে ছিল। ভদ্রলোক হনহন করে হেঁটে পুবদিক থেকে আসা একটা চলন্ত বাসে উঠে পড়ল।

দশ মিনিটের মধ্যে টালিগঞ্জ থানায় পৌঁছে ভদ্রলোক অফিসার-ইন-চার্জকে তার দেখা ঘটনাটা বলতেই ওসি অন্য এক অফিসার, দুজন কনস্টেবল ও সেই ভদ্রলোককে সঙ্গে নিয়ে জিপ নিয়ে কবরস্থানের দিকে ছুটলেন।

সাত আট মিনিটের মধ্যেই সবাই তাল খেজুর গাছের বাগান চত্বরে কবরস্থানে এসে দাঁড়াল।

পাহারারত রামচন্দ্র করুণ দৃষ্টিতে ওদের দিকে তাকিয়ে খানিকটা আশ্বস্ত হলো। এতক্ষণ সে ভয়ে ভয়ে হিন্দুদের তেত্রিশ কোটি দেবদেবীর যে কজনের নাম জানা আছে, তাঁদের নাম জপ করতে করতে কোনও মতে দাঁড়িয়ে ওই কাটা মাথাটা পাহারা দিচ্ছিল, আর মাঝে মধ্যে শিউরে উঠছিল।

খবরটা একেবারে ঠিক। ওসি ও অন্য পুলিশ কর্মচারীরা দেখল। ওসি রামচন্দ্রকে প্রশ্ন করে জেনে নিল, কিভাবে, কখন সে ওই কাটা মাথাটা দেখেছে, সে কি করে ইত্যাদি।

রামচন্দ্র ও ওই ভদ্রলোককে এখন ছাড়া যাবে না। ওদের বয়ান লিপিবদ্ধ করা দরকার। সাক্ষীর জন্য। ওসি ওদের দু'জনকে নিয়ে থানার দিকে ফিরে চলল। পাহারায় রইল দু'জন কনস্টেবল।

ওসি থানায় এসে প্রথমেই খবর দিল লালবাজারের গোয়েন্দা দফতরে। তখন গোয়েন্দা দফতরের ডিডি ডিসি (দ্বিতীয়) ছিলেন দেবী রায়, তিনি মার্ডার সেকশনের অফিসার শম্ভু দাস সরকার, শিশুরঞ্জন দাশ, দীপক রায় ও কুকুর সমেত ডগ স্কোয়াডের লোকজনকে নিয়ে ছুটলেন।

ওরা যখন ওই কবরস্থানে পৌঁছাল তার অনেক আগেই টালিগঞ্জ থানার ওসি দেবীবাবুর নির্দেশ মতো দ্বিতীয়বারের জন্য রামচন্দ্র ও তার সঙ্গীকে নিয়ে পৌঁছে গেছেন।

দেবীবাবু সমেত গোয়েন্দা দফতরের অন্য অফিসাররাও অবাক হয়ে দেখলেন কাটা মাথাটার কোনও খানে একটুও রক্তের দাগ নেই। এমন কী গলা থেকে শিরাগুলি বেরিয়ে আছে, সেখানেও রক্তের চিহ্ন নেই। মনে হচ্ছে, যেন জল দিয়ে পরিষ্কার করা। সোফার কাপড়েও রক্ত নেই। গলাটা কোনও ধারালো অস্ত্র দিয়ে কাটা নয়। এবং যে বা যারা কেটেছে তারাও যে এ ব্যাপারে ওস্তাদ নয় তাও বোঝা যাচ্ছে। কারণ কাটা অংশটা এবড়ো-খেবড়ো। কোনও পাকা হাতের 'কাজ' নয়।

শরীরের বাকি অংশটা কই? কবরস্থান, রবীন্দ্র সরোবরের আশপাশ, রেল লাইনের ধার দ্রুত তল্লাশি করা হলো। কিন্তু কোথায়ও তার দেখা নেই। তাহলে শুধু কাটা মাথাটা এখানে কে রেখে গেল? মাথা ছাড়া শরীরের বাকি বড় অংশটা কোথায় লুকিয়ে ফেলল? বাকি অংশটা যেখানে লুকিয়ে ফেলেছে সেখানেই তো মাথাটাও লুকিয়ে ফেলতে পারত, কিন্তু সেখানে খুনীরা মাথাটা রাখল না কেন? তবে কি, বাকি অংশটা কেউ উদ্ধার করে ফেললে মাথা না দেখে, শরীরের অংশ দেখে, অংশের মালিকের পরিচয় গোপন রাখার উদ্দেশে?

উপস্থিত আমাদের গোয়েন্দা দফতরের অফিসাররা একটা ব্যাপারে সহমত হলো যে, বাকি অংশটা খুনীরা সরোবরের জলে ফেলে দেয়নি। সরোবরের জলে ফেলে দিলে তারা মাথাটাও ওই ঠিকানাতেই পাঠিয়ে দিত। তার অর্থ, বাকি অংশটা অন্য কোনও জায়গায় সরিয়ে ফেলার পর তারা সরোবরের জলেই মাথাটা ফেলে দিতে এসেছিল। কিন্তু ফেলতে পারেনি।

তাদের ফেলতে না পারার কারণ খুব সম্ভবত তখন সরোবরের ধারে অন্য লোক ছিল। যারা, ওই থলি সমেত মাথাটা ফেললে তাদের দেখে ফেলতো। সেই ভয়েই তারা পিছিয়ে যায় এবং নিজেকে বা নিজেদের ওই কাটা মাথার ভার থেকে মুক্ত করতে উপায়ান্তর না দেখে পাশেই কবরস্থানের খেজুর গাছতলায় থলি রেখে দিয়ে সরে পড়েছে। অর্থাৎ খুনীরা রাতে নয়, দিনে মাথাটা ফেলতে এসেছিল। রাতে সরোবরের ওই অংশে সাধারণভাবে লোক থাকে না। দিনে থাকে। জোড়ায় জোড়ায়। একা। দল বেঁধে। নিজেদের মতো করে।

খুনীরা যে পেশাদার নয় তা কাটা মাথার গলার অংশটা দেখেই পরিষ্কার বোঝা যায়। তার ওপর যেভাবে কাটা মাথাটা ফেলে গেছে তাতেও ওই ধারণাই প্রতিষ্ঠিত। কারণ, সে বা তারা সরোবরের পূর্ব প্রান্তের জলে ফেলতে না পারলেও দীর্ঘ সরোবরের পাশ দিয়ে পশ্চিম দিকে হাঁটতে শুরু করলে কোনও না কোনও নির্জন স্থান পেয়ে যেত, যেখান থেকে তারা অনায়াসেই কাটা মাথা সমেত থলিটা সরোবরের বুকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারত। কিন্তু তা করেনি, এবং অবশ্যই ভয়ে। পেশাদার খুনীরা কিন্তু এই কাজটা করত না। তারা অপেক্ষা করত এবং সময় বুঝে দর্শকের চোখের আড়ালে কাটা মাথাটা লোপাট করে দিত।

টালিগঞ্জ থানার সাহায্য দিয়ে আমাদের দফতরের অফিসার ও কনস্টেবলেরা ওই অঞ্চলের আশেপাশের গলিতে গলিতে গিয়ে খোঁজ নিল অল্পবয়সী কোনও ছেলে নিখোঁজ হয়েছে কিনা।

না, নিখোঁজ হওয়ার কোনও বার্তা কারও কাছে নেই। তার একটা অর্থ হতে পারে খুনী দূর থেকে এসেছিল। কিন্তু কত দূর থেকে? সে কি পায়ে হেঁটে এসেছে? পায়ে হেঁটে যদি আসে তবে দূরত্ব খুব বেশি হবে না। কারণ তার উদ্দেশ্য ছিল, কাটা মাথাটা লুকিয়ে ফেলা। তার বেশি কিছু নয়। দূরত্ব বেশি হলে সে সরোবরের জলেই ওটা ফেলতে আসবে কেন, বা কবরস্থানেই বা রেখে যাবে কেন? সে তো অন্য কোনও পুকুর, ঝিলেও সেটা ফেলতে পারত বা কবরস্থানের মতো অন্য কোনও নির্জন স্থানেই থলিটা ফেলে দিতে পারত। আর পায়ে হেঁটেই যদি না আসে, তবে কি গাড়িতে এসেছিল? কি ধরনের গাড়িতে? খুনী নিশ্চয়ই ওই কাটা মাথা সমেত থলি নিয়ে বাসে চড়ে আসেনি। ধারণাটা হলো, আপাতদৃষ্টিতে বোঝা যাচ্ছে খুনী পেশাদার নয়। তবে খুন করার পর যে লাশ নিয়ে অনেকক্ষণ ঘাঁটাঘাঁটি করেছে তা কিন্তু প্রমাণিত। কারণ সে শরীরের বাকি অংশটা থেকে গলাটাকে বারবার কোনও দা জাতীয় অস্ত্র

দিয়ে আঘাত করে বিচ্ছিন্ন করেছে। তারপর বাকি অংশটাকে অন্যত্র পাচার করেছে। মাথাটা ভাল করে জল দিয়ে ধুয়েছে, তার ফলেই রক্তের চিহ্ন উধাও। এত সব করার পর নতুন চটের থলি কিনেছে। সেই থলিতে সোফার কাপড় ও কুশান দিয়ে মাথাটা জড়িয়ে থলিতে পুড়ে তারপর সেটা লুকিয়ে ফেলার প্রচেষ্টায় এদিকে এসেছিল।

বহুক্ষণ লাশ নিয়ে থাকার পর সে বা তারা আর ধৈর্য রাখতে পারেনি। থলিটা ফেলে বাঁচতে চেয়েছে। তার মানে খুনী শেষ মুহূর্তে ভয় পেয়েছিল, এবং সেই ভয় তাকে নিশ্চয়ই বাসে চড়ে আসতে দেয়নি। তবে খুনী কি ট্যাক্সি বা নিজের কোনও গাড়িতে চড়ে এখানে এসেছিল? ট্যাক্সি চড়ে এলে তার অর্থ সে বেশ খানিকটা দূর থেকে এসেছে। দূর থেকে এলে সে এখানেই ট্যাক্সি থেকে নেমে গেল কেন? ট্যাক্সি থেকেই তো সে দেখতে পাবে, যে উদ্দেশ্য নিয়ে তার এখানে আগমন তা সফল হবে না, কারণ সরোবরের পাড়ে লোকজন বসে আছে।

সে তাহলে গাড়ি ঘুরিয়ে সরোবরের অন্য অংশে নজর রাখতে রাখতে এগিয়ে যেতে পারত এবং তার সুবিধা মতো জায়গায় সে গাড়ি থেকে নামতে পারত। তার অর্থ খুনী গাড়িতে আসেনি।

তাছাড়া কবরস্থানে থলিটা ফেলে যাওয়ার মধ্যে বোঝা যাচ্ছে খুনী এই অঞ্চল সম্পর্কে অবহিত। সে সরোবরের জলেই সেটা ফেলে দিতে এসেছিল এবং তার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে সে তাড়াতাড়ি কবরস্থানে চলে যায় এবং সেখানে খেজুর গাছের তলায় রেখে পালিয়ে যায়। সে জানে কবরস্থানটা নির্জন এবং তার কর্ম অন্য লোকের দৃষ্টির গোচরে আসবে না।

তাহলে খুনী কতদূর থেকে এখানে এসেছিল? ডগ স্কোয়াডের কুকুর গন্ধ শুঁকে সাদার্ন অ্যাভিনিয়ু পর্যন্ত গিয়েই থমকে যায়। তার দ্বারা যে আমাদের কোনও উপকৃত হবে না তা বোঝা গেল।

আর একটা বড় প্রশ্ন তখন সামনে দাঁড়িয়ে, খুনী শরীরের বাকি অংশটা কোথায় পাচার করল। একটা উনিশ কুড়ি বছর বয়সের ছেলের শরীর তো আর একটুখানি নয় যে সেটা একটা থলিতে ভরে অন্য কোনও কবরস্থানের খেজুর গাছতলায় ফেলে এসেছে। তা যদি না হয় তবে কোথায় নিয়ে যেতে পারে?

পায়ে হেঁটেই যদি খুনী কাজ সারে তবে সে বা তারা নিশ্চয়ই বালিগঞ্জ বা তার আশপাশের এলাকার। বালিগঞ্জের মতো জায়গায় কি করে একটা বড় শরীর লুকিয়ে ফেলল, যেখানে একটা মাথা পাচার করতেই সে হিমশিম খেয়েছে।

কোনও গাড়িতে যদি দেহের বাকি অংশ লুকিয়েই রাখে তবে অনর্থক সে শুধুমাত্র মাথাটা এই কবরস্থানে ফেলে যাবে কেন? তার অর্থ খুনী গাড়িতে আসেনি। পায়ে হেঁটে এসেছে এবং লোকচক্ষুর অন্তরালে শরীরের বাকি অংশটার 'ব্যবস্থা' করে তবেই সে কাটা মাথা এখানে ফেলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চেয়েছিল।

দেবীবাবু ওই কবরস্থানে দাঁড়িয়েই এই খুনের তদন্তের ভার স্থানীয় টালিগঞ্জ থানার থেকে নিয়ে গোয়েন্দা দফতরের দায়িত্বে নিয়ে নিলেন। টালিগঞ্জ থানা এলাকায় খুনের বা সন্দেহজনক মৃত্যু বা দুর্ঘটনায় মৃত্যুর দেহগুলি মোমিনপুর মর্গে পোস্ট মর্টম হয়। দেবীবাবু স্পেশাল অনুমতি নিয়ে সেই কাটা মাথাটা কলকাতা পুলিশের মর্গে নিয়ে গেলেন। সেখানে তখন প্রখ্যাত ডাক্তার জে বি মুখোপাধ্যায় পোস্ট মর্টমের দায়িত্বে।

লালবাজারে অফিসাররা ফিরে আসার পর আলোচনা করে ঠিক হলো এই খুনের তদন্ত ও মামলার দায়িত্বে থাকবে দীপক রায়।

দীপক কাটা মাথাটা নিয়ে পোস্ট মর্টমের জন্য ডাক্তার জে বি মুখোপাধ্যায়ের কাছে গেল।

ডাক্তার মুখোপাধ্যায় ঝট করে একবার কাটা মাথাটা দেখেই দীপককে প্রশ্ন করলেন, "ওই কাটা মাথাটা দেখে তোমার কি মনে হচ্ছে, কোন অঞ্চলের ছেলে?"

দীপক বলল, "দেখে তো মনে হচ্ছে ছেলেটা বাঙালি।"

ডাক্তার মুখোপাধ্যায় বললেন, "বাঙালি তো নিশ্চয়ই, জিজ্ঞেস করছি কোন জেলার?"

দীপক আর একবার মাথাটার দিকে তাকাল। তারপর বলল, "স্যার, আমার তো মনে হচ্ছে, ছেলেটা মেদিনীপুর জেলার।"

ডাক্তার মুখোপাধ্যায় একবার হাসলেন, বললেন, "তোমার অনুমানই ঠিক, তদন্তের পর দেখ, মিলে যাবে।"

ওই মর্গে মৃতদেহ দীর্ঘদিন ধরে অবিকৃত রাখার ব্যবস্থা আছে। ডাক্তার মুখোপাধ্যায় মাথাটা সেইভাবে রাখার ব্যবস্থা করলেন।

দীপক লালবাজারে ফিরে এল। এবার শুরু হলো তদন্তের আসল দিক। প্রথমে জানা দরকার, ওই ছেলেটার পরিচয়। সেই পরিচয়ের সূত্র ধরে তার খুনীদের গ্রেফতারের জন্য এগিয়ে যাওয়া। দ্বিতীয় আর একটা জিনিসও দেখতে হবে, কোথায় আছে ওই মৃত ছেলেটার শরীরের বাকি অংশ। সেটা উদ্ধার করতে পারলে সেই সূত্র ধরেও খুনীর নাগাল পাওয়া যেতে পারে।

একদিন গেল, দু'দিন গেল, আশেপাশের এলাকা থেকে কোনও নিখোঁজের খবর নেই। আশ্চর্য, ঠিক হলো, পত্রিকায় একটা খবর দেওয়া হবে। গল্প করে বানিয়ে বলার জন্য নয়। যা সত্যি সেটাই। সেই খবরের ভিত্তিতে যদি ছেলেটার পরিচয় পাওয়া যায়।

শরীরের বাকি অংশটা যে সরোবরের জলে থাকতে পারে না, তা আমরা যুক্তি দিয়ে বুঝে গেছি। কিন্তু তবুও আমরা নিজেদের যুক্তির ওপর অতিরিক্ত বিশ্বাস না দেখিয়ে কলকাতা বন্দর ও আমাদের ডুবুরি নামালাম সরোবরের জলে।

তিন তিনজন ডুবুরি সরোবরের পূর্ব প্রান্তের জল ঘণ্টা তিনেক ধরে তোলপাড় করে জানাল, নেই। মানুষের দেহের কোনও অংশই তারা খুঁজে পায়নি। আমাদের যুক্তিটাই প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল।

দৈনিক পত্রিকায় খবর ছাপা হওয়ার পরও একটা দিন পার হয়ে গেল। খবরটা ছাপা হয়েছিল এইভাবে, "উনিশ কুড়ি বছর বয়সের একটা কালো রঙের ছেলের কাটা মাথা রবীন্দ্র সরোবর এলাকায় একটা চটের থলির ভেতর থেকে উদ্ধার করা হয়েছে, সেই ছেলেটার পরিচয় জানার জন্য পুলিশ তার পরিচিত জনকে হন্যে হয়ে খুঁজছে।"

এই খবর প্রকাশিত হওয়ার পর দ্বিতীয় দিন মিঃ রায়চৌধুরি নামের এক ভদ্রলোক টালিগঞ্জ থানায় এসে অফিসার-ইন-চার্জ নির্মল বন্দ্যোপাধ্যায়কে পত্রিকার ওই খবরের ওপর ভিত্তি করে বললেন, "যেদিন ওই কাটা মাথাটা পাওয়া গেছে, তার আগের দিন দুপুর থেকে আমার বাড়ির কাজের ছেলেটা নিখোঁজ। কোন কিছু না বলেই চলে গেছে। তার বয়সও উনিশ-কুড়ি। এবং গায়ের রঙ কালো।"

মিঃ রায়চৌধুরির কথা শুনে ওসি বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্গে সঙ্গে লালবাজারের মার্ডার সেকশনে ফোন করে তা জানালেন।

দীপক ও অন্য দুই অফিসার টালিগঞ্জ থানায় ছুটল। সেখান থেকে মিঃ রায়চৌধুরির বাড়ি। টালিগঞ্জ গার্ডেন্সের একটা তিনতলা বাড়ির দোতলার ফ্ল্যাটে মিঃ রায়চৌধুরি তাঁর বৃদ্ধা মা, স্ত্রী ও একটা শিশুকন্যা নিয়ে থাকেন। তাঁর বাড়িতেই একটা সর্বক্ষণের কাজের ছেলে ছিল। সেই ছেলেটাই নিখোঁজ। ছেলেটার নাম বাসুদেব জানা। ডাক নাম বাসু। আদি বাড়ি মেদিনীপুর। বছর দুয়েক ধরে মিঃ রায়চৌধুরির বাড়িতে কাজে বহাল। মোটামুটি বিশ্বাসী। ইদানীং মাঝে মধ্যে অন্যমনস্ক মনে হতো। একটু উদ্ধত ধরনেরও হয়ে গিয়েছিল। যুক্তফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পর স্থানীয় কিছু সি পি আই (এম)

ক্যাডারদের সঙ্গে মিশে মস্তান মস্তান ভাব করত। ঘরের কাজ তাড়াতাড়ি শেষ করে বিভিন্ন বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা মারতে যেত।

দীপকরা মিঃ রায়চৌধুরি ও মিসেস রায়চৌধুরির বয়ান শুনতে শুনতে ওদের ফ্ল্যাটের জিনিসপত্রের দিকে লক্ষ্য করছিল। যেটা তারা খুঁজছিল সেটা নেই। বাড়িতে কোনও সোফা নেই।

দীপক মিসেস রায়চৌধুরিকে প্রশ্ন করলেন, "বাসু কখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল? ক'টা নাগাদ?"

মিসেস রায়চৌধুরি বললেন, "ও যখন বেরিয়ে যায়, ঘড়ি তো আমি দেখিনি, মানে, দেখার প্রয়োজন মনে করিনি। তবে, দুপুর দুটো নাগাদ হবে। তখন বাসু দুপুরের খাওয়ার খেতে বসেছিল। ঠিক সেই সময় মদন নামে ওর একটা বন্ধু রাস্তা থেকে ওর নাম ধরে ডাকে। বাসু খেতে খেতে নিচে নেমে যায়। মদনের সঙ্গে কথা বলে দুই এক মিনিটের মধ্যে উঠে আসে। আমাকে বলে, আমি এক্ষুণি আসছি। তারপর মদনের সঙ্গে চলে যায়। আর ফেরেনি।"

দীপক প্রশ্ন করল, "ওর পরনে কী ছিল?"

মিসেস রায়চৌধুরি বললেন, "শুধু কালো একটা হাফপ্যান্ট।"

"আর কিছু নয়?"

"না, খালি গায়েই বাসু চলে যায়।"

দীপক জানতে চাইল, "ও কী খালি গায়ে পাড়ায় ঘুরতে যেত?"

মিসেস রায়চৌধুরি বললেন, "আশেপাশে গেলে কখনও-সখনও খালি গায়ে যেত। দূরে গেলে নয়।"

এই কথায় দীপকরা বুঝে গেল, মদন নামে ছেলেটি বাসুকে পাড়াতে যাওয়ার কথা বলেই নিয়ে গেছে। দূরে যাওয়ার কথা বললে সে নিশ্চয়ই গায়ে একটা জামা চাপিয়ে নিত। তাছাড়া মদন তাকে এমন কিছু বলেছিল যে সে তার দুপুরের খাওয়াও শেষ না করে চলে যায়। অর্থাৎ মদনের কথার পর তার আর সময় নষ্ট করার সময় ছিল না। অতি দ্রুত চলে যায়।

দীপক জানতে চাইল, "মদন কে?"

মিঃ রায়চৌধুরি বললেন, "মদন মিঃ কিরণ চৌধুরির বাড়িতে কাজ করে। বাসুর বন্ধু। আমাদের বাড়ি থেকে দশ বারোটা বাড়ির পরে কিরণবাবুর বাড়ি। ওখানেই মদন থাকে।"

দীপকরা কিরণবাবুর বাড়ি গেল। কিরণবাবু গড়িয়াহাটের একটা পেট্রল

পাম্পের মালিক। অবিবাহিত। সজ্জন ব্যক্তি। তার বাড়িতেই মদনকে দীপকরা পেয়ে গেল।

দীপক কুড়ি বাইশ বছরের মদনকে প্রশ্ন করল, "তুই কী বাসুকে সেদিন ডেকে নিয়ে এসেছিলি?"

মদন নির্দ্বিধায় বলল, "হ্যাঁ স্যার, ওর দাদা ওকে ফোন করেছিল, সেটাই ওকে জানাতে গিয়েছিলাম। ও ফোন করার পর কোথায় চলে গেছে তা আমি জানি না।"

দীপক জানতে চাইল, "ওর দাদা কোথায় থাকে?"

"সে স্যার ভবানীপুরের একটা পেট্রল পাম্পে কাজ করে, ওখান থেকেই সে মাঝে মধ্যে বাসুকে খবর দেওয়ার জন্য ফোন করে। আমি খবর দিয়ে দিই। ও আসে, আমাদের পাম্প থেকে ওর দাদাকে ফোন করে চলে যায়।" মদনের সরল উত্তর।

দীপক মদনের উত্তরের সত্যতা যাচাই করার জন্য কিরণবাবুকে জিজ্ঞেস করল, "সত্যিই বাসুর ফোন আসে কি?"

কিরণবাবু বললেন, "হ্যাঁ, মাঝে মাঝে আসে। তবে সেটা ওর দাদার কিনা আমি জানি না। মদনই জানে। এরা সবাই মেদিনীপুরের ছেলে। আর যেদিনের ঘটনার কথা বলছেন, সেদিনও বাসুর একটা ফোন এসেছিল। আমি মদনকে বলে দিয়েছিলাম, তারপর ওরা কী করেছে আমি খেয়াল করিনি।"

"তুই বাসুর দাদা যে পেট্রল পাম্পে কাজ করে সেটা চিনিস?" দীপক মদনের কাছে জানতে চাইল।

"চিনি। কিন্তু ও তো ছুটি নিয়ে স্যার দেশে চলে গেছে। সেটাই বাসুকে বলতে বলেছিল। বাসুকে আমি জানিয়েছি। তারপর বাসু ওর সঙ্গে ফোনে কী কথা বলেছে তা আমি জানি না।" মদন বলল।

গোয়েন্দা দফতরের পুলিশকে এত সরলভাবে বিশ্বাস করানো যায় না। দীপক বলল, "ঠিক আছে আমাদের সঙ্গে চল। দেখি বাসুর দাদা সত্যিই ওর দেশের বাড়িতে গিয়েছে কি না।"

মদন দীপকের কথায় সামান্য একটু দ্বিধাগ্রস্ত হলো। দীপক কিরণবাবুকে বলল, "আমি ওকে একটু নিয়ে যাচ্ছি। প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলেই আমি ওকে পাঠিয়ে দেব।"

কিরণবাবু আর কী বলবেন? বললেন, "ঠিক আছে। আর কোনও সাহায্যের দরকার হলে জানাবেন।"

দীপকরা মদনকে গাড়িতে তুলে ভবানীপুরের দিকে রওনা দিল। বাসুর দাদার খোঁজ পেলে তাকেও কিছু প্রশ্ন করবে। ওর ভাই যে আর জীবিত নেই সেই খবরও সে জানে না। সেটা অন্তত জানতে পারবে। কিভাবে মারা গেছে সেটা জানতে পারবে না। খুন হয়েছে এটাই জানবে। কিভাবে খুন হয়েছে সেই তল্লাশ করতেই তো ছোটাছুটি।

বাসুর দাদা সত্যিই তার কর্মস্থলে নেই। ছুটি নিয়ে মেদিনীপুরে তাদের বাড়ি গেছে। দুই একদিনের মধ্যেই ফিরবে।

দীপক মদনকে ছাড়ল না। ওই এখন একমাত্র যোগসূত্র। বাসুর শত্রু ও বন্ধুর খোঁজ ওর থেকেই পাওয়া যাবে। ওকে নিয়ে তাই দীপক সোজা লালবাজারে ফিরে এল।

দীপক ওকে ক্রমাগত জেরা করে যেতে লাগল। কিন্তু মদন একই কথা বারবার বলে যেতে লাগল। দীপকের মন থেকে মদনের ওপর সন্দেহের মাত্রাটা কমতে লাগল।

তবু মদনকে পরীক্ষা করার জন্য একবার শেষ চেষ্টা করার জন্য ওকে নিয়ে মর্গে গেল। যেখানে বাসুর কাটা মাথাটা রাখা আছে, সেখানে। মদনকে দীপক ওটা দেখাবে। সেটা দেখে মদনের কী প্রতিক্রিয়া হয় তার ওপর মদনকে নিয়ে কী করা হবে সেটা নির্ভর করবে। বিকেলবেলা মদনকে নিয়ে দীপক মর্গে পৌঁছাল।

দীপকের অনুরোধে মর্গের এক কর্মী একটা ট্রেতে করে বাসুর কাটা মাথাটা নিয়ে এল।

"মদন দেখ, এটাই তো বাসুর মাথা।" দীপক বলল।

একবার ওদিকে তাকিয়েই মদন চোখ বুজে মুখ বিকৃতি করে কোনও মতে বলল, "ওরে বাব্বা।"

দীপক আবার বলল, "কি রে মদন ভাল করে দেখ। এটাই তোর বন্ধু বাসুর মাথা কি না।"

মদন কিছুতেই তার চোখ খুলে মাথা ঘুরিয়ে দ্বিতীয়বার ওই কাটা মাথার দিকে তাকাচ্ছে না। শুধু বলল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ ওটাই বাসুর মাথা।"

মদনের প্রতিক্রিয়া দেখে দীপকের যা বোঝার বোঝা হয়ে গেছে। মদন যে এই খুনের সঙ্গে জড়িত তা বাসুর কাটা মাথা দেখার পর তার চোখ মুখের আচরণ দেখেই দীপক বুঝে গেছে। কারণ খুনীরা খুন করার পর তার কৃতকর্মের বিকৃত রূপটা পরবর্তী কালে আর দেখতে চায় না। ভয় পায়। মদনের প্রতিক্রিয়া ঠিক সেই রকমই।

দীপক মদনকে নিয়ে সোজা লালবাজারে চলে এল। এবার আর ওকে ভাল মানুষের মতো প্রশ্ন নয়। দীপক ওকে সরাসরি বলল, "দেখ মদন তুই যে বাসুকে খুন করেছিস, সেটা আমি জেনে গেছি। এখন যদি স্বীকার না করিস তবে কিভাবে স্বীকার করবি তা আমরা জানি। বল কোনদিক থেকে শুরু করব।"

বাসুর মাথাটা দেখার পর থেকে মদনের আচরণ পাল্টে গেছে। তা দীপকের চোখ এড়িয়ে যায়নি। ওর মুখ সাদা হয়ে গেছে। রক্ত যেন কে শুষে নিয়েছে। চোখ তার ভাষা হারিয়ে ফেলেছে। দুপুর থেকে সে যে দীপকদের সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবে কথা বলছিল তা আর বলতে পারছে না।

দীপকের হুমকি শোনার পরও একবার কাতর কণ্ঠে বলল, "আমি জানি না।"

"জানিস না বললে তো শুনবো না। এটা লালবাজার। মিথ্যা বলে পার পেয়ে যাবি না। তাড়াতাড়ি বল। নইলে আমাদের অন্য ব্যবস্থা করতে হবে। তখন বলবি। শুধু শুধু হয়রান হবি।" দীপকের হুঁশিয়ারি।

মর্গ থেকে লালবাজারে আসার পর মিনিট পাঁচ কি ছয় পার হয়েছে। বাসু এবার হঠাৎ কাঁদতে কাঁদতে বলে উঠল, "আমি একা করিনি স্যার।"

"আর কে কে আছে? তারা কোথায় থাকে?" দীপক তাড়াতাড়ি জানতে চাইল।

"রাজেন, শামু, রাজেন সাউ ছিল। ওরা সবাই আমাদের পাড়াতেই থাকে।"

"ওরা কি করে?" দীপক জানতে চাইল।

"ওরাও স্যার আমার মতো বাড়িতে কাজ করে। আমরা সবাই বন্ধু।"

"এখন গেলে ওদের পাব?" দীপক জানতে চাইল।

"হ্যাঁ স্যার, পেতে পারেন। কোথায় আর যাবে।" মদন কাঁপা কাঁপা গলায় জানাল।

"মাথা ছাড়া বাসুর দেহের বাকিটা কোথায় ফেলেছিস?"

"সিনহা সাহেবদের বাড়ির চেম্বারে। ওই বাড়িতেই রাজেন কাজ করে।" মদন জানাল।

"কোন বাড়িটা সিনহা সাহেবদের?"

"আটষট্টি নম্বর, বালিগঞ্জ প্লেস।" মদনের কথার উত্তর দীপক জানতে চাইল, "তা তোরা বাসুকে খুন করলি কেন? ও কি করেছিল?"

"সে স্যার অনেক কথা, আমার বলতে লজ্জা করছে।" মদন মাথা নিচু করে বলল।

"ন্যাকামি করিস না, খুন করতে লজ্জা হয়নি, এখন কী জন্য খুন করেছিস তা বলতে লজ্জা করছে। তাড়াতাড়ি বল। আমাদের হাতে সময় নেই।" দীপক ধমকে উঠল।

মদন মাথা নিচু করেই রইল। হয়তো ভাবছে, কোথা থেকে শুরু করব কিংবা অপরাধ করে নিজেই লজ্জিত। দীপক বলে উঠল, "কি রে মদন চুপ করে আছিস যে। বল।"

মদন এবার ঠোঁট খুলল, "স্যার, আমি, বাসু, রাজেনদা সবাই একই দেশের লোক।"

"দেশ মানে তো মেদিনীপুর জেলা।"

"হ্যাঁ, আমরা প্রত্যেকে প্রত্যেকেই চিনি। রাজেনদা আমাদের থেকে অনেক বড়। ও সি পি এম পার্টি করে। আমাদেরও পার্টির কাজে লাগায়। সে জন্য ওর বাড়িতে আমরা যাই।"

"ওর বাড়িটা কোথায়?" দীপক জানতে চাইল।

"স্যার ওই আটষট্টি নম্বরের পেছনে একটা বস্তি আছে। ওখানেই একটা ঘর ভাড়া নিয়ে রাজেনদা আর বৌদি থাকে।" মদন বলল।

"ছেলে মেয়ে নেই?"

"না স্যার, রাজেনদার ছেলে মেয়ে হয়নি। তবে বৌদিকে দেখতে খুব সুন্দর।" মদন এই কথাটা বলেই মাথা নিচু করে ফেলল।

"বলে যা, আমি শুনছি। তারপর?"

"ওই বস্তির ঘরেই আমরা যেতাম। তবে বাসু ঘন ঘন যেত। রাজেনদা না থাকলে বেশি যেত। আর বৌদির সঙ্গে গল্প করত।" মদন বলল।

দীপক গন্ধ পেয়ে গেছে। কারণের। নারীদেহই যে খুনের কারণ তা মদনের এইটুকু বিবৃতিতে প্রায় সামনে এসে পড়েছে। বলল, "তা তোদের ওই বৌদির সঙ্গে বাসু গল্প করত তো কি হয়েছে যে তাকে একেবারে খুন করে দিবি?"

"এ নিয়ে রাজেনদার সঙ্গে বৌদির রোজ ঝগড়া হতো। কিন্তু বৌদি বাসুকে বারণ করত না। বাসু তাই রোজ দুপুরে, সন্ধেবেলায় যেত। এ নিয়ে রাজেনদা আমাদেরও বলেছিল। আমরা বাসুকে বলেছিলাম, কিন্তু আমাদের কথা শোনেনি, ঠিক যেত।"

"তুই তখন থেকে শুধু যেত যেত করছিস। অন্য কিছু দেখেছিলি কী?" দীপক এবার মদনের কাছে সরাসরি উত্তর চাইল।

"রাজেনদা সব জানে, ওই বলতে পারে। তবে আমি একদিন দেখেছিলাম।"

"কী দেখেছিলি ?"

মদন একটু থমকে দাঁড়াল। কিছু ভাবল। তারপর বলতে শুরু করল। "রাজেনদা রোজ বলত, একটু খেয়াল করতে। সেদিন সন্ধেবেলায় বাসুকে আমি রাজেনদাদের বস্তির দিকে যেতে দেখি। রোজই যায়। আমার কাজ থাকে, আমি দেখতে যেতে পারি না। সেদিন বাসু ওইদিকে যাওয়ার আধঘণ্টা পর আমি ওখানে যাই। রাজেনদার ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। আমি দরজায় কান পেতে ভেতর থেকে বাসু ও বৌদির কথা শুনতে পারছিলাম। কিন্তু কী কথা বলছে বুঝতে পারিনি। রাজেনদা আমাকে একটা জায়গা বলে দিয়েছিল, যেখান দিয়ে ঘরের ভেতরটা দেখা যায়, আমি ঘরের পেছন দিকে সেই জানালাটা খুঁজে তার একটা ফুটো দিয়ে দেখার চেষ্টা করলাম। ঘরে একটা হ্যারিকেন জ্বলছিল। তাও টিমটিম করে। তাই ভাল করে দেখতে পারছিলাম না, তা, তাতেই দেখলাম, খাটের মধ্যে বৌদি শুয়ে আছে, আর বাসু পাশে বসে বৌদির পা টিপে দিচ্ছে। বৌদির কাপড়টা হাঁটু পর্যন্ত তোলা।" মদন একদমে ওর দেখা সেদিনের অভিজ্ঞতা বলতে লাগল।

"তারপর ? তুই চলে এলি ?" দীপক জিজ্ঞেস করল।

"না স্যার, বৌদি বাসুকে কি একটা বলল, বাসু খাট থেকে নেমে পড়ল। তারপর ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। আমিও চলে এসেছি।"

"তোর ওই বৌদির বয়স কত ?"

"কত হবে স্যার, তবে বাসুর চেয়ে বড়। পঁচিশ হবে। তবে স্যার বাসুর সঙ্গে যে মাখামাখি হয়েছিল তা ওই বস্তির অনেকেই জানে, ওই বস্তির একটা মেয়েও আমাকে বলেছিল। সে নাকি একদিন বাসুর কোলে বৌদিকে বসে থাকতে দেখেছিল। ওই মেয়েটা আমাদের পাশের বাড়িতে ঠিকে কাজ করে। ওকে জিজ্ঞেস করবেন।"

"সে দেখা যাবে। এবার বল, এই কারণেই কী তোরা খুন করলি ?" দীপক জানতে চাইল।

"রাজেনদা আমাদের রোজ দুপুরে বলত, কি রে আমার বৌটাকে তোরা বাসুর হাত থেকে বাঁচাবি না। আমরাও বলতাম, হ্যাঁ হ্যাঁ বাঁচাব। তারপর আমরা তাস খেলতে বসে যেতাম।"

"রোজ দুপুরে তোরা তাস খেলতিস ? কোথায় ?"

"সিনহা সাহেবের বাড়ির সামনে ফুটপাথে বসে। সবাই কাজ শেষ করে ওখানে এসে তাস খেলতে বসে যেতাম। আর তখনই রাজেনদা আমাদের বলত। সেদিনও আমরা ওখানে তাস খেলতেই এসেছিলাম। আর রাজেনদা

ওই একই কথা বলতে আমি জিজ্ঞেস করলাম, কি করে বাঁচাব, বল? রাজেনদা বলল, একেবারে সরিয়ে দিয়ে। আমি বললাম, সে কি? বলল, হ্যাঁ, অন্য কিছুতে হবে না। আমার মাথায় একটা প্ল্যান এসেছে। আজই সেই সুযোগ আছে। আমরা জানতে চাইলাম, কী? রাজেনদা বলল, এই মদন, আজ বাসুর দাদা ফোন করেছিল না? বললাম, হ্যাঁ। ও দেশে চলে যাবে সেটা বলে দিতে। রাজেনদা বলল, এখনও বলিসনি তো? বললাম, না, দেখা হলে বলে দেব। তখন রাজেনদা আমাকে বলল, খুব ভাল হয়েছে। তুই এখন ওর বাড়ি গিয়ে ওকে ডেকে ফোনের কথা বলবি। তারপর বলবি, বৌদি এক্ষুণি তোকে ডাকছে। বিশেষ দরকার, দেখবি ও সব কাজ ফেলে চলে আসবে। তারপর আমাকে বলল, ওকে আমাদের ঘরের দিকে যেতে দিবি না। বলবি, ওখানে রাজেনদা গিয়ে অশান্তি করতে বৌদি পালিয়ে এসেছে, আমি ওকে সিনহা সাহেবের বাড়ির পেছন দিকের বারান্দায় রেখে তোকে ডাকতে এসেছি। তোকে আমায় ডেকে নিয়ে যেতে বলেছে। দেখবি বাসু তখন তোর কথামতো এখানেই চলে আসবে। আমরা সব ওই জায়গায় বাথরুমে থাকব। তারপর মারব। শামু জানতে চাইল, ওর লাশ কোথায় চালান দেবে। রাজেনদা বলল, ম্যানহোল খুলে এই বাড়ির চেম্বারে। কেউ জানতে পারবে না। আমি বললাম, ওকে না পাওয়া গেলে তো সবাই আমাকে ধরবে, জিজ্ঞেস করবে, বাসুকে আমি কোথায় নিয়ে গেছি। রাজেনদা বলল, ধুর, সেজন্যই তো আজকে ভাল, তুই বলবি বাসুর দাদার ফোন এসেছিল, সেটা বলতে গিয়েছিলাম। তারপর ও কোথায় চলে গেছে আমি জানি না। তোকে কেউ সন্দেহ করবে না। রাজেনদার প্ল্যানটা আমাদের ভালই লাগল। আমি আর তখন অপেক্ষা না করে রাজেনদার নির্দেশমতো বাসুকে ডাকতে চলে গেলাম। তারপর তো সবই জানেন স্যার। বাসু চলে এল। আমি রাজেনদার কথামতো ওকে সিনহা সাহেবের বাড়ির পেছন দিক দিয়ে নিয়ে গেলাম। তবে বাসু একটু আশ্চর্য হয়েছিল, কারণ ওই বাড়িতেই তো রাজেনদা কাজ করে, আর ওখানেই বৌদি আছে, এটা ওর মনে একটু খটকা লেগেছিল। ও আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, এখানে বৌদি এসেছে? রাজেনদা জানে না? আমি বলেছিলাম, না। কোথায় আর রাখা যাবে। রাজেনদা যখন ওর বাড়িতে তখন এখানেই বৌদিকে রেখে গিয়েছি। বাসু আর আপত্তি করেনি আমার আগে আগে ঢুকে যায়। আমি পেছন দিকের দরজা বন্ধ করে দিই। যাতে ও পালিয়ে যেতে না পারে। তারপর ওর মুখ চেপে ধরে আমরা বাথরুমে ঢুকিয়ে দিই। বাসু ঢুকেই কিছু বুঝেছিল। ও ঢুকতেই রাজেনদা, শামু আর সাউ বেরিয়ে এসে

ওকে বাথরুমে জোর করে ঢুকিয়ে দেয়। শামু আর আমি ওকে চেপে ধরি, রাজেনদা আর সাউ ওর গলায় একটা দড়ি পেঁচিয়ে টানতে থাকে। দু'তিন মিনিটের মধ্যেই ও নেতিয়ে পড়ে। রাজেনদা বলে ওঠে, শেষ। শুয়োরের বাচ্চা শেষ। আমরাও দেখি, বাসু মরে গেছে। তারপর ওই বাথরুমের মধ্যেই বাসুর হাত, পা, মাথা আলাদা করতে বলে রাজেনদা। রাজেনদাই ছুটে একটা বড় কাটারি নিয়ে আসে। সাউ আর শামু কাটতে থাকে।"

"প্রথমে কোনটা কাটে?" দীপক জিজ্ঞেস করল।

"প্রথমে স্যার গলা কাটে, তিন চারবার কাটারিটা দিয়ে বাড়ি দিতে দিতে গলা আলাদা হয়।" মদন কাঁপা কাঁপা গলায় বলল।

"দা'টা কার হাতে ছিল? বাড়ি কে মারছিল?" দীপক জানতে চাইল।

"প্রথমে রাজেনদা, তারপর ওর হাত থেকে সাউ দা'টা নিয়ে নিয়েছিল। গলা কাটার পর শামু একটা হাত তুলে নিল। সাউ বগলের নিচ দিয়ে কাটারি চালাতে লাগল। প্রথম হাতটা কাটার পর দ্বিতীয় হাতটা একইভাবে কাটল। মাথা আর হাত আলাদা করার পর শামু পা দুটো কেটেছে।" মদন বলল!

"তুই তখন কী করছিলি?" দীপক মদনের কাছে জানতে চাইল।

"আমাকে বাথরুমের সামনে পাহারা দিতে বলেছিল। আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম।" মদন বলল।

"ওই কাটারিটা কার? রাজেনের না সিনহাদের?"

"সিনহা সাহেবদের।"

"ওটা কোথায় আছে? ওদের বাড়িতে না কি রাজেন ওটা অন্য জায়গায় সরিয়ে দিয়েছে?" দীপক জানতে চাইল।

"সেটা স্যার ধুয়ে রাজেনদা ওই বাড়িতেই রেখেছে। তবে কোথায় রেখেছে আমি সেটা জানি না।"

"বাসুর গলা, হাত, পা কাটার পর তোরা কী করলি? ওই চেম্বারে ঢুকিয়ে দিলি?" দীপক জিজ্ঞেস করল।

"হ্যাঁ স্যার, রাজেনদাই চেম্বারের ঢাকনা খুলে ওইগুলি নিয়ে আসতে বলল। শামু প্রথমে দুটো হাত নিয়ে এল। চেম্বারের নিচে ফেলে দিল। রাজেনদা সাউকে বলল শরীরটা নিয়ে আসতে। আমি আর সাউ ওটা নিয়ে গেলাম। তারপর ওটা আমরা সবাই মিলে ঢুকিয়ে দিলাম। তারপর পা দুটো। কিন্তু স্যার, চেম্বারটা তাতে একেবারে ভর্তি হয়ে গেল। মাথাটা আর ঢোকানো গেল না। মাথা ঢোকালে চেম্বারের ঢাকনাটা আর ঠিকমত

বসছে না। রাজেনদা তখন বলল, ছাড়, ওটার আমি অন্য ব্যবস্থা করছি। ওটাকে অন্য জায়গায় চালান করে দেব। তারপর মাথাটা বাদ দিয়েই রাজেনদা চেম্বারের ঢাকনাটা বন্ধ করে দিল।"

দীপক জানতে চাইল, "এই যে তোরা বাসুর শরীর এত কাটাকাটি করলি, রক্ত পড়ল না?"

"হ্যাঁ স্যার, অনেক রক্ত পড়েছিল, বাথরুমেই বেশি পড়েছিল। বাথরুমের জলে পুরো রক্ত রাজেনদা ধুয়ে দিয়েছে। মাথাটা ও পরে ভাল করে ধুয়ে দিয়েছে। রাজেনদা মাথাটা যখন ধুচ্ছিল, আমাকে পাঁচটা টাকা দিয়ে বলল, যা বাজার থেকে একটা চটের ব্যাগ কিনে নিয়ে আয়। আমি হাত ধুয়ে টাকা নিয়ে ব্যাগ কিনতে চলে গিয়েছিলাম। ফিরে এসে দেখি রাজেনদা সোফার কাপড়ে বাসুর মাথাটা জড়িয়ে রেখেছে। চেম্বারের আশে পাশে বালতি দিয়ে জল ফেলে পরিষ্কার করে ফেলেছে। আমি আসতেই আমার হাত থেকে ব্যাগটা নিয়ে ব্যাগে মাথাটা ঢুকিয়ে দিয়ে আমাকে বলল, যা এটা লেকের জলে ফেলে দিয়ে আয়। দেখবি কেউ যেন না দেখে। ছুঁড়ে মাঝখানটায় ফেলার চেষ্টা করবি। আমি ওটা নিয়ে চলে গিয়েছিলাম। কিন্তু ওখানে গিয়ে দেখি লেকের পাড়ে এখানে ওখানে অনেকগুলো ছেলেমেয়ে বসে আছে। আমি তাই ফেলিনি। ব্যাগটা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। তারপর আর ভাল লাগছিল না। তখন আমি ওই তালবাগানে নিয়ে ব্যাগটা রেখে চলে আসি।"

দীপক মদনকে বলল, "কোথায় এলি, রাজেনের কাছে, না তুই যেখানে কাজ করিস সেখানে?"

"না স্যার, রাজেনদা আমাকে বলে দিয়েছিল, ওর বাড়িতেই এসে খবর দিতে। আমি এসে দেখি রাজেনদা ফুটপাথে শতরঞ্চি পেতে তাস খেলতে বসে গেছে। আমাকে বসতে বলল, আমি বসলে রাজেনদা জিজ্ঞেস করল, কি রে ঠিকমত ফেলেছিস। আমি পুরো ঘটনাটা বলতে, আমাকে খুব খিস্তি দিল, তারপর চুপ করে গেল। আমরা সবাই চুপ করে আছি দেখে সাউ বলল, যা হবার হয়ে গেছে এবার তাস বাট। শামু তাস বাটলো। আমরা খেলতে শুরু করলাম।"

"তোরা খেলতে শুরু করলি, তোদের একবার মনেও হলো না, বন্ধুকে খুন করলি, ওর কথাও মনে পড়ল না?" দীপক জানতে চাইল।

মদন বলল, "আমার স্যার মনে পড়েছিল, অন্যদের কী হয়েছিল জানি না। আমার তখন মনে হয়েছিল, কাজটা ঠিক হয়নি, রাজেনদার কথায় বাড় খেয়ে এতবড় কাজ করাটা উচিত হয়নি, বাসুকে অন্যভাবেও শাস্তি

দেওয়া যেত। কিন্তু কী যে হয়ে গেল। তবে রাজেনদা তাস খেলতে খেলতে বারবার বলছিল, তোরা আজ আমার একটা বড় কাজ করেছিস। বন্ধুদের মতো কাজ। এই না হলে কিসের বন্ধু? শুয়ারের বাচ্চা এবার আমার বৌয়ের কাছে যাক। তোদের আজকে আমি খাওয়াব। সেদিন আমরা বেশিক্ষণ আর খেলার সময় পাইনি। যে যার বাড়িতে কাজ করতে চলে গিয়েছিলাম। রাত ন'টার সময় রাজেনদা আমাদের পেট্রল পাম্পের সামনে আসতে বলেছিল। আমরা গিয়েছিলাম, রাজেনদা আমাদের মাংসের তড়কা, রুটি, দোকানে নিয়ে গিয়ে খাইয়েছিল।''

''বাসুর খোঁজ কেউ করেনি?'' দীপক জানতে চাইল।

''হ্যাঁ স্যার করেছিল, রায়চৌধুরি সাহেব পরদিন সকালে আমার বাড়িতে এসে জিজ্ঞেস করেছিল বাসুর কথা। আমি বলে দিয়েছিলাম, ওর দাদা ফোন করেছিল, সেই খবরটা আমি দিতে গিয়েছিলাম, তারপর বাসু কোথায় গেছে আমি জানি না। আমার সঙ্গে আর দেখা হয়নি। কালকে ও তাস খেলতেও আমাদের ওখানে আসেনি। আমার কথা শুনে উনি চলে গিয়েছেন। আর কেউ বাসুর কথা জানতে চায়নি।''

দীপক মদনের সব কথা লিপিবদ্ধ করার পর এবার তোড়জোড় শুরু হলো বাকি আসামিদের গ্রেফতার করতে যাওয়ার। মদনকে নিয়ে যেতে হবে। ওই বাড়িগুলো চিহ্নিত করে দেবে।

তখন ডিসি ডিডি ছিলেন নিরুপম সোম। তিনিও যাবেন। তাছাড়া শম্ভুদাস সরকার, শিশুরঞ্জন দাস, স্বদেশ রায় চৌধুরি, আমি আর দীপক ফোর্স নিয়ে তিনটে গাড়ি নিয়ে ছুটলাম বালিগঞ্জের দিকে।

ঠিক হলো, প্রথমে একটা গাড়িতে মদনকে নিয়ে আমি, দীপক ও স্বদেশ গিয়ে রাজেন, সাউ ও শামু যে যে বাড়িতে কাজ করে তা চিনে নেব। এবং একই সঙ্গে ওই বাড়িগুলিতে আমরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে হানা দেব। যাতে একজনকে গ্রেফতার করার খবর অন্যজন শুনে পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ না পায়। আমরা পরিকল্পনা মাফিক রাত আটটা নাগাদ ওই পাড়ায় পৌঁছে গেলাম।

মদন আমাদের নির্দেশ পুরোপুরি কার্যকরী করল। একে একে বাড়িগুলো চিনিয়ে দিতে ওকে নিয়ে আমরা বেরিয়ে এলাম।

আমি ফোর্স নিয়ে গেলাম রাজেন সাউ যে বাড়িতে কাজ করে সেখানে। স্বদেশ গেল শামুর বাড়ি। বাকিরা মদনকে নিয়ে সোজা মিঃ সিনহার বাড়ি। মদনের বক্তব্য অনুযায়ী মিঃ ও মিসেস সিনহার ছেলে ও মেয়েরা বিকেল

পাঁচটার সময় স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে আসে। ছ'টার মধ্যে মিসেস সিনহা ও সাতটা সাড়ে সাতটার মধ্যে মিঃ সিনহা বাড়ি চলে আসেন।

আমি রাজেন সাউকে অনায়াসেই পেয়ে গেলাম। বাড়ির সদর দরজায় কড়া নাড়তে রাজেন সাউই দরজা খুলে দিল। মদনের বিবরণ অনুযায়ী ওকে দেখেই আমি চিনে গেছি। তবু বললাম, "রাজেন আছে?" রাজেন কি বুঝল জানি, আমাদের পাঁচ-ছ'জন লোককে দেখে নিশ্চয়ই একটু ভয় পেয়েছিল। অপরাধীরা যতই অন্য লোকের চোখে ধুলো দিয়ে চলুক না কেন, নিজের থেকে তো পালাতে পারে না। তাই আমাদের দেখে ওর চমক।

সে আমতা আমতা করে একটা ঢোক গিলে বলল, "আমিই রাজেন।" সে তো আমরা দেখেই চিনেছি। তবু ওর মুখ থেকেই ওর নামটা শুনে নিলাম। কথা বলতে বলতে ওই বাড়ির কর্তা ও গিন্নী বেরিয়ে এলেন। আমি তাদের বললাম, "আমরা লালবাজার থেকে এসেছি। রাজেনকে গ্রেফতার করলাম।"

গৃহকর্তা আমাদের কথা শুনে অবাক। বললেন, "সে কি? ও কি করেছে?" ঠিকই রাজেন কি করেছে তা তাকে বলা দরকার। কারণ উনি তো ভাবতেই পারছেন না একটা নিরীহ দর্শনের ছেলে এমন কী করল যে একেবারে লালবাজারের অফিসাররা এসে হাজির।

বললাম, "ওকেই জিজ্ঞেস করুন কি করেছে?"

রাজেন মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে। গৃহকর্তা ও তাঁর স্ত্রী ওর দিকে আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে ওর উত্তরের জন্য অপেক্ষা করছেন। কোনও উত্তর ও দিচ্ছে না।

গৃহকর্তাই রাজেন সাউকে জিজ্ঞেস করলেন, "কি রে তুই কি করেছিস, আমাকে বল। ওঁরা কেন এসেছেন?"

রাজেনের ঠোঁট কেঁপে উঠল। ও হাউমাউ করে কেঁদে উঠে মাটিতে বসে পড়ে গৃহকর্তার পা ফালতু জড়িয়ে ধরে বলতে শুরু করল, "আমাকে বাঁচান বাবু, আমি কিছু করিনি, আমি কিছু করিনি, ওই লম্বু রাজেনটার জন্য আমরা ফালতু জড়িয়ে গেলাম।"

গৃহকর্তা বললেন, "কি জড়িয়ে গেলি সেটা বল। আমি দেখি।"

আমি বললাম, "ও বলতে পারবে না, আমিই আপনাকে বলছি, ওরা একটা ছেলেকে খুন করেছে, ছেলেটা আবার ওদের বন্ধু ছিল।"

খুনের কথা শুনে ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলা তো ভয়ই পেয়ে গেলেন,

ভদ্রলোক বললেন, "সে কি, ওর দ্বারা খুন করা সম্ভব? কি বলছেন আমি তো বুঝতেই পারছি না। না-না, কোথায়ও একটা কোনও কিছু গণ্ডগোল হচ্ছে।"

আমি হাসলাম। বললাম, "আমাদের এত চট করে গণ্ডগোল হয় না। বেছে বেছে ওকেই আমরা ধরতে আসব কেন? শুনুন, শুধু খুনই নয়, ওরা খুনটা করেছে অত্যন্ত নৃশংস ভাবে। যখন সব জানতে পারবেন তখনই বুঝবেন। ওকেই জিজ্ঞেস করুন না, আমরা ঠিক বলছি কি ঠিক বলছি না?"

রাজেন তখন কথা বলার অবস্থায় নেই। কেঁদেই চলেছে। বললাম, "বুঝছেন না। ওর আমাদের দেখে এত কাঁদারই বা কী দরকার? আমরা কি ওকে কিছু করেছি? যাই হোক, ওকে আমরা নিয়ে চললাম, আগামিকাল আলিপুরের কোর্টে আসবেন, সব জানতে পারবেন।"

গৃহকর্তা ও গিন্নী আমার এবারের কথায় নির্বাক, বিহ্বল। কান্নাভেজা গলায় গিন্নী বলে উঠলেন, "ওর কী হবে?"

হেসে বললাম, "কী হবে সে কি আর আমরা বলতে পারব, কোর্টে যা হওয়ার তাই হবে। আমাদের কিছু করার নেই।"

আমরা রাজেন সাউকে নিয়ে বেরিয়ে আসার সময় গৃহকর্তা ও গিন্নীকে আমি একটা অনুরোধ করলাম। বললাম, "দয়া করে এখন কাউকে বলবেন না, ওকে আমরা গ্রেফতার করেছি। এই পাড়াতেই ওর অন্য সঙ্গীরা আছে, তারা শুনতে পেলে, পালিয়ে যেতে পারে। তবে তেমন সম্ভাবনা কম। তবু আমাদের অনুরোধটা মাথায় রাখবেন। চলি। আশা করি, খুনীদের আপনারা পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ দেবেন না।"

আমরা যখন রাজেন সাউকে পেয়েছি, তখন ডিসি ডিডি নিরুপম সোম, শিশুরঞ্জন দাস, শম্ভু দাস সরকার ও দীপকরা মিঃ সিনহাদের বাড়ি গিয়ে প্রধান আসামি রাজেনকেও পেয়ে গেছে। সোম সাহেব তো মিঃ সিনহা ও মিসেস সিনহাকে জেরা করতেই শুরু করেছেন। আসলে তো ওঁরা কিছু জানেনেই না। ওঁদের বাড়িতে ওঁদেরই বাথরুমে নৃশংসভাবে একটা অল্পবয়সী ছেলে খুন হয়েছে এবং সেই মাথাহীন লাশ ওঁদেরই বাড়ির চেম্বারে পড়ে আছে তা ওঁরা জানবেন কি করে? ওঁরাও রাজেন সাউয়ের বাড়ির গৃহকর্তা ও গিন্নীর মতো লালবাজারের অফিসারদের ওঁদের বাড়িতে আগমন দেখে হতবাক। সুতরাং ওঁদের জেরা করার কোনও অর্থই হয় না। আগে. গ্রেফতার ও মাথাহীন লাশ উদ্ধারের পর রাজেন সম্পর্কিত তথ্য জানাতে যেটুকু ওঁদের সাহায্যের দরকার সেটুকু প্রশ্ন করলেই যথেষ্ট।

সোমসাহেবরা যখন বাড়ির সামনের দিকে ঘরে বসে মিঃ সিনহা ও মিসেস সিনহাকে জেরাতে ব্যস্ত তখন দীপক মদনের দেওয়া বিবরণ অনুযায়ী বাড়ির যেখানে চেম্বারগুলো আছে সেদিকে দেখতে গেল।

দীপক দেখল, চেম্বারের একটা ঢাকনা দিয়ে লাল পিঁপড়ে লাইন দিয়ে ভেতরে ঢুকছে। কেন ঢুকছে তা আর ব্যাখ্যা করার দরকার নেই। দীপক সুইপারের ব্যবস্থা করতে বাইরে বেরিয়ে এল। মদন যখন চেম্বারের কথা বলেছিল, আমরা তখনই জানতাম, সুইপারের ব্যবস্থা করতে হবে। তাই ফোর্সের সঙ্গে দু'জন সুইপার সঙ্গে নিয়ে এসেছি।

দীপক বাড়ির সামনের ঘরে যেখানে সোমসাহেবরা মিঃ সিনহা ও মিসেস সিনহাকে জেরা করতে ব্যস্ত, সেখানে এসে দীপক বলল, "স্যার লাশ পেয়ে গেছি, সেটা এখন তোলার ব্যবস্থা করছি।"

সোমসাহেব বললেন, "লাশ পাওয়া গেছে! চলুন, চলুন, ওটা আগে উদ্ধার করি।"

দীপক আমাদের অন্য অফিসার ও সুইপার নিয়ে বাড়ির পেছন দিকে চলল। সুইপারদের দেখিয়ে দিল কোন চেম্বারে বাসুর ধড়হীন কাটা শরীরটা আছে। লাল পিঁপড়ের লাইন সার দিয়ে চলেছে। চেম্বারের মুখ বন্ধ। জায়গায় খুব বেশি আলো নেই। তবে যা আছে তা কাজ চলে যাওয়ার মতো।

সোমসাহেব ওখানে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কোথায়, কোথায় লাশ?"

"তুলতে হবে স্যার, তবে কোথায় আছে তা দেখে নিয়েছি।" দীপক বলল।

সোমসাহেবদের সঙ্গে সিনহা পরিবারের সদস্যরাও এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁরা সমস্ত ঘটনার আকস্মিকতায় মূক, বধির। রাজেন যে তাঁদের বাড়ির ভেতরই এমন একটা কাণ্ড করে বসেছে তা তাঁদের কল্পনারও অতীত। এবং সেই লাশ যে পাঁচদিন ধরে তাঁদের বাড়ির চেম্বারের নিচে শুয়ে আছে তা ভেবে শিউরে উঠছেন। তাঁরা তাই পলকহীন চোখে সমস্ত দৃশ্যটা দেখে যাচ্ছেন।

আমি রাজেন সাউকে নিয়ে আটষট্টি নম্বর বালিগঞ্জ প্লেসের বাড়ির কাছে যাওয়ার আগে এক কনস্টেবলকে পাঠিয়ে খবর নিলাম, ওখানে রাজেনকে গ্রেফতার করা হয়েছে কি না, সেই খবর নিয়ে আসতে। খবর নিয়ে এল, রাজেনকে পাওয়া গেছে। আমি নির্বিঘ্নে রাজেন সাউকে নিয়ে ওখানে চলে গেলাম।

দেখলাম, দীপকরা একটা ঘরে মদন ও রাজেনকে বসিয়ে রেখেছে, আমরাও সেখানে রাজেন সাউকে নিয়ে গিয়ে ওদের পাশে বসিয়ে রাখলাম।

তিনজন খুনী একসঙ্গে বসল। ওদের যে একসঙ্গে বহুদিন থাকতে হবে তা ওরা খুব বেশি অনুমান করতে পারছে না। প্রধান আসামি রাজেন, কালো, রোগা তবে লম্বা অন্য আসামিদের চেয়ে। বয়সেও অনেক বেশি। ওর বয়স বছর চল্লিশের কাছাকাছি তো নিশ্চয়ই। মদন ও সাউ মাথা নিচু করে বসে থাকলেও, ওর মধ্যে কোনও ভাবান্তর নেই। লজ্জিতও নয়। ওরই জন্য যে অন্যদের এই অবস্থা তাতেও ওর কোনও লজ্জা নেই। সম্ভবত দুঃখিতও নয়।

আমি যখন মিঃ সিনহাদের বাড়ি পৌঁছালাম স্বদেশরা তখনও শামুকে নিয়ে আসতে পারেনি। মনে হয়, আমাদের মতো ওরা চটপট আসামিকে ওর বাড়িতে পায়নি। সেই জন্যই ওদের দেরি হচ্ছে।

আসামিদের একসঙ্গে বসিয়ে, পাহারার ব্যবস্থা করে আমিও দীপকদের কাছে গেলাম, লাশ উদ্ধারের সাক্ষী হতে।

আমি যখন গেলাম, ঠিক সেই মুহূর্তেই আমাদের সুইপাররা চেম্বারের একটা ঢাকনা খুলল। তারপর টেনে বাসুর একটা কাটা পা উপরে তুলে আনল। উরুর মাঝখান থেকে অসমান ভাবে কাটা। পাঁচদিন চেম্বারে থেকে পচে ফুলে নরম তুলতুলে হয়ে গেছে।

চেম্বারের ঢাকনাটা খুলতেই যে ব্যাপারটা আস্তে আস্তে ঘটছিল, কাটা পা'টা তুলতেই সেটা তার মাত্রা ছাড়াতে লাগল।

মিসেস মমতা সিনহা তাঁর আঁচলের খুঁটটা নাকে চাপা দিয়ে, "বীভৎস বীভৎস" করে চিৎকার করতে করতে ঘরের ভেতরে ঢুকে গেলেন। এত দুর্গন্ধ যে ওইটুকু ঘেরা জায়গার হাওয়া নিমেষে তোলপাড় করে ছড়িয়ে দিল তাতে একমাত্র কর্মরত দুই সুইপার ছাড়া প্রত্যেকেই যে যার পকেট থেকে রুমাল বার করে নাকে চাপা দিল। যতই নাকে চাপা দিক, যে গন্ধ নাকের ভেতর দিয়ে প্রবেশ করে মস্তিষ্কে আঘাত হেনে সারা শরীরের অণু-পরমাণুতে মিশে যাচ্ছে তা যে আরও অন্তত দু'তিন দিন শরীরকে তাড়া করে ব্যতিব্যস্ত রাখবে তা নিজের অনুভূতি দিয়েই বুঝতে পারছি।

দ্বিতীয় পা'টাও উপরে তুলে রাখল। এটাও প্রায় একই কায়দায় একই জায়গায় কাটা। কাটা অংশের মাংস বেরিয়ে এসেছে। এতক্ষণ লাল পিঁপড়েরা তাদের পাকস্থলী ভর্তি করছিল। এখন মাছিরাও খবর পেয়ে ছুটতে ছুটতে ভোঁ ভোঁ করে উড়ে চলে এসেছে। তারাও বাসুর কাটা পচা-গলা রক্তেমাখা মাংসের স্বাদ নেওয়ার ভাগীদার। উড়ে উড়ে তারা তা নিতে থাকল।

সুইপার দু'জন সামান্য ঝুঁকে হাত-পা-মাথাহীন বাসুর শরীরের বাকি অংশ তোলার চেষ্টা করতে লাগল। বোঝা যাচ্ছে তাদের খুব কষ্ট হচ্ছে। হাত

নেই পা নেই, তাই তারা কোনও জায়গাটা ঠিকমত ধরতে পারছে না, যেটা ধরে টেনে তোলা যাবে। তার ওপর মাংস পচে যেতে সেটা এমন নরম হয়েছে যে, সুইপারদের আঙুল বসে যাচ্ছে, অসাবধানতায় টান দিলে মাংস খুবলে ওপরে চলে আসতে পারে। আর তাদের প্রয়াসে সবচেয়ে বড় বাধা লাল পিঁপড়েরা। তারা সুইপারদের হাত দুটোকে শত্রু ভাবছে। তাদের খাবারগুলো বেহাত হয়ে যাচ্ছে দেখে তারা ওদের হাতে পায়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে কামড় বসাতে লাগল।

টানছে, সুইপাররা টানছে। ধীরে ধীরে কাটা শরীরটা আমাদের চোখের সামনে স্পষ্ট হতে লাগল। তারপর উঠে এসে কাটা দু'পায়ের পাশে জায়গা নিল। বাসুর পরনের কালো প্যান্টটা তখনও কোমরে আটকানো। পেটটা ফুলে উঠেছে। একেবারে ঢোল হয়ে গেছে।

দূষণের মাত্রা এত বেশি হয়ে গেছে যে, হাওয়া মনে হচ্ছে অতিরিক্ত ভারী। পেটের নাড়ি গুলিয়ে উঠে আসতে চাইছে। বোঝাই যাচ্ছে যে, আমরা বাসুর শরীরের কাটা অংশগুলি নিয়ে গেলেও মিঃ সিনহাদের বাড়ি থেকে এই অতিরিক্ত ভারী দুর্গন্ধের হাওয়া সারারাত থাকবে, পালাবে না। বাড়ির বাসিন্দাদেরই বরং বাড়ি ছাড়া করবে। এবং ওদের এইখানে বাস করতে গেলে পাল্টা কিছু ব্যবস্থা করতেই হবে।

সুইপাররা এবার বাসুর হাত দুটো তুলবে। তাহলেই তাদের তোলার পর্ব শেষ হয়ে যাবে। দীপক আর আমি বাকি কাজটা শেষ করার জন্য রাজেনের কাছে এলাম। মিঃ সিনহা ও মিসেস সিনহাকেও ওর সামনে আমরা দাঁড় করিয়ে দিলাম।

দীপকই বলল, "এই রাজেন, কাটারিটা কোথায় রেখেছিস? বলে দে, এদের বাড়ি তল্লাশি করে ওলটপালট করতে চাই না।"

রাজেনের কোঠরাগত চোখ একবার চকচক করে উঠল। ও সিনহাদের দিকে একবার দেখল, তারপর একেবারে স্পষ্ট করে বলল, "রান্নাঘরের তাকে।"

দীপক মিঃ সিনহাকে জিজ্ঞেস করল, "রান্নাঘরটা কোনদিকে? চলুন। আপনারাও দেখবেন।" মিঃ সিনহারা আমাদের রান্নাঘরের দিকে নিয়ে গেলেন। একটা ঘর পার হয়েই মাঝারি মাপের একটা রান্নাঘর। সেখানে সিমেন্টের একটা তাক আছে। তারই এক কোনায় সত্যিই লোহার একটা দা আছে।

নামিয়ে নিলাম। বেশ বড়। শুকনো। ওটার ব্যবহার যে কম হয় তা ওটার ধার দেখলেই বোঝা যায়। প্রায় ভোঁতা। এই ভোঁতা দা দিয়েই রাজেনরা বাসুর মাথা, হাত, পা কুপিয়ে কুপিয়ে মূল শরীর থেকে আলাদা

কিন্তু তা তো আইনের চোখে নিরপরাধ হওয়ার মাপকাঠি হবে না। সুতরাং তাকে গ্রেফতার করে নিয়ে আসতেই হবে।

স্বদেশরা প্রায় চল্লিশ মিনিট অপেক্ষা করার পর শাম্মু বাজার থেকে ফিরে আসে। মনের আনন্দেই সে বাড়িতে ফিরেছিল। তার জন্য যে জীবনের অন্য অঙ্ক অপেক্ষা করছে তা ও আন্দাজই করতে পারেনি। একই পাড়ার মধ্যে অত্যন্ত গোপনভাবে আমরা একই সঙ্গে হানা দেওয়ার ফলে আমাদের আগমনের হেতুর খবর বহির্বাড়িতে প্রচার হয়নি।

বাসুর কাটা শরীর নিয়ে গাড়ি চলে যাওয়ার পর আমরাও ধৃত আসামিদের নিয়ে লালবাজারের দিকে রওনা দিলাম। মিঃ সিনহা ও মিসেস সিনহা ও তাঁদের সন্তানেরা হতবাক হয়ে আমাদের বিদায় দিলেন। রাজেনের জন্য বাচ্চাদের দুঃখ হচ্ছিল ঠিকই, কারণ তারা তো ঘটনার গুরুত্ব বোঝার মতো বয়সে তখনও পা দেয়নি। সুতরাং দুঃখ।

লালবাজারে আমরা যখন পৌঁছলাম তখন ঘড়িতে পৌনে এগারটা। আসামিদের জেরা করা আজ আর হবে না। ওদের সেন্ট্রাল লকআপে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। ততক্ষণে বাসুর বাকি শরীরও তার কাটা মাথার কাছে পৌঁছে গেছে। ওগুলো আর একসঙ্গে যুক্ত হবে না। শুধু পরদিন সকালে মাথা শরীরের যথাস্থানে রেখে ফটোগ্রাফার আবার ফটো তুলবে। ব্যস, কাটা অংশগুলো তাদের কাজ শেষ করে আলাদা আলাদা হয়ে ডাক্তার জে বি মুখোপাধ্যায়ের পরীক্ষার কাজে লাগবে।

সোমসাহেব বালিগঞ্জ থেকে বাড়ি চলে গিয়েছেন। আমি আর দীপক ছাড়া, অন্য অফিসাররা একে একে চলে গেছেন। আমরাও আসামিদের সেন্ট্রাল লকআপের আলাদা আলাদা লকআপে রাখার বন্দোবস্ত করে বাড়ি ফিরে গেলাম। বাসুর মৃতদেহের পচা গন্ধ আমাদের সারা শরীর জুড়ে তাড়া করছে। বাড়ি ফিরে শরীর ধুয়ে তার থেকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নিষ্কৃতি পেতে চাই।

পরদিন দীপক আসামিদের আলিপুর আদালতে হাজির করিয়ে তাদের আমাদের হেফাজতে জেরা করার উদ্দেশে নিয়ে এল।

মদনের বয়ান অনুযায়ী খুনের মোটিভ বা উদ্দেশ্য আমাদের জানা হয়ে গেছে, তবু সেটা মামলার স্বার্থে বিস্তারিতভাবে যতটা জানা সম্ভব জানা থাকলে মামলা তৈরি করতে ও পরিচালনা করতে সুবিধা হয়, তাই রাজেনকে নিয়ে প্রথম জেরা শুরু করল। শাম্মু আর সাউ যে নতুন কোন তথ্য আর জানাতে পারবে না তা আমরা জেনে গেছি।

টেবিলের উল্টোদিকে রাজেনকে নিয়ে দীপক বসল। কালো, ঢেঙ্গা, রোগা, চোয়াড়ে রাজেন নির্বিকার ভঙ্গীতে বসে আছে। পরিতাপের লক্ষণ তার আচরণে নেই। সামান্য আরষ্ট। লালবাজারে আসামি হয়ে এলে যা খুবই স্বাভাবিক, এই যা, তা ছাড়া তাকে দেখলে কেউ বলবে না যে, সে ঠাণ্ডা মাথায় একটা নৃশংস খুনের প্রধান ষড়যন্ত্রকারী। এই ধরনের আসামি যে আমরা আগে দেখিনি তা নয়।

তেমন একজন মিঃ রক্ষিত, স্কুলশিক্ষক। বলিষ্ঠ, ফর্সা, সুন্দর দর্শন, মাঝারি উচ্চতার, মৃদুভাষী, বিনয়ী এবং ভদ্র ছিল। তাকে দেখলেও কেউ বুঝতে পারবে না সে ঠাণ্ডা মাথার খুনী। খুনটাও করেছিল তার সুন্দরী স্ত্রীকে। খুন করার পর তারও কোনও ভাবগতিক এদিক ওদিক হয়নি।

রক্ষিত তার স্ত্রীকে কেন খুন করেছিল? তার খুনের মোটিভের সঙ্গে রাজেনের খুনের মোটিভের মিল আছে। কিন্তু রক্ষিত খুন করেছিল তার স্ত্রীকে আর রাজেন তার স্ত্রীর প্রেমিককে। রক্ষিত খুন করেছিল একাই। রাজেন খুন করছে তার দল নিয়ে। তফাৎ এখানেই।

রক্ষিতের স্ত্রী এক সন্তানের জননী। তার প্রেমিক ছিল তারই ঘরে। রক্ষিতের ছোট ভাই। রক্ষিত ও তার ছোট ছেলে স্কুলে চলে গেলে বৌদি ও দেবর প্রেম করতে শুরু করত। প্রেমটা অবশ্যই মৌখিক পর্যায়ে ছিল না। বিবাহিতা মহিলারা কতজন আর কতদিন শুধু মৌখিক প্রেমে মজে? বিবাহপূর্ব প্রেমিক ছাড়া, বিবাহ উত্তর প্রেমিকের সঙ্গে কতজন আর মৌখিক আলাপে তৃপ্ত থেকেছে? তার ওপর মিলনে যেখানে বাধা নেই, সেখানে দুটো নরনারী কতদিন আর স্বপ্নের আঙ্গিনায় খেলেছে?

সুতরাং রক্ষিতের স্ত্রী ও ভাই মিলনসুখে ভাসতে বেশিদিন আর অপেক্ষা করেনি। রক্ষিতের ভাই ছিল কলেজের ছাত্র। বৌদির সঙ্গে আবদ্ধ হওয়ার নেশায় তার কলেজে অনুপস্থিতির হার দিনদিন বৃদ্ধি পেতে লাগল। পড়াশুনায় হয়ে পড়ল অমনোযোগী। অল্পবয়সী যুবক যখন একবার সঙ্গমের জন্য বাড়ির ভেতর খোলা মাঠ পেয়ে যায় তখন কী আর তার কোনও দিকে আকর্ষণ থাকে? থাকে না। সে সেই খোলা মাঠেই সারাদিন বাঁশি নিয়ে পড়ে থাকতে চায়। আর সাত আট বছরের বিবাহিত স্ত্রী, যে স্বামী স্ত্রীর একই নিয়মে মিলনে অভ্যস্ত এবং কিছুটা যান্ত্রিক ও আলস্যে ভরা গতানুগতিকভাবে পৌনঃপুনিকতায় নিজেকে ক্লান্ত মনে করে একবার অন্য পুরুষের হাতে ধরা দিয়ে নতুনভাবে জীবন ও যৌবন উপভোগ করতে চায়, খুলে দেয়

লজ্জার বাঁধন, সেও তখন তার সেই নতুন প্রেমিকের বাঁশির সুরই ক্লান্তিহীনভাবে শুনতে চায়।

এভাবেই পুরোদমে জমে উঠেছিল তাদের প্রেম। এক মাস, দু'মাস করে প্রায় ছ'মাস। ভাইয়ের ক্ষেত্রে কলেজের উপস্থিতির কম হার, পড়াশুনায় অনিয়মিত, এ সবই রক্ষিতের চোখে ধরা পড়ছিল। স্ত্রীর ক্ষেত্রে ধরা পড়ছিল, সঙ্গমে হঠাৎ হঠাৎ অনাসক্ত অথচ প্রাণচঞ্চলে নতুন জোয়ার যা বিবাহিতা মহিলার ক্ষেত্রে তার আগমন বিনা শরীর সুখে আসে না। সে চিন্তা করছিল। তাছাড়া বাড়িওয়ালা ও অন্য প্রতিবেশী দুই একজনও তাকে নানা ইঙ্গিতে স্ত্রী ও ভাইয়ের সম্পর্ক নিয়ে ইঙ্গিত দিচ্ছিল। রক্ষিত নিজেও পুরাতনী ভাব ধারায় বিশ্বাসী ও সন্দেহবাতিকগ্রস্ত ছিল। তাই স্ত্রী ও ভাইয়ের চালচলন ও প্রতিবেশীদের ইঙ্গিত তাকে প্ররোচিত করল ওদের দু'জনকে একসঙ্গে আলাদাভাবে স্বচক্ষে দেখার।

সেদিন রবিবার। রক্ষিত সকালে বাজারে যাবে। যা কোনওদিনও করে না সেটা সে ইচ্ছে করেই করল। ছেলেকে নিয়ে বাজারে গেল।

রবিবার ও অন্যান্য ছুটির দিন রক্ষিতের স্ত্রী ও ভাইয়ের মন খারাপ থাকে। কারণ সেদিনগুলিতে রক্ষিত বাড়ি থাকার ফলে ওরা সঙ্গমলীলায় ভেসে যেতে পারে না। তাই অন্যদিনের উচ্ছ্বলতা সেদিন বিষণ্ণতার রূপ নেয়। আকাশে ভেসে বেড়ানো দুটো পাখিকে যদি হঠাৎ ধরে খাঁচায় পুড়ে আটকে রাখা যায় তবে তাদের মন যেমন উড়ে বেড়ানোর জন্য ছটফট করে ওদের অবস্থাও তেমনই হয়, কিন্তু কিছুই করতে পারে না।

রক্ষিত তার ছেলেকে একটা চেনা দোকানে রেখে মিনিট দশ বাদে বাড়িতে ফিরে এল। ওর ফাঁদে ওর স্ত্রী আর ভাই ধরা দেয় কি না সেটা স্বচক্ষে দেখার জন্য।

দেখল, রান্নাঘরে স্ত্রী ও ভাই চুম্বনরত। শুধু চুম্বনরতই নয়, ভাইয়ের জিভ তার স্ত্রীর মুখের ভেতর। সেটা গভীর আবেগে, গভীর কামনায় শোষণরত। দু'জনেরই চোখ বন্ধ।

রক্ষিত কিছু বলল না। নিঃশব্দে যেমন এসেছিল, তেমনভাবেই বেরিয়ে গেল। মাথার আগুন নিশ্চয়ই তার মস্তিষ্কের ভেতরের রসায়নাগারে কিছু রুটিন বহির্ভূত ক্রিয়া করছিল। ছেলে নিয়ে তাড়াতাড়ি বাজার সেরে সে বাড়ি ফিরে এল।

রক্ষিতের চালচলনে কোনও অস্বাভাবিকতা নেই। সে বাড়ি ফিরে দেখল,

ভাই ভাইয়ের ঘরে, স্ত্রী রান্নাঘরে। রক্ষিতও বাজার রান্নাঘরে স্ত্রীর হাতে দিয়ে ছেলেকে পড়াতে শুরু করল।

অন্য রবিবারের মতো সেই রবিবারও একইভাবে কেটে গেল। এই রবিবারগুলি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তত তাড়াতাড়ি পার করাতে চায় বাড়ির ভেতর ছটফট করতে থাকা দুই উপোসী প্রেমিক-প্রেমিকা।

সন্ধে গেল। রাত হলো। খাওয়া-দাওয়া সেরে ভাই চলে গেল ভাইয়ের ঘরে। রক্ষিত তার স্ত্রী ও ছেলেকে নিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল। ছেলে অল্প সময়ের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ পর রক্ষিতের স্ত্রীও। কিন্তু রক্ষিতের কিছুতেই ঘুম এল না। সে জেগে রইল। তার মাথার ভেতরের আগুন তাকে ঘুমোতে দিচ্ছে না। একটার পর একটা ঘণ্টা পার হয়ে যাচ্ছে। তার স্ত্রী যে তার ভাইয়ের সঙ্গে গভীর থেকে গভীরতর সম্পর্কে জড়িয়ে গেছে তা নিয়ে তার মনে আর সংশয় নেই। তার মাথার আগুন এর প্রতিকার চাইছে। কী ভাবে সে এর প্রতিকার করবে সেটা সে ভেবে যাচ্ছে। ঘরে একটা মৃদু আলো জ্বলছে।

রাত তিনটে। সে উঠে বসল। স্ত্রীকেও জাগাল। এবং সে স্ত্রীর কিছুটা ইচ্ছার বিরুদ্ধেই সঙ্গমে লিপ্ত হলো। এবং সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটাই চলতে লাগল একমুখী। স্ত্রীর তরফ থেকে তেমন উৎসাহশীল খুনসুটি নেই। রক্ষিতের সেদিকে কতটা খেয়াল আছে সেই জানে, সে একতরফাভাবে ক্রিয়ারত। মিনিট পাঁচ সাত পর সে তৃপ্ত হয়ে যেতেই সঙ্গমরত ভঙ্গিমাতেই তার স্ত্রীর গলা নিজের দু'হাতের মোটা পাঞ্জা দিয়ে চেপে ধরে টিপতে শুরু করল।

বিস্ফারিত চোখে একবার স্বামীর দিকে দেখে, রক্ষিতের স্ত্রী মিনিট খানেকের মধ্যেই নেতিয়ে পড়ল। রক্ষিত এবার স্ত্রীর শরীর থেকে নেমে এল।

রক্ষিত আলনার পেছনে ওরই লুকিয়ে রাখা সদ্যকেনা একটা পরিমাপ মতো মোটা নাইলনের দড়ি বার করে সেটা ফাঁসের মতো করে বাঁধল। তারপর ওর স্ত্রীর মৃতদেহটা বিছানা থেকে নামিয়ে ঘরের মেঝেতে শুইয়ে দিল। গলায় পরিয়ে দিল ফাঁস। তারপর আবার টেনে তুলল। নিজের শরীরের ওপর হেলান দিয়ে দাঁড় করিয়ে দিল, যাতে পড়ে না যায়। আস্তে আস্তে দেহটা নিয়ে গেল ঠিক ঘরের মাঝখানে, সে একটা চেয়ারে দেহটা হেলান দিয়ে বসিয়ে নিজে উঠে গেল টেবিলে এবং দড়ির অন্য প্রান্তটা সে আটকে দিল সিলিং পাখার রডের সঙ্গে। রক্ষিত নেমে এল। চেয়ার সমেত স্ত্রীর মৃতদেহ তুলে দিল টেবিলে। তারপর নিজেও বড় টেবিলটায় উঠে সিলিং পাখার বাঁধা দড়ির প্রান্তটা ছোট করে বেঁধে দিল, যাতে বোঝা না যায়

নিচ থেকে ওর স্ত্রীকে কেউ ঝুলিয়ে দিয়েছে। দড়ির কাজ শেষ হয়ে গেলে রক্ষিত চেয়ারে বসা স্ত্রীকে আস্তে সামনের দিকে ঠেলে দিল। চেয়ারটা ওর হাতে শক্ত করে ধরা। ফলে স্ত্রী দেহটা খোলা জায়গায় সিলিং পাখার রড থেকে নাইলনের দড়িতে ঝুলতে লাগল।

রক্ষিত ওর মূল কাজটা শেষ করে টেবিল থেকে নিচে নেমে এল। চেয়ারটা টেবিল থেকে নামিয়ে ওর স্ত্রীর পায়ের কাছে চিং করে শুইয়ে দিল। যাতে বোঝা যায় ওর স্ত্রী নিজেই চেয়ারে উঠে গলায় ফাঁস পড়ে তারপর আত্মহত্যার জন্য চেয়ারটা পা তুলে দিয়ে ঠেলে ঝুলে পড়েছে।

এবার ও বিছানায় শুয়ে পড়ল। অদ্ভুত বিছানা। একপাশে ঘুমন্ত ছেলে, অন্যপাশে স্ত্রী সিলিং পাখা থেকে টানটান হয়ে ঝুলছে। স্ত্রীকে হত্যা করে, হত্যাটা আত্মহত্যায় প্রমাণ করার জন্য তার নিজস্ব ঢঙে প্রয়াস করে সে বিছানায় ঘুমাবার চেষ্টা করছে। তার মাথার আগুন একটু কমেছে। প্রতিকার করেছে। তবু তার ঘুম আসছে না, আরও অভিনয় তার করতে হবে, অভিনয় দিয়েই সে প্রমাণ করতে চাইবে, সে হত্যা করেনি, তার স্ত্রীই আত্মহত্যা করেছে। কি কারণে সে জানে না।

দুঃশ্চিন্তাও তাকে এবার চেপে ধরেছে। সে এবার একা হয়ে গেল। তার ছেলেকে এবার একার দায়িত্বে মানুষ করতে হবে। সেটা একটা কঠিন কাজ। তার মনে হলো, তবু ভাল। এই রকম দুঃশ্চরিত্র স্ত্রীকে নিয়ে ঘর করা যায় না।

রক্ষিতের ঘুম কিছুতেই আসছে না। একবার সে ঘুমন্ত ছেলের দিকে তাকাচ্ছে, সে জানে না, তার মা আর জীবিত নেই। জানবে, ঘুম থেকে উঠে। তখন তার কিছু করার থাকবে না। তার মাকে আর সে পাবে না। মা যে চরিত্র নষ্ট করেছিল তাও সে জানবে না।

রক্ষিত যখন তার 'কাজ' শেষ করে বিছানায় শুয়েছে তখন ঘড়িতে পৌনে চারটে। সে আর বেশিক্ষণ এইভাবে শুয়ে থাকতে পারল না। ভোর পাঁচটা নাগাদ বিছানা ছেড়ে উঠে ঘর থেকে বেরিয়েই অভিনয়ের আসল পর্ব শুরু করল। চিৎকার চেঁচামেচি করতে লাগল। ভাই তার ঘর থেকে বেরিয়ে এল, রক্ষিত হাউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগল, "আমার ঘরে গিয়ে দেখ, কী সর্বনাশ হয়েছে।" ভাই গেল এবং তার গোপন প্রেমিকাকে ওইভাবে ঝুলতে দেখে চিৎকার করে সেও কাঁদতে লাগল। দু'ভাই দুই কারণে কাঁদতে লাগল। একজন হত্যা করে অভিনয়ের জন্য। অন্যজন প্রেমিকা হারানোর ব্যথায়। বাড়িওয়ালা ও অন্যান্য প্রতিবেশীরাও

মিনিট পাঁচেকের মধ্যে জড়ো হয়ে গেল। তারাও ঘরে গিয়ে দেখল, এবং বেরিয়ে এসে রক্ষিতকে যে যার ভাষায় সান্ত্বনা দিতে লাগল। তারা আড়ালে নিজেদের মধ্যে গুঞ্জনও শুরু করেছে এবং সেই গুঞ্জনের মধ্যে আবশ্যিকভাবে রক্ষিতের স্ত্রীর নষ্ট চরিত্রের কথা উঠে এসেছে।

রক্ষিতের চিৎকারে ছেলেটাও ঘুম থেকে উঠে গেছে। সে চোখ কচলাতে কচলাতে ধীরে ধীরে বিছানা থেকে নেমে মাকে ওইভাবে ঝুলে থাকতে দেখে ভয় পেয়ে ছুটে এসে কান্নারত বাবাকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে উঠল। সে কি বুঝল সেই জানে।

রক্ষিত তখন চিৎকার জুড়ে কাঁদছে, "এ কি করলে তুমি, কি হয়েছিল আমাকে তো বলতে পারতে, তুমি ছেলেটার কথা চিন্তা করলে না, এ কি করলে।"

থানায় কে একজন খবর দিয়েছিল। সাড়ে ছ'টা নাগাদ পুলিশ এল। রক্ষিতের স্ত্রীর দেহ সিলিং পাখার থেকে নামাল। রক্ষিতের বয়ান লিখে চলে গেল।

স্ত্রীর দেহ চলে যেতে রক্ষিত মনে মনে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। তবু তার কান্না আর থামতেই চায় না। ছেলেকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতেই লাগল।

স্ত্রীর দেহ সোমবার সকালেই পোস্ট মর্টমে চলে গেছে। সেখান থেকে মৃতদেহ নিয়ে তারা শ্মশানে নিয়ে যাবে। দুপুর দু'টো নাগাদ রক্ষিত তার মৃতদেহ পোস্ট মর্টম থেকে পেল। স্ত্রীকে চিতায় পুড়িয়ে সে ও তার ভাই যখন বাড়ি ফিরল তখন সন্ধে। রক্ষিত এখন অনেক শান্ত। সে কারও সঙ্গে বিশেষ কথাবার্তা বলছে না। শোকে স্তব্ধ। সেটাই সে সবাইকে বোঝাতে চাইছে।

সোমবারের পর মঙ্গল, বুধবারও একইভাবে গেল। বৃহস্পতিবার সকালে রক্ষিত ঠিক করল সে আজ থেকে স্কুলে যাবে। অভিনয়ে সব কিছু ধুয়ে দিয়ে সে তার হাত পরিষ্কার করে ফেলেছে।

কিন্তু স্কুল যাওয়ার আগেই পুলিশের জিপ তার বাড়ির সামনে এসে হাজির এবং ওকে গ্রেফতার করে নিয়ে এল।

তাকে জেরার টেবিলে নিয়ে বসাতে রক্ষিতই নির্বিকারভাবে আমাদের অফিসারকে প্রশ্ন করল, "আমাকে কী জন্য গ্রেফতার করে নিয়ে এলেন? তা তো বললেন না।"

অফিসার বলল, "আপনি সোমবার সকালে যে বিবৃতি দিয়েছিলেন নিশ্চয়ই আপনার মনে আছে।"

রক্ষিত বলল, "হ্যাঁ, কেন মনে থাকবে না, আমি একজন স্কুল মাস্টার আমি কি এত সহজে ভুলে যাই?"

অফিসার বলল, "আপনি সেদিন বলেছিলেন, ঘুম থেকে আপনি বাথরুমে যাওয়ার জন্য উঠেছিলেন, তখনই দেখলেন আপনার স্ত্রী সিলিং ফ্যান থেকে ঝুলছে, চেয়ারটা চিৎ হয়ে নিচে পড়ে আছে। আপনি চিৎকার করে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এসেছেন। তাই তো?"

রক্ষিত উত্তেজিত হয়ে বলে উঠল, "হ্যাঁ, তাই। আমি ঘুম থেকে উঠে স্ত্রীকে ওই অবস্থায় ঝুলতে দেখে নিজেকে আর সামলাতে পারিনি, দরজা খুলে বেরিয়ে এসেছি, বাথরুমে যেতেও ভুলে গেছি।"

অফিসার হাসল, বলল, "এই জন্যই আপনাকে গ্রেফতার করা হয়েছে।"

রক্ষিত গলায় বেশ জোর দিয়ে বলে উঠল, "তার মানে?"

অফিসার বলল, "তার মানে, ওই ঘরে আপনি একাই ছিলেন, আপনার সঙ্গে আপনার স্ত্রী ও ছেলে একই বিছানায় শুয়েছিল। ঠিক কিনা, বলুন। অন্য কোনও পুরুষ ছিল না, ঠিক কি না বলুন।"

রক্ষিত বলল, "ঠিকই তো। এর মধ্যে ভুল তো কিছু নেই।"

অফিসার এবারও হাসল। "বলল, এই জন্যই আপনাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এবং কেন করা হয়েছে, তাও আপনি ভাল করেই জানেন। তবু অভিনয় করে আমাদের ভুল পথে চালনা করার ব্যর্থ প্রয়াস এখনও করে যাচ্ছেন। আপনি বুঝতে পারছেন না, আপনার সেই চেষ্টা করে আর লাভ নেই। পোস্ট মর্টেম রিপোর্ট আজই আমরা সকালে হাতে পেয়েছি। তাতে পরিষ্কারভাবে লেখা আছে, আপনার স্ত্রী আত্মহত্যা করেনি, তাকে গলা টিপে শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়েছে, তারপর সেই খুনটা আত্মহত্যায় পরিণত করতে তাকে ফাঁস দিয়ে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। এবং খুন করার আগে তাকে ধর্ষণ করা হয়েছে। এবং সবটাই করেছেন আপনি। কারণ ওই ঘরে আপনি ছাড়া দ্বিতীয় কোনও পুরুষ ছিল না। আপনার ক্ষেত্রে আমি ধর্ষণ শব্দ উচ্চারণ করব না। সঙ্গম। আপনারা স্বামী স্ত্রী সঙ্গমে লিপ্ত হয়েছিলেন। ঠিক কি না? এবং সঙ্গম করেই আপনি আপনার স্ত্রীকে গলা টিপে খুন করে তারপর ঝুলিয়ে দিয়েছেন। ঠিক কি না, বলুন? মিথ্যা বলে কোনও লাভ নেই, তথ্য প্রমাণ সব আমাদের হাতে। কিন্তু একজন শিক্ষক হয়ে কেন এভাবে নিজের স্ত্রীকে খুন করতে গেলেন? আপনি কী জানেন না, শ্বাসরোধ করে হত্যা করা আর ফাঁসিতে মৃত্যু হলে তা পোস্ট মর্টেমে ধরা পড়ে যাবে? কী, আপনি এটা জানতেন না?

আপনি তো বিজ্ঞানের শিক্ষক, এটা না জানার তো কোনও কথা নয়। এবার বলুন কেন আপনি আপনার স্ত্রীকে হত্যা করলেন?"

রক্ষিত এতক্ষণ চুপচাপ শুনছিল, সে বুঝে গেছে, সে ধরা পড়ে গেছে, তার পালানোর রাস্তা বন্ধ। হঠাৎ সে উত্তেজিত হয়ে বলে উঠল, "কিন্তু কী করব বলুন, ওই রকম দুঃশ্চরিত্রা মহিলার সঙ্গে কী ঘর করা যায়? আপনি করতেন?"

অফিসার হাসল, তার জানা দরকার খুনের মোটিভ। সেই পথ দেখা দিয়েছে রক্ষিতের কথায়, তার গোপন বাঁধন আলগা করে দেওয়ার জন্যই সে বলল, 'আরে কত মহিলাই তো স্বামী ছাড়া অন্য লোকের সঙ্গে প্রেম করে বেড়াচ্ছে, তাদের স্বামীরা কী তাদের খুন করে দিচ্ছে?"

রক্ষিত এবার রেগে গেল, অফিসারের কথায় কাজ হয়েছে, রাগত গলায় বলে উঠল, "কে কী করছে জানি না, আমি ওই রকম নোংরা মহিলার সঙ্গে বাস করতে পারতাম না, তাই ওকে সরিয়ে দিয়েছি।"

"আপনি তখন থেকে দুঃশ্চরিত্রা, নোংরা বলছেন, কিন্তু কার সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠ হয়েছিলেন, সেটা তো বলছেন না।"

রক্ষিতের রাগ এবার দ্বিগুণ হয়ে গেল, "কে আবার, সে আমার ঘরেরই শত্রু বিভীষণ। আমার ছোট ভাই। বিশ্বাসঘাতক। এবার বোঝ কে তোকে খাওয়ায়, পড়ায়।"

"হুঁ, আপনার ছোট ভাইয়ের সঙ্গে যে আপনার স্ত্রী যুক্ত তা কবে জানলেন? আপনি কী দেখেছেন?"

"না দেখে আমি এই কাজ করিনি। আমি নিজের চোখে দেখেছি। তাছাড়া শুনেছি।" রক্ষিত একইভাবে বলল।

"কী দেখেছেন, কী শুনেছেন? শোনা কথাতেই আপনি এই কাজটা করে ফেললেন?" অফিসার ওকে তাতিয়ে দিল।

"না শুধু শোনা কথাতে আমি করিনি। দেখেছি। আমি নিজের চোখে ওদের চুমু খেতে দেখেছি। বৌকে আমার ভাইয়ের জিভ চুষতে দেখেছি। ওরা যে প্রায় মাস ছয়েক ধরে গভীরভাবে লিপ্ত তা আমি শুনেছি বাড়ির অন্য লোকেদের কাছে। আমি স্কুলে চলে গেলেই ওরা ঘর বন্ধ করে দিত। ওদের আর সাড়াশব্দ শোনা যেত না। তাহলে তখন ওরা কী করত? ভাই কলেজ কামাই করে এসব করত। তাছাড়া—"

রক্ষিতের কথা শেষ হলো না, অফিসার জিজ্ঞেস করল, "তাছাড়া কী?"

"তাছাড়া প্রথম প্রথম আমিও বুঝতে পারিনি। আমার বৌ আমার ভাইয়ের

সঙ্গেও মিলত, আবার প্রতিরাতে আমার সঙ্গেও। ওর খুব খাই ছিল। কিছুতেই আশ মিটত না। তবে ইদানীং ও আর আগের মতো আমার সঙ্গে মিলতে উৎসাহী হতো না, আমি চাইলেই আজ নয়, আজ নয়, বলে উল্টোদিকে মুখ করে ঘুমিয়ে পড়ত, সম্ভবত দিনেই ও সব খিদে মিটিয়ে নিত। সেটা আমার নজর এড়ায়নি। দু'জনেই গোল্লায় চলে গিয়েছিল।" রক্ষিত যেন কোনও গল্প বলছে, এবং সেই গল্পে ওর ভূমিকাটা যে সঠিক সেইভাবে বিবরণ দিতে লাগল।

"হুঁ। দু'জনেই যখন আপনার চোখে সমান অপরাধী, তখন আপনি আপনার ভাইকে বাদ দিয়ে স্ত্রীকে খুন করতে কেন গেলেন? অপরাধ বন্ধ করার জন্য ভাইকেও খুন করতে পারতেন, ব্যাপারটা তো একই দাঁড়াত।" অফিসার আবার উস্কে দিল।

"না, না, মোটেই এক ব্যাপার নয়। প্রথমতঃ ভাইকে খুন করাটা এত সহজভাবে হতো না। দ্বিতীয়তঃ, বৌ মরে গেলে আর একটা বৌ পাওয়া যায়। ভাই মরে গেলে আর একটা ভাই পাওয়া যায় না। তাছাড়া আমি ভেবে দেখেছি, প্রধান দোষটা ওরই। কারণ ও যদি ভাইকে আস্কারা না দিত তাহলে ভাইয়ের সাহস হতো না ওকে কিছু করার, তার মানে দোষটা ওর, ওর প্রশ্রয়েই ভাই ওর ফাঁদে জড়িয়েছে। আর আপনি জানেন তো, একবার যদি কোনও মহিলা স্বামী ছাড়া অন্য পুরুষের সঙ্গে শুতে শুরু করে তবে আর তার লজ্জা টজ্জা থাকে না। একটার পর একটার সঙ্গে চালিয়েই যায়। সেক্ষেত্রে ভাই মরে গেলে, আমার বৌ আর একটা পুরুষ জুটিয়ে নিত। এসব তো আর নিছক প্রেম-টেম নয়, খিদে মশাই, শরীরের খিদে, বিকৃতি কামের খিদে। বিকৃত কামের খিদে মশাই চট করে মরে না। বেড়েই যায়। আমি কী এই রকম মহিলার সঙ্গে জীবন কাটাতে পারি, না কি উচিত। ওর প্রতি আমার এমন ঘৃণা জন্মে গিয়েছিল না—। আচ্ছা আপনিই বলুন না নিজের বৌকে অন্য একটা লোকের জিভ চুষতে দেখলে কার না রাগ হবে?"

"তা আপনি তো খুন না করে ওকে ডিভোর্স করে দিতে পারতেন। তাহলে তো সব সম্পর্ক চুকে বুকে যেত। এসব ক্ষেত্রে বেশির ভাগ লোকই যা করে।"

"পারতাম। কিন্তু কী কারণে ডিভোর্স করছি, সেটা জানাতে গেলেই আবার পরিবারের কেচ্ছা বাইরে বেরিয়ে যেত, তাছাড়া আমি প্রমাণ করতাম কী করে যে ও আমার ভাইয়ের সঙ্গে যুক্ত? আমি তো আর ফটো তুলে রাখিনি?" রক্ষিত ওর যুক্তিগুলি বোঝাতে চাইল।

"এতেও তো আপনার পরিবারের কেচ্ছা প্রকাশ পেয়ে যাবে। অবশ্য প্রকাশ যাতে না পায়, সেজন্যই আপনি আত্মহত্যার ছকটা সাজিয়েছিলেন। তা ডিভোর্স যখন আপনার মনপূঃত হলো না, আপনি আপনার ভাইকেও তো বাড়ি থেকে অন্য জায়গায় সরিয়ে দিতে পারতেন।"

"পারতাম, কিন্তু তাতে কী আর সব সমস্যার সমাধান হতো? এতদিন যা করেছে তা কী ধুয়ে মুছে যেত? যেত না। ভাইকে অন্য জায়গায় সরিয়ে দিলেও সে ঠিক আসত। এসব মশাই এমন একটা টান, যতই বাধা দিন ঠিক টানে টানে চলে আসবে। তখন এমনও হতে পারত যে, আমার বৌ ভাই ছাড়াও অন্য ছেলেকে যোগাড় করে নিত। ওই যে বললাম না, ওর খুব খাই ছিল। খাইয়ের জ্বালায় ও ঠিক একে ওকে বাগিয়ে নিত। কারণ লজ্জা তো ওর ভেঙ্গে গিয়েছিল। একবার যে পর্দা সরিয়েছে, সে আর দ্বিতীয়বার পর্দা সরাতে লজ্জা পায় না। এই ধরনের নোংরা মহিলার সঙ্গে থাকা যায় না, সে আপনি যাই বলুন।" রক্ষিত দৃঢ়ভাবে বলল।

মোটিভ যা জানার জানা হয়ে গেছে। সামান্য একটু বাকি। অফিসার তাই প্রশ্ন করল, "আপনি তো আপনার স্ত্রীকে চরম ঘৃণা থেকেই খুন করেছেন। চরম ঘৃণাই যদি হয়, তবে খুন করার আগে ওর সঙ্গে সঙ্গমে লিপ্ত হলেন কেন? সে কী আপনার বৌয়েরই তাগাদায়? মানে ইচ্ছায়?"

"না, না। ওই যে বললাম না ইদানীং আমার সঙ্গে আর ওসব ব্যাপারে ও একেবারে উৎসাহী ছিল না। আমি গায়ে হাত দিলেই সরিয়ে দিত। আমিই করেছি, ওর ইচ্ছা ছিল না। আমি জোর করেছি। ভাবলাম, মেরেই যখন ফেলব তখন শেষবারের জন্য—।" রক্ষিত বলল।

'কী বীভৎস ব্যাপার। খুন করার আগে নিজের স্ত্রীকে আর পাবে না বলে শেষবারের মতো ভোগ।' অফিসার ভাবল।

সেই রক্ষিতের বিরুদ্ধে নিজের স্ত্রীকে খুন করার অভিযোগে মামলা শুরু হলো। আলিপুরের দায়রা আদালতের বিচারপতি তার রায়ে রক্ষিতকে একটা দানব হিসাবে বিবরণ দিল। যে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করার ছক করে দোকান থেকে দড়ি কিনে রেখে, তার পাশে শুয়ে, খুন করার আগে উপভোগ করে খুন করতে পারে সে এই সমাজে বেঁচে থাকার অধিকার হারিয়েছে। তাই তিনি রক্ষিতকে ফাঁসির হুকুম দিলেন। যদিও কলকাতা হাইকোর্ট ফাঁসির হুকুম নাকচ করে দিয়ে তার বদলে তাকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছিলেন। রক্ষিত যাবজ্জীবন দণ্ড খেটে তারপর আবার সমাজে ফিরে আসার অধিকার পেয়েছিল।

সেই রক্ষিতের যেমন স্ত্রীকে খুন করার পর কোনও তাপ উত্তাপ ছিল না, রাজেনের মুখ দেখলেও তেমনই মনে হতে লাগল। বাসুকে খুন করার জন্য ওর মনে কোনও দুঃখ নেই।

রক্ষিতের সঙ্গে রাজেনের খুনের তফাৎ, রক্ষিত তার স্ত্রীর সঙ্গে আর ঘর করতে পারবে না, সেই মোটিভে সে খুন করেছে। আর রাজেন তার স্ত্রীকে বাঁচিয়ে খুন করেছে তার স্ত্রীর প্রেমিককে। সে তার কাঁটা সরিয়ে স্ত্রীকে আবার নিজের মতো করে ফিরে পেতে চেয়েছে। সে ভেবেছিল সে ধরা পড়বে না। বাসু উধাও হয়ে যাবে। সব খুনীই চায়, খুন করার পর প্রমাণ লোপের, রক্ষিতও প্রমাণ লোপ করার জন্য স্ত্রীকে সিলিং পাখার রডের সঙ্গে ঝুলিয়ে দিয়েছিল। রাজেন প্রমাণ লোপের জন্য বাসুর দেহ টুকরো টুকরো করে ঢুকিয়েছিল সিনহাদের চেম্বারে। সেও রক্ষিতের মতো ভেবেছিল পুলিশকে ফাঁকি দিয়ে সে ও তার সঙ্গীরা বাকি জীবন কাটিয়ে দেবে। কিন্তু ধরা পড়ে গেল। ও ধরা পড়ে যেতে ওর স্ত্রী এখন বস্তিতে একা। সে কি আর নতুন কোনও বাসুকে যোগাড় করে নেবে না? যদি নেয়, তখন রাজেন কি করবে? তার কিছুই করার থাকবে না। যদি বাসুদের মিছিলও তার ঘরে যায়, তবু তার কোনও প্রতিকার করতে সে পারবে না।

দীপক রাজেনকে সরাসরি জিজ্ঞেস করল, "কি রে রাজেন, এখন কেমন লাগছে। তুই ভেবেছিলি, ধরা পড়বি না। তা বাসুকে খুন করলি কেন? ও এমন কী করেছিল?"

"কী করেছিল স্যার? ও বেইমানী করেছিল। ওকে আমিই আমার ঘরে নিয়ে গিয়েছিলাম। আর ওই কিনা আমার বৌকে আমার হাত থেকে ছিনিয়ে নিল।" রাজেন বেশ রাগ রাগ ভঙ্গীতে বলল। ওর এখনও রাগ যায়নি। হয়তো ভাবছে, বাসুর জন্যই ওর লালবাজারে আগমন। সেই ভাবনাই ওর নতুন করে রাগের কারণ।

"কী ভাবে ছিনিয়ে নিল, তোর বৌ তো আর বাচ্চা মেয়ে নয়, শুনেছি, বাসুর চেয়ে বয়সে একটু বড়ই।" দীপক জানতে চাইল।

"কী করে কী হয়েছিল, তা আমি জানি না। ক'মাস ধরেই ব্যাপারটা হচ্ছিল। আমাদের বস্তির লোকেরা আমাকে রোজই বলত। প্রতি সন্ধেয় বাসু আমার ঘরে আসত, ওরা ঘরে দরজা বন্ধ করে হাসাহাসি করত। ওরা জানত আমি সন্ধেবেলায় ঘরে যেতে পারব না। আমাকে কাজের বাড়িতে ওই সময় থাকতে হয়। প্রথম প্রথম আমি কারও কথা শুনিনি। বাসু আমাদের দেশের লোক। আমাকে দাদা, বৌকে বৌদি বলে, ও কিছু

করবে না, এমনিই হয়তো গল্প করতে যায়। কিন্তু একদিন আমি কাজের মধ্যে সন্ধেবেলায় দেখতে গেলাম। দেখলাম, ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। ভেতরটা অন্ধকার। সব নিবিয়ে রেখেছে। আমি বুঝলাম, ঘরের মধ্যে আমার বৌ ছাড়াও অন্য লোক আছে। কে আছে জানতে, আমি দরজা ধাক্কা দিয়ে বৌকে ডাকলাম। বৌ কিছুতেই দরজা খুলল না, বলল, "আমার মাথা ধরেছে, আমি শুয়ে আছি। কাজ শেষ করে একেবারে ফিরে এস, তখন খুলব।' বলুন এসবে কারও মাথা ঠিক থাকে? এমন কী মাথা ব্যথা করছে যে, উঠে একবার দরজা খুলতে পারবে না। আসলে তা নয়, ঘরের মধ্যে যে তখন বাসু ছিল। দরজা খুললে যে ধরা পড়ে যেত। তাই এসব বাহানা। সেদিন আমি চলে এলাম। রাতে ফিরে দেখি বৌ দিব্যি ভাল। ভাল তো হবেই, ওর তো তখন ফুর্তির গড়ের মাঠ। ওকে দেখে আমার রাগ ধরে গেল। আমি দু'তিনটে চাপড় মেরে দিলাম। বললাম, 'বাসু যেন না আসে।' কি রকম মাগী দেখুন স্যার, আমাকেই বলে কিনা, 'হ্যাঁ আসবে, তোর কী?' সেদিন খুব ঝগড়াঝাঁটি হলো। সবাই শুনেছে, তারপর থেকে আমি তক্কেতক্কে ছিলাম। ঘরের মধ্যে ওরা ঠিক কী করে সেটা দেখার জন্য। এর ঠিক দু'দিন পর আমি আবার গেলাম। আমার ঘরের পেছন দিকে একটা জানালায় একটা ফুটো ছিল। আমি ঘরের দরজা বন্ধ দেখে, সেদিনের মতো আর দরজা ধাক্কা না দিয়ে সেই ফুটো দিয়ে ঘরের ভেতরটা দেখতে লাগলাম। সেদিন পুরো অন্ধকার ছিল না। হ্যারিকেনটা কমিয়ে রেখেছিল। আমি দেখলাম কী স্যার? কী আর বলব?"

দীপক ইচ্ছে করেই জানতে চাইল, "কী দেখলি?"

"দেখলাম, আমাদের খাটে আমার বৌ শুয়ে আছে। কাপড়চোপড়ের কোনও ঠিক নেই। বাসু আমার বৌয়ের খোলা পা টিপে দিচ্ছে, আর হাসছে, গল্প করছে, আর বৌ চোখ বুজে মাঝে মাঝে কী বলছে, আর হাসছে। বলুন এ কী সহ্য করা যায়? নিজেরই ঘরে অন্য একটা লোক বৌকে নিয়ে খেলছে তা কতক্ষণ দেখা যায়? আমি সেদিন আর কিছু না বলে চলে এলাম। চোরের মতো গিয়েছি, যাতে অন্য কেউ না দেখে, আবার চোরের মতো ফিরে এসেছি কাজের বাড়িতে, কিন্তু কাজ কী আর হয়, বারবার ভুল হচ্ছিল দেখে ওখানেও গালাগালি খাচ্ছিলাম।" রাজেন পরিষ্কার করে বলল।

দীপক জানতে চাইল, "আর কোনওদিন কিছু দেখিসনি?"

রাজেন তাচ্ছিল্যের মতো বলল, "আর কী দেখার আছে স্যার? তবু আমি আরও একদিন ওদের জাপটে শুয়ে থাকতে দেখেছি। বাসু আমার

ঘরে যাওয়ার পর আমার ওখানে যেতে অনেকটা দেরি হয়ে গিয়েছিল। ওরা ততক্ষণে যা করার করে, তারপর শুয়েছিল। এর অল্প পরেই বাসু দরজা খুলে বেরিয়ে গিয়েছিল। আমি ঘরের পেছন থেকে এসে দরজা ঠেলে ঢুকতেই আমার বৌ উঠে বসে জিজ্ঞেস করেছিল, 'কখন এসেছ?' আমি শুধু বলেছিলাম, 'তুমি বাসুকে আসা বন্ধ না করলে আমি ওকে খুন করব।' ও বলেছিল, 'কত মরদ আমার জানা আছে।' ওর কথা শুনে আমি মনে মনে ঠিক করেছিলাম, যেমন করেই হোক, বাসুকে খুন করে আমি প্রমাণ করে দেব আমি মরদ কি মরদ না।"

একটু থেমে রাজেন আবার বলতে শুরু করল, "জানেন স্যার, মাস দুয়েক ধরে আমার বৌ ওর পাশে শুতে পর্যন্ত দিত না। আমি খাটের নিচে বিছানা পেতে শুতাম। বলুন, রাগ ধরে কি না। আমার বিয়ে করা বৌ, আমাকেই ওর পাশে শুতে দেয় না। অথচ অন্য ছেলের সঙ্গে শোয়। একবার ভাবলাম, দেশে রেখে আসি, কিন্তু ও কিছুতেই যেতে চাইল না।"

"বাসুকে কখনও বারণ করিসনি যে, তোর বাড়িতে ও যেন না যায়?" দীপক জানতে চাইল।

"আমি করিনি, কিন্তু মদনরা করেছিল। কিন্তু বাসু শুনল কই? শোনে নাকি, এমন একটা মাগী ফোকটে পেয়েছে।" রাজেনের চোখ দপদপ করে জ্বলতে লাগল।

"মদনরা তো ওদের দেখেছে, কী করছে। আমি ওদের পাঠিয়েছিলাম। আমার কথা ওরাও প্রথমে বিশ্বাস করেনি, তারপর নিজেরা দেখে বিশ্বাস করেছে।" রাজেন নিজের থেকেই আবার বলল।

"মদন ছাড়া আর কে কে দেখেছে?" দীপক জানতে চাইল।

"মদন ছাড়া আমাদের বস্তির অনেকে দেখেছে। ওরা যে ঘর বন্ধ করে কী করত তা তো আর কাউকে বলে দিতে হয় না। রোজ বাসু নয়ত কি জন্যে আমার ঘরে আসবে? সেটা সবাই বুঝে গিয়েছে।" রাজেন বলল।

"এই যে পাঁচদিন ধরে বাসু তোর বাড়ি যাচ্ছে না, কেন যাচ্ছে না সেই খোঁজ তোর বৌ করেনি?" দীপক জানতে চাইল।

"করেনি আবার? করেছে। ওর বয়সী একটা মেয়ে মদনের বাড়ির কাছে কাজ করে, তাকে দিয়ে মদনের কাছে জানতে চেয়েছিল বাসুর কিছু হয়েছে কিনা। মদন বলে দিয়েছে, 'বাসু বোধহয় দেশে গেছে।' সেটা শুনে আমার বৌ ওই মেয়েটাকে বলেছে, 'আমাকে না বলে চলে গেল, আমিও নয় ওর সঙ্গে দেশ থেকে ঘুরে আসতাম।' বুঝুন স্যার, আমার সঙ্গে যেতে

চায় না, বাসুর সঙ্গে যাবে। যা এখন, যা, কার সঙ্গে যাবি।" রাজেনের রাগ ফেটে বের হতে লাগল।

"বাসুকে খুন না করে তোর বৌকেও তো খুন করতে পারতিস। তোর জ্বালা তো মিটত। বরং তাতে মদনদের তোর লাগত না। ওরা বেঁচে যেত।" দীপক জানতে চাইল।

"আমি এত চিন্তা করিনি স্যার। আর বৌকে আমি খুব ভালবাসতাম। আমার সঙ্গে বাসু বেইমানী করেছে বলেই ওকে খুন করলাম।" রাজেন বলল।

"সে তো তোর বৌও তোর সঙ্গে বেইমানী করেছে। তোর কথা অনুযায়ী দু'জনেই তো একই অপরাধ করেছে, তা একজনকে ছেড়ে অন্যজনকে মারলি কেন?" দীপক জানতে চাইল।

রাজেন চুপ করে রইল, তারপর বলল, "ওই মাগীটাকে একটু বুঝিয়ে দিতে চাইলাম, আমিও পারি। আমিও শালা মরদ, তোর বাসুই একমাত্র মরদ নয়। ওকে মেরে ফেললে ও কী ভাবে বুঝত যে আমিও মরদ।"

"তা তুই তোর বৌয়ের কাছে প্রমাণ করতে চেয়েছিলি যে তুইও মরদ সেইজন্যই তুই বাসুকে খুন করলি?" দীপক সোজাসুজি জানতে চাইল।

"হ্যাঁ স্যার। আমিও যে মরদ সেটা এবার বুঝবে। ও বলেছিল না, 'তুমি কেমন মরদ সেটা আমার জানা আছে।' এবার তো বুঝবে, আমি কেমন মরদ।" রাজেন বেশ তৃপ্তি সহকারে বলল।

রাজেনের কাছ থেকে আর নতুন কিছু জানার নেই। দীপক রাজেনকে ছেড়ে দিয়ে শামুকে নিয়ে বসল। শামু বেশ লজ্জিত, দুঃখিতও। সে যা বলে গেল তা মদন যা বলেছিল তারই প্রায় পুনরাবৃত্তি।

সব শুনে দীপক প্রশ্ন করল, "তুই আর সাউ তো বাসুর গলা, হাত, পা কেটেছিস? তাই না? একটা বন্ধুকে খুন করার পর তার হাত, পা ওইভাবে কাটতে তোর একটুও মায়া লাগল না?"

"হ্যাঁ স্যার লেগেছিল, কিন্তু তখন তো আমাদের কিছু করার ছিল না, যা হবার, তা তো আগেই হয়ে গেছে। তখন রাজেনদার কথায় ওর লাশটা লুকানোর জন্যই ওইভাবে কেটেছি। কি করব? আমরা যে রাজেনদার কথায় বাড় খেয়ে বাসুকে খুন করে ফেলেছি।" শামু অনুশোচনার সুরে বলল।

"রাজেন কী তোদের কোনও লোভ দেখিয়েছিল? মানে, এই কাজটা করে দিলে আমি তোদের এটা দেব, ওটা দেব?" দীপক জানতে চাইল।

"না স্যার, তেমন কিছুই বলেনি, আমাদের কাছে রোজ ঘ্যানঘ্যান করত,

আমরাও বিরক্ত হয়ে গিয়েছিলাম। কিছু না ভেবেই বাসুকে মেরে ফেলি।” শামু জানাল।

“বাসুকে কী তোরা হিংসা করতিস? মানে ও যেমন রাজেনের বৌয়ের সঙ্গে মিশত সেটা তোরা পারতিস না বলে ওর প্রতি তোদের কোনও হিংসা ছিল না? সত্যি কথা বলবি।” দীপক প্রশ্নটা করে শামুর চোখের দিকে তাকিয়ে রইল।

“না, না। হিংসা করতাম না।” শামু বলতেই দীপক ধমকে বলে উঠল, “মিথ্যা বলিস না শামু, মিথ্যা কথা বলে এখানে কোনও লাভ নেই। সত্যি বল, একটুও হিংসা করতিস না? তোরও কী ইচ্ছা করত না রাজেনের বৌয়ের সঙ্গে বাসুর মতো মিশতে?’

শামু মাথা নিচু করে বলল, “ইচ্ছে যে হতো না বলছি না, ওর সঙ্গে মিশতে সবারই ইচ্ছে হতো। কিন্তু আমাদের ল্যাং মেরে বাসু ওকে নিয়ে নিল। অথচ বাসুর আগে থেকে ওই বাড়িতে আমরা যাতায়াত করতাম।”

“তার মানে তোদের মনে বাসুর প্রতি হিংসা ছিল, আর তার জন্যই ওইভাবে বাসুকে খুন করে ওর হাত পা কেটেছিস। কী এটাই সত্যি তো?” দীপক জানতে চাইল।

উত্তর না দিয়ে শামু চুপ করে রইল। দীপক যে ঠিক মনের কথাটা ধরে ফেলেছে, সেটা বুঝতে পেরে ও বোধহয় সামান্য হলেও লজ্জিত হলো।

শামুকে ছেড়ে দিয়ে রাজেন সাউকে নিয়ে জেরা শুরু হলো। সাউ নতুন কোনও আলোকপাত করতে পারল না। ওর মোটিভটা জানার জন্য দীপক ওকেও জিজ্ঞেস করল, “আচ্ছা, রাজেন তোকে আলাদা কোনও লোভ দেখায়নি? মানে এই কাজটা ওর হয়ে করে দিলে, ওকে সাহায্য করলে ও তোকে কিছু দেবে?”

সাউ বলল, “না স্যার, ওর দেবার কী আছে? তেমন কিছু বলেনি।”

ধমকে উঠে দীপক বলল, “মিথ্যা বলিস না, ও তোকে বলেনি ওর বৌকে তোকে দেবে। আর সেই উৎসাহেই তুই বাসুকে খুন করেছিস। শামু আর মদনকে তো বলেছিল, তোকে বলেনি? তোরা সবাই তো ওর বৌকে মনে মনে চাইতিস।”

দীপকের একটা উড়ানে সাউয়ের চোখ কেমন ঘোলাটে হয়ে গেল। বলল, “আমাকে স্যার, আমাকে স্যার, একদিন বলেছিল, বাসুকে না সরালে ওর মন অন্য দিকে যাবে না। বাসুকে সরালে তবেই পথ ফাঁকা

হবে। আর বাসুকে সরালে ও আমাকে আর বৌকে নিয়ে দীঘা বেড়াতে যাবে বলেছিল। সেখান থেকে সে পালিয়ে আসবে, আমি আর ওর বৌ দু'দিন থেকে তারপর কলকাতায় ফিরব। ও বলেছিল, এই সব ব্যবস্থাই ও করবে। কাউকে বলতে বারণ করেছিল।"

সাউয়ের মোটিভ এক ধাক্কায় পরিষ্কার। মামলার মশলা হস্তগত। এবার ছোটখাট ব্যাপারগুলি সাজাতে হবে। চিত্রনাট্য ঠিক করতে হবে। সাক্ষী ঠিক করতে হবে। ইত্যাদি।

পরদিন সকালে গাড়ি পাঠিয়ে রাজেনদের বস্তি থেকে রাজেনের স্ত্রীকে আনা হলো। ওর থেকেও যদি কিছু পাওয়া যায় সেটা জানা দরকার। রাজেনের স্ত্রী সত্যিই সুন্দরী।

মেদিনীপুর জেলার এক অজ পাড়াগাঁয়ের মেয়ে যে এতটা সুন্দর হতে পারে তা চট করে বোঝার উপায় নেই। বয়স খুব জোর বাইশ তেইশ। অবশ্য মহিলাদের বয়স তো আর দেখলেই বোঝা যায় না। ওটা প্রায় দুঃসাধ্যের পর্যায়ে পড়ে। তবু অনুমান অনুযায়ী তাই মনে হয়। রাজেনের মতো গরীব লোকের স্ত্রী যে তার শরীরের ত্বক টানটান রাখার জন্য পয়সা খরচ করতে পারে না, সেটা বুঝতে খুব বেশি বুদ্ধি খরচ করতে হয় না। ওর ত্বকের ঔজ্জ্বল্য দেখেই বয়সের মাপকাঠি বোঝার চেষ্টা করলাম। ফর্সা, চোখ মুখে বেশ ধার আছে, মাঝারি উচ্চতার মহিলার দেহের গড়ন দেখলে যে কোনও বাঙালি আধুনিকা, সচেতন শরীর-পারদর্শিনী, নিজেকে লুকিয়ে ফেলবে। কামদেবী ওর শরীর তৈরি করার সময় ঠিক ঠিক জায়গায় ঠিক ঠিক মাপের ছাঁচে গড়া জিনিস লাগিয়েছে। ও যদি কোনও ধনী ঘরে জন্ম নিত এবং শরীরের যত্ন বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে করার সুযোগ পেত তবে অনেক পুরুষই ওর ডানার ঝাপটা খেয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ত। এ হেন মহিলা যে রাজেনের মতো একটা ডেঙ্গা, কালো, গরীব লোকের আশ্রয়ে বেশিদিন থাকতে পারে না, তা তার ইতিউতি চোখের বানে ধরা পড়ে যায়। বাসুর মতো ছেলে যে ওর ওই বানে ভেসে যাবে তাতে আর নতুনত্ব কী আছে? এটা বুঝতে কোনও গবেষকের দরকার হয় না। গ্রাম্য মেয়ে, রাজেনের সঙ্গে বিয়ের পর একেবারে কলকাতার বালিগঞ্জের মতো উচ্চবিত্তের পাড়ায় এসে উঠেছে, হোক না সেটা একটা বস্তি, কিন্তু আধুনিকতার জোয়ারের ঢেউয়ের ধ্বনি সামান্য হলেও বস্তির ঘরে ঘরে আছাড় খায়, আর তারই ফলশ্রুতিতে গ্রাম্য মহিলা স্বামী ছাড়া অন্য প্রেমিকের বক্ষলগ্না হওয়ার সাহস পেয়ে বাসুর কাছে ধরা দিয়েছিল। এখন সেই বাসু

আর নেই। তবে ওর জন্য নতুন নতুন বাসুরা, যে কোনও ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত তা ওকে দেখলেই বোঝা যায়। এমন কী, বালিগঞ্জের অনেক ধনী বাসুরা যে টাকার থলি নিয়ে ওর জন্য হাজির হয়ে প্রতিযোগিতা শুরু করতে পারে, তাও সহজেই বোঝা যায়। সেটা ও কতটা উপলব্ধি করতে পেরেছে কে জানে। যদি পারতই, তবে বাসুর মতো একটা গরীব ছেলের বদলে বালিগঞ্জের কোনও নন্দের দুলালকেই ও অনায়াসে আঁচলের খুঁটে বেঁধে নিতে পারত। প্রেমদেবী খেলার সামগ্রী দিলেও উচ্চমার্গীয় পরিধির বাইরে ওর জন্ম হওয়াতে ওর জন্য বাসুকেই মরতে হলো।

দীপক ওকে বসাল। আমিও বসলাম। মহিলাদের মনের গোপন খবর শোনার অপেক্ষায় এবার শুরু হবে প্রশ্ন। আমাদের সামনে বসে ও বেশ জড়োসড়ো। যতই হোক, গ্রামের লজ্জা, সরলতা, সামান্য ভয় এখনও ওর আচরণ থেকে পুরোপুরি উধাও হয়নি। পরিস্থিতি নিজের নিয়ন্ত্রণে না থাকলে সেটা আরও পরিস্ফুটিত।

দীপক ওকে বলল, "জানো তো, বাসুকে খুন করা হয়েছে। কে কে খুন করেছে সেটাও নিশ্চয়ই শুনেছ? কিন্তু কেন বাসু খুন হয়েছে সেটা তুমি জানো?"

রাজেনের স্ত্রী খুব আস্তে বলল, "না, জানি না।" ওর চোখ দুটো সামান্য ছলছল করে উঠল। সেটা নিশ্চয়ই রাজেনের জন্য নয়, বাসুর জন্য।

দীপক বলল, "তোমার জন্য। তুমি রাজেনকে পাত্তা দিতে না, বাসুর সঙ্গে মাখামাখি করতে, রাজেন তোমাকে বাসুর সঙ্গে মিশতে বারণ করা সত্ত্বেও তুমি সেটা শোননি। তুমি বাসুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়েই দিয়েছিলে। এটা কী সত্যি নয়?"

রাজেনের স্ত্রী মাথা নেড়ে বলল, "সত্যি।" তারপর খুব আস্তে বলল, "আমিই এর জন্য দায়ী। কিন্তু কী করব বলুন, আমি যে ওকে আর সহ্য করতে পারতাম না।" ওর কথার মধ্যে যে সত্যতা আছে তা আর বলে দিতে হবে না। মেদিনীপুরের গ্রামীণ টান রাজেনের স্ত্রীর ভাষায় স্পষ্ট। এবার হঠাৎ সরাসরি বলে ফেলল, "আমরা দু'জনে দু'জনকে ভালবাসতাম, এটা ওরা সহ্য করতে পারত না।"

দীপক জানতে চাইল, "রাজেনের কী দোষ ছিল যে, তুমি ওকে একেবারে ত্যাগ করেছিলে, এমন কী ওকে তোমার পাশে শুতে পর্যন্ত দিতে না। কী হয়েছিল?"

রাজেনের স্ত্রী মাথা নিচু করে নিল। হয়তো ভাবছে কারণটা বলবে কী বলবে না। কিংবা অন্য কিছু। এক, দু'মিনিট কেটে গেল। আমিই বললাম, "আমাদের হাতে কিন্তু বেশি সময় নেই। যা বলার আছে তাড়াতাড়ি বলে দাও।"

রাজেনের স্ত্রী একটু নড়েচড়ে বসল। ছাপা শাড়ির আঁচলটা ঠিক করল, মাথাটা নীচু করে আছে। মুখটা অতিরিক্ত লাল হয়ে উঠেছে। হঠাৎ বলে উঠল, "ও কোনও মরদই নয়, পারত না। আমাকে ও দিন দিন শেষ করে দিচ্ছিল। অথচ ইচ্ছে আছে খুব, ক্ষমতা নেই। বাধ্য হয়ে তাই ওকে আমি তাড়িয়ে দিতাম। কী করব আপনারাই বলুন। মেয়েরা এভাবে কত দিন থাকতে পারে?"

"সে জন্যই তুমি বাসুকে বেছে নিয়েছিলে?" দীপক জানতে চাইল।

"হ্যাঁ, সেই জন্যই। তারপর আমরা ঠিক করেছিলাম, পালিয়ে যাব, অন্য জায়গায় চলে যাব, এভাবে তো বেশিদিন চলে না। কিন্তু এর মধ্যেই কী যে হয়ে গেল।" ও হঠাৎ মুখে আঁচল চাপা দিয়ে ডুকরে উঠল। আমরা ওকে সামান্য সময় দিলাম। প্রেমের জোয়ার কান্নার মাধ্যমে ঝরিয়ে দিতে। আমরা দেখতে লাগলাম।

সামান্য পরে দীপক বলল, "কেঁদে কোনও লাভ নেই, তুমি কী রাজেনদের শাস্তি চাও? আমাদের বল।"

মুখ থেকে আঁচলটা না সরিয়েই রাজেনের স্ত্রী ইতিবাচক হিসাবে মাথা নেড়ে আমাদের জানাল, "হ্যাঁ, চায়।"

ওর মাথা নাড়া দেখে মনে মনে ভাবলাম, 'কী মেয়ে রে বাবা, মৃত প্রেমিকের প্রতি এখনও কী টান! স্বামীর শাস্তি চায়!'

বললাম, "খুনের শাস্তি মানে জানো? ফাঁসি নয়ত যাবজ্জীবন কারাদণ্ড, মানে সারা জীবন জেলখানাতেই কাটতে হবে। রাজেনকে আর পাবে না। তখন তুমি কী করবে?"

এবার ও মুখ থেকে আঁচলটা সরিয়ে নিল। দৃষ্টিতে খরতা। চোখের জল খরতার উষ্ণতায় উধাও। বেশ জোরের সঙ্গেই বলে উঠল, "ও মিনসে থাকল কী মরল আমার কিছু যায় আসে না। ও আমার কাছে এমনিতেই মরা।"

ভাবলাম, 'কামের কী তাড়না রে বাবা, বিয়ে করা স্বামী মরে গেলে তার লাভ সেটা সে স্পষ্টাস্পষ্টি ঘোষণা করছে। কারণ সে ওর কামের কাছে মৃত।'—কামের এমন তাড়না যে দেখিনি তা নয়, তবে স্বামী মরে

যাক, এমন সরাসরি ঘোষণা এর আগে এমন তীব্রভাবে শুনিনি। তাই কানের ভেতরের পর্দা তীব্রভাবে ঝনঝনিয়ে উঠল।

দীপক জানতে চাইল, "তুমি কী এমন কিছু দেখেছিলে বা শুনেছিলে যে বোঝা যায়, বাসুকে ওরা মেরে ফেলার ছক করছে?"

ওর গলার জোর আরও বেড়ে গেছে, সাহসীও হয়ে উঠেছে, আড়ষ্টতা আর বেশি নেই। বলল, "না। তেমন যদি বুঝতে পারতাম, তা হলে কী আমি মিনসেকে বাঁচতে দিতাম? নয়ত বাসুকে নিয়ে আমি ঠিক পালিয়ে যেতাম।"

"হুঁ। আচ্ছা বাসুকে খুন করার পর ওরা চারদিন বাইরে ছিল। রাজেনও ঘরে ছিল। তার মধ্যে রাজেন ও ওর বন্ধুদের গতিবিধি বা কথাবার্তায় কোনও পরিবর্তন দেখেছিলে?" দীপক জানতে চাইল।

রাজেনের স্ত্রী এবার ভাবতে নিল দু'একটা মুহূর্ত। তারপর বলল, "ক'দিন ধরে ওকে খুব খুশি খুশি লাগছিল। একদিন মাংস কিনে এনেছিল, বলল, রাঁধ, আজ জমিয়ে খাব। তখন তো বুঝিনি ওর এত ফূর্তি কিসের। জানলে কী আমি আর মিনসেকে মাংস রেঁধে খাওয়াতাম?"

"বন্ধুদের কাউকে ঘরে ডাকেনি?" দীপক জানতে চাইল।

"হ্যাঁ ওই সাউকে একদিন এনেছিল। আমাকে চা বানাতে বলে ওরা কী সব ফুসুর ফুসুর করছিল, আমি শুনিনি।"

রাজেনের স্ত্রীর কথায় আমরা বুঝে গেলাম, এর থেকে মামলার জন্য প্রয়োজনীয় কোনও তথ্য পাওয়া যাবে না। ফালতু আমাদের সময়ের অপচয় হচ্ছে। ওর সামনে রাজেনের খুনের বিষয় নিয়ে ওরা কোনও কথা বা কাজ করেনি।

দীপকই জানতে চাইল, "তুমি এবার কী করবে? কোথায় থাকবে? এখন যেখানে আছ, সেখানে তো তুমি একা থাকতে পারবে না, কোথায় যাবে?"

রাজেনের স্ত্রী নির্বিকার ভঙ্গীতে বলল, "আমি দেশে চলে যাব। কী আর করব?"

"দেশ মানে তো মেদিনীপুর? তো তোমার গ্রামের বাড়িতে কে কে আছে?" জানতে চাইলাম।

বলল, "মা, দাদা, কাকা, কাকিমারা আছে। ওখানেই থাকব। মরতে আর যাব কোথায়। আমার কপালটাই পোড়া। ওই মিনসে আরও পোড়াল।" গলায় আবার জলীয় বাষ্প।

কীভাবে ওর মিনসে ওর কপালটা আরও পোড়াল, তাতো আমরা জানিই, ও যে বাসুকে নিয়ে নতুন ভাবে জীবন শুরু করতে চেয়েছিল সে তো স্বীকার করেছেই। সেই স্বপ্ন তছনছ হয়ে যাওয়াতে ও এখন দিশেহারা। মেদিনীপুরের গ্রাম্য জীবনে ও আর ফিরে যেতে চাইছে না, কিন্তু উপায় নেই। যেতেই হবে। গিয়ে কী পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে তাও ওর অজানা। ও বুঝে গেছে রাজেনরা কী কারণে বাসুকে খুন করেছে তা আর কারও কাছে গোপন থাকবে না। সেই কারণটা যে ও সেটা সবাই জেনে যাবে। এবং তারপর ওর পক্ষে পরিস্থিতিটা যে সহজ হবে না সেটা ও ভালভাবেই বুঝতে পারছে। তাই ওর ভয়, দ্বিধা। কেমন করে এই পরিস্থিতি সামাল দেবে তাও ওর অজানা। গ্রাম্যজীবনে এই ভরা যৌবন নিয়ে, এই 'নষ্ট চরিত্রের' অপবাদ মেখে ওর জীবন যে অতিষ্ঠ হয়ে যাবে সেটা ও এখানেই বসে বুঝতে পারছে। তাই ওর সংশয়। দুঃচিন্তা।

"দেশে তুমি কী করে যাবে? তোমাকে নিয়ে যাওয়ার মতো কেউ এখানে আছে?" দীপক জিজ্ঞেস করল।

"না। তেমন কেউ নেই। কে নিয়ে যাবে, ভাবছি।" রাজেনের স্ত্রী উত্তর দিল।

"হুঁ। শোন, আমি তোমাকে আজ বাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছি। কাল সকালে তুমি জিনিসপত্র নিয়ে তৈরি হয়ে থাকবে, আমাদের লোক যাবে, ওরা তোমাকে তোমার বাপের বাড়িতে পৌঁছে দেবে।" দীপক বলল।

"ঠিক আছে। আমি রেডি থাকব। কখন যাবে স্যার?" রাজেনের স্ত্রী জানতে চাইল।

"তুমি রেডি থেকো। ওরা দশটার পর যখন তখন পৌঁছে যাবে।"

এরপর আমার দফতরের দু'জন বয়স্ক, বিশ্বস্ত কনস্টেবলকে ডাকলাম ওকে বালিগঞ্জে ওর ঘরে পৌঁছে দিতে। ওরা ওর ঘরটা চিনে আসবে। ওরাই আগামিকাল সকালে ওকে নিয়ে মেদিনীপুরে ওর বাড়িতে পৌঁছে দেবে। কামদেবী ওকে যেভাবে সাজিয়েছে তাতে যার তার সঙ্গে ওকে পাঠানোটা একটু ঝুঁকি হয়ে যাবে বলেই এই কাজের জন্য আমরা ওই দু'জন বয়স্ক, বিশ্বস্ত কনস্টেবলকে ওর সঙ্গী হিসাবে নিয়োগ করলাম। তবে ও যে কোনও লোককে টলিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে এবং সেই ক্ষমতা ও ঠিকমতো প্রয়োগ করলে যে ওর কোনও অসুবিধা হওয়ার নয় সেটা হলফ করে নিশ্চিন্ত মনে বলে দেওয়া যায়। তবে জয় করতে গেলে

বাসুর মতো একটা গরীব, নিরীহ প্রাণীকে ধরলে চলবে না। সরস কাউকে ধরতে হবে, এবং ও ওর কামদেবীর সাজানো বাগান দিয়ে ওকে অনায়াসেই আঁচলে আটকাতে পারবে। সেটারই সফল প্রয়োগ দরকার। যাই হোক, রাজেনের স্ত্রী ওদের সঙ্গে চলে গেল।

এরপর আলিপুরের দায়রা আদালতে মামলা শুরু হলো। মামলায় শম্ভুর জন্য মিঃ ভট্টাচার্য কলকাতার অন্যতম নামকরা আইনজীবীকে দাঁড় করালেন। দীর্ঘদিন ধরে মামলা চলল। এই মামলার সবচেয়ে কঠিন জায়গাটা ছিল কাটা মাথা ও দেহের অঙ্গগুলি যে একই ব্যক্তির সেটা প্রমাণ করা। ডাক্তার জে বি মুখোপাধ্যায় সেটা করলেন। মদনকে রাজসাক্ষী করা হয়েছিল।

বিচারপতি মদনকে ছাড়া বাকি আসামীদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিলেন। মদন রাজসাক্ষী হওয়ার সুবাদে মুক্তি পেয়ে গেল। বাসুকে খুন করে যাবজ্জীবন কারান্তরালে গিয়ে রাজেন সাচ্চা 'মরদ' হলো। রাজেনের স্ত্রীর কি হলো? যাকে আপন করে রাখার জন্য রাজেন বাসুকে খুন করেছিল। সেও ওর হাতছাড়া হয়ে গেল। সেটাই স্বাভাবিক। বাস্তব। রাজেনের স্ত্রী নতুন জীবনসঙ্গী খুঁজে পেতে বেশিদিন সময় নেয়নি। 'কুলটা' বদনাম নিয়ে সে বেশিদিন গ্রামে থাকেনি। প্রায় চারবছর কলকাতার বালিগঞ্জের অভিজাত পাড়া সংলগ্নে বাস করে, চলনে বলনে গ্রাম্যভাবটা ঝেড়ে ফেলে অনেকটাই আধুনিক হয়ে উঠেছিল। চিন্তাধারাও অনেক পরিবর্তন করে ফেলেছিল। ছোবল মারার কায়দাও বেশ রপ্ত করে ফেলেছিল। তার ওপর জন্মসূত্রে পাওয়া চেহারাটা তো ওর সঙ্গেই আছে। সে কেন বাড়ি এবং গ্রামের পাঁচজনের মুখঝামটা খেয়ে মুখ বুজে পড়ে থাকবে। অল্প ক'দিনের মধ্যেই সে তার খেলা চালু করেছিল। এবং এবার সে রাজেনের থেকে অনেক ওজনদার এক প্রেমিক জুটিয়ে নিল। তারপর শুনেছি সে উড়ে গিয়েছিল। কোথায় গিয়েছিল জানি না। নতুন জীবনসঙ্গী খুঁজে সে নতুন করে ঘর না বাঁধলে সমাজের দাবির চাহিদা মেটাতে তাকে হয়তো মৃত্যুবরণ করতে হতো। মানসিকভাবে নয়ত শারীরিকভাবে।

অদ্ভুত ব্যাপার সে কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই জীবনযাপন করবে। তার মনে কী একবারের জন্যও এই প্রশ্নটা মনে উঁকি দেবে যে, তার জন্যই একটা পুরুষের জীবন অকালে ঝরে গেল আর চারজন যুবকের জীবন তছনছ হয়ে গেল। ভাববে না। চিন্তাও করবে না। সে কী করবে? কামদেবী তাকে এমনভাবেই গড়েছে যে সে নিজেও জ্বলবে, অন্যকেও জ্বালাবে।

নারীরা জ্বলছে, নারী নিয়ে জ্বলছে এ তথ্য আর পৃথিবীর মানুষের কাছে নতুন কিছু নয়। কত অসংখ্য পরিবার যে এর জন্য ছারখার হয়ে গেছে, তার কোনও পরিসংখ্যান কেউ দিতে পারবে না। মানুষের সমাজে বিয়ের প্রথা চালু হওয়ার পরেই যে এর প্রাবল্য বৃদ্ধি পেয়েছে তাও আর নতুন করে বলার কিছু নেই। বিশ্ব সাহিত্যের বড় অংশ জুড়েই রয়েছে বহুগামী নারী-পুরুষের সমস্যা ও তাদের টানাপোড়েন নিয়ে।

কিন্তু যে জ্বলে সে জ্বলেই। জ্বলে নিঃস্ব হয়ে শেষ হয়ে যায়। তাকে প্রলেপ দিয়ে কতজন আর বাঁচিয়ে রাখতে পারে। বিচিত্র প্রেমের বিচিত্র সব দহন। সেই দহনের জের আমাদের সামলাতে হয়। কখনও সেটা রাজেন বা রক্ষিতের মতো খুনের জের, কখনও বা আপাত নিরীহভাবে অপরাধের সংজ্ঞার সীমার বাইরের জের।

হিন্দি ছবির এক সময়কার খলনায়কের চরিত্রাভিনেতা হীরালালের দ্বিতীয়া স্ত্রী কলকাতার ভবানীপুরে থাকতেন। স্ত্রী না বলে তাকে রক্ষিতা বলাই যুক্তিযুক্ত। হিন্দু, বাঙালি। হীরালাল কলকাতায় এলে তার কাছেই, তার ঘরে থাকতেন। তাদের একটাই সন্তান। মেয়ে। সেই মেয়ে যখন যুবতী হলো তার রূপের ছটায় মোহিত হবে না এমন পুরুষ খুঁজে পেলে অবশ্যই বুঝতে হবে সেই পুরুষের কোনও শারীরিক ব্যাধি আছে।

টকটকে ফর্সা রঙের ওপর সামান্য লম্বা ধরনের মুখে আয়ত দুটো প্রেমাসিক্ত চোখ। টিকালো নাকের ওপর পরিমাপ মতো কপাল। তার নিচে সরু লম্বা ভ্রু আয়ত চোখের সঙ্গে এমন ঘরানার যুগলবন্দীতে নিঃশব্দে সুর তুলেছে যে, স্বয়ং ইন্দ্র এসে যদি ভবানীপুরের ওই বাড়িতে কলিংবেল বাজায় তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। শিক্ষিত ওই সুন্দরী যুবতীর শারীরিক গঠন, কথা বলার ধরন, হাঁটা, ঠোঁটের ভাঁজে হাসা দেখতে বহু যুবকই দশ পনেরো কিলোমিটার হেঁটে এসে ওর বাড়ির গলির মুখে সকাল সন্ধেয় দাঁড়িয়ে থাকবে তাতেও কোন বিতর্ক নেই।

সেই মেয়ের সঙ্গে প্রেম করার জন্য যুবকদের লম্বা লাইন। ওর সামান্য সান্নিধ্য পেতে হা-হুতাশ। সাধনা। আত্মত্যাগের বহর। কখনও বা অতিরিক্ত জাহির করার প্রয়াস। নিজেকে ছাপিয়ে ওর চোখে ফুল হওয়ার জন্য ছটফটানি। ছোটা। এক এক করে ছাঁটাই হয়ে গেল। রয়ে গেল পলাশ নামে কালীঘাট

অঞ্চলের এক যুবক। অবশ্য প্রেম বলতে তখন রবীন্দ্রনাথকে ঘিরে। 'একটুকু ছোঁয়া লাগে, একটুকু কথা শুনি।' তাতেই আকাঙ্ক্ষা বাড়ে। পেতে।

কিন্তু এক রাম ধাক্কায় সেই চাওয়া পাওয়ার খেলা শেষ করে দিল হীরালাল। মেয়ের বিয়ে দিল লন্ডন প্রবাসী ইঞ্জিনিয়ার জ্যোতি ভট্টাচার্য নামে এক যুবকের সঙ্গে। বিয়ের পর জ্যোতি তার স্ত্রীকে নিয়ে উড়ে গেল। ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের কর্মী পলাশ শূন্য দৃষ্টিতে তা পর্যবেক্ষণ করল। দেখল, তার সাধনার স্বপ্নকে নিয়ে অন্য এক পুরুষ হুস করে এসে হুস করে ছিনিয়ে নিয়ে চলে গেল। প্রতিরোধ করার কোনও প্রাচীরই ও তুলতে পারল না।

দু'বছরের মধ্যে হীরালালের মেয়ে দুই যমজ ছেলের মা হলো। লন্ডনে ছেলেরা বড় হতে লাগল। জ্যোতি তার সুন্দরী স্ত্রীর মর্জিমাফিক সংসার চালায়। একটা নির্দিষ্ট কক্ষপথ ধরে তাদের জীবন আন্দোলিত হতে হতে এগিয়ে যেতে থাকে।

এই বাঁধাধরা জীবন হীরালালের মেয়ের একঘেয়ে লাগে। ওর মন জুড়ে পড়ে থাকে পলাশ। জ্যোতি তার মনের খবর রাখে না। সে কী করে জানবে যে, তার যমজ দুই ছেলের মা'র মন তখনও জুড়ে বসে আছে বিয়েপূর্ব এক প্রেমিক। শরীরে সে আছে, মনে নেই। এটা জানা যে কোনও পুরুষের কাছে দুঃসাধ্য। জ্যোতিও বুঝতে পারেনি। বোঝার চেষ্টাও করেনি। সে নিয়ম মেনে চলেছে। এতেই যে তার স্ত্রী তুষ্ট নয়, সেটা বোঝার ক্ষেত্রে ফাঁক থেকে গেছে।

সে নিয়ম মেনে মেনে চলেছে। সংসারের নিয়মের ফাঁকগুলি যে অনেক বেনিয়ম দিয়ে ভরাট করতে হয় তা তার অজানা। সে ইঞ্জিনিয়ার, অঙ্কের ছকে বাঁধা তার জীবন। মনের অঙ্ক সে জানে না। এ ব্যাপারে সে প্রায় মূর্খ। একই রাগে সে গান গায়। মিশ্র রাগের খবরই রাখে না।

এইভাবে প্রায় পাঁচ বছর চলে গেল। এই পাঁচ বছরের মধ্যে জ্যোতি তার স্ত্রীকে নিয়ে আর নিজের দেশে ফেরেনি। স্ত্রী বারবারই ওকে দেশে আসার অনুরোধ করে, জ্যোতি নানা অজুহাত দিয়ে পাশ কাটিয়ে যায়। ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায়।

অবশেষে আটষট্টি সালের শেষ দিকে জ্যোতিকে তুষ্ট করে ওর স্ত্রী একাই দেশে এল। কলকাতায়। কথা ছিল, মাকে দেখে সে আবার ফিরে যাবে লন্ডনে স্বামী ও ছেলেদের কাছে। এক মাস যায়, দু'মাস, তিন মাস স্ত্রী আর দেশে ফেরে না। চিঠির উত্তরও ঠিকমত দেয় না। খবরই রাখে না। জ্যোতি তার দুই শিশুসন্তানকে নিয়ে একেবারে ল্যাজে গোবরে

হয়ে গেল। ছেলেরাও 'মা-মা' করে অস্থির। ওদের সঙ্গে জ্যোতিও অস্থির। মা থেকেও ওরা মা-হারা হয়ে জ্যোতির কাজকর্ম প্রায় শিকেয় তুলে দিল। ওদের চিন্তা জুড়ে সবসময়ই মা। কী করে জ্যোতি ওদের সামলাবে ভেবে পায় না। সে তাই বারবার স্ত্রীকে লন্ডনে ফিরে আসতে অনুরোধ করে, কিন্তু তার অনুরোধে স্ত্রী কোনও কর্ণপাতই করে না। সে ভাবে, কী করে এই অল্প ক'দিনে ছেলেদের ভুলে গেল ওর-স্ত্রী। তাদের কথা চিন্তা করেও তার ফিরে আসা উচিত। দিন যায়, কিন্তু এই সঙ্কটের থেকে পরিত্রাণের কোনও উপায় খুঁজে পায় না।

অবশেষে সে ভাবল, সে নিজেই দুই ছেলেকে নিয়ে কলকাতায় এসে এর একটা বিহিত করবে এবং যে করেই হোক স্ত্রীকে লন্ডনে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে।

জ্যোতি এল। সঙ্গে তার দুই যমজ সন্তান। জ্যোতির পৈতৃক বাড়ি দক্ষিণ কলকাতার অভিজাত অঞ্চলে। সেখানেই সে উঠল।

এবার সে শুরু করল, যে উদ্দেশ্যে তার আগমন সেই কাজে। প্রথমেই সে তার ছেলেদের নিয়ে গেল তাদের দিদিমার ভবানীপুরের বাড়ি। দিদিমা তার নাতিদের দেখে খুবই আনন্দিত। খুশি। কিন্তু জানাল, তার সঙ্গে তাদের মা থাকে না।

শাশুড়ীর কাছে জ্যোতি শুনল, "আমি ওকে বহুবার বলেছি, ফিরে যেতে, কিন্তু কিছুতেই ও আমার কথা শুনছে না। কী করব? তুমি এসেছ, দেখ, কিছু করতে পার কি না। আমার সঙ্গে মতের অমিল হতে ও আর আমার সঙ্গে থাকে না। হাজরার কাছে একটা মেয়েদের হোস্টেলে থাকে। মাঝেমধ্যে আসে। দু'চার মিনিট থাকে, চলে যায়। এটা ভাল না। বারবার জানতে চেয়েছি, কী এমন হলো যে ও তোমাদের ছেড়ে এখানে এসে পড়ে থাকছে। কিন্তু কিছুতেই ও আমাকে কারণটা জানায়নি। আমি কান্নাকাটিও করেছি, তবু ওকে ওর জিদ থেকে ফেরাতে পারিনি। দু একবার শুধু বলেছে, 'তোমার শুনে লাভ নেই। তুমি বুঝবে না।' আরে আমি কী বাচ্চা মেয়ে যে বুঝব না। তারপরেও আমি ওকে তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলেছি। শোনেনি।"

জ্যোতি শুনল, কিন্তু কী উত্তর দেবে ভেবে পেল না। কারণ উত্তরটাই তো ওর জানা নেই। ওর ভীষণ অস্বস্তি হচ্ছে। চুপচাপ খানিকটা সময় নিয়ে অবশেষে জ্যোতি বলল, "আমরা এসেছি, ওকে বলবেন। ছেলে দুটোর মুখ চেয়ে অন্তত ও আমাদের সঙ্গে ফিরে চলুক। বলবেন। আজ চলি।" জ্যোতি ছেলেদের নিয়ে ব্যর্থ হয়ে ফিরে এল।

পরদিন জ্যোতি বহু খোঁজাখুঁজি করে হাজরার কর্মরত মহিলাদের আবাসনটা খুঁজে পেল। স্ত্রীকে পেল না। সে সকাল ন'টায় বেরিয়ে গেছে, সন্ধের পর ফিরবে। ঠিক করল সে সন্ধের পর আবার আসবে।

জ্যোতি সন্ধে আটটার পর এল। একা। সে একাই নিভৃতে তার স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে কোনও সমস্যা থাকলে তা সমাধান করতে চায়। আবাসনে এসে জ্যোতি শুনল, আছে। তার স্ত্রী সামান্য আগেই ফিরেছে। ওর ভিতরে সামান্য উত্তেজনা দেখা দিল, মনে হলো বহু বছর পর ওর স্ত্রীর সঙ্গে দেখা হচ্ছে। ভাবল, এটাকেই কী বিরহ বলে? জ্যোতি এসব ব্যাপার ভাল বোঝে না। ও মনে প্রাণে উত্তেজনাটা দমিয়ে রাখার চেষ্টা করতে লাগল। স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করতে লাগল।

জ্যোতিকে একটা ছোট্ট ঘরে বসিয়ে আবাসনের এক বৃদ্ধা কর্মচারী ওর স্ত্রীকে ডেকে আনতে চলে গেল। প্রায় দশ মিনিট পর ওর স্ত্রীর উদয় হলো। ওকে দেখেই বলল, "তুমি! হঠাৎ, এভাবে, কবে এলে, কী মনে করে?"

জ্যোতি স্থির দৃষ্টিতে ওর স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে রইল। যেন সে তার স্ত্রীকে নতুন করে দেখছে। সিঁদুর-টিদুঁর কোনওদিন লাগায় না। সেই প্রায় বছর ছ'আগে যেদিন বিয়ে হয়েছিল, সেদিন লাগিয়েছিল। তারপর মাস খানিক, যতদিন কলকাতায় ছিল। লন্ডনে পা দেওয়ার পর আর ওর স্ত্রীর সিঁথি লাল রঙে রঞ্জিত হতে জ্যোতি দেখেনি। জ্যোতি কিছু মনে করেনি। ও প্রকৃত অর্থেই উদারপন্থী। এসব কুসংস্কার ও বহুদিন আগেই ত্যাগ করে দিয়েছে। জ্যোতি দেখছে ওর স্ত্রীকে। মনে হচ্ছে, সে একটা অবিবাহিতা কুমারী মেয়েকে দেখছে। ভাবছে, ও কী আরও একটু সুন্দর হয়েছে? মনে হচ্ছে। লন্ডনে ওর শরীরে যে মেদ জমেছিল তা ঝরিয়ে ফেলেছে। চেহারাটা আরও দোহারা হয়েছে। বোঝাই যাচ্ছে না, ও যমজ সন্তানের মা। ও কী একটু কালো হয়েছে? হয়েছে। রোদে ঘুরে ঘুরে হয়েছে। কী দরকার ওর রোদে ঘোরার? লন্ডনের জীবন ছেড়ে এখানে কী এমন মধু পেল যে নিজের ছেলে দুটোকে ছেড়ে এখানে এই অনিশ্চিত জীবন বেছে নিল? লন্ডনের ওই জীবনযাপনের সঙ্গে এখানকার কোনও তুলনাই চলে না। ও নিজের খুশি মতোই চলত, জ্যোতি তার নিজের অনেক ইচ্ছাই স্ত্রীর জন্য ত্যাগ করেছে। ওকে করতে হয়নি। অথচ সেই কিনা এই কঠিন জীবন বেছে নিল?

জ্যোতির বুক থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসছিল। সেটা সে প্রাণপণে চেপে রাখল। বলল, "এলাম। তোমার কাছে। গতকাল এসেছি। সকালে

তোমার মা'র সঙ্গে দেখা করে এসেছি। ভেবেছিলাম ওই বাড়িতেই তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে। পেলাম না। তারপর এখানে। তোমার ছেলেদেরও এনেছি। ওরা সারাক্ষণই তোমার কথা বলে কাঁদে। আমি একা আর ওদের সামলাতে পারছি না। তুমিই বল না, আমি কী ওদের কখনও এভাবে সামলেছি? তুমিই যা করার করেছ। তাই তোমাকে নিতে এসেছি।"

জ্যোতির কথা ওর স্ত্রী মোটামুটি মন দিয়ে শুনছিল। শেষ কথাটা শুনে ওর ঠোঁটে হালকা হাসির একটা ঢেউ টুক করে দেখা দিল। জ্যোতির চোখ এড়াল না। ও তো ওর স্ত্রীর মুখ থেকে একেবারের জন্যও দৃষ্টি সরিয়ে নেয়নি।

বলল, "হাসলে যে?"

"এমনিই। তোমার কথা শুনে। চা খাবে?"

"না। আমি তো চা খেতে আসিনি। তোমাকে নিতে এসেছি। বল, কবে যাবে?"

"তুমি কী পাগল? তুমি তো জানই আমি যাব না। গেলে তো অনেকদিন আগেই চলে যেতাম। তুমি চিঠি দিয়েছ, আমি উত্তর দিইনি। যাব না বলেই দিইনি। সেটা তুমি ভালই বুঝেছ। তবু তুমি বেকার এলে কেন?"

"কিন্তু কেন যাবে না, সেটা তো বলবে। কী এমন ঘটনা ঘটল যে তুমি ছেলেদের ফেলে এখানে থাকতে চাইছ। আমি তো এমন কোনও কারণই খুঁজে পাচ্ছি না।" জ্যোতি বলল।

খানিকটা সময় নিয়ে জ্যোতির স্ত্রী মুখটা সামান্য ঘুরিয়ে নিল। বলল, "সে তুমি বুঝবে না। আমিও বলব না।"

"বলা না বলাটা তোমার ইচ্ছে। বললে, আমি জানতে পারব, কোনও সমস্যা থাকলে তার প্রতিকার করব। না জানালে আমি কী করব?" জ্যোতি সরল গলায় বলল।

"তোমার জানারও দরকার নেই। প্রতিকার করারও দরকার নেই। শুধু জেনে নাও, আমি আর ফিরে যাচ্ছি না। তুমি ডিভোর্স চাও, আমি দিয়ে দিচ্ছি, তুমি আর একটা বিয়ে করে নাও।"

"কী যা তা বলছ, এখানে ডিভোর্সের কথা উঠছে কী করে? ছাড় আমার কথা। তুমি তো ছেলে দুটোর কথাও ভাববে। তারা কেন মা-হারা হয়ে জীবন কাটাবে? তাছাড়া ওদের বড় করাও তো তোমার কর্তব্য। নয় কী?" জ্যোতি বলল।

"কেন বারবার ওদের প্রসঙ্গ তুলছ? ওরা ঘটনাচক্রে জন্মে গেছে।" জ্যোতির স্ত্রী ঝট করে বলল।

"ঘটনাচক্রে! কী বলছ তুমি। তোমার পরিবর্তন দেখে তো আমি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি। তুমি ওদের কত ভালবাসতে। সারাদিন ওদের নিয়েই থাকতে, আর এখন বলছ ওরা ঘটনাচক্রে জন্মে গেছে।"

"আমি এ নিয়ে তোমার সঙ্গে ঝগড়া করতে চাই না। তুমি জেনে নাও, তুমি বেকার টাকা খরচ করে এসেছ। আমাকে তুমি আর নিয়ে যেতে পারবে না। আমি এখানেই ভাল আছি। লন্ডনে আমি বন্দি হয়ে ছিলাম। এখানে এসে মুক্তি পেয়েছি।"

"লন্ডনে তুমি বন্দি হয়ে ছিলে? তোমার কোন স্বাধীনতা ছিল না? তুমি যা বলেছ আমি তাই করেছি।"

"করেছ। কিন্তু সেই করার মধ্যে আন্তরিকতা ছিল না। করতে হয় বলে করেছ। নিজের ধ্যানেই তুমি থাকতে। আমার দিকে একবারও ফিরে দেখেছ? জিজ্ঞেস করেছ আমি কী চাই? আমার ভাল লাগে কী না। আমি তো একটা খাঁচায় আটকে থাকতাম। ওখানে আমি তোমার দাসী হয়ে ছিলাম। তোমার আর তোমার ছেলেদের ফরমাস খাটতাম। এভাবে আমি কেন আমার জীবন শেষ করব?"

জ্যোতি ওর স্ত্রীর অভিযোগের কী উত্তর দেবে প্রথমে ভেবে পেল না। এরকম অভিযোগ যে শুনতে হবে তা ও মুহূর্তের জন্যও ভাবেনি। বলল, "কী বলব বলত, আমার আন্তরিকতা ছিল না, এমন কথা আমায় শুনতে হবে, আমি ভাবিনি। আমি সব কাজই মন দিয়ে করি। আর তোমার দিকে ফিরে দেখিনি এটা তুমি বললে কী করে? তোমাকে আমি যদি ভালই না বাসতাম তবে তো আমার অন্য বান্ধবীও জুটত, তেমন কিছু কী তুমি কোনও দিন দেখেছ?"

"ছাড়। এ সব এখন বলে কোনও লাভ নেই। আমি তোমার কাছে ফিরে যাচ্ছি না এটা শুনে নাও। এটাই আমার ফাইনাল ডিসিশন। আমি জানি, তুমি তোমার ছেলেদের জন্য একটা আয়া খুঁজতে এসেছ। আমি আর ওদের আয়া হতে রাজি নই। ব্যস, এবার তুমি যেতে পার। কাল আমার সকালে অনেক কাজ আছে, আমি তাড়াতাড়ি ঘুমাব। তুমি লন্ডনে ফিরে যাও। আর এস না। যেদিন বলবে সেদিনই আমি ডিভোর্স করে দেব।"

জ্যোতি ওর স্ত্রীর চোখা চোখা কথা শুনে অবাক হয়ে নিজের কথাই মাঝে মাঝে হারিয়ে ফেলছে। তবু নিজেকে যতদূর সংযত রাখা দরকার ততদূর সংযত রেখে বলল, "দেখ, তুমি কী দেখে কী ভেবেছ আমি জানি না। আমার যদি কোনও দোষ হয়ে থাকে তবে আমাকে ক্ষমা করে

নও। ফিরে চল। ওসব আয়া ফায়ার কথা মাথা থেকে সরিয়ে ফেলো। আয়ার দরকার হলে আমাকে কলকাতায় আসতে হবে কেন, লন্ডনে বসেই তো পাওয়া যায়। ওরা আয়াকে চাইছে না। মা'কে চাইছে। সবার মাকেই নিজের সন্তানের জন্য আয়া হতে হয়। তোমার জন্য কী তোমার মা আয়া হননি। তুমি বললে, আমি ওদের জন্য দুটো আলাদা আয়া রেখে দেব। তবু তুমি ওদের কাছে থাক। সব সন্তানই মাকে চায়। এটাই নিয়ম। ওরা চাইবে না কেন? তুমি সব বোঝ, এটা কী বোঝ না। এখন তোমার ব্যাপার, তুমি ভেবে দেখ।" শেষের দিকে জ্যোতির গলায় প্রায় কান্নায় চাপা হতাশা ঝরে পড়ল।

"আমার যা ভাবার আমি অনেকদিন আগেই ভেবে নিয়েছি। লন্ডনেই ভেবে নিয়েছি। তুমি কী ভাবছ আমি এসব এখানে এসে ভেবেছি? না। আমি আসার আগেই ভেবে নিয়েছি। তুমি বুঝতে পারনি। পারলে, তুমি আমাকে আসতে দিতে না। আটকে রাখতে। অবশ্য তুমি আমাকে কোনওদিনই বুঝতে পারনি। চেষ্টাও করনি। করলে বুঝতে।" জ্যোতি তার স্ত্রীর এমন আগুন-ঝরা গলা কোনও দিন শোনেনি। তার চোখে মুখে একটা দিশাহারা ভাব ফুটে উঠল।

স্ত্রীর এসব অভিযোগের উত্তর আর দেবে না, জ্যোতি ঠিক করল। কিন্তু কী করলে ওর মন থেকে এসব অবান্তর অভিযোগের প্রশ্নগুলি দূর করতে পারবে তাও বুঝে উঠতে না পেরে চুপ করে রইল। হঠাৎ জ্যোতি ওর থেকে খানিকটা দূরত্বে বসা স্ত্রীর একটা হাত চেপে ধরে বলল, "চল, প্লিজ, তোমাকে ছাড়া আমি থাকতে পারছি না। কষ্ট হচ্ছে।"

ওর স্ত্রীর মুখে আবার সেই হালকা হাসিটা খেলে গেল। হাতটা জ্যোতির হাত থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, "এখন যাও, আমাদের হোস্টেল বন্ধ হয়ে যাবে, এখানে আর এস না। যদি আসও ছেলেদের কখনও আনবে না। আমি দেখা করব না। কোনও নাটক করার চেষ্টা কর না।" উঠে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে হাঁটা দিল।

জ্যোতি ওর স্ত্রীর দিকে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল, "ওদের তোমার একবারও দেখতে ইচ্ছে করে না?"

দাঁড়িয়ে গেল। ঘুরল। জ্যোতির দিকে ফিরে জ্যোতির চোখের দিকে সোজা তাকিয়ে ওর স্ত্রী বলল, "না।" দাঁড়াল না। চলে গেল।

অদ্ভুত লাগছে জ্যোতির। এমন উত্তর শুনবে ভাবতেও পারেনি। ওর বুকটা কেমন হালকা হালকা লাগছে। কেন জানে না। ও স্ত্রীর চলে যাওয়ার হাঁটার দিকে দু'এক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল। ও এখন একা। ফাঁকা। জ্যোতি

আর কী করবে। দাঁড়াল। নিজেকে কেমন অবাঞ্ছিত মনে হতে লাগল। ওর স্ত্রীর হাঁটার আওয়াজ মিলিয়ে গেল। নিজেকে সে ফিরে পেল। তারপর ব্যর্থ হয়ে বাড়ি ফিরে চলল।

বাড়ি ফিরে জ্যোতি ওদের ছেলেদের মুখোমুখি হলো। ওরা খুব উৎসাহ ভরে বাবাকে জিজ্ঞেস করল, "বাবা, মাকে আনলে না?"

জ্যোতি কী বলবে? ওদের মা যে ওদের দেখতেই চাইছে না তা ও মুখ ফুটে কী ভাষায় বলবে? ওকে যে প্রায় ঘাড় ধাক্কা দিয়েই তাড়িয়ে দিয়েছে তা জ্যোতি বলতে পারবে না। ওদের জন্ম নিয়ে যে ভাষায় সে মতবাদ ওকে জানিয়েছে, তা ওদের কেন, কাউকে সে বলতে পারবে না। ওর শিক্ষা-রুচিতে বাধবে। কোনও মা সে নিজের সন্তানের জন্ম সম্পর্কে ওই রকম 'ঘটনাচক্রের' কথা বলতে পারে তাও তার জানা ছিল না। সেটা তার মুখের ওপর তার স্ত্রীই তার সন্তানদের সম্পর্কে এভাবে বলবে তা সে স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি। সে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। তবু সে ধৈর্য ধরে প্রায় আত্মসমর্পণ করেছিল। ভেবেছিল অতিরিক্ত নরম হলে যদি তার স্ত্রীর মন পরিবর্তন হয়। তাহলে অন্তত তার দুটো ছেলে তাদের মাকে ফিরে পাবে। কোনও কিছুই কার্যকরী হয়নি। বরং অসম্ভব ধরনের কটু কথা বলে তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে। উপায়ান্তর না দেখে বাধ্য হয়ে জ্যোতি তাই ওদের মিথ্যা কথা বলল, "না দেখা হয়নি।"

জ্যোতির কথা শুনে ওর দুই শিশুপুত্রের লাল টুকটুকে ফর্সা মুখ দুটো ফ্যাকাশে হয়ে গেল। ওরা দু'জনে খুব আনন্দ করতে করতে লন্ডন থেকে কলকাতায় এসেছে, মাকে পাবে বলে। অথচ দু'দিন হয়ে গেল তবু তারা তাদের মাকে দেখতেই পেল না। জ্যোতি ওদের নিজের কাছে টেনে আদর করতে লাগল। ওদের জন্য বুকটা ফেটে যেতে লাগল। মনে মনে ঠিক করল, সে একটা শেষ চেষ্টা করবে। ওদের মাকে ফিরিয়ে দিতে।

ঠিক তো করল যে, সে একটা শেষ চেষ্টা করবে। কিন্তু কী উপায়ে তা ভেবে পাচ্ছে না। ও ওর স্ত্রীর যে রকম একগুঁয়ে আচরণ দেখে এল তাতে সে বুঝে গেছে, শুধু কথা বলে তাকে সে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না। অন্য কোনও পথে ওকে বুঝিয়ে নিয়ে যেতে হবে। পথটা কী হবে, কে বলে দিতে পারবে?

জ্যোতির ভগ্নিপতি জ্যোতির বন্ধু। সে এবং ওর পরিবারের সব সদস্যই সব কিছু জানে। তারা ভেবেছিল, জ্যোতি এলে, স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে যেটুকু মনোমালিন্য দু'জনের মধ্যে হয়েছে তা ঠিক সমাধান করে ওরা আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে গিয়ে সুখের সংসার করবে। জ্যোতিরও মনে মনে

আশা ছিল, সে ঠিক ওর স্ত্রীর মন ভুলিয়ে দিতে পারবে। আবার ওরা মিলে যাবে। কিন্তু হাজরার হোস্টেলে সাক্ষাতের ধাক্কায় জ্যোতি বুঝে গেছে ভবী ভুলবার নয়। আর একটা জিনিসও সে বুঝে গেছে, যে সব ঠুনকো অভিযোগ ওর বিরুদ্ধে ওর স্ত্রী করছে, শুধু সেই কারণে ও এইরকম একগুঁয়ে হয়নি এবং সেই সব ভিত্তিহীন অভিযোগের জন্য সে কলকাতায় থাকার সিদ্ধান্ত নেয়নি। অন্য কারণ আছে। কারণ, যে সব অভিযোগ ওর স্ত্রী ওকে শোনাল, সেই সব অভিযোগ প্রায় প্রতি ঘরে স্ত্রীরা স্বামীর বিরুদ্ধে করে থাকে। ওর মা ওর বাবাকে প্রায়ই এসব কথা বলতেন, বাবা মাছি তাড়ানোর ভঙ্গিতে ওই সব অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে হাসতেন। তারপর মা যেন কোনও কথাই বলেননি, এমন ভাব করে নিজের কাজে মনোনিবেশ করতেন। সুতরাং জ্যোতি ওর স্ত্রীর অভিযোগগুলোকে কোনও গুরুত্বই দিল না। কিন্তু সেই অন্য কী কারণ আছে? তার উত্তর জ্যোতির কাছে নেই।

জ্যোতি ওর স্ত্রীর সঙ্গে বিফল সাক্ষাতের বিস্তারিত বিবরণ ওর ভগ্নিপতিকে জানাল। ওর স্ত্রীর আচরণ সম্পর্কেও ও কোনও কথাই গোপন করল না।

ভগ্নিপতি সব কথা শুনল। চুপ করে রইল। তারপর জ্যোতিকে জিজ্ঞেস করল, "তুমি কী ভাবছ, কী করবে? ছেড়ে দেবে। না কি আবার চেষ্টা করবে?"

জ্যোতি বলল, "নতুন করে ছেড়ে দেওয়ার কী আছে, ছাড়াই তো আছে। আমি চাইছি আমার ছেলেরা ওদের মাকে ফিরে পাক। সেই জন্যই আমার এখানে ছুটে আসা। আর একটা কারণও আমার আছে। সেটা অবশ্য গুরুত্বপূর্ণ নয়, আমার ব্যক্তিগত। সেটা হলো, কী আকর্ষণে ও মিথ্যা কথা বলে ও কলকাতায় চলে এল, সেটা জানা। মাকে দেখব বলে এসেছিল, অথচ এখানে এসে দেখলাম ও মায়ের কাছেই থাকে না, হোস্টেলে থাকে, খুব সম্ভবত কোনও একটা জায়গায় চাকরি-বাকরি কিছু একটা করে। লন্ডনের সুখের জীবন ছেড়ে ওকে কলকাতায় চাকরির জীবন কী এমন আনন্দ দিল সেটাও জানতে ইচ্ছে করছে।"

"হুঁ। তবে তোমার কাজটা যে সহজে হবে না সেটা তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ। তোমার কথাতেই আমি বুঝেছি ও কিছুতেই ভাঙ্গবে না। ওর এই আচরণ ওর মা'র ভাল লাগেনি বলে তিনি প্রতিবাদ করেছিলেন। তাই ও মা'র সম্পর্ক ছেড়ে এখন হোস্টেলে থাকে। শুধু চাকরি করলে ও মা'র কাছেও থাকতে পারত। ব্যাপারটার অন্যদিক আছে। সেটা জানার

দরকার। তুমি কী ভাবছ, বল।" ভগ্নিপতি ওর মতামত জানিয়ে জ্যোতির মুখের দিকে উত্তরের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

জ্যোতি বলল, "ঠিকই বলেছ। তুমি যেটা ভাল বোঝ সেটাই কর। আমি তো এখন কলকাতার কাউকে চিনি না। কার সাহায্য নেব, কী করব আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। কী আর বলব, আমার ভাল লাগছে না। চেষ্টা কর, না হলে তুমি আর কী করবে।"

জ্যোতি আর হতাশা চেপে রাখল না। ভগ্নিপতিই বলল, "দেখ, আমি একটা কথা ভাবছি। তুমি বললে আমি সেই রাস্তায় যেতে পারি।" জ্যোতি জানতে চাইল, "কোন রাস্তায়? তোমার যদি মনে হয় ভাল হবে, তবে আমার আপত্তি থাকবে কেন। আমি চাই মীমাংসা। সেটা যেভাবেই হোক।"

"তবে শোন, গোয়েন্দা দফতরের ডিসি দেবী রায় আমার বিশেষ পরিচিত। ওকে বললে, তিনি আমাদের সাহায্য করতে পারেন। চল, কাল যাই। উনি কী বলেন শুনি। তারপর আমরা দেখব, কী করা যায়।" ভগ্নিপতি বলল।

জ্যোতি ভগ্নিপতির কথায় সামান্য উৎসাহিত হলো। বলল, "ঠিক আছে, কালই চল। ওরা চাইলে ব্যাপারটার একটা নিষ্পত্তি হতে পারে।"

ওদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরদিন দুপুরেই জ্যোতি আর ওর ভগ্নিপতি লালবাজারে এল। দেবীবাবুর সঙ্গে দেখা করে সবিস্তারে সব কথা জানাল। দেবীবাবু শুনলেন। বললেন, "দেখুন এটা তো কোনও মামলা নয়, এইসব সমস্যার সমাধান করতে গেলে অবস্থা অনুযায়ী চলতে হবে, কতদূর কী হবে জানি না। তবে আমি একটা অফিসারকে আপনাদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিচ্ছি, ওকে সব বলুন, আমি আশা করছি ও একটা ব্যবস্থা করতে পারবে।"

এরপর দেবীবাবু ওর চেম্বারে আমাকে ডেকে পাঠালেন। জ্যোতি ও ওর ভগ্নিপতিকে দেখিয়ে বললেন, "এরা আমার খুবই পরিচিত লোক। আপনজন। একটা সমস্যায় পড়েছে। তুমি ওদের কথা শোন। তারপর একটা ব্যবস্থা কর।"

আর কিছু বলে দিতে হবে না। দেবীবাবু এভাবেই নির্দেশ দিতেন। আমি জ্যোতি ও ওর ভগ্নিপতিকে নিয়ে আমার ঘরে এসে বসলাম। জ্যোতি এবার ওর সমস্যার কথা আমাকে জানাল।

সব শুনে আমি ওর শাশুড়ির বাড়ির ও হাজরার হোস্টেলের ঠিকানাটা লিখে নিয়ে বললাম, "আমি জানাব। আপনারা আমার সঙ্গে দু'দিন পর এসময়ই দেখা করবেন। দেখি কী করতে পারি।" ওরা চলে গেলে, আমি চিন্তা করতে লাগলাম কী উপায়ে জট ছাড়াব।

পরদিন সকালে আমি একাই জ্যোতির শাশুড়ির সঙ্গে দেখা করতে ওঁর ভবানীপুরের বাড়ি গেলাম। জ্যোতির কথাতেই বুঝেছি, তিনিই বলতে পারবেন কী কারণে ওঁর মেয়ে লন্ডন ছেড়ে কলকাতায় থাকার সিদ্ধান্তে অনড়। পাঁচ দশ বছর দাম্পত্য জীবনযাপন করে বিচ্ছেদ হওয়াটা এমন কোনও আশ্চর্যজনক ঘটনা নয়। অসংখ্য দম্পতির বিচ্ছেদ হয়েছে। কিন্তু তার পেছনে পরস্পরের প্রতি সুনির্দিষ্ট অভিযোগ থাকে। এখানে আপাতভাবে কোনও অভিযোগ ছাড়াই জ্যোতির স্ত্রী ছ'বছর দাম্পত্য জীবন কাটিয়ে হঠাৎ বিচ্ছেদ চাইছে। কেন? সবটাই ওর মা'র থেকে প্রথমে আমার জানা দরকার। জ্যোতির স্ত্রী আমাকে বলবে না।

জ্যোতির শাশুড়ির সঙ্গে প্রাথমিক আলাপ পরিচয়ের পর আমি জিজ্ঞেস করলাম, "দেখুন, আমি এসেছি ওদের আবার মিলিয়ে দিতে। আপনিও তাই চান। আমি তাই আশা করি আমার কাছে আপনি কিছুই গোপন করবেন না। গোপন করলে আমি সফল হতে পারব না। আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন।"

উনি বললেন, "না-না, গোপন করব কেন? গোপন করার কীই বা আছে? আপনি জিজ্ঞেস করুন, আমি যা জানি অবশ্যই বলব।"

আমি সরাসরি প্রশ্ন রাখলাম, "আপনার কী মনে হয়, কী কারণে আপনার মেয়ে ওর স্বামী ছেলেদের ছেড়ে কলকাতায় থাকার জন্য পড়ে রইল?"

উনি আমার প্রশ্ন শুনে সামান্য সময় নিলেন, তারপর বললেন, "দেখুন, আমি যে কথাটা জ্যোতিকে বলতে পারিনি, সেটাই আপনাকে জানাচ্ছি। পলাশ নামে একটা ছেলের সঙ্গে ওর বিয়ের আগে থেকে আলাপ। ওকেই বিয়ে করতে চেয়েছিল। ওর বাবা অবশ্য জানতেন না। ও শুধু আমাকে বলেছিল। আমি কোনও মতামত জানাইনি। তারপর জ্যোতির মতো একটা ভাল ছেলে পাওয়ার পর আমরা বিয়ে দিয়ে দিই। আমি ভেবেছিলাম, বিয়ে হয়ে গেলে, দু'চার বছর সংসার করলে, ছেলেপুলের মা হলে ওসব ও ভুলে যাবে। কত মেয়ের জীবনেই তো বিয়ের আগে ছেলেদের সঙ্গে সম্পর্ক থাকে। অন্য জায়গায় বিয়ে হলে সেটাই মেনে নেয়, আগেকার কথা নিয়ে মাথা ঘামায় না। এখানেই আমার ভুল হয়েছিল, আমি বুঝতে পারিনি যে ও পলাশকে ভুলতে পারেনি। পলাশও ওকে ভুলতে পারেনি। ও এতদিন বিয়েও করেনি। আমার মনে হয় ওদের মধ্যে চিঠিপত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ বোধহয় ছিল। নয়ত এতদিন পর এভাবে পাগলের মতো মেতে উঠতে পারে না। বিশেষ করে নিজে দুটো ছেলের মা হয়ে। এখানে এসেই

ওরা নিজেরা আবার মিশতে শুরু করল। আমি বারণ করলাম। শুনল না। আমার বাড়ি ছেড়ে হোস্টেলে গিয়ে উঠল। ওদের ইচ্ছা ওরা বিয়ে করবে। কী যে অশান্তি!" হঠাৎ থেমে গেলেন। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথা নামিয়ে নিলেন।

খুবই সুন্দরী ছিলেন। হীরালাল এমনি এমনি ওকে রক্ষিতা রাখেননি। প্রায় পঞ্চান্ন ছাপ্পান্ন বছর বয়সেও ত্বক বেশ টানটান। কী যুক্তিতে বিয়ে-থা না করে হীরালালের রক্ষিতা হয়ে রইলেন তা উনিই জানেন। সেই কাহিনী জানার জন্য অবশ্য আমি আসিনি। তবে মনে মনে একটা কৌতূহল আছে বৈকি। কিন্তু সেটা জানার উপায় নেই।

প্রশ্ন করলাম, "ওই পলাশ নামের ছেলেটা কোথায় থাকে, কী করে?"

উনি বললেন, "পলাশ কালীঘাটে থাকে। ওর মা আবার তন্ত্রসাধিকা। তন্ত্রসাধনা করেই ছেলেকে বড় করেছেন। পলাশ চাকরি করে ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সে। কী আপদ, একটা মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে, তাও ওর পেছন ছাড়ে না। ভাবি ওকে একবার বলি, তুই একটু যদি সমঝে চলতিস, তবে তো এমন একটা কাণ্ড হতো না।"

বলতে পারতাম, 'আপনার মেয়েও তো সমঝে চললে এমন হতো না।' বললাম না। বললাম, "কালীঘাটের ঠিক কোন জায়গায় থাকে?"

উনি জানালেন, "মন্দিরের আশেপাশেই। আমি ঠিক বাড়িটা চিনি না। আপনারা পুলিশ। আপনারা ঠিক বের করে নিতে পারবেন।"

পারব। নাম, চাকরিস্থল, তন্ত্রসাধিকার ছেলে। অনেক সূত্র পেয়ে গেছি। কালীঘাটে আমার বহু পরিচিত পাণ্ডা ও সোর্স আছে। তাদের এতগুলি তথ্য দিলে এক দু'ঘণ্টার মধ্যে ওরা আমাকে বিস্তৃতভাবে জানিয়ে দেবে। ওনার কাছ থেকে পেয়ে গেলে আমাকে আর ওদের সাহায্য নেওয়ার দরকার হতো না।

মোটামুটি যা জানার জেনে নিয়েছি। দরকার হলে আবার আসা যাবে। আমি উঠে দাঁড়িয়ে জ্যোতির শাশুড়িকে বললাম, "আজ আসি। প্রয়োজন হলে আবার আসব।"

উনিও দাঁড়ালেন। বললেন, "ঠিক আছে। আমি আর কী বলব। দেখুন, ওদের মিলিয়ে দিতে পারেন কিনা। ওটা হলে আমার চেয়ে আর কেউ বেশি খুশি হবে না। এরকম চললে আমি মরেও শান্তি পাব না।"

আমি কোনও উত্তর দিলাম না। একটু হাসলাম। রাস্তায় নামলাম। কালীঘাটের দিকে গাড়ি ছুটিয়ে দিলাম।

কালীঘাটের হালদার বাড়ির এক পরিচিত পাণ্ডাকে ধরে আমি তাকে পলাশের নাম, চাকরিস্থল ও তন্ত্রসাধিকার খোঁজ নিতে বললাম। সে আমাকে বলল, "চিনি। তবুও ভালভাবে জেনে নিই। আমি বিকেলের মধ্যে সব জানিয়ে দেব।"

ঘড়ি দেখলাম। দুপুর একটা। এখন জ্যোতির স্ত্রীকে ওর হোটেলে পাওয়া যাবে না। ফিরে এলাম লালবাজারে। বিকেলের আগে নতুন কোনও অগ্রগতি হবে না। পলাশের খবরটা পেলে ওর বক্তব্যটা জানতে পারব।

বিকেল পর্যন্ত আমাকে অপেক্ষা করতে হলো না। পাণ্ডা পুজো ছেড়ে একেবারে লালবাজারে এসে হাজির। পলাশের সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য জানিয়ে ও বিদায় নিল। সন্ধে আটটার পর ও বাড়ি ফেরে। অর্থাৎ জ্যোতির স্ত্রী আর ও প্রেম সেরে যে যার আস্তানায় ফিরে যায়। মশগুল থাকে নিশ্চয়ই। পুরনো প্রেম নতুন করে শুরু হলে গভীর হয় বেশি। এদের ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম হবে না নিশ্চয়ই। কতদূর গভীর, আর সেই গভীরের শেকড় উপড়ে আমাকে ওদের পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে।

রাত আটটার পর কালীঘাটে পৌঁছলাম। আমার পাণ্ডাদূত ঠিক দাঁড়িয়ে আছে। সে আমাকে পলাশের মা'র তন্ত্রসাধনার আখড়া দেখিয়ে চলে গেল। ওই আখড়া চালিয়েই পলাশের মা পলাশকে বড় করেছে। অর্থাৎ দীর্ঘদিনের এই কারবার। আর ওই তন্ত্র এবং তান্ত্রিকের অলৌকিক পরিবেশে পলাশ বড় হয়েছে।

আমি ওদের পুরনো আমলের একটা বাড়িতে গেলাম। পলাশের খোঁজ করতে বেরিয়ে এল ওর জটাধারী কালো পাড়ের থান কাপড় পরিহিত মহিলা। সম্ভবত পলাশের মা। কালীসাধিকা পলাশের মায়ের গায়ের রঙটাও কালোই। চোখ দুটো অবশ্য অন্য তন্ত্রসাধক সাধিকাদের মতই লাল। তন্ত্র সাধনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান চাইতে যে সব সাহায্যপ্রার্থীরা ওঁর কাছে আসে, সেই রকম কোনও এক সাহায্যপ্রার্থী হিসাবেই তিনি আমাকে ভেবে বললেন, "এখন তো আমি কিছু শুনি না। কাল সকালে আসবি।"

হিন্দুধর্মের এইসব তন্ত্রসাধক, সাধিকা বা সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসীনিদের আচরণ প্রতিক্ষেত্রে প্রায় এক। অচেনা, অজানা, বয়সের কোনও হেরফের না দেখেই ওরা প্রত্যেক ব্যক্তিকে 'তুই' বলে সম্বোধন করবে। এটা খুব সম্ভবত প্রথমেই ওরা বোঝাতে চায় যেহেতু ওরা সরাসরি 'ঈশ্বরের প্রতিনিধি' সেজন্য ওরা কোনও ব্যক্তিবিশেষকে বয়সের মাপকাঠিতে মাপে না। ওদের কাছে সবাই 'সন্তান'। দ্বিতীয় কারণটা বোধহয়, 'তুই' সম্বোধন করে একেবারে আপনজন করে সাহায্যপ্রার্থীর সমস্যার সমাধান করাটা ওর নিজের ব্যাপার করে নেওয়ার একটা আপাতত প্রেরণা দেখানো।

পলাশের মাও আমার ক্ষেত্রে একইভাবে আচরণ করলেন। আমি বললাম, "না, আমি আপনার কাছে আসিনি। আমি পলাশবাবুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।" আমাদের কথাবার্তার মধ্যেই একটা চৌত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছরের লম্বা, কালো, রোগা যুবক কৌতূহল নিয়ে এসে হাজির। আমার মন বলল, 'এই হচ্ছে পলাশ।'

পলাশের মা বললেন, "ও।" তারপর দ্রুত ওই যুবকটির দিকে ফিরে বললেন, "এই তোর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।" চলে গেলেন।

পলাশ আমার দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, "আমি তো আপনাকে ঠিক চিনতে পারলাম না। মানে, কোথ থেকে এসেছেন?"

বললাম, "লালবাজার থেকে। আপনার সঙ্গে কিছু ব্যক্তিগত কথাবার্তা ছিল। সেটা কী এখানেই বলব? না কি একটু বাইরে যাবেন?"

লালবাজার থেকে এসেছি শুনে অজানা একটা আতঙ্ক কি ওর মনের গভীরে ঘাই মেরেছে? তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "না, না, বাইরের কিছু নেই, এখানেই বলুন না।" দু'জনে পাশাপাশি দুটো পুরনো দিনের হাতলওয়ালা কালো চেয়ারে বসলাম।

আমি কোনও ভণিতা না করে জ্যোতির স্ত্রীর নাম করে বললাম, "দেখুন, ওকে আপনি ভালবাসেন। আপনার জন্য ওদের সংসার ভেঙ্গে যাচ্ছে। এই ব্যাপারটা আপনি শেষ পর্যন্ত কী ভেবেছেন? মানে এর পরিণতিটা কী?"

আমার থেকে একেবারে ওর হৃদয়ের অন্দরমহলের কথা শুনতে হবে এমনটা ও বোধহয় আন্দাজ করতে পারেনি। শুনে, খানিকটা ধাক্কা খেল। চালাক ছেলে, সামলে নিল। বলল, "এ ব্যাপারে আমাদের আর নতুন করে কিছু বলার নেই। আমরা বিয়ে করব।" থামল, সামান্য হাসল। বলল, "ওরা এখন আবার পুলিশ লাগিয়েছে।"

আমি বললাম, "বিয়ে করবেন কী করে, ডিভোর্সই তো হয়নি। হবেও না। তাছাড়া অন্যের স্ত্রীকে, দুই ছেলের মা'কে আপনি বিয়ে করতে যাবেন কেন, আপনি তো অন্য সুন্দরী পাত্রী এমনিই পেয়ে যাবেন। সেটাই ভাল নয় কী?"

"এটা আমার নিজের ব্যাপার। একদম ব্যক্তিগত। আমরা যদি এতেই সুখী হই তবে অন্যদের আপত্তি থাকার কী আছে।"

"আপত্তি থাকার কারণ ছিল না। যেহেতু একজন বিবাহিত। আপনার জন্য দুটো বাচ্চা মা-হারা হয়ে যাচ্ছে। ওদের কী দোষ। তাছাড়া এভাবে কী আপনারা সুখী হবেন? কী মনে হয় আপনার?"

পলাশ চুপ করে রইল সামান্য। বলল, "বাচ্চারা ওদের বাবার কাছে থাকবে, ভালই থাকবে। অনেকের তো মা মারা যায়। ওরা কী বড় হয় না? তাই হবে।"

"বা, সুন্দর সমাধান, মা থেকেও মা-হারা। ওরা ধরে নেবে ওদের মা মারা গেছে। দেখুন, আপনি পিছিয়ে এলে ভাল হতো। বলুন, কী করবেন? সেটাই আমি পরিষ্কার ভাবে জানতে এসেছি।" বললাম।

"পিছিয়ে আসার প্রশ্নই নেই। আর আমি পিছিয়ে এলেও ও পিছবে না। এটা জেনে রাখুন। আর আমিও পিছুব না। জ্যোতি তো ডিভোর্স করে আর একটা বিয়ে করতে পারে। তাতেও সমাধান হতে পারে।"

"ব্যাপারটা নিয়ে অযথা জল ঘোলা করছেন। আমি আগামিকাল আবার আসব, আপনার শেষ মতামতটা জেনে নেব। আপনি আজ চিন্তা করুন।" উঠে দাঁড়ালাম।

পলাশও উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, "আমার চিন্তা করার কিছু নেই। মতামতের কোনও পরিবর্তন হবে না। আপনাকেও আর কষ্ট করে আসতে হবে না। দয়া করে আমাকে ডিসটার্ব করবেন না। যে ভাবেই হোক আমরা বিয়ে করবই।"

আমি বেরিয়ে আসতে আসতে জিজ্ঞেস করলাম, "এটাই কী আপনার শেষ কথা?" পলাশ বেশ প্রত্যয়ের সঙ্গে জবাব দিল, "হ্যাঁ।"

লালবাজারে ফিরে আসতে আসতে ভাবলাম, 'না। সোজা আঙুলে এখানে ঘি উঠবে না। বেঁকাতেই হবে। ওরা দু'জনেই এখন বেপরোয়া। যা হয় হবে এই মনোভাব নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। একজনের স্ত্রী, ছ'বছর ঘর করার পর সেই মহিলাকে পেতেই পলাশ উগ্র হয়ে গেছে। বিচিত্র প্রেম। এই ধরনের প্রেমেই টান থাকে বেশি। উজানে যেতে কোনও ঝড়কেই তোয়াক্কা করে না।' দেখা যাক কী হয়। ঠিক করলাম, জ্যোতির স্ত্রীর সঙ্গেও একবার কথা বলতে হবে। এবং সেটা আগামিকালই। পলাশের সঙ্গে ওর দেখা হওয়ার আগেই আমি ওর মনোভাবটা বোঝার চেষ্টা করব। হোস্টেল থেকে সকালে বের হওয়ার আগেই আমি পৌঁছে যাব।

পরদিন সকালে হাজরায় হোস্টেল খুঁজে বার করতে আমার অসুবিধা হলো না। সকাল আটটায় হোস্টেলের ঘুম বোধহয় তখনও ভালভাবে ভাঙেনি। সদর দরজাটা অল্প ফাঁক করা, বোঝা যায় কেউ বেরিয়েছে, তাই খোলা। আমি সেই দরজা ঠেলে ঢুকে গেলাম। কেউ নেই। কাকে জিজ্ঞেস করব, কাকে বলব, জ্যোতির স্ত্রীকে ডেকে দিতে?

কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে একটা মনুষ্যপ্রাণীর জন্য, যাকে আমি

আমার ইচ্ছেটা প্রকাশ করতে পারি? কি পেয়েছে এই নারী, যে লন্ডনের নিশ্চিত আরাম ছেড়ে এমন একটা নিম্ন মধ্যবিত্ত হোস্টেলে এসে আশ্রয় নিয়েছে। সুখের সন্ধানে কে যে কোথায় আশ্রয় নেয়, সারাজীবন ধরে চেষ্টা করেও তার মীমাংসা সূত্র খুঁজে পাব না।

পেছন থেকে একটা পুরুষ গলার আওয়াজ, "কাকে চাই?" ফিরে তাকালাম। একটা অল্পবয়স্ক যুবক, বাজার সেরে হোস্টেলে ফিরছে। দু'হাতে দুটো বড় বড় চটের থলি। বাজারের। আমার মুক্তির দূতকে জ্যোতির স্ত্রীর নামটা বললাম। যুবকটি একটা ছোট ঘর দেখিয়ে বলল, "ওখানে বসুন আমি ডেকে দিচ্ছি।" যুবকটির বোধহয় খুব তাড়া আছে। সে আমাকে বলেই হনহনিয়ে ভেতরের দিকে চলে গেল।

আমি ওই ছোট ঘরের একটা চেয়ারে গিয়ে বসলাম। অপেক্ষা করতে হবে। কি নিয়ে সময় কাটাব? ওই ঘরের কোণে একটা ছোট্ট টেবিল, তার ওপর শতছিন্ন কটা পুরনো ম্যাগাজিন পড়ে আছে। অগত্যা সঙ্গী হিসাবে তারই একটার পৃষ্ঠা চোখের সামনে মেলে ধরলাম। যদিও চোখ ম্যাগাজিনের দিকে, মন কিন্তু ঘরের দরজার ওপর দাঁড়িয়ে আছে এক মহিলার জন্য।

ঘড়ি দেখিনি। মিনিট দশেক পর সে এল। চেয়ারে বসে আমার টাল সামলানো দায়। পলাশ কোন ছাড়। এর চোখের দু'পাতার ভেতর দিয়ে বহু আচ্ছা আচ্ছা পুরুষ ঢুকে যাওয়ার জন্য মানত করবে। কে বলবে এই মহিলা বিবাহিত এবং এর গর্ভে দুটো যমজ সন্তান জন্ম নিয়েছে। সেই সংবাদে, দুত্তোর বলে পাশ কাটিয়ে বহু নাক উঁচু পুরুষ ওর পায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়বে। সকালেই স্নান সারা। কাঁধ থেকে নিচের দিকে কালো চুল পিঠ জুড়ে এলিয়ে পড়েছে। কানে একটা ছোট দুল ছাড়া সারা শরীরে কোনও অলংকার নেই, প্রসাধনের ছোঁয়াও স্নানের পর পড়েনি। মেদহীন উদ্যত শরীর টানটান করে যেভাবে আমার সামনে এসে দাঁড়াল, তাতে মনে হলো জ্যোতিরও দোষ নেই। এমন স্ত্রী হাতছাড়া হতে দেখলে লন্ডন কেন অন্য গ্রহ থেকেও সরাসরি এসে তা থামানোর চেষ্টা করতেই পারে যে কোনও লোক। কিন্তু ভেবে কোনও যুক্তি খুঁজে পাচ্ছি না, পলাশের মধ্যে এমন কোন রঙ খুঁজে পেল সে যে তাতে মজে গেল। পলাশই বা কোন জাদুমন্ত্রে একে পাগল করেছে? পলাশের থেকে জ্যোতি সর্বাংশে অনেক উচ্চস্থানীয়। শুধু তাই নয়, এই মহিলার জীবনে বহু পুরুষই যে এসেছে, সেটা জানতে কোনও জ্যোতিষীর দরকার নেই। তা সেই সব পুরুষকে তাড়িয়ে সে পলাশে তরী ভেড়ালো কেন তাও বোধগম্য হলো না।

"আপনি কী আমার কাছে এসেছেন?" অচেনা পুরুষকে যেভাবে এই পরিস্থিতিতে প্রশ্ন করতে হয় ঠিক তেমন ভারসাম্য গলার আওয়াজে। আমি ওর নামটা বলে জানতে চাইলাম, "আপনিই কী সেই? তাহলে আমি তার কাছেই এসেছি।"

"হ্যাঁ, ওটাই আমার নাম, বলুন কী জন্যে এসেছেন, আপনাকে তো আমি চিনতে পারছি না।" কথা বলতে বলতে জ্যোতির স্ত্রীর ভ্রু জোড়া কপালের ওপর পরস্পরের কাছাকাছি সামান্য এগিয়ে এল।

"আমাকে না চেনাটাই স্বাভাবিক। আমি লালবাজার থেকে এসেছি আপনাকে একটা অনুরোধ করতে।" ওর মাতাল করা চোখের দিকে তাকিয়ে বললাম। সুন্দরীরা সবাই সুন্দর সচেতন হয়, ও কতটা সচেতন বুঝতে পারলাম না। ওর প্রতিটা অঙ্গ সঞ্চালনই পুরুষকে বধ করার মতো ওজনদার তা কি ও জানে?

চোখ দুটো হঠাৎ অবাক। ভ্রু দুটো আরও কাছাকাছি। বলল, "লালবাজার থেকে, আমার কাছে? অনুরোধ করতে! আমি তো এমন কিছু করিনি!" ভণিতা করে লাভ নেই, যে কাজের জন্য এসেছি তা বলে দিলাম, "আমাদের অনুরোধ আপনি জ্যোতিবাবুর সঙ্গে লন্ডনে ফিরে যান, আপনাদের মধ্যে কোনও মতপার্থক্য হয়ে থাকলে দু'জনে বসে মিটিয়ে নিন। আপনার ছেলেরাও আপনাকে ফিরে পাবে।"

আমার কথা শুনতে শুনতে ওর মুখ চোখ লাল হতে লাগল। তারপর বলল, "ছিঃ, জ্যোতি এতটা নিচে নেমেছে যে সে লন্ডন থেকে এসে আমার নামে লালবাজারে নালিশ করেছে। ওকে বলে দেবেন, ও যতই চেষ্টা করুক আমি আর ওর সঙ্গে ফিরে যাব না।"

"কিন্তু কেন? তা কি আমি সামান্য হলেও জানতে পারি। অবশ্য এটা আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার, আপনি বলবেন কি বলবেন না আপনিই জানেন। তাছাড়া আপনার শিশুসন্তানদের কথাটাও চিন্তা করবেন না?"

"ছেলেরা ওর। দরকার হলে ও আর একটা বিয়ে করে নিক না। কে আপত্তি করছে? আমি তো পরিষ্কার বলেই দিয়েছি।" সোজাসুজি বলল।

মা তার সন্তানদের প্রায় অস্বীকারই করছে, এমন অভিজ্ঞতা আমার আগে হয়নি। প্রেমের কি টান! পেছনের জীবনের সব শিকড় তুলে ছুঁড়ে ফেলে কামনায় ধেয়ে চলেছে। সেখানে সন্তান, স্বামী, মা সব তুচ্ছ। এটা প্রেম না পাগলামি? ভাবলাম একটা হাতুড়ির ঘা মেরে দেখি।

বললাম, "এতে কি ভাল হবে? আপনার চেয়ে পলাশের ক্ষতি হয়ে যাবে বেশি। এটা আপনি ভেবে দেখেছেন?" আমার হাতুড়ির আঘাতে

মুহূর্তের জন্য জ্যোতির স্ত্রীর মুখের আলগা হাসিটা মিলিয়ে গেল। মুহূর্তের জন্যই। সেটা ফিরে এল আরও বেশি সপ্রতিভ ভাবে। এই মহিলা যে অভিনয়ে দারুণ দক্ষ ওর এই হাসি নিয়ে খেলা দেখলেই বোঝা যায়। কতটা পরিমাপে হেসে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে হয় ওর ঠোঁট জানে। অনায়াসেই তা নিয়ে প্রায় ছেলেখেলা করে।

হাসি ছড়িয়েই বলল, "হোক, তা পলাশ ও আমি বুঝে নেব। খুন তো কেউ করবে না। ওকে বলুন, আমার কোনও দাবি নেই। ও ডিভোর্স করে চলে যাক। দু'জনেরই এতে লাভ।" থামল। "শুনুন, আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে। আমি যাব। আপনার অনুরোধ আমি রাখতে পারলাম না। মাপ করবেন।" শেষ কথাগুলো বেশ জোরের সঙ্গেই বলে আমাদের আলোচনার পথ বন্ধ করে দিল।

না। এর সঙ্গে আর নতুন করে কথা বলে লাভ নেই। অন্য পথ দেখতে হবে। স্থির করলাম। "ঠিক আছে, আপনার মর্জি। আমি চলি।" আমি ওকে প্রায় সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করে বেরিয়ে এলাম। লালবাজারে ফিরতে ফিরতে ঠিক করলাম, 'এই মহিলাকে আমি লালবাজারে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ওর প্রেমের তেজ আলগা করে ছাড়ব।'

দেবীবাবুকে কিছু জানালাম না। অগ্রগতি তো কিছুই হয়নি। পলাশ ও জ্যোতির স্ত্রীর মনোভাবটা জেনে এসেছি। শুধু কথাতে কিছু হবে না। মোটামুটি অনুমান করেছিলাম। ওদের বাঁকা পথ দেখাতে হবে। কি সেই পথ, সেটা দেখানোর আগে দেবীবাবুকে জানিয়ে রাখব। তার আগে পথের ঠিকানাটা ঠিক করে নিই।

বড়বাজার থানায় যখন ছিলাম, তখন ওই অঞ্চলের এক অ্যাডভোকেটের সঙ্গে আমার খুবই ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছিল। সেই অ্যাডভোকেট শ্যাম শুক্লাকে আমার প্রয়োজন। কারণ যে পথটা ঠিক করেছি তাতে ওর সাহায্যের দরকার। ওর সঙ্গে সোনাগাছির বহু যৌনকর্মীর যোগাযোগ আছে। এই নাটকে তাদের একজন আমার দরকার। সেদিনই আমি শ্যাম শুক্লাকে লালবাজারে ডেকে আমি আমার পুরো পরিকল্পনাটা ওকে বললাম। শ্যাম আমাকে সাহায্য করবে বলে চলে গেল। এবং পরদিনই সে একটা অল্পবয়সী যৌনকর্মীকে সঙ্গে নিয়ে আমাকে বলল, "একে দিয়েই তোমার কাজ উদ্ধার হয়ে যাবে। ওর নাম সন্ধ্যা।"

ওকে দেখলাম। সাতাশ আটাশ বছরের যৌনকর্মীর গায়ের রঙটা ফর্সা। মুখ চোখও খারাপ নয়। আমি যে কাজের জন্য ওকে নিয়োগ করতে চাইছি তাতে চলে যাবে। ওকে বললাম, "দেখ সন্ধ্যা, তোমাকে একজনের

বৌ সাজতে হবে। তুমি বলবে, ওই লোকটা তোমাকে বিয়ে করেছে। ঘর করেছে। তারপর তোমার সোনাদানা নিয়ে পালিয়ে এসেছে। ব্যস, বাকি যা করার আমরা করব। এর জন্য তোমাকে আমরা পয়সা দেব। তুমি খালি অভিনয়টা ভাল করে করবে। ভাববে সত্যিই তোমাকে ওই লোকটা বিয়ে করেছিল।"

সন্ধ্যা আমার কথায় রাজি। বলল, "সে আপনি দেখে নেবেন স্যার, আমি ঠিক করে দেব।" যতক্ষণ কথা বলেনি, ভালই ছিল। গলার কর্কশতায় মালুম হলো ও কোন অঞ্চলের বাসিন্দা। পলাশকে ধরাশায়ী করতে এমন কর্কশতাই দরকার। এবার আমার ছক দেবীবাবুকে জানালাম।

পরদিন সকালেই শাঁখা সিঁদুর পরিয়ে সন্ধ্যাকে অভিযোগ ক্রমে সন্ধ্যার নামে পলাশের বিরুদ্ধে ব্যাঙ্কশাল কোর্টে নালিশ করলাম। ফৌজদারী মামলা। পলাশের বাড়ি তল্লাশি ও ওকে গ্রেফতার করার আদেশ পেয়ে গেলাম। বাঁকা পথের ঠিকানা। এই পথেই ওকে ঘা দিয়ে কাজ আদায় করতে হবে।

সেদিনই সন্ধেবেলায় পলাশের নামে গ্রেফতারী পরওয়ানা ও বাড়ি তল্লাশির আদেশ হাতে নিয়ে পলাশের 'স্ত্রী' সন্ধ্যাকে সঙ্গে করে আমি ক'জন কনস্টেবল সমেত ওর কালীঘাটের বাড়িতে হামলা করলাম।

পলাশের তন্ত্রসাধিকা মা আমাকে ও সঙ্গের কনস্টেবলদের দেখে অবাক। বললেন, "আপনি?" বললাম, "আপনার ছেলের কীর্তির জন্য আসতে হলো। তল্লাশি করব। স্ত্রীর গয়নাগাঁটি নিয়ে পালিয়ে এসেছে। ভরণপোষণও দেয় না।" এবার আরও অবাক, চোখ দুটো কপালে তুলে বললেন, "তার মানে, আমার ছেলে আবার কবে বিয়ে করল? কোথায় কাকে বিয়ে করল আমি জানব না।"

"সবই কি আপনাকে জানিয়ে করে?" সন্ধ্যাকে দেখিয়ে বললাম, "এই যে আপনার বৌমা।" দক্ষিণেশ্বরে বিয়ে করেছিল। সব প্রমাণ আমার কাছে আছে। কোর্ট থেকে আদেশ নিয়ে এসেছি। এখন আমাদের কাজ করতে দিন। পলাশবাবু কই? দেখছি না। ও তো একটু আগে বাড়ি ফিরেছে।"

পলাশের মা বললেন, "আসছে। দোকানে গিয়েছে।" সন্ধ্যা আমার পাশেই দাঁড়িয়েছিল, সে এগিয়ে গিয়ে পলাশের মাকে ঢিপ করে একটা প্রণাম করে বলে উঠল, "কতদিন আমি বলেছি আপনার কাছে আমাকে নিয়ে আসতে, বাড়ি ছেড়ে কার বিয়ের পর অন্য জায়গায় থাকতে ভাল লাগে, বলুন? তো আমায় খালি বলত 'নিয়ে যাব, নিয়ে যাব'। কিন্তু নিজেরই তিন মাস ধরে পাত্তা নেই। আমার সব নিয়ে এসেছে।" সন্ধ্যার

কথায় পলাশের মা অবাক হওয়ার বদলে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েন। হতাশ হয়ে বলে উঠল, "কি জানি বাপু।"

ভেতরের ঘরে সন্ধ্যা, পলাশের মা ও দু'জন কনস্টেবলকে নিয়ে গেলাম। একটা পুরনো দিনের কাঠের আলমারির পাশে একটা ছোট স্টিলের সিন্দুক। পলাশের মাকে বললাম, "এই আলমারি দুটো খুলুন।" তিনি একটু ইতস্তত করে বললেন, "এখানে কারও কিছু নেই। সব আমার।" সামান্য গলা উঁচিয়ে বললাম, "সেটা দেখলেই বোঝা যাবে। সবাই একই কথা বলে। তারপর ইঁদুর বেরিয়ে পড়ে। খুলুন।" পলাশের মা প্রথমে কাঠের আলমারিটা খুলতে গেল। আমি বললাম, "ওটা পরে দেখব, আগে ওই স্টিলেরটা খুলুন।" আঁচলের চাবির গোছা থেকে একটা চাবি নিয়ে আমার নির্দেশ পালন করলেন। আমরা তল্লাশি শুরু করলাম, "প্রথমেই একটা বেশ ভারি বিছে হার।" সন্ধ্যা বলে উঠল, "এইতো এইতো, আমার মায়ের বিছে হারটা। কোথায় এনে রেখেছে।" পলাশের মা ওর কথা শুনে বলে উঠল, "কি বলছ, এটা কবেকার, আমার দিদিমার আমলের, তুমি বলছ, তোমার।" বললাম, "চুপ করুন। কোর্টে প্রমাণ করবেন। বিছে হারটা বাজেয়াপ্ত করলাম। এবার একে একে বের হতে লাগল, বালা, চুড়, আংটি, টিকলি। এক একটা সোনার জিনিস বের হচ্ছে আর সন্ধ্যা চিৎকার করে বলছে, "এইতো, এইতো আমার বালা জোড়া, টিকলি, চুড়।" আমরাও ওর কথা অনুযায়ী ওইগুলি বাজেয়াপ্ত করতে লাগলাম। পলাশের মা প্রতিবাদ করতে করতে হয়রান হয়ে পড়েছেন। তবু বলে যাচ্ছেন।

তল্লাশির মাঝেই পলাশ এসে উপস্থিত। আমাদের দেখে ওর মা'র উদ্দেশে বলল, "কি হয়েছে মা?" আমি সন্ধ্যাকে পলাশকে চিনিয়ে দেওয়ার জন্যই বলে উঠলাম, "এই যে পলাশবাবু এসে গেছেন। আপনার নামে গ্রেফতারী পরওয়ানা আছে। আপনি আর কোথাও যাবেন না। সেদিনই বললাম, বৌয়ের ভরণপোষণ দিন, ভালভাবে সংসার করুন, আপোষে সব মিটিয়ে নিন। তা করলেন না। এখন সেই আমাদের ছোটাছুটিতে ফেললেন।" পলাশ তখনও ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেননি, বলল, "আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। কোর্ট, তল্লাশি, বৌ।" সন্ধ্যা এবার আসরে নেমে বলল, "বুঝবে কি করে? মায়ের সামনে ভালমানুষ সাজা হচ্ছে, আমি সব বলে দিয়েছি, আমার সব মাল এনে এখানে রাখা হয়েছে। আমি নিয়ে যাচ্ছি।"

পলাশের বিস্ময়ের ঘোর এখনও কাটেনি। সন্ধ্যার দিকে তাকিয়ে বলল, "কে আপনি? আমি তো আপনাকে চিনিই না।" সন্ধ্যা পাকা অভিনেত্রীর মতো প্রায় কেঁদে ফেলে বলে উঠল, "এমা, একি গো, তুমি আমাকে

আপনি আপনি বলছ, বিয়ে করা বৌকে কেউ আপনি আজ্ঞে করে, কেউ শুনেছে?" সন্ধ্যার "স-স" উচ্চারণের মাত্রা কমানোর জন্য বলে উঠলাম, "ওইসব কোর্টে মীমাংসা হবে। নিজেদের কথা নিজেরা পরে বলবেন এখন আমাদের কাজ করতে দিন।" পলাশ এবার উগ্র চোখে আমার দিকে তাকাল। ও তো বুঝে গেছে এই সবই আমার কারসাজি। ওকে আমার কথা মেনে নেওয়ার জন্য উল্টো চাপ।

কাঠের আলমারিতে কিছু রুপোর জিনিস ছিল। ওগুলি আমরা ধরলাম না। সন্ধ্যাও কিছু বলল না। আমরা এবার যেখানে পলাশের মা তন্ত্র সাধনা করেন, সেখানে সিঁদুরে সিঁদুরে মাখা কালী প্রতিমা রাখা আছে, তার পাশে একটা ট্রাঙ্ক তল্লাশি করতে লাগলাম। সেখানেও ক'টা সোনার গহনা পাওয়া গেল। সন্ধ্যার কথায় সেগুলিও বাজেয়াপ্ত করলাম। পলাশের মা তখনও কেঁদে কেঁদে প্রতিবাদ করে যাচ্ছেন। পলাশকে বলছে, "এ সবই তোর জন্য, কোথায় কী করেছিস, আর এখন আমার মায়ের জিনিসগুলি ওরা সব নিয়ে যাচ্ছে।" পলাশ ওর মাকে শান্ত করার জন্য শুধু বলে যাচ্ছে, "তুমি চুপ কর, সবই ফেরৎ পাবে।"

প্রায় চল্লিশ ভরি সোনার গহনা নিয়ে আমরা পলাশকে গ্রেফতার করে ওর বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলাম। বাড়ির সামনে ততক্ষণে জমে গেছে প্রচুর ভিড়। ওই ভিড় থেকে পলাশের উদ্দেশে বিভিন্ন মন্তব্য ছুটে আসছে। কেউ বলছে, 'আমরা জানতাম ভাল ছেলে, কখন ডুবে ডুবে জল খেয়েছে।' কেউ বলছে, 'শালা দেখতে সবাই ভদ্দরলোক, এদিকে বৌ লুকিয়ে রেখে, তার গয়না নিয়ে পালিয়ে এসেছে, ছ্যাঃ ছ্যাঃ।' পলাশ ওর দু'কানে হাত দিয়ে আমাদের গাড়িতে বসে আছে। গাড়ি ছুটিয়ে দিলাম লালবাজারের দিকে। পলাশ নিশ্চুপ। হয়তো ভাবতে পারেনি এতটা বেইজ্জত তার প্রেমের প্রতিদানে ভোগ করতে হবে। সম্পূর্ণ পরিস্থিতিটাই ওর নিয়ন্ত্রণের বাইরে।

লালবাজারে এলাম। সন্ধ্যাকে দু'শ টাকা দিয়ে বললাম, "দারুণ কাজ করেছিস, যখন দরকার হবে ডাকলেই চলে আসবি। আমি আরও টাকা দেব।" সন্ধ্যা চলে গেল। পলাশ হতাশ হয়ে আমার টেবিলের সামনে বসে আছে। আমি সন্ধ্যাকে বিদায় করে ফিরে এলে ও বলল, "এটা কী করলেন, আমার মানসম্মান একেবারে ধুলোয় মিশিয়ে দিলেন।" আমি কঠিন, কালো রুক্ষ কাজ করছে। বললাম, "আমি তো আপনাকে বলেইছিলাম, আমার কথা মেনে নিন, নয়ত পস্তাতে হবে। অন্যের স্ত্রীর সঙ্গে প্রেম করার সুখ এখন সামলান।"

পলাশ আমার দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকাল। বিভ্রান্ত। ঠিক কি করবে

তা বুঝতে পারছে না। দৃষ্টিতে তারই স্পষ্ট ছাপ। বল এখন ওর কোর্টে, ও যদি জ্যোতির স্ত্রীর থেকে সরে যায়, তবে ওর মুক্তি তাড়াতাড়ি, নয়ত সন্ধ্যাকে নিয়ে নাটক যে বহু দৃশ্য মঞ্চস্থ হবে সেটা ও বুঝে গেছে, আর সেই নাটক যে ওকে আরও বেআবরু করে ছাড়বে তাও পলাশ বুঝতে পেরেছে।

পরদিন পলাশ আদালত থেকে জামিন পেল না। ওর বাড়ি থেকে বাজেয়াপ্ত করা সব সোনার জিনিস আদালতে জমা পড়ে গেল। মামলার নিষ্পত্তি হলে ওগুলির ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হবে।

আদালতে অভিযোগকারিনী সন্ধ্যাকেও নিয়ে যেতে হলো। নির্দেশ অনুযায়ী সকালবেলাতেই পাক্কা গৃহবধূ সেজে সন্ধ্যা লালবাজারে হাজির হয়েছিল। বাসন্তী রঙের একটা সিল্কের শাড়ি, কপালে দেখা যাওয়ার মতো গোল সিঁদুরের টিপ, সিঁথিতে চওড়া করে সিঁদুরের টান, হাতে নতুন শাঁখা ও পলা পরে আমার সামনে এসে হেসে বলেছিল, "ঠিক আছে তো স্যার?"

ওর দিকে এক ঝলক তাকিয়েই আমি উত্তর দিয়েছি, "দারুণ মেকআপ করেছিস। পলাশও চমকে যাবে।" সন্ধ্যা আমার কথায় যেন সামান্য লজ্জা পেল। ওর ভেতরের প্রাচীন ভারতীয় নারীসত্তা বোধহয় খানিকটা জেগে উঠল। হয়তো বা মনের গোপন লালিত ইচ্ছাটা বুকে উঠে হোঁচট খেয়ে থমকে দাঁড়াল। মনে মনে আমিও ওর জন্য মুহূর্তে দুঃখ অনুভব করলাম। মুহূর্তের জন্যই। তার বেশি নয়। আমরা যে পাষাণ। মনকে আইনের পেছনে চালাতে অভ্যস্ত। ওর ইচ্ছার গলাটাকে টিপে বলে উঠলাম, "শোন, তোর ভয় পাওয়ার কিছু নেই। কোর্টে যা করার আমাদের উকিলই তা করবে। তবু ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব যদি তোকে কিছু জিজ্ঞাসা করেন, তুই শুধু হুঁ, হ্যাঁ করবি। খুব বেশি হলে জানতে চাইবেন, গয়নাগুলি তোর কি না। তুই পলাশের স্ত্রী কি না। আজ এর থেকে বেশি কিছু জানতে চাইবেন না। ঠিক আছে?"

সন্ধ্যা একমনে আমার কথাগুলি শুনে জানাল, "ঠিক আছে।" আমরা সময়মতো আদালতে পৌঁছে গেলাম। সব কাজও দ্রুত সম্পন্ন হয়ে গেল। আদালতে সন্ধ্যাকে কোনও প্রশ্নই করা হলো না। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব শুধু একবার ঘোমটা টানা সন্ধ্যার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। ব্যাস।

পরদিন থেকে শুরু হয়ে গেল জ্যোতির স্ত্রীর লালবাজারে আগমন। আগমন তো নয়, ভূমিকম্পের মতো আগমন। রূপের ছটার ভূমিকম্প। সেই ভূমিকম্পের জের হৃৎপিণ্ডে কেউ টের পায়নি এমন কেউ তখন লালবাজারে

ছিল বলে বিশ্বাস হয় না। জ্যোতির স্ত্রীও সেটা জানে। সে কিন্তু উদ্যতভাবে নির্বিকার। সে এসেছে প্রেমিককে ছাড়াতে।

পলাশের মাও এখন ওখানে ছোটাছুটি করতে শুরু করলেন। বিফল। আমরা জ্যোতির স্ত্রীকে নানাভাবে বোঝালাম, জ্যোতির সঙ্গে লন্ডনে ফিরে যেতে। জ্যোতিও অনেক অনুনয় বিনয় করল। বোঝানোর চেষ্টা করল। কিন্তু ওর স্ত্রীর এক গোঁ। সে কিছুতেই আর ফিরে যাবে না।

এইভাবে কেটে গেল চারদিন। জ্যোতির স্ত্রীর রূপে আস্তে আস্তে বিষণ্নতার ছাপ ফুটে উঠতে লাগল। অবশ্য সেটা চেহারায়। কথাবার্তায় নয়। চোখের তিরের চাউনিতে নয়। গলার স্বরের পর্দা যেখানে যেমন লাগানোর দরকার ঠিক সেই লয়েই বেজে যাচ্ছে। অনেক সাধনা ও রেওয়াজ করে ওটা যে সে আয়ত্ত করেছে সেটাও সে অনায়াসে বোঝাতে চায় না। আমি জানি, ওটা ও মা'র কাছ থেকে শিখেছে।

পলাশ লালবাজারে বন্দি। ওর ওপর আমি ক্রমাগত চাপ দিয়ে চলেছি। পাঁচদিনের দিন ও ভেঙ্গে পড়ল। ও যেমন করেই হোক লালবাজার থেকে মুক্তি চায়। অবশেষে আমাকে কথা দিল, সে কিছুতেই জ্যোতির স্ত্রীকে বিয়ে করবে না। চেষ্টা করবে, সম্পর্ক না রাখার।

কথা আদায় করে পলাশকে জামিনে ছেড়ে দিলাম। জামিনে ছাড়া পেয়ে লজ্জায় নিজের বাড়িতে ফিরে না গিয়ে ও আত্মগোপন করে রইল।

জ্যোতির স্ত্রীর কিন্তু কোনও লজ্জা নেই। ও মামলা প্রত্যাহারের অনুরোধ নিয়ে প্রায় দিনই লালবাজারে আসতে লাগল। এত বেপরোয়া নারী আমি আগে কখনও দেখিনি। অবৈধ প্রেমের পরিণতির লক্ষ্যে স্থির। গোপনে নয়, ঘোষণা করে। তাই ওর অনুরোধের বদলে আমাদের অনুরোধ মানতেও রাজি নয়। ও কোনও অবস্থাতেই পলাশকে ছাড়বে না, লন্ডনেও ফিরে যাবে না। পলাশের মধ্যে কোন কৃষ্ণকে ও পেয়েছে একমাত্র ওই জানে।

স্নায়ুযুদ্ধের টানাপোড়েনে এইভাবে চলে গেল প্রায় মাসখানেক। জ্যোতি অধৈর্য হয়ে হাল ছেড়ে দিল। একদিন আমাদের ধন্যবাদ জানিয়ে দুই শিশু সন্তানকে নিয়ে লন্ডনে ফিরে গেল। স্ত্রীকে কার্যত পরিত্যাগ করেই। যে শিশু দুটো তাদের মাকে ফিরিয়ে নিতে কলকাতায় এসেছিল, তারা একবার তাদের মাকে দেখতেও পেল না।

এরপর আমাদের আর কী করার আছে। সন্ধ্যাকে নিয়ে মামলার নাটক আর বিস্তৃত করলাম না। নকল গৃহবধূর সাজ ছেড়ে সন্ধ্যা তার প্রতিদিনের জীবনে ফিরে গেল।

৩১১

পলাশকে মামলা থেকে অব্যাহতি দিয়ে দিলাম। সোনা গহনা ফিরে পেল। ও কিন্তু কথা রাখল। জ্যোতির স্ত্রীকে ও বিয়ে করল না। যদিও আইনত তখনও বাধা ছিল। জ্যোতির সঙ্গে ওর স্ত্রীর সবরকম বিচ্ছেদ হয়ে গেলেও আইনি বিচ্ছেদ হয়নি। কিন্তু ওরা বিয়ে করলে জ্যোতি কোনও বাধাই সৃষ্টি করত না। এরপর জ্যোতির স্ত্রীই পলাশের রক্ষিতা হিসাবে বাকি জীবন কাটিয়ে দিতে স্থির করল। মায়ের পথেই মেয়েও পা রাখল। অদ্ভুত চরিত্র, স্বামী, সন্তান, সংসার ছেড়ে রক্ষিতা হিসাবে থাকতেই ওর বেশি সুখ, বেশি শান্তি। কার কোথায় সুখের আধার ধরা আছে কে জানে। সৃষ্টির রহস্যের মধ্যেই কী?